শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়

ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

Text Book on Economics & Civics for Higher Secondary & Multipurpose Schools—Written strictly in accordance with the latest approved Syllabus of the Board of Secondary Education, West Bengal, for Classes IX-XI.

ধনবিজ্ঞান
ও
পৌরবিজ্ঞান

[উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত]

শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ.
অধ্যাপক, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

Library

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

DHANABIJNAN O POURABIJNAN
(Economics & Civics in Bengali for
Higher Secondary Students)
By K. L. Chatterjee, M. A.
Price : Rs. 7·00 only

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার,
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

* * * * *
প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
মূল্য : ৭·০০ (সাত টাকা) মাত্র
* * * * *

Date 24. 7. 2008
No. 13660

মুদ্রাকর :
প্রথম খণ্ড : শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

দ্বিতীয় খণ্ড : শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড্ আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা-১২

ভূমিকা

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (Syllabus) অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পুস্তক বিশেষ যত্ন সহকারে রচিত হইয়াছে। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলি যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু অনাবশ্যক বিষয়ের অবতারণা করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা হয় নাই। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন এবং অন্যান্য সম্ভাব্য প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি পুস্তকে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এই পুস্তকখানি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে ছাত্রছাত্রীরা সমুদয় প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিবে। 'ধনবিজ্ঞান' অংশে যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। 'পৌরবিজ্ঞান' অংশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল নীতিগুলি এবং ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন দিক সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভাষার সরলতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্বপ্রকারে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সহায়ক বিবেচিত হইলে আমার পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব।

গ্রন্থকার

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
BANIPUR

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ ধনবিজ্ঞান

নবম শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

প্রথম অধ্যায়

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু (Definition and Scope of Economics) ... ৩—৬

বিনিময়, ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, ধনবিজ্ঞানের স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ণয় (Some Definitions) ৭—১২

অভাব, উপযোগ, দ্রব্য, দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ, ধন, ধনের শ্রেণীবিভাগ, ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্য, মূল্য ও দাম।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production) ১২—১৮

অভাব মোচন, উৎপাদন কাহাকে বলে, উৎপাদনের উপাদান কি কি, জমি, শ্রম, মূলধন, উদ্যোগ বা সংগঠন।

চতুর্থ অধ্যায়

জমি (Land) ... ১৯—২৪

জমি শব্দের তাৎপর্য, জমির বৈশিষ্ট্য, জমির প্রয়োজনীয়তা, গভীর চাষ ও ব্যাপক চাষ, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের ব্যতিক্রম, কৃষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রম (Labour) ... ২৪—৪৫

উৎপাদক শ্রম, শ্রমের সরবরাহ, জনসংখ্যা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি, ম্যাল্‌থাসের মতবাদ, জনসংখ্যা ও আর্থিক উন্নতি-অবনতি, ভারতের জন-সংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন, জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়, কাম্য জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা, শ্রমিক সংখ্যা, ভারতের শ্রমিক সংখ্যা, কাজের সময়, শ্রমদক্ষতা, ভারতীয় শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য, বেকার সমস্যা, বেকার অবস্থার প্রকারভেদ, বেকার সমস্যার সমাধান, ভারতে বেকার সমস্যা, ভারতে বেকার-সমস্যার সমাধান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারিগরি নৈপুণ্য (Technical Skill) ... ৪৬—৪৯

কারিগরি নৈপুণ্য কাহাকে বলে, কারিগরি নৈপুণ্যের প্রয়োজনীয়তা, কারিগরি নৈপুণ্য গঠনের উপায়, ভারতে কারিগরি নৈপুণ্যের সমস্যা।

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন (Capital) ... ৪৯—৫৬

মূলধন কাহাকে বলে, মূলধনের প্রকারভেদ, উৎপাদনের ব্যাপারে মূলধনের কার্যাবলী ও গুরুত্ব, মূলধনের সংগ্রহ ও বৃদ্ধি, ভারতে মূলধনের সমস্যা।

অষ্টম অধ্যায়

জাতীয় আয় (National Income) ... ৫৭—৬৯

জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়, জাতীয় উৎপাদন (জাতীয় আয়) নির্ণয়ের মাপকাঠি, জাতীয় আয় পরিমাপের উপায়, জাতীয় আয় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপায়, মাথা পিছু আয়, জাতীয় আয় বণ্টন, জীবন যাপনের মান, ভারতের জাতীয় আয়।

নবম অধ্যায়

আর্থিক গঠন ব্যবস্থা (Economic Structure) ৬৯—৭৪

অর্ধোন্নত আর্থিক গঠন কাহাকে বলে, অর্ধোন্নত আর্থিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য, আর্থিক উন্নয়নের উপায়।

দশম শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

দশম অধ্যায়

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান (Forms of Business Organisation) ... ৭৭—৯১

একমালিকী প্রথা, অংশীদারী প্রথা, যৌথ মূলধনী প্রথা, যৌথ মূলধনী প্রথার সুবিধা-অসুবিধা, সমবায় প্রথা, সমবায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, সমবায় প্রথার নীতি, সমবায় সমিতির প্রকারভেদ, সমবায় প্রথার সুবিধা-অসুবিধা, ভারতে সমবায় প্রথা, ভারতে সমবায় আন্দোলনের ত্রুটি।

একাদশ অধ্যায়

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন (Scale of Business) ৯২—৯৬

ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণ, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তনের সীমাবদ্ধতা, ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের সুবিধা।

দ্বাদশ অধ্যায়

উৎপাদনে বিশেষীকরণ (Specialisation) ৯৬—১০২

শ্রমবিভাগ, শ্রমবিভাগের গুণাগুণ, শিল্পের একদেশতা, শিল্পের একদেশতার কারণ, শিল্পের একদেশতার সুবিধা-অসুবিধা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকা (Economic Role of the Government) ... ১০২—১১০

অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের কার্যাবলী, সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষে যুক্তি, সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতে উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning in India) ... ১১১—১৪৪

ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূত্রপাত, স্বাধীন ভারতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের প্রাক্কালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা, কৃষি, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প, পরিবহন ও সংসরণ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অর্থবরাদ্দের প্রকারভেদ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে খরচের প্রকারভেদ, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সরকারী আয়ব্যয় (Government Finances) ১৪৪—১৫৬

সরকারী অর্থব্যয়, সরকারের আয়ের রকম-ভেদ, করের নীতি, ক্রমবর্ধমান হার, ক্রমহ্রাসমান হার, সমহার, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, প্রত্যক্ষ করের গুণাগুণ, পরোক্ষ করের গুণাগুণ, সরকারের ঋণ গ্রহণ, বাজেট, উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ।

ষোড়শ অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাঙ্ক (Money and Banking) ১৫৬—১৭২

দ্রব্য বিনিময় প্রথা, অর্থ, অর্থের কাজ, অর্থের মান, ব্যাঙ্ক-প্রথা, ব্যাঙ্কের প্রকারভেদ, ব্যাঙ্কের কার্যাবলী, আস্থাপত্র, ব্যাঙ্ক-স্থষ্ট অর্থ, অর্থ-স্থষ্টি।

সপ্তদশ অধ্যায়

সাধারণ দর-দাম (General Price) ... ১৭২—১৮১

সাধারণ মূল্যস্তর, সাধারণ মূল্যস্তরের ধারণার গুরুত্ব, সাধারণ মূল্যস্তরের স্থত্র, সাধারণ মূল্যস্তরের নিয়ন্ত্রণ, অর্থস্ফীতি, অর্থস্ফীতির ফলাফল, সাধারণ মূল্যস্তরের তারতম্যের পরিমাপ, দর পরিবর্তনের স্থচক সংখ্যা।

একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

অষ্টাদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) ১৮৫—২০৩

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে, আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ, আপেক্ষিক স্থবিধার অথবা ব্যয়ের নিয়ম, বহির্বাণিজ্যের স্থবিধা-অস্থবিধা, সংরক্ষণ নীতি, ভারতের বহির্বাণিজ্য নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত, বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্ত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য, ভারতের পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত, ভারতের বৈদেশিক চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত।

উনবিংশ অধ্যায়

বাজার (The Market) ... ২০৩—২০৯

'বাজার' কথাটির তাৎপর্য, বাজারের প্রকারভেদ।

বিংশ অধ্যায়

চাহিদা (Demand) ... ২১০—২১৭

চাহিদার নিয়ম, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, জিনিস অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, আয় অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, চাহিদা, উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র উপযোগ।

একবিংশ অধ্যায়

যোগান (Supply) ... ২১৮-২২৮

যোগানের নিয়ম, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, উৎপাদন ব্যয়, পরিবর্তনীয় ব্যয় ও অপরিবর্তনীয় ব্যয়, মৌলিক ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, গড়পড়তা ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়, সাধারণ লাভ : প্রান্তিক কারখানা, সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদনের হার : ব্যয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দাম নির্ধারণ (Price Determination) ... ২২৯—২৪৬

মূল্য ও দাম, দাম ও সাধারণ মূল্যস্তর, দাম-নির্ধারণের প্রধান উপাদান, চাহিদা ও যোগানের সাম্য, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জিনিসের মূল্য বা দাম, দাম নির্ধারণে কালের গুরুত্ব, বাজার দর ও স্বাভাবিক দর, অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জিনিসের মূল্য বা দাম, একচেটিয়া ব্যবসায়, উৎপাদনের উপাদানের ব্যবহার মূল্য।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মজুরি (Wages) ... ২৪৭—২৫৮

মজুরির হার, আর্থিক মজুরি ও বাস্তব মজুরি, মজুরির নির্ধারণ, শ্রমের চাহিদা, শ্রমের যোগান, শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং মজুরি, মজুরির নিম্নতম ও ঊর্ধ্বতম হার, একচেটিয়া ব্যবসায়ে মজুরির হার, বিভিন্ন শিল্পে এবং ব্যবসায়ে মজুরির হারের তারতম্য হয় কেন, শ্রমিক সংঘ, ভারতে শ্রমিক সংঘ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মুনাফা (Profits) ... ২৫৮—২৬১

মুনাফার উদ্ভবের কারণ, উদ্যোক্তার আয়-নির্ধারণ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

খাজনা (Rent) ... ২৬১—২৬৬

খাজনার সংজ্ঞা, উৎপাদনের উপাদানগুলির আয় নির্ধারণের সাধারণ নিয়ম, জমির খাজনার উদ্ভব ও নির্ধারণ, জমি ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদকের খাজনা, খাজনা নির্ধারণের বিস্তারিত আলোচনা।

ষড়বিংশ অধ্যায়

সুদ (Interest) ... ২৬৬—২৭৪

সুদ ও অর্থ, সুদের হার নির্ধারণ, অর্থের চাহিদা, নগদ টাকা হাতে রাখার উদ্দেশ্য, অর্থের যোগান, সরকার ও সুদের হার, সরকার কর্তৃক টাকার চাহিদা কমানো, সরকার কর্তৃক টাকার যোগান বাড়ানো, সরকার কর্তৃক টাকার চাহিদা বাড়ানো, সরকার কর্তৃক টাকার যোগান কমানো, সুদের হারের বিভিন্নতা।

W. B. Higher Secondary Examination Questions, 1960, 1961 ২৭৫—২৭৬

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড : পৌরবিজ্ঞান

নবম শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

প্রথম অধ্যায়

পরিবার ও সমাজ (Family and Society) ... ৩—৮

পৌরবিজ্ঞান কাহাকে বলে, সমাজ, সমাজের বিবর্তন, পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার, ভারতীয় যৌথ পরিবার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র (State) ... ৯—২০

রাষ্ট্র কাহাকে বলে, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি : ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ, ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি।

তৃতীয় অধ্যায়

সরকার (Government) ... ২০—৩৮

রাষ্ট্র ও সরকার, সরকারের বিভিন্ন রূপ, গণতন্ত্র, পরোক্ষ গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্রের গুণ, গণতন্ত্রের ত্রুটি, গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, পার্লামেণ্টারি সরকার, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার।

চতুর্থ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Organs of Government and Separation of Powers) ৩৮—৪৫

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, ব্যবস্থা বিভাগের কার্য, আইন-সভার গঠন, শাসন বিভাগের

কার্য, শাসন বিভাগের গঠন, বিচার বিভাগের কার্য, বিচার বিভাগের গঠন।

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের কার্যাবলী (Functions of Government) ৪৬-৫৭

রাষ্ট্রের বা সরকারের কর্তব্য, রাষ্ট্রের বা সরকারের মুখ্য কর্তব্য, রাষ্ট্রের বা সরকারের গৌণ কর্তব্য, ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) ... ৫৭—৬৬

জাতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ, জাতিসঙ্ঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূলনীতি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরখানা।

দশম শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকতা (Citizenship) ... ৬৯—৭৪

নাগরিক, নাগরিকতা লাভের উপায়, নাগরিকতার বিলোপ, সুনাগরিকতা, সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক।

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties of a Citizen) ... ৭৪—৮৪

অধিকার কাহাকে বলে, কর্তব্য কাহাকে বলে, বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার, বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক বা পৌর অধিকার, বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক অধিকার, রাষ্ট্রের

প্রতি নাগরিকের কর্তব্য, পরিবার ও সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য, অধিকার ও কর্তব্য।

নবম অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty) ৮৫—৯১

আইন কাহাকে বলে, আইনের উৎস, আইন ও নীতি, স্বাধীনতা, স্বাধীনতার বিভিন্নরূপ, আইন এবং স্বাধীনতা।

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্রকৃত্যক (Public Services) ... ৯১—৯৪

রাষ্ট্রকৃত্যক, জনপালনকৃত্যক, দেশরক্ষাকৃত্যক, রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ।

একাদশ অধ্যায়

জনমত (Public Opinion) ... ৯৪—৯৯

জনমতের সংজ্ঞা, জনমত গঠনের উপায়, জনমতের বাহন, জনমতের প্রয়োজনীয়তা।

দ্বাদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল (Political Parties) ... ৯৯—১০৫

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী, দলপ্রথার সুফল, দলপ্রথার কুফল।

একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : প্রস্তাবনা (Constitution of India : Preamble) ১০৯—১১২

ভারতের সংবিধান, ভারতের স্বাধীনতা, সংবিধানের প্রস্তাবনা।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান ঃ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি (Fundamental Rights and Directive Principles) ... ১১২—১১৯

মৌলিক অধিকার কাহাকে বলে, ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিসমূহ, ভারতের নাগরিক, ভোট-দানের অধিকার।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান ঃ যুক্তরাষ্ট্র ১২০—১২৬

যুক্তরাষ্ট্রের গঠন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন-প্রণয়নের ও শাসনকার্যের ক্ষমতা বিভাগ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি।

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান ঃ রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১২৬—১৪১

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতির সহিত পার্লামেন্টের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রপতির অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতির বিচার বিষয়ক ক্ষমতা, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিসভার সম্বন্ধ, সংবিধানে রাষ্ট্রপতির স্থান, উপ-রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিসভার নিয়োগ, প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সহিত পার্লামেন্টের সম্বন্ধ, মন্ত্রীদের কার্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান ঃ কেন্দ্রীয় আইনসভা ১৪২—১৪৫

পার্লামেন্ট, রাজ্যসভা, লোকসভা, পার্লামেন্টের কার্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান ঃ রাজ্যপাল ও রাজ্যের মন্ত্রিসভা ১৪৬—১৫৩

রাজ্যপাল, রাজ্যপালের ক্ষমতা, রাজ্যের মন্ত্রিসভা, জম্মু ও কাশ্মীর, কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : রাজ্যের আইনসভা — ১৫৩—১৫৭

বিধান পরিষদ, বিধানসভা, রাজ্যের আইনসভার কার্য, কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড, আঞ্চলিক পরামর্শ সভা, নির্বাচন কেন্দ্র।

বিংশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : কেন্দ্র ও রাজ্য সম্বন্ধে নানা কথা — ১৫৭—১৬১

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্বন্ধ, কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়, রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়।

একবিংশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : বিচার-ব্যবস্থা — ১৬১—১৬৫

বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, জেলার বিচারালয়, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

স্থানীয় শাসন — ১৬৫—১৬৯

স্থানীয় শাসন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, মিউনিসিপ্যালিটি, কলিকাতা কর্পোরেশন, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, জেলা বোর্ড, গ্রাম-পঞ্চায়েত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পল্লী ও শহরের সমস্যা — ১৬৯—১৭৬

গ্রামের সমস্যা, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠন, শহরের সমস্যা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

দেশরক্ষার ব্যবস্থা — ১৭৭—১৭৯

ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর।

পরিশিষ্ট — ১৮০—১৮৫

W. B. Higher Secondary Examination Questions, 1960, 1961. — ১৮৬—১৮৮

Board of Secondary Education, West Bengal,

Syllabus in
Elements of Economics & Civics

For Higher Secondary Examination.

DISTRIBUTION OF MARKS

Paper I	—	Economics	(ধনবিজ্ঞান)	—	100 marks
Paper II	—	Civics	(পৌরবিজ্ঞান)	—	100 ,,

The objects that have been kept in view in preparing the syllabus are :

(a) to help the students understand and take an intelligent interest in the everyday problems of our economic life,

(b) to prepare them as future citizens to appreciate and to take an intelligent part in the affairs of the country, and

(c) to provide those amongst them who intend to take up the 3-Year Degree Course in Economics with the necessary theoretical background.

A. Economics

CLASS IX

1. National Income and its distribution—per capita income—standard of living.
2. Broad factors determining national income—factors of production.
3. Population—population and food supply—population and national income—labour supply—unemployment.
4. Natural resources—land and its productivity.
5. Capital—factors governing the accumulation of capital.
6. Technical skill—its importance—factors governing its formation.

7. Economic structure—main structural features of an under-developed economy—requirements for economic development.

CLASS X

8. Forms of business organisation—Single-owner firm—Partnership—Joint-Stock Companies.
   Co-operation—principles—different types of co-operative societies and their main features.
   Small and Large scale industries.
9. Role of the Government—economic functions of the Government—Government and development planning—Indian 5-Year Plans.
10. Government finances—taxation, expenditure and borrowing —financing of development.
11. Money—functions of money—monetary standards— creation of money—Banks—Commercial Banks—Central Bank —Functions of Banks—Bank money.
12. The General price level—measurement of changes in the general price level—simple index numbers—inflation.

CLASS XI

13. International Trade : territorial division of labour—Balance of Trade and Balance of Payments—Protection and Free Trade.
14. Markets—forms of markets—Competition and Monopoly.
15. Price determination under different market conditions—factors governing demand : price changes and income variations, elasticity of demand—factors governing supply and supply price : increasing and diminishing returns.
16. Different types of factor incomes—wages, interest, rent and profits—Collective bargaining and Trade Unions.

N.B. The subject is to be treated with special reference to Indian conditions.

B. Civics

CLASS IX

1. The evolution of human society. The Family. The patriarchal and matriarchal families. The Indian joint-family.
2. The State : its origin and characteristics.
3. The Government. Forms of Government. Democracy and Dictatorship. Merits and defects of Democracy. Unitary and Federal Government. Parliamentary and Presidential Government.
4. Organs of Government. Separation of Powers. Departments of Government.
5. Functions of Government.
6. The Individual and Society. Socialism.
7. The Nation. Right of Self-determination. United Nations.

CLASS X

8. The Citizen ; how citizenship is acquired and lost ; qualities of a good citizen ; hindrances to good citizenship.
9. The Citizen's Rights. The Right to Vote : its importance and implications.
10. The Citizen's Duties—to the family, to the community, to the State,
11. Rights and Duties.
12. Law and Liberty.
13. Public Services.
14. Public Opinion. Organs of Public Opinion.
15. Political Parties.

CLASS XI

16. A brief outline of the Constitution of India with special reference to—

    The Preamble.

    Fundamental Rights ; Directive Principles. The Indian Citizen.

    Franchise.

The Federation of India.
The Distribution of Powers.
The President—how he is elected. Powers of the President.
The Union Parliament. Control of the Executive by the Legislature.
The States. The Governor. The State Legislature.
Relation between the Centre and the States.
Heads of Revenues and Expenditures for Union and State Governments.
The Judiciary. The Supreme Court.
The Indian Political Parties.

17. Local Government.
18. Civic Problems. Village Improvement. Community Development Projects. Towns and Cities. Food. Housing. Sanitation. Health.
19. Defence of India. The Army, the Navy and the Air Force. Voluntary Defence Organisations. The National Cadet Corps.

প্রথম খণ্ড

ধনবিজ্ঞান

নবম শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

W. B. Secondary Board Syllabus in Economics for Class IX

1. National Income and its distribution—per capita income—standard of living.
2. Broad factors determining national income—factors of production.
3. Population—population and food supply—population and national income—labour supply—unemployment
4. Natural resources—land and its productivity.
5. Capital—factors governing the accumulation of capital.
6. Technical skill—its importance—factors governing its formation.
7. Economic structure—main structural features of an under-developed economy—requirements for economic development.

প্রথম অধ্যায়

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

(Definition and Scope of Economics)

বিনিময় (Exchange)—সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমান জগতে বেশীর ভাগ লোকই বিশেষ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জন করে। যেমন, একজন ডাক্তার চিকিৎসা করিয়া রোগীর নিকট হইতে পারিশ্রমিক পান। সমাজের অন্য অনেক লোক আবার বহুবিধ জিনিসপত্র—কেহ খাদ্য, কেহ বস্ত্র ইত্যাদি—প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। চিকিৎসার পরিবর্তে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ডাক্তার তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র—খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করেন। বস্তুত তিনি তাঁহার কাজের বদলে এই সব জিনিসপত্র পান। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি কাজের বদলে টাকা পান এবং সেই টাকার বদলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তৈয়ারি জিনিসপত্র পান। এইভাবে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন লোকের পরিশ্রম ও জিনিসপত্রের বিনিময় চলে। তবে অর্থের মাধ্যমে এই বিনিময়কার্য সম্পন্ন হয়।

অর্থের মাধ্যমে শুধু বিনিময়কার্যই সম্পন্ন হয় না। ইহার দ্বারা সঞ্চয়ের কার্যও চলে। আমাদের উদাহরণে উল্লিখিত ডাক্তার শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই কেনেন না, তিনি ভবিষ্যতের জন্যও কিছু সংস্থান রাখিতে চান। এই জন্য তিনি সব টাকা এখন খরচ না করিয়া কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে পারেন। ব্যাঙ্কে এইরকম বহু লোকের বহু টাকা জমা হয়। সেই টাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়।

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় (Scope of Economics)—বর্তমান জগতে বিভিন্ন রকমের কার্যাবলীর ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটে। ধরা যাক, আমাদের উদাহরণের উল্লিখিত ডাক্তার সকালে উঠিয়া এক পেয়ালা চা পান করেন। এই চা তাঁহার কাছে পৌছাইতে কি কি ধরণের কর্ম সম্পাদিত হইয়াছে তাহা যদি ভাবিয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব পৃথিবীতে সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য লোকে কি করে।

W. B. Secondary Board Syllabus in Economics for Class IX

1. National Income and its distribution—per capita income—standard of living.
2. Broad factors determining national income—factors of production.
3. Population—population and food supply—population and national income—labour supply—unemployment
4. Natural resources—land and its productivity.
5. Capital—factors governing the accumulation of capital.
6. Technical skill—its importance—factors governing its formation.
7. Economic structure—main structural features of an under-developed economy—requirements for economic development.

প্রথম অধ্যায়

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

(Definition and Scope of Economics)

বিনিময় (Exchange)—সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমান জগতে বেশীর ভাগ লোকই বিশেষ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থ উপার্জন করে। যেমন, একজন ডাক্তার চিকিৎসা করিয়া রোগীর নিকট হইতে পারিশ্রমিক পান। সমাজের অন্য অনেক লোক আবার বহুবিধ জিনিসপত্র—কেহ খাদ্য, কেহ বস্ত্র ইত্যাদি—প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। চিকিৎসার পরিবর্তে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ডাক্তার তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র—খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করেন। বস্তুত তিনি তাঁহার কাজের বদলে এই সব জিনিসপত্র পান। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি কাজের বদলে টাকা পান এবং সেই টাকার বদলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তৈয়ারি জিনিসপত্র পান। এইভাবে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন লোকের পরিশ্রম ও জিনিসপত্রের বিনিময় চলে। তবে অর্থের মাধ্যমে এই বিনিময়কার্য সম্পন্ন হয়।

অর্থের মাধ্যমে শুধু বিনিময়কার্যই সম্পন্ন হয় না। ইহার দ্বারা সঞ্চয়ের কার্যও চলে। আমাদের উদাহরণে উল্লিখিত ডাক্তার শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই কেনেন না, তিনি ভবিষ্যতের জন্যও কিছু সংস্থান রাখিতে চান। এই জন্য তিনি সব টাকা এখন খরচ না করিয়া কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে পারেন। ব্যাঙ্কে এইরকম বহু লোকের বহু টাকা জমা হয়। সেই টাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়।

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় (Scope of Economics)—বর্তমান জগতে বিভিন্ন রকমের কার্যাবলীর ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটে। ধরা যাক, আমাদের উদাহরণের উল্লিখিত ডাক্তার সকালে উঠিয়া এক পেয়ালা চা পান করেন। এই চা তাঁহার কাছে পৌছাইতে কি কি ধরণের কর্ম সম্পাদিত হইয়াছে তাহা যদি ভাবিয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব পৃথিবীতে সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য লোকে কি করে।

হয়ত এই চা দার্জিলিংএর চা-বাগানে জন্মিয়াছে। চা জন্মাইতে প্রথমে চাই জমি। দার্জিলিংএর পাহাড়ের ঢালু জায়গায় বনজঙ্গল কাটিয়া চাষের উপযোগী করিয়া চায়ের গাছ জন্মানো হইল। তারপর কচি পাতা তুলিয়া মেসিনে শুকানো হইল। ঝাড়িয়া বাছিয়া বিভিন্ন প্রকার চা আলাদা করিয়া প্যাকিং বাক্সে ভর্তি করা হইল। এই সব কাজ করিতে কুলি লাগে এবং তাহাদের মজুরি দিতে হয়। তারপর চা-বাগানের মালিক বাক্সে ভর্তি করিয়া চা কলিকাতায় চালান করিল। কলিকাতায় চা-এর নিলাম ঘরে চা ব্যবসায়ীরা পাইকারী দরে চা কিনিল। তারপর বিভিন্ন দোকানে খুচরা বিক্রয় হইল।

কিন্তু ইহাতেই ঠিক বোঝা যায় না কত লোক এই চা-এর উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে কাহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছে। মেশিন ইত্যাদি কিনিবার জন্য এবং চা বিক্রয় করিয়া টাকা পাইবার পূর্বেই কুলিদের মজুরি দিবার জন্য অনেক সময় ব্যাঙ্কের সাহায্য লইবার দরকার হয়। উৎপাদন এবং বিক্রয়ে যে লোকসানের ঝুঁকি আছে তাহা চা কোম্পানীর অংশীদারগণ লইয়াছে, অথবা যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের একার চা-বাগান থাকে তাহা হইলে সে নিজেই লইয়াছে। চা-এর মেশিন চালাইতে বিদ্যুৎ খরচ হইয়াছে। আবার বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ীরা কেহ মেশিন, কেহ চা-এর বাক্স ইত্যাদি সরবরাহ করিয়াছে। বাড়ীতে চা তৈয়ারি করিতে কয়লার আগুন লাগিয়াছে, চিনি-দুধ লাগিয়াছে; চা-এর কেটলি, পেয়ালা, পিরিচ, ছাঁকনি, চামচ ইত্যাদি লাগিয়াছে।

প্রতিটি জিনিস তৈয়ারি হইয়া গৃহস্বামীর কাছে পৌছিতে বহু লোকের সাহায্য লাগিয়াছে, বহু সময় ব্যয় হইয়াছে।

উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে এইরূপ বিভিন্ন ধরণের কাজ ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কাজটি হাতে করা ভাল না মেশিনে করা ভাল, বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান না ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানে করা উচিত, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা হইতে আসে, যদি ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয়া থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক টাকা পাইল কোথায়, কিরূপে কাঁচা মালের এবং তৈয়ারি মালের দাম ঠিক হয়, বিভিন্ন শ্রমিক কিরূপ মজুরি বা বেতন পায়, মজুরির হারের তারতম্যের কারণ কি, বিদেশ হইতে আমদানী জিনিসের

দাম কি ভাবে দেওয়া হয়—এই ধরণের বিষয়গুলি হইল অর্থসংক্রান্ত সমস্যা। সমাজবদ্ধ মানুষের এই সকল অর্থসংক্রান্ত সমস্যাই হইল ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Economics)—ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষণ করিয়াই ইহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়।

প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে। ধর্ম, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা, সাংসারিক কাজকর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়া মানুষ জীবন যাপন করে। তবে ধনবিজ্ঞানে প্রধানত লোকের সাংসারিক কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা চলে। ধনবিজ্ঞান পাঠ করিলে জানিতে পারি কি ভাবে এবং কেন লোকে অর্থ উপার্জন, ব্যয় ও সঞ্চয় করে। অর্থ উপার্জন, ব্যয় ও সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য অভাব দূর করা। অভাব মিটাইবার উপযোগী জিনিস অপ্রচুর। এই অপ্রাচুর্যের সমস্যা ও তাহার সমাধান আলোচনা করা ধনবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

মনে রাখিতে হইবে, যাহারা সমাজের বাহিরে নির্জন জীবন যাপন করে তাহাদের বিষয় লইয়া ধনবিজ্ঞানে আলোচনা হয় না। যে সকল সন্ন্যাসী লোকালয়ের বাহিরে পর্বতগুহায় থাকিয়া ধ্যানধারণার মধ্যে জীবন কাটান ধনবিজ্ঞানে তাঁহাদের কথা কিছু বলা হয় না। ধনবিজ্ঞান কেবলমাত্র সমাজ-বদ্ধ মানুষের অর্থসংক্রান্ত দিক বিবেচনা করে।

ধনবিজ্ঞানের স্বরূপ—উনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন মনীষী ধনবিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁহাদের মতে, ধনবিজ্ঞান মানুষের অর্থসংক্রান্ত দিক ব্যতীত অন্যান্য সব দিক উপেক্ষা করে। মানুষকে এমনভাবে দেখা হয় যে সে যেন ধর্ম, নীতি, দয়া, মায়া, সমাজপ্রীতি ইত্যাদি সব কিছু বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র নিজের আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। আইন-কানুনগুলি কোন রকমে আক্ষরিকভাবে পালন করিয়া একে অপরকে কিরূপে হটাইয়া দিয়া—দরকার হইলে ঠকাইয়া—নিজের স্বার্থ সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিতে পারে, ধনবিজ্ঞান সেই বিষয়ে আলোচনা করে, ইহাই হইল উপরোক্ত মনীষীদের মত। সেই জন্য, তাঁহাদের মতে ধনবিজ্ঞান অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক শাস্ত্র।

কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা ঠিক নহে। ধনবিজ্ঞান মানুষকে কেবলমাত্র একটি অর্থলিপ্সু প্রাণী বলিয়া ধরিয়া লয় না। ইহাতে গোটা মানুষের

কথাই—স্নেহ-প্রীতি, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি দোষে-গুণে ভরা মানুষের কথাই—ভাবা হয়। তবে এই দোষ-গুণ-সমন্বিত মানুষের সব দিকই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা না করিয়া ধনবিজ্ঞানে তাহার একটা দিক বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, ধনবিজ্ঞানে মানুষকে কেবলমাত্র অর্থসংগ্রহের যন্ত্র অর্থাৎ অমানুষ বলিয়া কল্পনা করা হয় না। অর্থের দ্বারা দৈহিক ও মানসিক উন্নতি হয়। ইহাকে অকল্যাণের বস্তু মনে করা ভুল। আর সমাজবদ্ধ মানুষ অশেষ প্রতিযোগিতার মধ্যেও প্রতিবেশীকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে কল্যাণের কথাই—কেবলমাত্র আত্মকল্যাণ নহে, সমাজকল্যাণও—আলোচনা করা হয়।

ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহাতে কোন ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত না থাকে, সেইজন্য আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অনেকে কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞানের (Welfare Economics) আলোচনা করেন। এই শাস্ত্রে কিভাবে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত সমষ্টিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমন্বয় সাধন করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করা হয়। আমার বাড়ীতে কারখানা খুলিয়া আমি কিছু লাভ করিতে পারি, কিন্তু সেই কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় আমার প্রতিবেশীর স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। সুতরাং সমষ্টিগত লাভের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে আমার ব্যক্তিগত লাভ হইতে আমার প্রতিবেশীর চিকিৎসার খরচ বাদ দিতে হইবে এবং এই সমষ্টিগত লাভের কথা চিন্তা করিয়াই আমার বাড়ীতে কারখানা খোলা উচিত কিনা তাহা ঠিক করিতে হইবে। কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞানে এই ধারার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

প্রশ্ন

1. Define Economics. What do you mean by Welfare Economics ?

('ধনবিজ্ঞান' কাহাকে বলে ? 'কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান' বলিলে কি বোঝ ?) [৫-৬ পৃষ্ঠা]

2. "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life." Explain.

("ধনবিজ্ঞানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ আলোচিত হয়"—এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।) [৫-৬ পৃষ্ঠা]

3. What is the scope of Economics ?

(ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি ?) [৩-৫ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকটি বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ণয়

(Some Definitions)

ধনবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথার তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।

অভাব (Wants)—'অভাব' বলিতে আমরা কি বুঝি ? মানুষ বিভিন্ন জিনিস ভোগ করিতে চায়। এই ভোগের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না। তাহার ফলে অভাববোধ জন্মে। এই অভাব পূরণের জন্য লোক অর্থ-সংক্রান্ত কার্যের প্রেরণা পায়। মানুষের অভাব অনন্ত। অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটিলে আসবাবপত্রের অভাব বোধ হয়। আসবাবপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইলে বিভিন্ন রকমের বিলাসদ্রব্য পাইতে ইচ্ছা হয়। তাহাতেও আকাঙ্ক্ষা মেটে না। কোন একটা বিশেষ জিনিসের অভাব দূর হইলেও অন্য অনেক জিনিসের অভাব দেখা দেয়। বাস্তবিক পক্ষে অভাব নিত্যই বাড়িতেছে, অর্থাৎ মানুষ নিত্য নূতন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। প্রত্যেক লোকই প্রায় প্রত্যেকটি জিনিস চাহিতেছে। কিন্তু যে সকল জিনিসে মানুষের অভাব মোচন হয় তাহার প্রায় সবগুলিই সীমাবদ্ধ। কাজেই যাহাদের চাহিদা আছে তাহাদের মধ্যে এই পরিমিত জিনিসগুলি ভাগ করিয়া দেওয়ার উপায় বাহির করিতে হয়। সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার গোড়ার কথা হইল এই : সসীম দ্রব্যসম্ভার দ্বারা মানুষের অসীম অভাব কি ভাবে দূর করা যায় ?

উপযোগ (Utility)—অভাব পূরণের জন্য আমরা আলো, হাওয়া, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি জিনিসপত্র ব্যবহার করি। সুতরাং এইরূপে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের একটি ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাটি হইল আমাদিগকে কতকাংশে তৃপ্ত করার, আমাদের অভাবগুলি কিছু পরিমাণে মিটাইবার ক্ষমতা। অভাব দূর করিবার এই ক্ষমতাটিকে ধনবিজ্ঞানে 'উপযোগ' (utility) বলে।

মনে রাখিতে হইবে যে অভাব যেমন নীতিসম্মত তেমন নীতিবিরুদ্ধও হইতে পারে। অভাবের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, কোন জিনিস যদি

সেই অভাব দূর করিতে পারে তবে তাহার 'উপযোগ' থাকিবেই। যেমন মদ। মদ্যপান নীতিবিগর্হিত বটে। কিন্তু মদ্যপের কাছে মদের উপযোগ আছে—ইহা তাহার তৃষ্ণাজনিত অভাব মিটায়। জিনিসটি ভাল কি মন্দ সে বিচার ধনবিজ্ঞানের নহে। কাহারও না কাহারও অভাব মোচন করিবার ক্ষমতা থাকিলেই একটি জিনিসের উপযোগ আছে বলিয়া ধরা হয়।

'উপযোগ' সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। একটি জিনিসের উপযোগ যে সকল লোকের কাছে অথবা একই লোকের কাছে সব সময়ে সমান হইবে তাহা নহে। যে নিরক্ষর তাহার কাছে পুঁথিপত্রের উপযোগ নাই। গায়কের কাছে বাদ্যযন্ত্রের উপযোগ আছে, অগায়কের নিকট নাই।

দ্রব্য (Goods)—যাহার উপযোগ আছে তাহাকে 'দ্রব্য' (goods) বলা হয়। যাহা কিছু মানুষের প্রয়োজন মিটায় তাহাই দ্রব্য। কালি, কলম, চেয়ার, টেবিল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপযোগ আছে—এইগুলিকে দ্রব্য বলিব। আবার লোকের কর্মক্ষমতাকেও দ্রব্য বলিতে হইবে, কারণ সমাজে বহু লোক অর্থের বিনিময়ে এই কর্মক্ষমতা ক্রয় করিতে চাহে—ইহার উপযোগ আছে। যাহা কিছু মানুষের অভাব মিটায় তাহাই দ্রব্য।

দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ (Classification of goods)—ধনবিজ্ঞানে দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

কতকগুলি দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে আছে যে সেগুলির যথেষ্ট উপযোগ থাকিলেও লোকে সেগুলি অনায়াসে পাইতে পারে। এই সকল দ্রব্যের জন্য কোন দাম দিতে হয় না। এইগুলিকে বিনামূল্যের দ্রব্য (free goods) বলা হয়। যেমন—বাতাস, সূর্যের আলো, নদীর জল ইত্যাদি। অন্য অনেক দ্রব্য আছে যাহা চাহিদার তুলনায় পরিমাণে অল্প। এইগুলির যতটা লোকে অভাব পূরণের জন্য চায় ততটা পাওয়া যায় না। এগুলির জন্য দাম দিতে হয়। ধনবিজ্ঞানে এগুলিকে মূল্যবান অপ্রচুর দ্রব্য (scarce goods) বলা হয়। খাদ্যদ্রব্য, বসনভূষণ ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে।

অবশ্য, একথা মনে রাখিতে হইবে যে স্থানবিশেষে অথবা সময়বিশেষে কোন একটি দ্রব্য মূল্যবান অথবা বিনামূল্যের হইতে পারে। মরুভূমিতে বালির কোন দাম নাই, কিন্তু কলিকাতা শহরে বাড়ী তৈয়ারির জন্য দাম দিয়া বালি কিনিতে হয়। নদীর তীরবর্তী যে সকল স্থানে লোক-বসতি কম সে

সকল স্থানে জলের কোন দাম নাই, যাহার যত খুশি জল নিতে পারে। সেই জন্য এক পয়সাও খরচ করিতে হয় না। কিন্তু বড় বড় শহরে বিপুল জনসংখ্যার প্রয়োজন মিটাইবার মত জল অনেক সময়েই সহজলভ্য নয়। তাই শহরে জল পাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়। মরুভূমিতে ত কথাই নাই; সেখানে জলের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। বাতাসকে সাধারণত বিনামূল্যের দ্রব্য বলা হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সমুদ্রের তলায় ডুবুরীদের বাঁচিবার মত বাতাস অর্থ ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। সুউচ্চ পর্বত-শিখরে অভিযানকারীদের নিকট অক্সিজেন একটি মহার্ঘ বস্তু।

ধন (Wealth)—বিশেষ ধরণের কতকগুলি দ্রব্যকে 'ধন' (wealth) বলে। সকল দ্রব্যই 'ধন' নহে। 'ধন' আখ্যা পাইতে হইলে কোন দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার।

যাহা দ্রব্য নহে, অর্থাৎ যাহার 'উপযোগ' নাই, তাহা ত 'ধন' হইবেই না। কেহ যদি অনর্থক রাস্তায় কতকগুলি গর্ত খুঁড়িয়া রাখে তাহা হইলে এগুলিতে লোকের ক্ষতিই হয়, কাহারও অভাব মেটে না। সুতরাং এইরূপ গর্ত দ্রব্য নয়—'ধন' ত নয়ই।

দ্রব্যসমূহের মধ্যেও যেগুলি মূল্যবান কেবলমাত্র সেইগুলিকেই ধন বলা হয়। 'ধন' হইতে হইলে দ্রব্যটি চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইবে। মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যতটা দরকার তাহার চেয়ে বেশী সরবরাহ থাকিলে কোন দ্রব্য 'ধন' আখ্যা পাইতে পারে না। অনায়াসলভ্য দ্রব্য 'ধন' হইতে পারে না। ধনের একটি বৈশিষ্ট্য অপ্রাচুর্য। সাধারণ অবস্থায় আলো, হাওয়া ইত্যাদিকে 'ধন' বলা হয় না।

তাহা ছাড়া, যে সকল দ্রব্যের মালিকানা স্বত্ব অন্যের নিকট বিক্রয় করা যায় না সেই সকল দ্রব্যও 'ধন' পদবাচ্য নহে। হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে জিনিসটির বিনিময়মূল্য নিরূপিত হয় না। এইরূপ দ্রব্যকে 'ধন' বলা হয় না। তবে যে সকল দ্রব্য—বাস্তবই হউক অথবা অবাস্তবই হউক—একের অধিকার হইতে অন্যের অধিকারে নেওয়া যায় সে সকল দ্রব্য 'ধন'। খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি শুধু অপ্রচুর নয়, হস্তান্তরযোগ্য। সুতরাং এগুলি 'ধন'। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ হস্তান্তর করা যায় না। কবির কবি-প্রতিভা, গায়কের সঙ্গীত-নৈপুণ্য অন্য লোকের অধিকারে সম্পূর্ণভাবে দিয়া দেওয়া যায় না। তাই এগুলি 'ধন'

নহে। পক্ষান্তরে, কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সুনাম (goodwill) ক্রয়বিক্রয় করা চলে। ইহা 'ধন'।

ধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wealth)—যে 'ধন' প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করা যায় তাহাকে উপভোগ্য 'ধন' (consumption wealth) বলা হয়—যেমন, কাপড়চোপড়, ঘড়ি, গহনাদি, বইপত্র, মোটরগাড়ী, চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী, রেডিও ইত্যাদি। কিন্তু যে ধন প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করা যায় না, যাহার সাহায্যে অন্যান্য জিনিস উৎপাদন করা হয়, তাহাকে উৎপাদক 'ধন' (capital wealth) বলে—যেমন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি। স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে সকল ধনই উৎপাদক ধন অর্থাৎ মূলধন নহে। ধনের (wealth) সহিত মূলধনের (capital) ইহাই পার্থক্য।

কোন কোন উপভোগ্য অথবা উৎপাদক ধনের মালিক বিশেষ একজন লোক অথবা কয়েকজন নির্দিষ্ট অংশীদারের কোম্পানী। এই সকল ধনকে ব্যক্তিগত (private) 'ধন' বলা যায়। আবার কোন কোন উপভোগ্য অথবা উৎপাদক ধনের মালিক সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান—রাষ্ট্র, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি। এই সকল ধনকে সমষ্টিগত (public) 'ধন' বলা যায়। মোটামুটিভাবে ধনকে ইহার বৈশিষ্ট্য এবং মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়:—

ধন
- উপভোগ্য
  - ব্যক্তিগত (যেমন, লোকের নিজস্ব কাপড়চোপড়, ঘড়ি ইত্যাদি)
  - সমষ্টিগত (যেমন, যাদুঘর, চিত্রশালা ইত্যাদি)
- উৎপাদক
  - ব্যক্তিগত (যেমন, নিজস্ব কাপড়ের কল)
  - সমষ্টিগত (যেমন, ভারত সরকারের জাহাজ তৈরির কারখানা)

ব্যবহার মূল্য (Value-in-Use) **ও বিনিময় মূল্য** (Value-in-Exchange)—কোন জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণ ব্যবহার করিয়া যে পরিমাণ অভাব পূরণ (satisfaction of want) হয় তাহাই হইল সেই জিনিসটির সেই সংখ্যা বা পরিমাণের ব্যবহার মূল্য (value-in-use)।

কোন জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের বদলে অন্য আর একটি জিনিসের যে সংখ্যা বা পরিমাণ বাজারে পাওয়া যাইতে পারে সেই সংখ্যার বা পরিমাণের জিনিস হইল প্রথম জিনিসটির ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের বিনিময়মূল্য (value-in-exchange)।

এমন অনেক জিনিস আছে (যেমন, বাতাস) যাহার ব্যবহারমূল্য প্রচুর, কিন্তু বিনিময়মূল্য কিছুই নাই। মোটের উপর বলা যায়, যে সব জিনিসের বিনিময়মূল্য আছে সে সব জিনিসের ব্যবহারমূল্য থাকিবেই, কিন্তু কোন কোন জিনিসের ব্যবহারমূল্য থাকিলেও বিনিময়মূল্য না থাকিতে পারে।

মূল্য (Value) ও দাম (Price)—মূল্য বলিলে সাধারণত বিনিময়মূল্য বুঝায় (ব্যবহারমূল্য নয়)। একটি জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের (সাধারণত, একক—unit) বিনিময়ে অন্য আর নানারকম জিনিসের যে যে বিভিন্ন সংখ্যা বা পরিমাণ পাওয়া যায় সেই সব বিভিন্ন সংখ্যা বা পরিমাণ হইল প্রথমোক্ত জিনিসের নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের মূল্য (value)। ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের বদলে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইল ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের (সাধারণত একক) দাম (price)।

মূল্য বলিলে বিনিময়ক্ষেত্রে অন্য যে কোন জিনিসের সম্পর্ক বুঝায়। যেমন, একটি কলমের মূল্য ২৫ দিস্তা কাগজ অথবা ১০০ কমলালেবু অথবা ১০ সের চিনি ইত্যাদি হইতে পারে। কিন্তু দাম বলিলে অর্থের (money) সহিতই সম্পর্ক বুঝাইবে। একটি কলমের দাম বলিলে সেই কলমটির বদলে কত টাকা পাওয়া যাইবে (ধরা যাক ১০ টাকা) অথবা সেই কলমটি পাইতে হইলে কত টাকা দিতে হইবে একমাত্র তাহাই বুঝাইবে।

প্রশ্ন

1. Define the following terms with suitable examples :—Utility, Goods, Wealth, Consumption Wealth, Capital Wealth, Private Wealth, Public Wealth.

(উদাহরণদ্বারা নিম্নলিখিতগুলির সংজ্ঞা নির্ণয় কর :—উপযোগ, দ্রব্য, ধন, উপভোগ্য ধন, উৎপাদক ধন, ব্যক্তিগত ধন, সমষ্টিগত ধন।) [৭-১০ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between :

(a) Value-in-use and Value-in-exchange ;

(b) Wealth and Capital;
(c) Value and Price.
(Higher Secondary Compartmental Examination, 1960).

[(ক) ব্যবহারমূল্য ও বিনিময়মূল্য
(খ) ধন ও মূলধন
(গ) মূল্য ও দাম
—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?] [১০-১১ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদান
(Factors of Production)

অভাব মোচন (Satisfaction of Wants)—মানুষের সকল শ্রমের উদ্দেশ্য হইল অভাব মোচন। যখন প্রত্যেক পরিবার নিজের পরিশ্রম দিয়া সকল অভাব মিটাইত তখন পরিবারের অভাব অনুযায়ী পরিবারস্থ প্রত্যেক লোকের কাজ ঠিক হইত। সর্বপ্রথম মানুষের অভাব খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের। প্রথম প্রথম এই জিনিসগুলি ন্যূনতম পরিমাণে পাইতেই তাহার সকল শ্রম ব্যয় হইত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কম পরিশ্রমে পাওয়ার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবার মানুষের অভাবের সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মানুষ ক্রমান্বয়ে অভাবের পর অভাব বোধ করিতেছে।

এই অভাব মিটাইবার কাজও লোকে এখন সরাসরি ভাবে না করিয়া পরোক্ষভাবে করে। আজকাল খুব কম লোকেই তাহার সব অভাব নিজে নিজেই মিটায়। আজকাল টাকার বিনিময়ে লোকে কাজ করে এবং সেই টাকা দিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি কেনে। এই সব জিনিসপত্র আবার অন্য লোকে তৈয়ারি করিয়াছে। বর্তমান অর্থনৈতিক

সংগঠনের ফলে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরণের জিনিসপত্র উৎপন্ন হইতেছে এবং নিত্য নূতন জিনিসের উদ্ভব হইতেছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে লোকে উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত থাকে আর্থিক সঙ্গতির জন্য, এই অর্থের বিনিময়ে তাহারা নিজেদের অভাব মিটায় এবং অন্য লোকেরও অভাব মিটাইতে সাহায্য করে। যাহারা উৎপাদন করে তাহারাই আবার উপভোগও করে, অর্থাৎ নিজেদের অভাব মোচন করে। সুতরাং যে কোন উৎপাদন কার্যকে দুইভাবে দেখা যায়—ইহার জন্য (১) যে শ্রম ব্যয় হইল এবং (২) যে অভাব দূর হইল।

'উৎপাদন' কাহাকে বলে? (What is Production?)—সাধারণত আমরা 'উৎপাদন' (production) বলিলে কোন জিনিস সৃষ্টি করা বুঝি। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে কোন জিনিস (যেমন, একটি মোটর গাড়ী) তৈয়ারি করার অর্থ বিভিন্ন কতকগুলি উপাদানের একত্র সমাবেশ করা। এই সমাবেশ কার্যে প্রকৃতিদত্ত জিনিসকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তোলা হয়।

ধনবিজ্ঞানে 'উৎপাদন' কথাটির দ্বারা শুধু জিনিসপত্র তৈয়ারি করা বুঝায় না, বিভিন্ন প্রকারের কর্মসাধনকেও বুঝায়—যেমন উকিল, ডাক্তার, গায়ক প্রভৃতির কাজ। এই সকল লোক নিজেদের এবং অন্য লোকের অভাব মোচনের জন্য পরিশ্রম করে। সেইরূপ যে সব কাজে তৈয়ারি জিনিসপত্র ক্রেতার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় (যেমন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়, পরিবহন) সে সব কাজকে উৎপাদন কার্যের অঙ্গীভূত বলা চলে, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তৈয়ারি জিনিস ক্রেতার কাছে পৌঁছায় ততক্ষণ উৎপাদন কার্য শেষ হয় না। উৎপাদনের উদ্দেশ্য হইল অভাবমোচন। সেই কার্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন সম্পূর্ণ হয় না।

'উৎপাদন' কথাটিতে তাহা হইলে অনেক কিছুই বুঝায়। এক কথায় উৎপাদন মানে উপযোগবৃদ্ধি। কোন জিনিসের রূপান্তর করিয়া তাহার উপযোগ বাড়ানো যায়—যেমন, কাঠ হইতে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি তৈয়ারি করিলে কাঠ বস্তুটিকে অন্য রূপ দান করিয়া উপযোগ বৃদ্ধি করা হইল, চেয়ার টেবিল উৎপাদন করা হইল। শুধু কাঠে লোকের চেয়ার টেবিলের অভাব মিটিত না, তাই চেয়ার টেবিল তৈয়ারি করা হইল। এখানে রূপান্তর দ্বারা উপযোগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তেমনি কোন জিনিস স্থানান্তর করিলেও

তাহার উপযোগ বৃদ্ধি পায়। ধরা যাক চিনির কথা। উত্তর প্রদেশে চিনি উৎপন্ন করা হয়, কারণ সেখানে প্রচুর আখ জন্মে। পশ্চিম বঙ্গে আখ তেমন জন্মায় না, কাজেই চিনির কলও নাই বলিলেই চলে। এখন, উত্তর প্রদেশেই যদি উৎপন্ন সব চিনি রাখা হইত তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গের লোকের চিনির অভাব মিটিত না এবং উত্তর প্রদেশে চিনির দাম খুবই কম হইত, কারণ প্রয়োজনের তুলনায় পরিমাণ বেশী হইত। ঐ চিনি পশ্চিম বঙ্গে চালান করিয়া তাহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়। যাহারা এই পরিবহনকার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের কার্যও উৎপাদনকর্ম। আবার কেহ যদি অসময়ের জন্য কোন জিনিস রাখিয়া দেয় তাহা হইলেও সেই জিনিসের উপযোগবৃদ্ধি হয়। ফসল তোলার সময়ে লোকে যদি বর্ষাকালের জন্য কিছু ধান জমাইয়া রাখে তাহা হইলে তাহাতে ধানের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। যাহারা এই কাজ করে তাহাদের শ্রম উৎপাদক—অর্থাৎ ঐ শ্রম উপযোগ বৃদ্ধি করিতেছে, উৎপাদন করিতেছে। ইহা ছাড়া, যাহা অন্যের অভাব মিটায় সেইরকম বিবিধ কর্মকেও 'উৎপাদন' বলে।

তাহা হইলে উৎপাদক শ্রম বলিতে আমরা এমন শ্রম বুঝি যাহা আমাদের অভাব পূরণ করে। যে জিনিসের চাহিদা নাই এমন জিনিস যদি কেহ তৈয়ারি করে তবে বুঝিতে হইবে সেই শ্রম উৎপাদক নহে।

উৎপাদনের উপাদান কি কি? (Factors of Production)—কোন জিনিস তৈয়ারি করিতে গেলে কি কি লাগে? ধরা যাক ধান। ধান উৎপন্ন করিবার জন্য প্রথম চাই কিছু জমি। তারপর চাই বীজ, লাঙ্গল, গরু এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। তারপর চাই চাষ করিবার জন্য, ফসল কাটিবার জন্য কিছু লোক। জমি ত প্রকৃতিদত্ত। শুধু জমিতে উৎপাদন হয় না। তাহাতে চাষ করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। তাহার জন্য শ্রমিক দরকার। তারপর শুধু জমি ও শ্রমিকে চলে না। তাই লাঙ্গল দরকার, বীজ দরকার। এগুলিকে ধনবিজ্ঞানে মূলধন বলা হয়। এই তিনটি হইল উৎপাদনের আসল উপাদান। এ ছাড়া আজকাল একশ্রেণীর লোকের দরকার হয়—সংগঠক বা উদ্যোক্তা (entrepreneur)। উদ্যোক্তার কাজ হইতেছে উৎপাদনের লাভ-ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি নিজে লইয়া জমি, শ্রমিক এবং মূলধনকে একত্র খাটানো।

তাহা হইলে বোঝা গেল যে কোন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ নির্ভর

করে সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমিক, মূলধন এবং এইগুলি কাজে লাগাইবার মত উদ্যোগ অথবা পরিচালনক্ষমতার উপর।

জমি (Land)—ধনবিজ্ঞানে 'জমি' (Land) এই কথাটির দ্বারা সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়। কাজেই জমি বলিলে বুঝি, আমাদের পায়ের তলায় যে কঠিন মৃত্তিকার আবরণ রহিয়াছে তাহার অবস্থান, উর্বরাশক্তি, আবহাওয়া, আলো-বাতাস যাহা জমির উর্বরাশক্তি বাড়াইয়া তোলে, খনি, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। মানুষ নিজে যাহা তৈয়ারি করে না, যাহা প্রকৃতির দান, তাহাই জমি।

শ্রম (Labour)—উৎপাদনের জন্য শ্রমিকও প্রয়োজন। শ্রমিক (labour) না হইলে প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত থাকে। কয়লা খনিতে থাকিলে তাহা আমাদের কাজে লাগে না। তাই কয়লা খনি হইতে তুলিয়া আনিবার জন্য লোকের দরকার। এইরূপ প্রতিটি উৎপাদনের কাজে শ্রমিক দরকার। শ্রমিক বলিলে সেই সব লোককে বুঝি যাহারা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করে। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের শ্রম, এই দুইটিকে উৎপাদনের মূল উপাদান বলা হয়।

মূলধন (Capital)—শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমিক থাকিলেই চলে না। উৎপাদনের জন্য আরও একটি জিনিসের দরকার। তাহা হইল মূলধন। মানুষ তাহার শ্রমের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদকে রূপান্তরিত করিয়া অভাব মিটাইতেছে। এই উৎপাদনের কাজে সব সময়েই কিছু না কিছু উপকরণ (যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। এই উপকরণগুলিই মূলধন (capital)। মূলধন খুব সাধারণ হইতে পারে, অথবা জটিলও হইতে পারে। আদিম মানুষেরা পাথর দিয়া বনের জন্তু মারিয়া খাইত। এই পাথরের টুকরা তাহাদের কাছে মূলধন ছিল। আজকাল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানায় নানা রকমের জটিল যন্ত্রপাতির দ্বারা মানুষের ভোগের সামগ্রী তৈয়ারি হয়।

উদ্যোগ বা সংগঠন (Enterprise or Organisation)—উৎপাদনের কাজে আর একটি উপাদানের দরকার হয়। ইহা হইল উদ্যোগ (enterprise) বা সংগঠন (organisation)।

যদি কোন লোক নির্দিষ্ট সুদে মূলধন যোগাড় করিয়া এবং নির্দিষ্ট বেতনে শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া কয়লার খনি হইতে কয়লা উৎপন্ন করায় তবে তাহার কার্যকে 'উদ্যোগ' বলা হয়। কয়লা বিক্রয় করিয়া টাকা

পাইবার পূর্বেই উদ্যোক্তাকে (entrepreneur) অনেক রকম খরচ করিতে হয়। খনির মালিককে খাজনা দিতে হয়, শ্রমিকদের মজুরি দিতে হয়, মূলধনের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়, ইত্যাদি। এই সব খরচ করিয়া সে যে দামে কয়লা বিক্রি করিতে পারিল তাহাতে হয়ত তাহার লোকসান হইতে পারে, আবার লাভও হইতে পারে। কিন্তু সে যদি লাভের লোভে লোকসানেরও ঝুঁকি (risk) না লইত, তাহা হইলে জমি (এ ক্ষেত্রে খনি) শ্রমিক এবং মূলধন থাকা সত্ত্বেও সেইগুলি কাজে খাটানো হইত না এবং কয়লা উৎপাদন করা হইত না। সুতরাং উৎপাদনকার্যের জন্য উদ্যোগের দরকার।

প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের শ্রম এবং মূলধনকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একত্র নিয়োজিত করাকে উদ্যোগ বলে। উৎপাদনের উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া সর্বাপেক্ষা কম খরচে সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা, উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্যোক্তা উদ্যোগী হইয়া লাভ-লোকসানের সমস্ত দায়িত্ব লইয়া দ্রব্য উৎপাদন করে। যত দিন যাইতেছে, উৎপাদনবিধি যতই জটিল হইতেছে, উদ্যোক্তার দায়িত্ব ততই বাড়িতেছে।

উদ্যোক্তার কাজ বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাহার দায়িত্ব বহু রকমের। যে ধরণের ব্যবসায়ে শ্রমিকের তুলনায় মূলধন কম লাগে সে সেই ধরণের ব্যবসায় আরম্ভ করিবে, না যাহাতে শ্রমিকের তুলনায় মূলধন বেশী লাগে সেই ধরণের ব্যবসায় আরম্ভ করিবে, ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রধানত নির্ভর করে মূলধন ও শ্রমিকের ভাড়ার (hire) হারের উপর, অর্থাৎ সুদ ও মজুরির হারের উপর। তারপর আবার যে ধরণের ব্যবসায় বাছিয়া লওয়া হইল সেই ধরণের ব্যবসায়গুলির মধ্যে কোনটিতে লাভের সম্ভাবনা বেশী আছে তাহা ঠিক করিতে হয়। তারপর ব্যবসায়ের বহর (scale) কতটা বাড়াইলে সুবিধা হয় তাহা ভাবিয়া দেখিতে হয়। কখনও কখনও মূলধনের অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া কমাইয়া সর্বাপেক্ষা লাভজনক অনুপাত ধার্য করিতে হয়।

সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজকর্ম চলিতেছে কিনা সেই দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়। তারপর যে বাজারে বেশী লাভের সম্ভাবনা থাকে সেই বাজারে মাল সরবরাহ করিবার বন্দোবস্তও করিতে হয়। অবশ্য, ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে উদ্যোক্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব না রাখিয়া বেতনভোগী

কর্মসচিবের (manager) উপর নির্ভর করিতে পারে। কিন্তু নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব তাহাকে নিজের হাতে রাখিতে হয়।

উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইল ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করা (risk taking)। ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার (uncertainty) অন্ত নাই। যে জিনিস তৈয়ারি করা হইতেছে তাহার দাম কমিয়া যাইতে পারে। ব্যবসায় আরম্ভ করার পরে হয়ত দেখা গেল জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি এবং মূলধনের স্থদ সবই বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ উৎপাদনের খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। উদ্যোক্তাকে এই সব অনিশ্চয়তার ভার বহন (uncertainty bearing) করিতে হয়। লাভের আশায় যে উৎপাদন-ব্যবস্থার স্থত্রপাত তাহা লোকসানের কারণ হইতে পারে। লোকসানের ঝুঁকি লইয়াই উদ্যোক্তাকে কার্যে অগ্রসর হইতে হয়।

ব্যবসায়ের আয় বণ্টন করাও উদ্যোক্তার কাজ। ব্যবসায়ে অর্জিত সমুদয় অর্থ তাহার হাতে আছে। সে অন্য সকলের প্রাপ্য মিটাইয়া দেয়। যেমন, জমির মালিককে খাজনা দিতে হয়, মূলধনের মালিককে স্থদ দিতে হয়, শ্রমিককে মজুরি দিতে হয়। ব্যবসায়ের আয় দ্বারা এই সকল প্রাপ্য মিটাইতে না পারিলে উদ্যোক্তা নিজের তহবিল হইতে এগুলি মিটাইয়া দেয়। আর অপর সকলের প্রাপ্য মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা উদ্যোক্তার প্রাপ্য লাভ বলিয়া গণ্য হয়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটু আধটু ঝুঁকি (risk) অবশ্য প্রত্যেক উৎপাদককেই (factor) লইতে হয়। মূলধনের মালিক হয়ত এমন অবস্থার মধ্যেও পড়িতে পারে যে স্থদ ত দূরের কথা, আসলও পাইল না। কোন কোন ক্ষেত্রে জমির মালিক খাজনা না পাইতে পারে। শ্রমিকের মজুরি প্রাপ্তি সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা থাকে। শ্রমিকেরা কখনও কখনও চুক্তি (contract) অনুসারে মজুরি না পাইতে পারে। তাহা ছাড়া, যে সব শ্রমিক বিশেষ এক ধরণের কাজ ছাড়া অন্য কাজ করিবার শিক্ষা লাভ করে না তাহারাও এইরূপ বিশেষীকরণের জন্য এক রকমের ঝুঁকি বহন করে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়টি উঠিয়া গেলে এই সব শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতে পারে।

তবে এই সব উপাদানের ঝুঁকির তুলনায় উদ্যোক্তার ঝুঁকি অনেক বেশী। আধুনিক যুগে চাহিদার আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে, অর্থাৎ আজ যে দ্রব্যের চাহিদা বেশী এক বা দুই বৎসর পরে তাহার চাহিদা খুব কমিয়া যাইতে পারে। আবার বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে উৎপাদন-

ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, যে যন্ত্রপাতি আজ ব্যবহৃত হইতেছে এক বা দুই বৎসর পরে তাহার চেয়ে উন্নত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই সকল পরিবর্তন উদ্যোক্তার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইতে পারে। সে যে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে তাহার চাহিদা কমিতে পারে। সে যে খরচে উৎপাদন করিতেছে তাহার চেয়ে কম খরচে অন্য উদ্যোক্তা নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিতে পারে।

কিন্তু এই ভাবে ক্ষতি স্বীকারের ঝুঁকি উদ্যোক্তা নেয় বলিয়াই উৎপাদন ব্যবস্থা চালু থাকে। ক্ষতির ভয়ে উদ্যোক্তা উৎপাদনে নিযুক্ত না হইলে দেশের আর্থিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে। এই জন্যই আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার গুরুত্ব খুব বেশী।

প্রশ্ন

1. What do you mean by production ?
('উৎপাদন' বলিতে কি বুঝায় ?) [১৩-১৪ পৃষ্ঠা]

2. In what ways can utility be added ?
(কি কি ভাবে উপযোগ বৃদ্ধি করা যায় ?) [১৩-১৪ পৃষ্ঠা]

3. Describe the different factors of production.
(উৎপাদনের উপাদানগুলি বর্ণনা কর।) [১৪-১৬ পৃষ্ঠা]

4. Explain the nature of the services performed by the entrepreneur in modern business organisation. (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)
(আধুনিক ব্যবসায় সংগঠনে উদ্যোক্তার কাজকর্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।) [১৫-১৮ পৃষ্ঠা]

5. Explain the importance of the entrepreneur in production.
(উৎপাদন ব্যাপারে উদ্যোক্তার গুরুত্ব কিরূপ তাহা বুঝাইয়া দাও)। [১৫-১৮ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

জমি

(Land)

জমি শব্দের তাৎপর্য (Significance of Land)—ধনবিজ্ঞানে 'জমি' (land) কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জমি বলিলে কেবল ভূমিই বুঝায় না। মানুষ যাহা সৃষ্টি করিতে পারে না সেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলির সবই জমি—যেমন ভূমি, আলো, হাওয়া, খনি, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। তবে সঙ্কীর্ণ অর্থে জমি বলিলে কেবল মাটিই বুঝি এবং উৎপাদন ব্যাপারে মাটির আকারে যে জমি দেখা যায় তাহার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জমিকে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ বলি। কিন্তু তাহাতে এ কথা বুঝায় না যে ইহা কাহারও স্বত্বাধীন নহে। যে যত খুশি জমি বিনা পয়সায় ব্যবহার করিতে পারে এমন অবস্থা বর্তমান জগতে নাই। একে ত জমির পরিমাণ অসীম নয়। তাহা ছাড়া অন্তত আধুনিক জগতে প্রায় সব ব্যবহার-যোগ্য জমিই কোন না কোন মালিকের অধিকারভুক্ত আছে। সুতরাং জমি—বিশেষ করিয়া কর্ষণযোগ্য ভূমি—প্রাকৃতিক সম্পদ হইলেও, ইহার মালিকানা স্বত্ব আছে। ইহাকে প্রাকৃতিক সম্পদ এই অর্থে বলি যে মানুষ চেষ্টা করিয়া ইহা তৈয়ারি করিতে পারে না।

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land)—মানুষের চেষ্টায় জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ (limited)। জমি প্রকৃতির দান। প্রকৃতি যতটা দান করিয়াছে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিই লোকের ব্যবহার করিতে হয়। আমরা ত আর দরকারমত সমস্ত পৃথিবীর ভূখণ্ড দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারি না। চেষ্টা করিয়া হয়ত পতিত জমিকে চাষের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি, ওলন্দাজদের মত জল নিষ্কাষণ করিয়া সমুদ্রের তলার মাটি কাজে লাগাইতে পারি, সার দিয়া জমির উর্বরাশক্তি বাড়াইতে পারি। কিন্তু এইসব করায় ঠিক জমির পরিমাণ বাড়ানো হয় না। প্রকৃতির দান যাহা ছিল তাহাই থাকে, আমরা শুধু তাহা রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলি। এইরকম ব্যবহারযোগ্য

করাকেও যদি বাড়ানো বলি তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে এই ভাবেও জমি খুব বেশী বাড়ানো যায় না। পৃথিবীর লোকসংখ্যা, মূলধন, পরিচালনক্ষমতা প্রভৃতি যে হারে বাড়িতেছে জমিও কি কোন অর্থেই সেই হারে বৃদ্ধি পাইতেছে? উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় জমির পরিমাণ অনেক বেশী সীমাবদ্ধ। জমির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (law of diminishing returns) প্রযুক্ত হয়।

জমির প্রয়োজনীয়তা (Importance of Land)—জমি—বিশেষত ভূমি—উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান। বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় যে সমস্ত কলকব্জা ব্যবহার করা হয় তাহা লৌহনির্মিত। এই লৌহ খনি হইতে তোলা হইয়াছে। আবার কারখানাগুলিতে যে সমস্ত কাঁচামাল (যেমন, সূতা ও কাপড়ের জন্য তুলা) প্রয়োজন হয় তাহা প্রায় সবই চাষের ফসল। কারখানার বাড়ীও ত জমির উপরই তোলা হইয়াছে। কাজেই শিল্পব্যাপারে জমির দরকার। কৃষিকার্যে ত কথাই নাই। ক্ষেত না থাকিলে ফসল ফলিবে কোথায়?

গভীর চাষ ও ব্যাপক চাষ (Intensive Cultivation and Extensive Cultivation)—ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য জমি চাষ করিতে হয়। আমরা বিশেষ একখণ্ড জমি ক্রমান্বয়ে বেশী ভাল করিয়া চাষ করিতে পারি। আগাছা সাফ করিয়া, উন্নততর প্রণালীতে চাষ করিয়া, ভাল সার দিয়া এবং ভাল বীজ বপন করিয়া অধিকতর পরিমাণে ফসল পাইতে পারি। এইরূপ একখণ্ড জমিতেই অধিকতর ফসল ফলাইবার চেষ্টাকে গভীরভাবে চাষ করা (intensive cultivation) বলে। এইরূপ না করিয়া এক খণ্ড জমিতে সামান্য কিছু চেষ্টা করিয়া যাহা পাইলাম তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আরও ফসলের জন্য অন্য জমি চাষ করিলে ব্যাপক চাষের (extensive cultivation) প্রণালী অবলম্বন করা হয়।

অতি প্রাচীনকালে লোক ছিল কম, জমি ছিল বেশী—জমির জন্য বেশী দাম দিতে হইত না। তখন লোকে একই জমির প্রতি বেশী যত্ন না নিয়া একটির পর একটি জমি কোনরকমে চাষ করিয়া প্রয়োজনীয় ফসল সংগ্রহ করিত। কিন্তু আজকাল আর এরকম ব্যাপকভাবে চাষ করা সম্ভব হয় না। আজকাল জমির জন্য বেশ দাম দিতে হয়। সুতরাং লোকে

371

একখণ্ড জমিতেই গভীরভাবে চাষ করিয়া যথাসম্ভব বেশী ফসল পাইতে চেষ্টা করে।

আমাদের দেশে গভীর চাষের প্রথা প্রচলিত আছে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns)—চাষের চেষ্টা বাড়াইলেই ফসলও যে ক্রমান্বয়েই বাড়িতে থাকিবে তাহা নহে। জমির পরিমাণ না বাড়াইয়া কেবল অধিক হইতে অধিকতর পরিশ্রম এবং মূলধন প্রয়োগ করিতে থাকিলেই যে ফসলও সেই অনুপাতে বাড়িতেই থাকিবে তাহা নয়। একখণ্ড জমি হয়ত ভাল ভাবে চাষ করি নাই, তাহাতে দশ মণ ধান পাইলাম। বেশ খাটিয়া চাষ করিলাম, জলসেচের ব্যবস্থা করিলাম, সার দিলাম, মোটের উপর দ্বিগুণ পরিশ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলাম—তখন হয়ত ২৫ মণ অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী ধান পাইলাম। কিন্তু এই জমিতেই হয়ত দেখিব যে তিনগুণ পরিশ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলে ফসল আগের বার যে পরিমাণে বাড়িয়াছে সেই পরিমাণে বাড়িবে না। গভীরভাবে চাষ করিতে গিয়া লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে হারে পরিশ্রম ও সার ইত্যাদি বৃদ্ধি করা হয় সেই হারে ফসল বৃদ্ধি হয় না। সাধারণত একজন চাষী যদি দ্বিগুণ পরিশ্রম করে এবং দ্বিগুণ মূলধন খাটায় তাহা হইলে ফসল সামান্য কিছু বাড়িতে পারে, কিন্তু দ্বিগুণ হইবে না। আবার এমন অবস্থাও হইতে পারে যে পরিশ্রম ইত্যাদি বাড়াইলেও ফসল মোটেই বাড়িতেছে না।

প্রথম দিকে অবস্থা বিশেষে ফসল দ্বিগুণের বেশীও হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে প্রথম দিকে জমিতে যথোপযুক্তভাবে চাষ হয় নাই, উপযুক্তভাবে চাষ হওয়ায় ফসলের পরিমাণ খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসিবে যখন আর সমান অনুপাতে ফসল বাড়িবে না। তারপর এমন সময়ও আসিবে যখন ফসলের পরিমাণ মোটেই বাড়িবে না। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটি নিয়মের কথা বলিয়াছেন। নিয়মটি এইরূপ :—

একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে, যদি একখণ্ড জমিতে শ্রম ও মূলধন উপর্যুপরি বাড়াইতে থাকা যায় তাহা হইলে তুলনায় কম অনুপাতে ফসল বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ যে হারে শ্রম এবং মূলধন বাড়ানো হইতেছে ফসল বৃদ্ধি তাহার চেয়ে কম হারে হইবে।

LIBRARY
Date 24.9.2008

এই নিয়মটিকে বলা হইয়াছে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns)।

মনে করা যাক যে একটি লোকের এমন এক খণ্ড জমি আছে যে সে একা ইহা ভাল ভাবে চাষ করিয়া উঠিতে পারে না। প্রথম বৎসরে সে নিজেই ইহা চাষ করিয়া ১০০ মণ ধান পাইল। দ্বিতীয় বৎসরে সে আর একটি লোক, আর একটি লাঙ্গল এবং আর এক জোড়া বলদ লইয়া জমি চাষ করিল। সম্ভবত এবার সে ২১০ মণ ধান পাইল, অর্থাৎ যে পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বাড়াইল তাহার তুলনায় অধিকতর ফসল বাড়িল। তৃতীয় বৎসরে সে আর একটি লোক এবং আর একটি লাঙ্গল ইত্যাদি বাড়াইল। এবারে কিন্তু সে ২৫০ মণ ধান পাইল, অর্থাৎ যে পরিমাণে ফসল বৃদ্ধি হইল তাহা দ্বিতীয় বৎসরের ফসল বৃদ্ধির পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। এইরূপে সে যদি প্রতি বৎসরই ক্রমাগত শ্রমিক এবং মূলধন বাড়াইয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে এমন এক অবস্থা আসিবে যখন আর অতিরিক্ত ফসল পাওয়াই যাইবে না।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি একটি তালিকার দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায়।

একখণ্ড জমিতে কি পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইতেছে			বাৎসরিক উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ	অতিরিক্ত শ্রমিক ও মূলধন	অতিরিক্ত ফসল
১ জন চাষী,	১টি লাঙ্গল,	১ জোড়া বলদ	১০০ মণ ধান		
২ ,, ,,	২টি ,,	২ ,, ,,	২১০ ,, ,,	১ সংখ্যক	১১০ মণ ধান
৩ ,, ,,	৩টি ,,	৩ ,, ,,	২৫০ ,, ,,	১ ,,	৪০ ,, ,,
৪ ,, ,,	৪টি ,,	৪ ,, ,,	২৭৫ ,, ,,	১ ,,	২৫ ,, ,,
৫ ,, ,,	৫টি ,,	৫ ,, ,,	২৮৫ ,, ,,	১ ,,	১০ ,, ,,
৬ ,, ,,	৬টি ,,	৬ ,, ,,	২৮৫ ,, ,,	১ ,,	০ ,, ,,

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে খুব বেশী ফসল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই নিয়মটি ক্রমান্বয়ে পরিস্ফুট হইয়া ষষ্ঠ বৎসরে দেখাইয়াছে যে শ্রম ও মূলধন বাড়াইলেও ফসল কিছুই বাড়ে নাই। এমন অবস্থারও কল্পনা করা যায় যখন লোকে লাঙ্গল ও বলদ বাড়াইবার ফলে চাষের সাহায্য না হইয়া বরং ক্ষতিই হইতে পারে। তখন ফসল কমিতে থাকিবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের ব্যতিক্রম (Limitations to the Law of Diminishing Returns)—ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম কিছু কালের জন্য প্রশমিত (limited) হইতে পারে। প্রথমত, যতক্ষণ পর্যন্ত যথোপযুক্ত মূলধন এবং শ্রমের প্রয়োগ করা হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কম হারে না বাড়িয়া বরং বেশী হারেই বাড়িবে। দ্বিতীয়ত, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন আরম্ভ হইলেও ঠিক সেই সময়ে যদি উন্নত প্রণালীতে—যেমন, ভাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে—চাষ আবাদ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদনের হার না কমিয়া বাড়িতে পারে। তবে, চাষের প্রণালী ত আর অনবরত উন্নতিই লাভ করে না। স্নতরাং, একই প্রণালীতে অন্তত কিছু কাল কৃষিকার্য চলে। সে অবস্থায় উৎপাদনের হারও ক্রমান্বয়ে কমিবে। অর্থাৎ, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম সাময়িকভাবে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেও যথাকালে এই নিয়ম চালু হইবেই।

কৃষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns applied outside agriculture):—মৎস্য চাষ এবং খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। বেশী মাছ ধরিবার জন্য নদী অথবা সমুদ্রে বেশী গভীরে প্রবেশ করিতে গিয়া যে পরিমাণ পরিশ্রম এবং মূলধন বাড়াইতে হয় তাহার তুলনায় ধৃত মৎস্যের পরিমাণ কম বাড়ে। কয়লার খনির মালিক যদি বেশী কয়লা তুলিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া খনির ভিতরে আরও বেশী নীচে প্রবেশ করাইতে হইবে এবং সেইজন্য নিরাপত্তা ইত্যাদি ব্যবস্থায় বেশী মূলধন খাটাইতে হইবে। কিন্তু যে অনুপাতে শ্রমিক ও মূলধন বাড়ানো হয় সেই অনুপাতে বেশী কয়লা তোলা যায় না।

এই নিয়ম শিল্পের ব্যাপারেও খাটে। একটি উপাদান স্থির রাখিয়া উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে কারখানা শিল্পেও (manufactures) এমন একটা সময় আসিবে যখন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ আগের মত আর বাড়িবে না। তবে কারখানা শিল্পের চেয়ে কৃষিকার্যে এই নিয়মটি বেশী তাড়াতাড়ি বলবৎ হয়।

প্রশ্ন

1. In what sense is the term 'land' used in Economics? By what characteristics does it differ from other factors of production?

(ধনবিজ্ঞানে 'জমি' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য অনুসারে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সহিত ইহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়?) [১৯-২০ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between intensive cultivation and extensive cultivation. Which of these two methods prevails in India?

(গভীর চাষ ও ব্যাপক চাষের মধ্যে পার্থক্য কি? ভারতবর্ষে কোন্‌টি প্রচলিত?) [২০-২১ পৃষ্ঠা]

3. Explain and illustrate the Law of Diminishing Returns. Has it any limitations? (Higher Secondary Examination, Commerce Group, 1961.)

(উদাহরণ দ্বারা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম ব্যাখ্যা কর। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আছে কি?) [২১-২৩ পৃষ্ঠা]

4. Does the Law of Diminishing Returns apply to (*a*) fisheries, (*b*) mines and (*c*) manufactures? (Higher Secondary Examination, Commerce Group, 1961.)

(ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম কি (ক) মৎস্য চাষ, (খ) খনিজ শিল্প এবং (গ) কারখানা শিল্পে কার্যকর হয়?) [২৩ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রম

(Labour)

উৎপাদনের আর একটি বিশেষ উপাদান হইল 'শ্রম' (labour)। জমি এবং শ্রমের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে জমি প্রকৃতির দান, কিন্তু শ্রমের যোগান দেয় মানুষ।

উৎপাদক শ্রম (Productive Labour) কাহাকে বলে—'শ্রম' বলিতে কেবল শারীরিক পরিশ্রমকেই বুঝায় না। ধনবিজ্ঞানে দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রমই 'শ্রম' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। একজন দিনমজুরের শ্রমও 'শ্রম', আবার একজন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারীর পরিশ্রমও 'শ্রম'।

তবে যে পরিশ্রমের কোন দাম নাই অথবা যাহার দ্বারা কোন অর্থ উপার্জন করা হয় না তাহাকে উৎপাদক শ্রম (productive labour) বলা যায় না। যদি কোন চিত্রশিল্পী কেবল নিজের আনন্দ বর্ধনের জন্যই ছবি আঁকিয়া যায় এবং সেই ছবি বিক্রয় করিতে না চায় তবে তাহার শ্রম উৎপাদক নহে। যদি কোন অভিনেতা কিংবা গায়ক নিজেকে এবং অন্যান্য লোককে কেবল আনন্দই দেয়, কিন্তু কোন পারিশ্রমিক নিতে রাজী না হয়, তবে তাহার শ্রম অনুৎপাদক (unproductive)। কিন্তু পেশাদার অভিনেতা, গায়ক, খেলোয়াড় প্রভৃতির শ্রম অর্থকরী, সুতরাং উৎপাদক।

যাহাদের উদ্যোগের ফলে উৎপাদনকার্য চলে তাহাদের পরিশ্রম সাধারণত 'শ্রম' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এই সকল লোক পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা পায় না। ব্যবসায়ে লোকসান হইলে ইহারা কিছুই পায় না, তবে লাভ হইলে সেটা সবই ইহারা পায়। কাজের জন্য কোন নির্দিষ্ট মজুরি পায় না বলিয়া ইহারা শ্রমিক (labourer) বলিয়া গণ্য হয় না।

শ্রমের সরবরাহ (Supply of Labour)—কোন দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতির সরবরাহের উপর। শ্রমিকের সরবরাহ কিসের উপর নির্ভর করে? সহজেই বলা যায়—জনসংখ্যার উপর। অনেকে কিছু না ভাবিয়াই বলিবেন যে দুই দেশের মধ্যে যে দেশে লোক বেশী সেই দেশের শ্রমশক্তি বেশী। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ধরা যাক এক দেশের লোকসংখ্যা ১০ কোটি আর এক দেশের লোকসংখ্যা ৮ কোটি। ইহাতেই কিন্তু প্রমাণ হয় না যে প্রথম দেশটিতে দ্বিতীয় দেশ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ এবং চিররুগ্ন লোকেরা শ্রমের কাজ করিতে পারে না। আবার সব দেশেই এমন কিছুসংখ্যক লোক আছে যাহারা খাটিয়া খাইতে চায় না, জমানো টাকার সুদ দিয়া জীবিকানির্বাহ করে। ধরা যাক প্রথম দেশটিতে এইরকম অক্ষম ও অনিচ্ছুক লোকের সংখ্যা ৭ কোটি, কিন্তু দ্বিতীয় দেশটিতে ইহাদের সংখ্যা ৪ কোটি। তাহা হইলে প্রথম দেশটিতে ৩ কোটি এবং দ্বিতীয় দেশটিতে ৪ কোটি শ্রমিক পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথম দেশটিতে দ্বিতীয় দেশ অপেক্ষা মোট লোকসংখ্যা বেশী হইলেও শ্রমিকসংখ্যা কম হইতে পারে। কাজেই লোকসংখ্যা জানিলেই শ্রমিকের সংখ্যা বোঝা যায় না, মোট লোকসংখ্যার কত অংশ কাজ করিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক তাহা জানা দরকার।

শুধু লোকসংখ্যা এবং শ্রমিকের অনুপাত জানিলেই শ্রমের সরবরাহ বোঝা যাইবে না। দেশের লোকেরা সাধারণত কত ঘণ্টা করিয়া কাজ করে তাহাও দেখিতে হইবে। ধরা যাক দুইটি দেশের লোকসংখ্যা সমান এবং শ্রমিকের সংখ্যাও সমান। কিন্তু ইহাদের একটি দেশে প্রত্যেকে গড়পড়তা হিসাবে বৎসরে ২০০০ ঘণ্টা এবং অন্যটিতে ১৫০০ ঘণ্টা কাজ করে। বলা বাহুল্য, লোকসংখ্যা এবং শ্রমিকসংখ্যায় সমান হইলেও প্রথম দেশটিতে দ্বিতীয় দেশটি অপেক্ষা বেশী শ্রমের যোগান মেলে। এই জন্য শ্রমের যোগান নির্ণয় করিতে হইলে গড়পড়তা হিসাবে কাজের ঘণ্টাও বিচার করিতে হয়।

আরও একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হয়। ইহা হইল শ্রমনৈপুণ্য বা শ্রমদক্ষতা। শ্রমের সরবরাহ বলিতে আসলে কাজের সরবরাহই বুঝায়। কিন্তু সকল কাজ ত একই দরের নয়। একজন মুটেমজুরের এক ঘণ্টার কাজ আর একজন মিস্ত্রীর এক ঘণ্টার কাজ কি সমান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? 'শ্রম' অথবা কাজের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে মিস্ত্রীর কাজকে মুটেমজুরের কাজের চেয়ে বেশী বলিয়া ধরিতে হইবে। আবার একই ধরণের শ্রমিকও সব দেশে সমান কাজ করিতে পারে না। ভারতবর্ষে কাপড়ের কলে একজন শ্রমিকের সাহায্যে যত কাপড় তৈয়ারি হয় ইংলণ্ডে ঠিক সেই রকম কলে একজন শ্রমিকের সাহায্যে তাহার চেয়ে অনেক বেশী কাপড় তৈয়ারি হয়। ইহার কারণ একই ধরণের ভারতীয় শ্রমিকের চেয়ে ইংরেজ শ্রমিক বেশী কর্মদক্ষ। কি পরিমাণ শ্রমের যোগান দেওয়া হইতেছে এই কথা বিচার করিতে গেলে কর্মদক্ষতার কথাও ভাবিতে হইবে। ধরা যাক, দুই দেশের প্রত্যেকটিতে সমানসংখ্যক ঘণ্টার কাজ হয়, কিন্তু একটিতে অন্যটি অপেক্ষা দক্ষ শ্রমিকের কাজ অনেক বেশী হয়। তাহা হইলে প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা শ্রমের যোগান বেশী হয়।

জনসংখ্যা (Population)—প্রত্যেক বৎসর কিছুসংখ্যক লোক জন্মগ্রহণ করে, আবার কিছুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার চেয়ে বেশী লোক জন্মগ্রহণ করিলে জনসমষ্টি বাড়িয়া যায়। বিপরীত ক্ষেত্রে জনসমষ্টি কমিয়া যায়। সুতরাং, মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে কোন দেশের জন্মের হার এবং মৃত্যুর হার জানিতে পারিলে সেই দেশের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি বোঝা যায়।

তবে আরও একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান

জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ পূর্ব বঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। অর্থাৎ ইহারা না আসিলে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান লোকসংখ্যা অনেক কম হইত, ইহারা আসিয়া লোকসংখ্যা অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। বিদেশ হইতে লোক আসিয়া বসতি স্থাপন করিলে জনসংখ্যা বাড়িয়া যায়। আবার দেশ হইতে লোক বিদেশে চলিয়া গেলে জনসংখ্যা কমিয়া যায়।

সুতরাং কোন দেশের লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে ঃ—(১) সেই দেশে জন্মের হার, (২) সেই দেশে মৃত্যুর হার, (৩) বসতি স্থাপনের জন্য সেই দেশে আগমনের হার, এবং (৪) সেই দেশ হইতে অন্যত্র গমনের হার।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি (Increase of Population and Increase in Food Production)—লোকসংখ্যা বাড়িয়া গেলে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। কেহ ত আর না খাইয়া মরিতে চায় না। লোকের প্রধান চেষ্টা হইল খাদ্যসংগ্রহের জন্য। ফলে, লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে লোকে গভীর ও ব্যাপক দুই ভাবেই চাষের কাজ বাড়াইয়া ফসল বাড়ায়। আবাদী জমিতে বেশী পরিশ্রম করিয়া চাষ করে। বনজঙ্গল সাফ করিয়া এবং পতিত জমি উদ্ধার করিয়া চাষবাসের বিস্তার করে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে অনেক জমি পড়িয়া ছিল। খাজনা দিয়া (কোন কোন ক্ষেত্রে বিনা খাজনায়ও) কেহ সেই সকল জমি বন্দোবস্ত লইতে চাহিত না। আর যে সকল জমিতে কৃষিকার্য চলিত তাহারও তেমন বেশী আদর ছিল না বলিয়া খাজনার পরিমাণ অনেক কম ছিল। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের ক্ষুধা বাড়িয়াছে। নালাডোবা, বনজঙ্গলও কৃষিকার্যের উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাল পর্যন্ত খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। তবে এই বৃদ্ধির অনুপাত সমান নয়। ফসল উৎপাদনের বেলায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম চলে। সুতরাং লোকবৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণ পরিশ্রম বাড়ানো হয় তাহার তুলনায় ফসলবৃদ্ধি কম হয়। ফসল বাড়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে পরিমাণে লোক বাড়ে সেই পরিমাণে ফসল বাড়ে না এবং এমন এক সময় আসিতে পারে যখন ফসল মোটেই বাড়িবে না।

ম্যাল্‌থাসের মতবাদ (Malthusian Theory)—এই ধরণের একটি অবস্থা বিবেচনা করিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ মনীষী ম্যাল্‌থাস্ (Malthus) তাঁহার সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

তিনি বলেন, বিবাহ করিয়া সংসার পাতিলে লোকের কেবল সন্তান জন্মিতে থাকে। জনসংখ্যা বাড়িয়া যায়, কিন্তু খাদ্যের সরবরাহ সেই অনুপাতে বাড়ে না। অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। যে ভাবেই হউক, মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্য দিয়া অযথাবর্ধিত জনসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতির কার্পণ্যেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। মানুষ যত বেশী মানুষ জন্মায় প্রকৃতি তত বেশী ফসল ফলায় না। প্রকৃতির এই আচরণের ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদিতে মানুষের মরিতে হয়, লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ভাবে মৃত্যুর হার বাড়াইয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে ম্যাল্‌থাস্ লোকধ্বংসাত্মক নিয়ন্ত্রণ (positive check) বলিয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, জনসংখ্যাবৃদ্ধির এইরূপ প্রতিরোধ কি অত্যন্ত ভয়াবহ, অত্যন্ত শোকাবহ নহে? ম্যাল্‌থাস্ বলেন, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বাধা পাইবেই এবং সেই বাধা দেওয়ার ভার প্রকৃতির (খাদ্যসরবরাহের) হাতে ছাড়িয়া দিলে ইহা মৃত্যুর করাল রূপেই দেখা দিবে।

তাঁহার মতে, মানুষের উচিত মৃত্যুর হার বাড়িতে না দিয়া নিজেরাই জন্মের হার কমাইয়া লোকসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করা। এই জন্য যতদিন পর্যন্ত যথোপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা না হয় ততদিন পর্যন্ত বিবাহ করা উচিত নয়। কিছুসংখ্যক লোক যদি অবিবাহিত থাকে কিংবা বেশী বয়সে বিবাহ করে তাহা হইলে জন্মের হার কমিবে, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হইবে। এই ভাবে জন্মের হার কমাইয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে ম্যাল্‌থাস্ জন্মনিরোধক নিয়ন্ত্রণ (preventive check) বলিয়াছেন।

জনসংখ্যা ও আর্থিক উন্নতি-অবনতি (Population and Economic Welfare)—ম্যাল্‌থাসের মত সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত নহে। জনবিরল দেশে অন্তত প্রথমদিকে জনবৃদ্ধি এবং খাদ্যবৃদ্ধি সমানভাবে দ্রুতগতিতে চলিতে পারে।

তাহা ছাড়া, জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির তুলনা না করিয়া

সমগ্র সম্পদবৃদ্ধির তুলনা করা উচিত। অনেক সময়ে এমন হয় যে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে শিল্পোৎপাদন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ফলে দেশের সমগ্র সম্পদ অনেক বেশী বাড়িয়া যায়, মাথাপিছু আয়ও বাড়িতে থাকে। এইরূপ হইলে দেশের মধ্যে বেশী খাদ্য না পাইলেও বর্ধিত শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা হয়। এমতাবস্থায় জনবৃদ্ধির ফল খারাপ না হইয়া বরং ভালই হয়। ইহার ফলে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায়। ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এইরূপ অবস্থার দৃষ্টান্ত মেলে।

আরও একটি বিষয় বিবেচনার যোগ্য। কোন দেশের লোকদের সুখদুঃখ খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের উপর ত নয়ই, কৃষিজাত এবং শিল্পজাত এই উভয়বিধ উৎপাদনের উপরও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না। সুখদুঃখ বেশী নির্ভর করে বরং বন্টনের উপর। এক জায়গায় ১০০ জন লোক ১০০ টাকার জিনিস তৈয়ারি করিয়া একজন ৯০ টাকার জিনিস নিল এবং ৯৯ জন ১০ টাকার জিনিস ভাগ করিয়া নিল। আর এক জায়গায় ১২৫ জন লোক ১০০ টাকার জিনিস তৈয়ারি করিয়া সমানভাবে ভাগ করিয়া নিল। দুর্ভিক্ষ মহামারী কি দ্বিতীয় জায়গায় দেখা দিবে, না প্রথম জায়গায়?

তবে ম্যাল্‌থাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব সর্বতোভাবে স্বীকৃত না হইলেও, একথা ঠিক যে দ্রুতবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান করা বর্তমানে যে কোন দেশের সরকারের নিকট একটা গুরুতর সমস্যা।

ভারতের জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন (Population and Food Production in India)—ম্যাল্‌থাসের তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের অবস্থা আলোচনা করা যায়। ভারতবর্ষে জন্মের হার অত্যন্ত বেশী। এখানকার লোকদের হাজারকরা প্রায় ৪০টি শিশু (ইংলণ্ডে ১৬) প্রতি বৎসর জন্ম গ্রহণ করে। ম্যাল্‌থাস্ যে সকল বাঞ্ছনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন ভারতবর্ষে সেইগুলি নাই বলিলেই চলে। এদেশে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এখানে প্রায় সকলেই বিবাহ করে। আবার অনেকেরই খুব কম বয়সেই বিবাহ হয়। মৃত্যুর হারও খুব বেশী। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর হাজারকরা ১১ জন মারা যায়, ভারতবর্ষে ২৭ জনেরও বেশী।

স্পষ্টই বোঝা যায়, ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার (জন্মহার – মৃত্যুহার) বছরে

হাজারকরা ১৩, অর্থাৎ শতকরা ১'৩। অনেকে মনে করেন, হিসাবে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। এই সব বিবেচনা করিয়াও মোটামুটিভাবে বলা যায়, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার শতকরা ২এর বেশী নয়। তবে, সরকার কর্তৃক রোগনিবারণমূলক ব্যবস্থার বিস্তারসাধন এবং সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত ইত্যাদির ফলে মৃত্যুর হার ক্রমে খুব কমিয়া যাইবে। কিন্তু জন্মের হার কমিবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং জন্মের হার ও মৃত্যুর হারের মধ্যে পার্থক্য এমন-ভাবে বাড়িতে পারে যে মোট লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, মৃত্যুর হার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হার বেশ না কমিলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার খুব বাড়িয়া যাইবে।

জনসংখ্যা যেমন বাড়িতেছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদনও তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি অনুসারে পতিত জমির উদ্ধার, সেচব্যবস্থার উন্নতি, উন্নত ধরণের সার সরবরাহ প্রভৃতির ফলে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বেশ বাড়িয়া যাইতেছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে আজকাল ভয়ানক কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন ১৯৫৭-৫৮ সালের বন্যা) না হইলে খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির বাৎসরিক হার গড়ে শতকরা প্রায় ৪ হিসাবে চলিতেছে।

সুতরাং, খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির হার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে ত বেশীই, এমন কি কখনও কখনও জন্মের হারের (বছরে শতকরা ৪এর কম) চেয়েও বেশী। ফলে, খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি এখনকার মত চলিতে থাকিলে মৃত্যুর হার কমিয়া গেলেও খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির হার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের তুলনায় হয়ত বেশীই থাকিবে। ইহা হইতে অবশ্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) ভুল প্রতিপন্ন হয় না; কারণ, যে পরিমাণ মূলধন ও শ্রমের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে সেই অনুপাতে ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে, খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি বরাবর বর্তমান হারে চলিতে থাকার সম্ভাবনা নাই।

তাহা হইলেও, দেশের সামগ্রিক সম্পদবৃদ্ধির কথা না ভাবিলেও, এমন কি শুধু খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াও, ঠিক এখনই ভারতের জন্মহার সম্পর্কে ভীষণভাবে বিচলিত হইবার তেমন কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

তবে কয়েকটি কারণে কিছু পরিমাণে বিচলিত হইতে হয়।

প্রথমত, ভারতে জন্মের হার অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় সত্যই ভয়ানক বেশী। অনেকেরই সন্তান জন্মে, আবার জন্মদাতাদের মধ্যেও অনেকেরই খুব বেশী সংখ্যক সন্তান জন্মে। বছরে হাজারকরা যে ৪০টি শিশু জন্মে, তাহার মধ্যে অন্তত ১৬টি হইল পিতামাতার চতুর্থ কি পরবর্তী সন্তান। সরকারী হিসাবে দেখা যায় ভারতে জাত শিশুদের শতকরা ৪২·৮টি (ইংলণ্ডে শতকরা ১৪·৩টি) চতুর্থ কি তাহারও পরবর্তী সন্তান। নবজাত শিশুদের মধ্যে অনেকেই পিতামাতার দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণবশত রুগ্ন, নিস্তেজ, অকর্মণ্য নাগরিক হিসাবে গড়িয়া ওঠে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্যোৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম অনুসারেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং, ভবিষ্যতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে কম হইতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব হইতেই দেশে উৎপন্ন খাদ্যের দ্বারা ভারতবাসীদের খাদ্যসংস্থান হইতেছে না। অনেক দিন হইতেই বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হয়। আজকাল উৎপাদন বাড়িতেছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার খাদ্য (প্রধানত গম ও চাল) বিদেশ হইতে কিনিয়া আনিতে হয়। শীঘ্র এই অবস্থার অবসান হইবে বলিয়া মনে হয় না। জনসংখ্যা বাড়িতে না থাকিলে খাদ্য আমদানির বাবদ দেয় অর্থের দ্বারা দেশের শিল্পোন্নতির জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করা যায়।

চতুর্থত, কি পল্লী অঞ্চলে কি শহরাঞ্চলে দেশের সর্বত্র বেকারের সংখ্যা বেশী। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতের জনসংখ্যা কৃষিকার্য কি কারখানা শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং আমরা বলিতে পারি না যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার সাহায্যে আরও ভালভাবে কারখানা-শিল্পের উন্নতি হইবে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি খুব বাড়িবার ফলে খাদ্য আমদানি করিতে হইলেও মোটের উপর লাভই হইবে।

আসল কথা এই যে, ভারতের জনসংখ্যা উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। সেইজন্য অনেকে জন্মসংখ্যা কমাইতে বলেন।

দশবার্ষিক হিসাব অনুযায়ী গড়পড়তা প্রতি বৎসরে শতকরা জন্মের হার, মৃত্যুর হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নে দেওয়া হইল।

দশক	শতকরা জন্মের হার	শতকরা মৃত্যুর হার	শতকরা জনবৃদ্ধির হার
১৯০১-১০	৪·৮১	৪·২৬	·৫৫
১৯১১-২০	৪·৯২	৪·৮৬	·০৬
১৯২১-৩০	৪·৬৪	৩·৬৩	১·০১
১৯৩১-৪০	৪·৫২	৩·১২	১·৪০
১৯৪১-৫০	৩·৯৯	২·৭৪	১·২৫

বিভিন্ন দেশে প্রতি বৎসরে জাত শিশুদের মধ্যে শতকরা চতুর্থ কিংবা পরবর্তী সন্তানের হার নিম্নে দেওয়া হইল।

দেশ	নবজাত শিশুদের মধ্যে চতুর্থ কিংবা পরবর্তী সন্তানের শতকরা হার
ভারত —	— — — ৪২·৮
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	— — — ১৯·২
ইংলণ্ড —	— — — ১৪·৩
ফ্রান্স —	— — — ১৯·৭
জাপান —	— — — ৩৩·৯

ভারতে খাদ্যোৎপাদনের তালিকা

বৎসর	পরিমাণ
১৯৫০-৫১ —	— ৪,৯৯,২২,০০০ টন
১৯৫৫-৫৬ —	— ৬,৫৭,৯৪,০০০ ,,
১৯৫৬-৫৭ —	— ৬,৮৭,৪৮,০০০ ,,
১৯৫৭-৫৮ —	— ৬,২৫,১১,০০০ ,,
১৯৫৮-৫৯ —	— ৭,৩৫,০৩,০০০ ,,
১৯৫৯-৬০ —	— ৭,৪৭,০০,০০০ ,,
১৯৬০-৬১ —	— ৭,৯৩,০০,০০০ ,,

ভারতে খাদ্যোৎপাদনের সূচক সংখ্যা

(১৯৪৯—১৯৫০=১০০)

বৎসর	সূচক সংখ্যা
১৯৫০-৫১	৯০·৫
১৯৫৫-৫৬	১১৫·৩
১৯৫৬-৫৭	১২০·৫
১৯৫৭-৫৮	১০৮·০
১৯৫৮-৫৯	১২৮·২
১৯৫৯-৬০	১৩০·৩
১৯৬০-৬১	১৩৮·২

বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্য আমদানির হিসাব

বৎসর	পরিমাণ
১৯৫৭	৩৫,৮২,০০০ টন
১৯৫৮	৩১,৭৮,০০০ ,,
১৯৫৯	৩৮,০৭,০০০ ,,

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় (Population and National Income)—লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমগ্র ধনসম্পদও প্রথম দিকে অতিরিক্ত হারে বাড়িতে পারে।

লোকসংখ্যা বাড়িলে শ্রমিকসংখ্যা বাড়িতে পারে। পূর্বের শ্রমিক-সংখ্যা প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে কম থাকিলে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বর্ধিত হওয়া পর্যন্ত উৎপাদনের হার ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকিবে। ফলে, মাথাপিছু গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িবে। এই অবস্থায়, লোকসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ে, জাতীয় আয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই তার চেয়ে বেশী অনুপাতে বাড়িয়া যায়। মাথাপিছু গড়পড়তা আয়ও বাড়িয়া যায়।

কিন্তু এই দিক হইতে দেখিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে এমন একটা সময় আসে যখন সমগ্র ধনসম্পদও বেশী অনুপাতে ত নয়ই, সমান অনুপাতেও বাড়ে না। প্রথম দিকে হয়ত মাথাপিছু আয় বাড়িতে পারে। কিন্তু এইরূপ বাড়িতে বাড়িতে এমন একটা সময় আসিবেই যখন মাথাপিছু আয় কমিতে আরম্ভ করে।

যে জনসংখ্যার অবস্থানকালে জনসংখ্যার জন্যই মাথাপিছু আয় সব চেয়ে বেশী হয় সেই জনসংখ্যাকে সর্বাপেক্ষা বেশী কাম্য (optimum) বলা হয়। জনসংখ্যা কাম্যের চেয়ে বেশী হইলে অতিপ্রজনতা (over-population) দেখা দেয়।

কাম্য জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা (India's Population in Terms of Optimum Population)—

ভারতের বর্তমান (১৯৬১ সাল) জনসংখ্যা প্রায় ৪৪ কোটি। দেশের

আয়তন অনুসারে ঘনত্ব খুব বেশী নয়, গড়ে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ৩৪৮ জন। ১৯৫৭-৫৮ সালের দ্রব্যমূল্য অনুসারে ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয় ছিল ১৩৩২০ কোটি টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালের দ্রব্যমূল্যের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৩০৪ টাকা। এ কথা নিঃসন্দেহ ভাবে বলা যায় যে আমাদের জাতীয় আয় বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে—বৃদ্ধির হার গড়পড়তা বছরে শতকরা ৩ এর বেশী। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু জাতীয় আয় বেশী হারে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া মনে হইতে পারে যে ভারতের জনসংখ্যা কাম্যসংখ্যার চেয়ে কমই হইবে। কিন্তু, বিভিন্ন কারণে এ ধারণা ভুল।

প্রথমত, উৎপাদন ও আয় বাড়াইবার জন্য বর্তমান লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক কম লোকসংখ্যাই যথেষ্ট। বেকারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হইতে প্রমাণ হয় যে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য জনবৃদ্ধির মোটেই প্রয়োজন নাই। উৎপাদন দ্রুততালে বৃদ্ধি পাইতেছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য, জনবৃদ্ধির জন্য নহে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের মাথাপিছু আয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। লোকসংখ্যা কমিলে মাথাপিছু আয় বাড়িতে পারে, উৎপাদনেরও কোন ক্ষতি হয় না। তাহাতে মনে হয় ভারতে লোকসংখ্যা কাম্যের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ এ কথা বলিলে ভুল হয় না যে ভারতে অতিপ্রজনতা (overpopulation) দেখা দিয়াছে।

শ্রমিক সংখ্যা (Numerical Strength of Labour)—যে সব দেশে কৃষি, শিল্প, উন্নতি লাভ করে নাই সেই সব অনগ্রসর (under-developed) দেশে কোন মতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলকেই 'শ্রম' সরবরাহ করিতে হয়। ধনসমৃদ্ধ দেশে অধিকাংশ পরিবার খাদ্যবস্ত্র বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। সুতরাং সেরূপ দেশে অন্তত বালকবালিকা এবং বৃদ্ধবৃদ্ধাদের খাটিয়া খাইতে হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে ধনসম্পন্ন দেশের চেয়ে দরিদ্র দেশে জনসংখ্যার বেশী অংশ 'শ্রম' জোগায়।

আবার, যে সকল দেশে সমাজ সেবার (social services) আদর্শ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সকল দেশে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় বালকবালিকারা 'শ্রম' দিতে পারে না। ইংলণ্ডে বেশ

বেশী বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাইতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশে এখনও শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় নাই, তবে ১৪ বৎসরের কম বয়সের ছেলে মেয়েদের কারখানা কিংবা খনির কাজে নিযুক্ত করা বে-আইনী। ঐ সকল দেশে আবার অনেক রকম কাজে নির্দিষ্ট বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করায় বৃদ্ধবৃদ্ধারা 'শ্রম' সরবরাহ করিতে পারে না। এই সব কারণেও শ্রমিক-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে।

সামাজিক রীতিনীতির ফলেও শ্রমিকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। যে দেশে পর্দাপ্রথা আছে সে দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক ক্ষেত্রে শ্রম সরবরাহ করে না। যে দেশে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব আছে সেখানে স্ত্রীলোকেরাও কাজে যোগ দিয়া শ্রমিকসংখ্যা বাড়াইয়া তোলে।

জীবনযাপনের মানের উপরও শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে। যে দেশে জীবনধারণের মান অত্যন্ত উঁচু, অর্থাৎ যে দেশের লোকেরা একটু অধিক সম্পদ অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করে, সে দেশে বেশী লোক পরিশ্রম করে।

আবার, কর্মের প্রতি অনুরাগ-বিরাগের উপরও শ্রমের যোগান নির্ভর করে। কোন কোন লোক অত্যন্ত কর্মবিমুখ। তাহারা সম্পত্তিশালী হইলে কোন কাজ করে না। কাজেই জনসংখ্যার এইরূপ অংশ শ্রমিকসংখ্যার মধ্যে গণ্য হয় না।

এই সব কথা বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে একটি দেশের কোন অংশ শ্রম সরবরাহ করিবে তাহা সেই দেশের আর্থিক অবস্থা, সমাজসেবার আদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রার মান, কাজের প্রতি অনুরাগ-বিরাগ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

ভারতের শ্রমিকসংখ্যা (Labour Force in India)—ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করা হয় নাই। তবে অচিরে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়, কারণ সংবিধানে এইরূপ নির্দেশ আছে। সুতরাং ১৪ বৎরের কম বয়সের বালকবালিকাদের শ্রমিকসংখ্যার মধ্যে গণ্য করা উচিত নয়। সরকারী হিসাব হইতে বলা যায় জনসমষ্টির শতকরা ৩৮ জন এই বয়সের।

ভারতে বৃদ্ধদের সকলের জন্য সাধারণভাবে কোন পেন্সনের (old age pension) বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং, বৃদ্ধরাও বাধ্য হইয়া শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করিতে চায়। ইহাদিগকে শ্রমিকসংখ্যার মধ্যে ধরা উচিত।

তাহা হইলে ভারতীয় জনসমষ্টির শতকরা ৬২ জনই শ্রমিকসংখ্যার মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু, ভারতীয় নারীগণ এখনও বেতনভোগী শ্রমিকের কাজে তেমন অগ্রসর হইতেছে না। সুতরাং জনসমষ্টির একটা বড় অংশ শ্রমিক-সংখ্যার মধ্যে গণ্য হয় না।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে ভারতের শ্রমিকসংখ্যা জনসমষ্টির শতকরা ৪০ জনের বেশী হইবে না। ১৯৫৪ সালের "Final Report of the National Income Committee"তেও এইরূপ সংখ্যার কথা বলা হইয়াছে।

কাজের সময় (Hours of Work)—দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে থাকিলে লোকের শ্রমের বয়স (জীবনের প্রথম এবং শেষ অংশ বাদ দিয়া) কমাইয়া দেওয়া হয়, আবার ছুটির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং কাজের সময় কমাইয়া দৈনিক ও বাৎসরিক মোট কাজের সময়ও বেশ কমাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে শ্রমদক্ষতা বাড়িলে অবশ্য শ্রমের মোট সরবরাহ বাড়িতে পারে, কিন্তু শ্রমদক্ষতা না বাড়িলে কাজের সময় কমাইবার ফলে শ্রম সরবরাহের লাঘব হয়।

বাস্তবিক পক্ষে, কি পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা লাভ, পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ এবং কাজের সময় হ্রাস করাইয়া মোট কর্মদক্ষতা বাড়াইতে এবং শ্রম সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যায় তাহা নির্ণয় করা আধুনিক দেশগুলির একটি প্রধান সমস্যা।

শ্রমদক্ষতা (Efficiency of Labour)—একজন শ্রমিক প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণের (quantity) এবং যে রকম উৎকর্ষের (quality) জিনিস উৎপাদন করিতে পারে তাহার দ্বারা সেই শ্রমিকের শ্রমদক্ষতা বা শ্রমনৈপুণ্য (efficiency of labour) বিচার করা হয়। দেশের জলবায়ু, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও শিক্ষা, কাজের অবস্থা প্রভৃতির উপর শ্রমনৈপুণ্য নির্ভর করে।

সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের চেয়ে শীতপ্রধান দেশের লোকেরা বেশী পরিমাণে কাজ করিতে পারে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে সে ভালভাবে কাজ করিতে পারে। রুগ্ন লোকের পক্ষে, শারীরিক ত নয়ই, মানসিক পরি-শ্রম করাও কষ্টকর হইয়া পড়ে।

লোকদের বুদ্ধি থাকিলে তাহারা কর্মকুশল হয়। শ্রমিক যদি মোটামুটি ভাবে সাধারণ শিক্ষা পায় তাহা হইলে তাহার বুদ্ধির প্রখরতা বাড়ে।

তখন তাহার পক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আয়ত্ত করা সহজ হয়। শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ ও বৃত্তিমূলক, এই উভয়বিধ শিক্ষাই প্রয়োজনীয়।

যে অবস্থায় শ্রমিকদের কাজ করিতে হয় এবং তাহারা যেরূপ পারিশ্রমিক পায় তাহার উপর তাহাদের কর্মদক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে। উৎপাদনের অন্য উপাদানগুলি উন্নত ধরণের হইলে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে। জমি যদি খুব উর্বরা হয় তবে শ্রমিকদের জনপ্রতি ফসলও বাড়ে। যন্ত্রপাতি যদি ভাল হয় তবে শ্রমিকরা জনপ্রতি বেশী জিনিস উৎপন্ন করে। উদ্যোক্তা বা পরিচালক যদি জমি, শ্রম এবং মূলধনের যথাযথ সমন্বয় করিতে পারে তবে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। কাজের গুরুভার লাঘব করিবার ব্যবস্থা থাকিলে তাহা শ্রমিকদের পক্ষে হিতকর। অবসর বিনোদনের সুব্যবস্থা, কাজের সময়ে ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদিতে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে। কারখানাগুলিতে যদি বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে কর্মরত শ্রমিকগণও সেই সব ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করিয়া দক্ষতা অর্জন করিতে পারে। আজকাল অনেক বড় বড় কারখানায় এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে যে কারখানায় যেরূপ জিনিস তৈয়ারি হয় সেই কারখানার শ্রমিকরা সেরূপ জিনিস তৈয়ারি করিবার কৌশল আয়ত্ত করে। বেশী বেতন পাইলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, শক্তি বৃদ্ধি পায়, মনে আনন্দ থাকে। ইহাতে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে।

সমাজনিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি (social security measures) শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াইতে সাহায্য করে। এই সব ব্যবস্থায় লোকের খাওয়া-পরা এবং বাসস্থান ভাল হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে, অসুখের সময় চিকিৎসা হয়, এবং অসুস্থতার জন্য বেশী সময় নষ্ট হয় না। লোকে বেকার অবস্থায়ও পয়সা পায়, তাহাতে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। অবসর গ্রহণ করিবার পর পেন্সনের বন্দোবস্ত থাকিলে লোকে কাজ করিবার সময় স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয় না।

ভারতীয় শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Indian Labour)—যে সকল উপাদান ও অবস্থা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক ভারতে তাহাদের বিশেষ অভাব। এইজন্য ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতার মান আশানুরূপ নয়।

ভারতে শ্রমিকগণের অনেকে বারমাস একই কাজে সময় কাটায় না;

কখনও কৃষিকার্যে, কখনও খনির বা কলকারখানার কার্যে নিযুক্ত থাকে। কোন বিশেষ কাজে ইহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে না। জমির আয় জীবিকানির্বাহের জন্য অপ্রচুর বলিয়া অনেকে সাময়িকভাবে শহরে বা কলকারখানা অঞ্চলে চলিয়া আসে। পল্লী অঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসার হইলে চাষীরা অল্প সময়ের জন্য কলকারখানায় আসিবে না, কুটির শিল্প হইতে আয় বৃদ্ধি করিবে। তখন যাহারা কলকারখানায় কাজ লইবে তাহারা স্থায়ীভাবে সেখানেই থাকিবে, তাহাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়িবে।

ভারত মোটের উপর গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এখানকার লোকদের পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করা অত্যন্ত কষ্টকর। ভারতীয় আবহাওয়ায় শ্রমিকদের সাধারণ দক্ষতা ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের তুলনায় অনেক কম।

এখানকার শ্রমিকগণ দরিদ্র, উপযুক্ত আয়ের অভাবে কোন রকমে শরীর টিকাইয়া রাখে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে ন্যূনতম পুষ্টিকর খাদ্য, আলোহাওয়াযুক্ত গৃহ ইত্যাদির প্রয়োজন তাহাও জোটে না। ফলে, ভারতীয় শ্রমিকগণ স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল ও অক্ষম। স্বভাবতই তাহাদের কর্মদক্ষতা কম। যে সকল দেশে শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নত সেখানে তাহাদের কর্মদক্ষতাও বেশী।

শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের দক্ষতা অনেকাংশে তাহার বুদ্ধি ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে. কেবলমাত্র শারীরিক শ্রমে সমর্থ হইলেই শ্রমিককে দক্ষ বলা যায় না। ভারতীয় শ্রমিকগণ বুদ্ধিহীন নয়। কিন্তু, শিক্ষার অভাবে তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি তেমন কার্যকরী হইতে পারে না। এদেশে কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত যথোপযুক্ত নয়। সুতরাং, ভারতীয় শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতাও কম। যন্ত্রপাতি চালাইবার ব্যাপারে ভারতীয় শ্রমিককে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্তের অভাবে শ্রমিকগণ বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র চালাইবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে না।

ভারতের কলকারখানাগুলি তেমন উন্নত ধরণের নয়। পাশ্চাত্যদেশে যে সকল নূতন ধরণের যন্ত্রাদি কলকারখানায় ব্যবহৃত হয় সেগুলি এদেশে অপ্রচলিত। ফলে এখানকার শ্রমিকেরা ঐ সকল যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ না পাইয়া উৎপাদনে দক্ষতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় না।

মোটের উপর বলা যায় যে, ভারতীয় শ্রমিকদের কারিগরি নৈপুণ্যও (technical skill) খুব কম, সাধারণ নৈপুণ্যও (general efficiency) কম। ইহাদের সাধারণ নৈপুণ্য একজন ইংরেজ শ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশের বেশী নয়। শ্রমিকদের দক্ষতাবৃদ্ধির উপর ভারতীয় শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণভাবে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়াইবার উপায় পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঐ সব উপায় অবলম্বন করিলে ভারতীয়দের কর্মদক্ষতা বাড়ানো যাইবে।

বেকার সমস্যা (Unemployment Problem)—আজকাল প্রায় সব দেশেই সরকারকে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হয়। যাহারা কাজে নিযুক্ত ছিল কিন্তু কাজ হারাইয়াছে, ধনবিজ্ঞানে তাহাদিগকে বেকার বলা হয়। আবার, যাহারা কাজ করিতে সমর্থ এবং প্রচলিত বেতনে কাজ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াও কাজ সংগ্রহ করিতে পারে না তাহাদিগকেও আজ-কাল বেকার বলা হয়। মোটের উপর, লোকে যখন ইচ্ছা এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাইয়া বসিয়া থাকে তখন তাহার সেই কর্মহীন অবস্থাকে বেকার অবস্থা (unemployment) বলিতে পারা যায়।

বিভিন্ন কারণে লোকে কর্মহীন হইয়া পড়ে। তবে সর্বক্ষেত্রেই বেকার সমস্যার আসল কারণটি হইল এই যে শ্রমিকদের চাহিদা কম, কিন্তু সরবরাহ বেশী। শ্রমিকদের সংখ্যা হঠাৎ পরিবর্তন করা যায় না। অথচ চাহিদা অনেকদিন ধরিয়া কম থাকিতে পারে, আবার হঠাৎ খুব কমিয়া যাইতে পারে। শ্রমিক চাওয়া হয় কাজের জন্য। কাজ কম থাকিলে শ্রমিকদের চাহিদা কমে, কাজ বেশী থাকিলে এই চাহিদা বাড়ে। ভারতবর্ষে সরবরাহের তুলনায় শ্রমিকের চাহিদা সাধারণ অবস্থায়ই কম; দুর্যোগ, দুর্বিপাক হইলে আরও কমিয়া যায়। কাজেই এখানে বেকার সমস্যা লাগিয়াই আছে। যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন দেশগুলিতে সাধারণত চাহিদার আকস্মিক পরিবর্তনে বেকার সমস্যা আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। যদি কোন একটি ব্যবসায়ে লাভ কম হইতে থাকে, অথবা অনেকগুলি ব্যবসায়ে কিংবা সব ব্যবসায়ে একযোগে মন্দা পড়ে, তাহা হইলে শ্রমিকের চাহিদা হঠাৎ কমিয়া যায় এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক শ্রমিক আবার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয় বলিয়াও বেকার অবস্থায় দিন কাটায়। জড়তাও বেকার অবস্থার একটি কারণ।

বেকার অবস্থার প্রকারভেদ (Types of Unemployment)—সাধারণত তিন ধরণের বেকার অবস্থা দেখা যায়। একটি হইল যান্ত্রিক উন্নতির (rationalisation) জন্য। শ্রমিকদের কায়িক পরিশ্রমের বদলে যন্ত্র দিয়া কাজ চালাইতে গেলে শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যায়। ফলে বহু লোক বেকার হইয়া পড়ে। ইহাতে কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে—যেখানে যান্ত্রিক উন্নতি হইয়াছে সেখানে—বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়। আজকাল শিল্পোন্নতির যুগে ইহা একটি সাধারণ ঘটনা।

দ্বিতীয় ধরণের বেকার অবস্থা ঘটে যদি কোন বিশেষ শিল্পে বার মাস কাজ না চলে—মাঝে মাঝে বিরতি থাকে—তাহা হইলে। যেমন, আমাদের দেশে চিনির কলে। চিনির কল বৎসরে সব সময়ে চলে না, বেশ কিছু সময় বন্ধ থাকে। তখন চিনির কলের শ্রমিকেরা বেকার হইয়া পড়ে। রাস্তা তৈয়ারির কাজও এইরকম। রাস্তা তৈয়ারির কাজ বার মাস চলে না, মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে। কাজেই রাস্তা তৈয়ারির শ্রমিকেরা মাঝে মাঝে বেকার হইয়া পড়ে।

ব্যবসাবাণিজ্যে সাধারণভাবে মন্দা পড়িলে তৃতীয় ধরণের বেকার অবস্থা ঘটে। এইরকম সময়ে ব্যবসায়ীরা ছাঁটাই করে। ফলে বেকার অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বেকার সমস্যার সমাধান (Solution of the Problem of Unemployment)—বিভিন্ন ধরণের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের জন্য যে বেকার সমস্যা দেখা দেয় তাহা সহজেই দূর হয়। সেই যন্ত্রপাতিও তৈয়ারি করিতে হয়। সেইজন্য নূতন কারখানা খুলিতে হয়। তাহার ফলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক উন্নতির ফলে দেশের সম্পদ বাড়ে, বিভিন্ন জিনিস তৈয়ারির জন্য উদ্যোগ আরম্ভ হয়, তখন শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে।

যে সব জিনিস তৈয়ারির কাজ মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে সেই সব জিনিসের কারখানায় যদি অবসরকালে অন্য কোন জিনিসের তৈয়ারির বন্দোবস্ত করা যায় তাহা হইলে বারমাসই কাজ চলে। তবে সব রকমের কাজে এরূপ বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়—যেমন, রাস্তা তৈয়ারির কাজে।

ব্যবসাবাণিজ্যে সাধারণভাবে মন্দা পড়িলে প্রায় সব দেশেই সরকারের উদ্যোগে ধনোৎপাদনের কাজ করা হয় এবং সমাজউন্নয়নমূলক কাজ বাড়াইয়া

দেওয়া হয়। সরকার সাধারণ অবস্থায় যে সব কাজ করে না তাহা করিতে আরম্ভ করিয়া বেকার শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করে। এই সব কাজ নানারকমের হইতে পারে। যেমন, বাড়ী তৈয়ারি, রাস্তা তৈয়ারি, বস্তিসংস্কার, বৃক্ষরোপণ, খাল খনন, ইত্যাদি। ইহাতে শ্রমিকেরা কাজ পায় এবং দেশেরও একটা স্থায়ী উপকার হয়। মন্দার সময় মজুরির হার কমাইয়াও কিছুটা উপকার করা যায়। ইহা করিলে লোকের সম্পূর্ণভাবে বেকার হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা কম থাকে।

অনেক সময়ে অনেক শ্রমিক শুধু নিজেদের অজ্ঞতার (ignorance) জন্য বেকার থাকে। এক শিল্পে কিংবা এক জায়গায় কাজ না থাকিলেও অন্যত্র বেশ কাজ থাকিতে পারে। কিন্তু কোথায় কখন কাজ পাওয়া যায় তাহা বহু শ্রমিক জানে না। কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠান (Employment Exchange) স্থাপন করিয়া তাহার মাধ্যমে শ্রমিকদিগকে এই সব খবরাখবর সরবরাহ করা যাইতে পারে। আজকাল প্রায় সকল সভ্য দেশেই এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে।

ভারতে বেকার সমস্যা (**Problem of Unemployment in India**)—ভারতে বেকার সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। জনসংখ্যার হাজারকরা অন্তত ১৫ জন বেকার। নিয়োগযোগ্য লোকদের, অর্থাৎ যাহারা কাজ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক তাহাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা হাজারকরা ৩৫ জনেরও বেশী। আবার, যাহারা কার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের মধ্যেও বহুসংখ্যক লোক (নিযুক্ত লোকদের শতকরা প্রায় ১০ জন) অপূর্ণ-নিয়োগের (under-employment) যাতনায় ক্ষুব্ধ। তাহারা যত সময় এবং যেরূপ অর্থকরী কাজ করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক সেইরূপ সময়ের জন্য অথবা সেই ধরণের কাজ তাহাদের জোটে না। ফলে তাহাদের আয়ও যথাযোগ্য আয়ের তুলনায় অনেক কম।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কর্মে নিযুক্ত লোকদের শতকরা ৭২ জন কৃষিকার্যে কাল যাপন করে। এখানকার কৃষিকার্য অত্যন্ত ছোট বহরের। সুতরাং ইহা শ্রমপ্রধান (labour-intensive)। তাহা হইলেও স্পষ্টই বোঝা যায়, এত লোক কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজন হয় না। দেখা যায় যে একজনের কাজ দুইজনে করে এবং আয় অনর্থক ভাগ হইয়া যায়। ফলে অপূর্ণ-নিয়োগ সমস্যার উৎপত্তি হয়। তাহা ছাড়া, কৃষির কাজ বারমেসে

নয়। কৃষকগণ বছরের অধিকাংশ সময় অনিয়োগের জ্বালা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলেও অপূর্ণ নিয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মূলধনের অভাবের ফলে শিল্পের প্রসার তেমন দ্রুতগতিতে হইতেছে না। সুতরাং খনি, কারখানা প্রভৃতির কাজেও বেশী সংখ্যক লোক ঢুকিতে পারিতেছে না। যাহাদের কোন রকম কারিগরি শিক্ষা নাই তাহাদের পক্ষে কাজ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ, কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্তও তেমন নাই। Employment Exchangeগুলির হিসাব হইতে দেখানো হইয়াছে, যাহারা বেকার বলিয়া নাম লিখাইয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জনের (১৯৫৯ সালে) মোটেই কোন কারিগরি দক্ষতা নাই, মাত্র ৪৭ জনের কোন কোন বিষয়ে নৈপুণ্য আছে।

সাধারণ শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যার স্ফীতি ভারতের একটি বিশেষ সমস্যা। ইহারা হাতের কাজ করিতে অনিচ্ছুক। অবশ্য উচ্চশিক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে যদি হাতের কাজও জুটিত তবে অনেকেই তাহা করিত। কিন্তু কোন রকমের কাজ জোটে না বলিয়াই অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের জন্য কেরানীগিরি ব্যতীত অন্যান্য কাজ জোটা অসম্ভব। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি এত বেশী হয় নাই যাহাতে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এত অধিকসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত লোকদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কেরানীর পদ সৃষ্টি হইতে পারে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে Employment Exchangeগুলির তালিকায় যাহাদের নাম ছিল তাহাদের শতকরা ২৫ জনেরও বেশী ছিল কেরানীপদের প্রার্থী। গ্রাজুয়েট বেকারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী ও মহারাষ্ট্রে খুব বেশী।

ভারতে বেকার-সমস্যার সমাধান (Solution of Unemployment Problem in India)—গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদি তৈয়ারি ও মেরামতের কাজ, পরিবহনের কাজ, সেচের কাজ, মাঝারি বহরের কারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে কাজ—এই রকম নানা প্রকারের কাজের ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকগণের উদ্বৃত্ত অংশকে যথোপযুক্ত কাজ দিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় কুটিরশিল্পের প্রসার। কুটির শিল্প শ্রম-প্রধান (labour-intensive)—ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূলধনের দরকার হয় এবং মূলধনের তুলনায় অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের বন্দোবস্ত হয়।

বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার আরও দ্রুততর করা প্রয়োজন। ইহার ফলে বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় কাজ জুটিবেই, আনুষঙ্গিক অনেক স্বল্পায়তন কারখানারও সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতেও কাজের বন্দোবস্ত হইবে।

কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার করিয়া সাধারণ শিক্ষার দ্বার কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত রাখিলে ভাল হয়। শিক্ষিত লোকদেরও কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা উচিত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, সরকারী হিসাব অনুসারে দেখা যায়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলেও, অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালেও, ভারতবর্ষে অন্তত ৩০ লক্ষ লোক সম্পূর্ণভাবে বেকার থাকিবে।

প্রশ্ন

1. Distinguish between productive labour and unproductive labour. Give examples.

(উদাহরণ দ্বারা উৎপাদক এবং অনুৎপাদক শ্রমের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।) [২৪-২৫ পৃষ্ঠা]

2. Is the function of an entrepreneur 'labour' in Economics ?

(ধনবিজ্ঞানে উদ্যোগকার্য কি 'শ্রমে'র পর্যায়ে পড়ে ?) [২৫ পৃষ্ঠা]

3. Analyse the factors that determine the supply of labour in a country,

(কোন দেশে শ্রমসরবরাহ যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।) [২৫-২৬ পৃষ্ঠা]

4, Can the supply of labour possibly fail to increase when there is an increase in population ? If so, how ?

(দেশের লোকসংখ্যা বাড়িয়া গেলেও কি শ্রম সরবরাহ না বাড়িয়া যাইতে পারে? যদি এরূপ সম্ভব হয় তাহা কি ভাবে সম্ভব ?) [২৫-২৬ পৃষ্ঠা]

5. Critically examine the Malthusian theory of population.

(ম্যাল্‌থাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনা কর।) [২৭-২৯ পৃষ্ঠা]

6. What is the significance of 'optimum population' ?

('কাম্য জনসংখ্যা' কথাটির তাৎপর্য কি ?) [২৮-২৯ পৃষ্ঠা, ৩৪ পৃষ্ঠা]

7. "The growth of population should be compared not with that of food supply but with that of total income."—Discuss

("জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাদ্যবৃদ্ধির বিচার না করিয়া মোট আয়বৃদ্ধির বিচার করা উচিত"—এই উক্তিটির আলোচনা কর।) [২৮-২৯ পৃষ্ঠা, ৩৪ পৃষ্ঠা]

8. Discuss the relation between population and food production in India.

(ভারতের জনসংখ্যার সহিত খাদ্যোৎপাদনের সম্বন্ধ আলোচনা কর।) [২৯-৩৪ পৃষ্ঠা]

9. Discuss the problem of India's population and food supply. (Higher Secondary Examination, 1961)

(ভারতের জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহের সমস্যা আলোচনা কর।) [২৯-৩৪ পৃষ্ঠা]

10. Discuss the relation between population and national income.

(জনসংখ্যার সহিত জাতীয় আয়ের সম্পর্ক আলোচনা কর।) [২৮-২৯ পৃষ্ঠা, ৩৪ পৃষ্ঠা]

11. Is India over-populated?

(ভারতে কি অতিপ্রজনতা ঘটিয়াছে?) [৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা]

12. What are the factors on which the number of labourers in a country depend.

(কোন দেশে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর সেই দেশের শ্রমিক সংখ্যা নির্ভর করে?) [৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা]

13. Describe the relation between the hours of work per labourer and the total supply of labour.

(এক একজন শ্রমিকের কাজের সময়ের সহিত সেই দেশের মোট শ্রম-সরবরাহের সম্পর্ক বর্ণনা কর।) [৩৭ পৃষ্ঠা]

14. What do you mean by efficiency of labour? Describe the various factors upon which the efficiency of labour depends.

(শ্রমের দক্ষতা বলিতে কি বোঝ? যে যে বিষয়ের উপর শ্রমের দক্ষতা নির্ভর করে তাহা বর্ণনা কর।] [৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা]

15. What are the chief defects of Indian industrial labour and what, in your opinion, are their remedies? (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)

(ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের প্রধান ত্রুটিগুলি কি কি? কিভাবে উহা দূর করা যাইতে পারে?) [৩৮-৪০ পৃষ্ঠা, ৩৭ পৃষ্ঠা]

16. What is meant by unemployment? What are its causes?

(বেকারত্ব কাহাকে বলে? ইহার কারণ কি কি?) [৪০-৪২ পৃষ্ঠা]

17. What are the main types of unemployment?

(কি কি প্রকারের বেকারত্ব দেখা যায়?) [৪১ পৃষ্ঠা]

18 How can the unemployment problem be solved?

(কিরূপে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়?) [৪১-৪২ পৃষ্ঠা]

19. Discuss the unemployment problem of India. How can th number of the unemployed here be reduced?

(ভারতের বেকার সমস্যার আলোচনা কর। এখানকার বেকার-সংখ্যা কিভাবে হ্রাস করা যায়?) [৪২-৪৪ পৃষ্ঠা]

20. Discuss the special features of unemployment in India.

(ভারতে বেকারসমস্যার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।) [৪২-৪৩ পৃষ্ঠা]

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারিগরি নৈপুণ্য

(Technical Skill)

কারিগরি নৈপুণ্য কাহাকে বলে? (What is technical skill?)—উন্নত হইতে উন্নততর পদ্ধতিতে কাজ করার কৌশল জানাকে কারিগরি নৈপুণ্য (technical skill) বলা হয়। তবে বর্তমান যুগে উন্নততর যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিয়াই উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সেই জন্য, কারিগরি নৈপুণ্য বলিলে প্রধানত যন্ত্রপাতি বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান ও কর্মতৎপরতা বুঝায়। বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি কি ভাবে চালাইতে হয়, দরকার হইলে কি ভাবে মেরামত করা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানকে কারিগরি নৈপুণ্য বলে। এমন কি, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও কারিগরি নৈপুণ্যের মধ্যে পড়ে।

কারিগরি নৈপুণ্যের প্রয়োজনীয়তা (Importance of technical skill)—কারিগরি নৈপুণ্য সাধারণ নৈপুণ্যের (general efficiency) একটি বিশেষ রূপ। শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতাকে সাধারণ দক্ষতা বা নৈপুণ্য বলে। একজন শ্রমিক যে পরিমাণ এবং যতটা উৎকৃষ্ট জিনিস উৎপন্ন করে তাহার দ্বারা সেই শ্রমিকের সাধারণ নৈপুণ্য নির্ধারিত হয়। তবে আজকাল প্রায় সব জিনিসই যন্ত্রের সাহায্যে তৈয়ারি করা হয়। সুতরাং যন্ত্রের ব্যবহার যত ভাল জানা থাকে ততই অধিক পরিমাণে জিনিস তৈয়ারি করার ক্ষমতা লাভ করা যায়। বর্তমান এই যান্ত্রিক যুগে প্রধানত কারিগরি নৈপুণ্যের উপরই শ্রমিকদের সাধারণ নৈপুণ্য নির্ভর করে। শ্রমিকদের সাধারণ নৈপুণ্যের উপর আবার দেশের ধনোৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং, কোন দেশের সম্পদ বাড়াইবার জন্য কারিগরি দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন।

চাষের জন্য ট্রাক্টর (Tractor) কিনিয়া অর্থাৎ মূলধনের ব্যবস্থা করিয়াও যদি সেই ট্রাক্টর চালাইবার মত লোক না পাওয়া যায় তাহা হইলে মূলধন

থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনের উন্নতি বিধান করা যায় না। আবার, এমন লোক হয়ত পাওয়া গেল যে ট্রাক্টরটি চালাইতে পারে, কিন্তু সামান্য একটু বিকল হইলেও ইহা মেরামত করার উপায় জানে না। এমতাবস্থায় ট্রাক্টরটি ফেলিয়া রাখিতে হয়, মূলধনের অপচয় হয়। বিদেশ হইতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আনিয়া হয়ত কারখানা খোলা হইল, কিন্তু এই সকল যন্ত্র চালাইবার মত লোক না থাকিলে সর্বাপেক্ষা উন্নত উপায়ে জিনিস তৈয়ারির বন্দোবস্ত হয় কি ভাবে? এমনও হইতে পারে যে উপযুক্তসংখ্যক শ্রমিককে কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে যে সময় অতিবাহিত হইল তাহার মধ্যে বিদেশে ইহা অপেক্ষাও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইয়াছে। সেরূপ হইলে পূর্বে আনীত যন্ত্রপাতির উৎপাদন-ক্ষমতা বিদেশের তুলনায় বেশ কমিয়া যায়। স্পষ্টই বোঝা যায়, কেবলমাত্র মূলধনের ব্যবস্থা করিলেই দেশের উৎপাদন বাড়ানো যায় না, দেশের লোকদের কারিগরি নৈপুণ্যও সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইতে হয়।

আমাদের ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের উন্নতি বিধান করিবার সময়ে এইরূপ অবস্থা পরিস্ফুট হয়।

কারিগরি নৈপুণ্য গঠনের উপায় (Factors governing the formation of technical skill)—গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ শিক্ষার (অন্তত মাধ্যমিক শিক্ষা) বিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের মন যন্ত্রপাতির দিকে আকৃষ্ট করা উচিত। সাধারণ শিক্ষার ঝোঁক (bias) কারিগরি ব্যাপারের দিকে যত বেশী হইবে কারিগরি বিদ্যার প্রতি ততই আগ্রহ জন্মিবে। আমাদের দেশে সাধারণত কারিগরি শিক্ষার প্রতি কিছু পরিমাণ বিতৃষ্ণা দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ, আমাদের সাধারণ শিক্ষার (general education) মধ্যে যন্ত্রপাতির উল্লেখ পর্যন্ত থাকে না, আমাদের মনই গড়িয়া ওঠে যন্ত্র-বিমুখ হইয়া।

কারিগরি-নৈপুণ্যশীল লোকদের বেতনের হার খুব বেশী হইলে লোকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থার প্রসার ঘটিলে লোকে এই শিক্ষা লাভের প্রচুর সুযোগ পায় এবং তাহার ফলে নৈপুণ্য অর্জন করিতে পারে। Technical School, Engineering College প্রভৃতির সংখ্যা বাড়াইয়া কারিগরি শিক্ষা লাভের জন্য প্রার্থী সকলকেই এই শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত। Technical

Schoolএ শিক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে Engineering Collegeএ ঢুকিতে পারে তাহারও বন্দোবস্ত করা ভাল। শুধু তাহাই নয়, যাহারা কারিগরি শিক্ষা লাভ করে নাই অথচ কারখানায় কাজ করিতে করিতে যন্ত্রপাতি চালাইতে ও মেরামত করিতে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে তাহাদের জন্যও যথাযোগ্য ক্ষেত্রে Technical School অথবা Collegeএ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে নৈপুণ্য গঠনের সুবিধা হয়। এই ধরণের শ্রমিকেরা হয়ত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথায় বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে নাই বলিয়া ইহারা কেন কি হয় তাহা জানে না এবং সামান্য কিছু অদলবদল-করা যন্ত্রপাতির ব্যবহারেও অনেক সময়ে অপারগ হয়। যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিলেই ইহারা অত্যন্ত সুদক্ষ শ্রমিক হইয়া ওঠে, কারণ যন্ত্রের প্রতি ইহাদের স্বভাবগত এবং অভ্যাসগত ঝোঁক রহিয়াছে। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারগণ যদি মাঝে মাঝে কারিগরি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দান করেন এবং বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণও যদি মাঝে মাঝে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তাহা হইলে শিক্ষার মান উন্নত হয়। প্রয়োজন অনুসারে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞদের আনাইয়াও শিক্ষাদানের ব্যাপারে উন্নতির বন্দোবস্ত করা উচিত।

কারিগরি নৈপুণ্য গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি প্রথা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়। বিভিন্ন খনি, কারখানা ইত্যাদিতে কিছুসংখ্যক করিয়া শিক্ষানবিশ (apprentice) নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে হাতে কলমে শিক্ষা দান করিলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মোটের উপর কিছু লাভই হয়, দেশে সুদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়িয়া যায়।

অনুন্নত এবং অর্ধোন্নত দেশগুলির দ্রুত উন্নতির পথে একটি প্রধান বাধা হইল নিপুণ কারিগরের অভাব। এই সব দেশের সরকার এবং শিল্পপতিগণের উচিত একদিকে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ আনাইয়া দেশের মধ্যে সুচারুরূপে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা এবং অন্য দিকে দেশের যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠাইয়া উন্নত ধরণের উৎপাদন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করিয়া আনা।

ভারতে কারিগরি নৈপুণ্যের সমস্যা (Problem of technical skill in India)—ভারত এখনও অর্ধোন্নত দেশ (under-developed country)। কারিগরি নৈপুণ্যের অভাব এখানে অনুন্নত দেশগুলির মত

তত বেশী প্রকট না হইলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ কারিগর আমাদের দেশে নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী পরিকল্পনা অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির অভাবে দ্রুতগতিতে ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই।

দেশের সরকার এই বিষয়ে সচেতন হইয়া নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রসার, বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ, বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন—এই রকম নানা উপায়ে সরকার ভারতে কারিগরি নৈপুণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে এই বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

1. What do you mean by technical skill ? Describe its importance in economic development.
   ('কারিগরি নৈপুণ্য' বলিলে কি বোঝ ? অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার গুরুত্ব কিরূপ বর্ণনা কর।) [৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা]
2. Explain the factors that govern the formation of technical skill in a country.
   (কোন দেশে যে যে বিষয়ের দ্বারা কারিগরি নৈপুণ্যের গঠন নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ কর।) [৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা]
3. Briefly describe the problem of technical skill in India. What measures has the Government adopted to solve the problem ?
   (ভারতে কারিগরি নৈপুণ্যের সমস্যা কিরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে ?) [৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা]

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন
(Capital)

মূলধন কাহাকে বলে ? (What is capital ?)—সাধারণত 'মূলধন' (capital) বলিলে টাকাকড়ি বুঝায়। যেমন, আমরা চলতি কথায় বলিয়া থাকি ব্যবসা করিতে গেলে টাকা লাগে। তাহা ছাড়া, কোন ব্যবসায়ী তাহার হিসাব-নিকাশের খাতায় মূলধনের অঙ্কে তাহার যাবতীয়

সম্পত্তির অর্থমূল্যই ধরিয়া থাকে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'মূলধন' কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ধনবিজ্ঞানে 'মূলধন' বলিলে এমন কতকগুলি জিনিস বুঝায় যাহা মানুষের তৈয়ারি এবং যাহা সোজাসুজিভাবে ভোগ না করিয়া উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করিয়া অর্থ উপার্জন করা হয়।

জমি 'মূলধন' নয়, কারণ ইহা মানুষে তৈয়ারি করে না, ইহা প্রকৃতির দান। অবশ্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যাহা যাহা মূলধন বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাতেও প্রকৃতির দান কিছু না কিছু আছেই। কিন্তু এই সব জিনিসের বেলায় প্রকৃতির দানকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে মানুষের কাজের পরিমাণ খুব বেশী প্রযুক্ত হয়। জমির বেলায়ও অনেক সময়েই প্রকৃতির দানকে মানুষের কাজের দ্বারা (জঙ্গল পরিষ্কার, আগাছা দূর করা, সার দেওয়া ইত্যাদি) কার্যোপযোগী করা হয়। কিন্তু জমির ব্যাপারে মানুষের কাজ অপেক্ষা প্রকৃতির দানের পরিমাণই অনেক বেশী। তাহা ছাড়া, যে সব ক্ষেত্রে মানুষের কাজের পরিমাণ নগণ্য নয় সে সব ক্ষেত্রে ঐ কাজের মূল্যকে মূলধন হিসাবে গণ্য করিয়া কেবলমাত্র প্রকৃতির দানকে 'জমি' বলিয়া ধরা হয়।

খাদ্যবস্ত্রাদি যাহা লোকে সরাসরি ব্যবহার করে তাহা 'মূলধনের' পর্যায়ে পড়ে না। এই রকম জিনিসকে উপভোগের সামগ্রী (consumer goods) বলে। কিন্তু যে সব জিনিসের সাহায্যে মানুষ উৎপাদন করে তাহা 'মূলধন'—যেমন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি। 'মূলধন' সরাসরি ভোগ করা যায় না। মূলধনের উপভোগ পরোক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ। জেলে জাল দিয়া মাছ ধরে। সে যদি হাত দিয়া মাছ ধরিত তবে সোজাসুজি মাছ পাইত। তাহা না করিয়া সে কয়েকদিন ধরিয়া জাল তৈয়ারি করিল। তারপর সেই জাল দিয়া মাছ ধরা আরম্ভ করিল। ইহাতে সে জালের উপযোগ ভোগ করিল মাছের মধ্য দিয়া এবং কয়েকদিন অপেক্ষা করিবার পর সে সেই উপযোগ ভোগ করিল। বড় বড় কলকারখানার ব্যাপারেও এই রকমই হয়।

মূলধনের পর্যায়ে শুধু যে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদিই পড়ে তাহা নয়—এমন অনেক জিনিস পড়ে যাহা কখনও কখনও সরাসরি ভোগ করা হয়, আবার অবস্থাবিশেষে উৎপাদন কার্যে সাহায্য করে। আসল কথা, একটি জিনিস কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা বুঝিয়া ইহা মূলধনের পর্যায়ে পড়িতেছে কি না তাহা ঠিক করিতে হইবে। যদি ইহা সরাসরি উপভোগ করা হয়

তবে ইহা 'মূলধন' নয়। যদি ইহা উৎপাদনের কার্যে লাগানো হয় তবে ইহা 'মূলধন'। ধরা যাক, সেলাই করিবার স্থতা। বাড়ীর গৃহিণী যদি জামা সেলাই করিবার জন্য স্থতা ব্যবহার করেন তাহা হইলে ইহা ভোগ্যবস্তু, 'মূলধন' নহে। কিন্তু দরজী যখন সেলাই করিবার স্থতা ব্যবহার করে তখন ইহা 'মূলধন', ভোগ্যবস্তু নহে। ব্যবসায়ী যদি ব্যবসার কাজে তাহার মোটর গাড়ী ব্যবহার করে তবে সেটা 'মূলধন'। কিন্তু সে যদি নিজের স্থখের জন্য ইহা ব্যবহার করে তবে ইহা 'মূলধন' নয়। কারখানার জন্য তৈয়ারি বাড়ী সর্বদাই 'মূলধন'। কিন্তু বাসগৃহ সম্বন্ধে একটু সমস্যা আছে। কেহ যদি বাড়ী তৈয়ারি করিয়া তাহাতে নিজে বাস করে তবে সে বাড়ী সাধারণত 'মূলধন' বলিয়া পরিগণিত হয় না। কিন্তু কেহ যদি বাসগৃহ তৈয়ারি করিয়া তাহা ভাড়া দেয় তবে উহা 'মূলধন'। 'মূলধন' নিয়োগ করিয়া মূলধনের মালিক আয় করে। এরূপ আয়কে স্থদ বলে। ধনবিজ্ঞানে এরূপ আয়ের হার পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট বলিয়া ধরা হয়।

মূলধনের প্রকারভেদ (Classification of capital)—মূলধনের প্রকারভেদ আছে। সাধারণত ইহাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) স্থায়ী (fixed) এবং (২) পরিবর্তনশীল বা চলতি (circulating) মূলধন। যে জিনিস বহুবার উৎপাদনের কার্যে ব্যবহার করা যায় তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে—যেমন যন্ত্রপাতি, কারখানাঘর ইত্যাদি। একই বাড়ীতে একটি কারখানা বহুদিন ধরিয়া কাজ চালাইতে পারে। একই যন্ত্র দিয়া বহুদিন ধরিয়া উৎপাদন কার্য চলে। এই ব্যাপারে ইহাদের কোন রূপান্তর হয় না। কিন্তু কাঁচা মাল ব্যবহৃত হইলে সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করে—যেমন তূলা। তূলা হইতে যখন স্থতা তৈয়ারি হয় তখন আর তাহা তূলা থাকে না। এক গাছি স্থতা এবং এক বাণ্ডিল তূলায় অনেক তফাৎ। তাই তূলা পরিবর্তনশীল মূলধন। ইহা একবার ব্যবহার করিলেই রূপ বদলায়। স্থতা দিয়া আবার কাপড় বোনা হয়। ইহাও পরিবর্তনশীল মূলধন। কিন্তু স্থতা কাটার কল কিংবা কাপড় বুনিবার কল স্থায়ী মূলধন।

উৎপাদনের ব্যাপারে মূলধনের কার্যাবলী ও গুরুত্ব (Functions and importance of capital in production)—মূলধন ব্যতীত উৎপাদন কার্য অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনে মূলধন প্রয়োজন হয়। কৃষিকার্যে লাঙ্গল লাগে, মই লাগে, বীজ লাগে। খনি হইতে

কয়লা তুলিতে গেলে গাঁইতি লাগে। এসব ত খুব সাধারণ ব্যাপার। উন্নত ধরণের মূলধন নিয়োগ করার ফলে আজকাল উৎপাদন কার্য এত প্রসার লাভ করিয়াছে। আধুনিক যুগকে যান্ত্রিক যুগ বলা হয়। এখন বহুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। তাহার ফলে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান কম পরিমাণে ব্যবহার করিয়া জিনিসপত্র তৈয়ারি করা যায় এবং কম সময়ের মধ্যে অধিক জিনিস উৎপন্ন হয়। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শ্রমের লাঘব হইয়াছে। এখন ক্রেইনের সাহায্যে ভারী ভারী মালপত্র নামানো হয়। ইহাতে শুধু কায়িক শ্রম কমে নাই, সময়ও বাঁচিয়াছে। যে কাজ হয়ত দশ দিনে হইত তাহা এখন এক ঘণ্টায় হয়। লাঙ্গল দিয়া চাষ করিলে যতটুকু জমি একদিনে চাষ করা যায় ট্রাক্টর দিয়া চাষ করিলে তাহার চেয়ে অনেক বেশী জমি চাষ করা যায়, ফসলও অনেক বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কলে সুতা কাটিলে এক ঘণ্টায় যত সুতা কাটা যায় চরকায় তত বেশী সুতা কাটা যায় না। তাহা ছাড়া, যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছে। বিশাল জলপ্রপাতকে এখন বিদ্যুৎ সরবরাহের উৎস করা হয় এবং সেই বিদ্যুৎ অতি সস্তায় লোকে ব্যবহার করিতে পারে। আমাদের দেশে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায়ও এই ধরণের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যন্ত্রযুগে এখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মানুষের অবাধ গতি প্রতিষ্ঠিত।

মূলধন আর এক ভাবেও বহু প্রকার জিনিসের উৎপাদনে অপরিহার্য। প্রায় সব রকমের জিনিস তৈয়ারি করিতে গেলেই কাঁচা মালের প্রয়োজন। এই পরিবর্তনশীল মূলধনটি উৎপাদন ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

মূলধনের সংগ্রহ ও বৃদ্ধি (Accumulation and increase of capital)—মূলধনের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি হয় কি ভাবে ? সঞ্চয় (saving) না করিলে মূলধন জন্মে না। খুব ছোট একটি উদাহরণ দিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝানো যাইতে পারে। একটি চাষী ধান জন্মায়। সে যাহা জন্মায় তাহা যদি সবই খাইয়া ফেলে তবে ভবিষ্যতে সে আর ধান জন্মাইতে পারিবে না। ধান জন্মাইতে বীজ লাগে। কাজেই বীজ জমাইয়া না রাখিলে—ধান সঞ্চয় না করিলে—পরের বৎসর সে কিছু বপন করিতে পারিবে না, সে ধান জন্মাইতে পারিবে না। কিন্তু সে কিঞ্চিৎ ধান সঞ্চয় করিলে তাহা বীজ রূপে তাহার মূলধন হইল। ইহার সাহায্যে সে ভবিষ্যতে ফসল উৎপন্ন করিতে পারিবে।

সব ব্যাপারেই এই রকম। সেই জন্য বলা হয়, সঞ্চয় হইতেই মূলধনের উৎপত্তি।

সঞ্চয় করার অর্থ উপভোগের সামগ্রী ভোগ না করা। লোকে যদি তাহাদের আয়ের সবটাই উপভোগ্য দ্রব্যের জন্য ব্যয় করে তাহা হইলে দেশের যাবতীয় শ্রম এবং সম্পদ ভোগ্যবস্তু তৈয়ারির জন্য নিয়োজিত হইবে। ফলে কোন মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ারি হইবে না। লোকে যদি তাহাদের আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে তবে সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে দেশের শ্রম ইত্যাদি 'মূলধন' তৈয়ারির কাজে নিয়োজিত হইতে পারে। অবশ্য, এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে সঞ্চিত অর্থও এইভাবে নিয়োজিত না করিলে মূলধনের সৃষ্টি হয় না। তবে নিয়োজিত করিলে, তাহার ফলে মূলধনের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। একবার কিছু মূলধন সৃষ্টি হইলে তাহা দ্রুতগতিতে বাড়ানো যায়। ইহার কারণ এই যে মোট উৎপাদন বর্ধিত হয়, কাজেই লোকের ভোগের মাত্রা বাড়িয়া না গেলে সঞ্চয়ও বেশী হয় এবং এই বর্ধিত সঞ্চয়ের দ্বারা অধিকতর মূলধন তৈয়ারি হইতে পারে।

সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দেশের লোকদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা (power to save) ও ইচ্ছার (will to save) উপর।

আয় যদি যথেষ্ট বেশী না হয়, অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেই যদি সমস্ত আয় খরচ হইয়া যায়, তাহা হইলে লোকে সঞ্চয় করিতে পারে না। কাজেই সঞ্চয় করিতে হইলে এমন আয় থাকা দরকার যাহাতে মোটামুটি প্রয়োজন মিটাইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকে।

শুধু সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেই যে সঞ্চয় করা হয় তাহা নহে। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি না থাকিলে সঞ্চয় হয় না। এই প্রবৃত্তি সকলের সমান থাকে না। যাহারা বেশী সাবধানী তাহারা ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান রাখিতে চায়। আবার স্নেহ ভালবাসার প্রেরণায়ও লোকে সঞ্চয় করে। নিজের মৃত্যুর পরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যাহাতে সম্পদের অভাবে কষ্ট না পায় সেই জন্য অনেক সময়ে লোকে সঞ্চয় করে। অনেকে আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়াও সঞ্চয় করে—অনেকে মূলধনের মালিক হইয়া সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে চায়।

ইহা ছাড়া, সব লোকেরই সঞ্চয় প্রবৃত্তি বাড়িবার এবং কমিবার কারণ আছে। দেশে সঞ্চিত সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকিলে সঞ্চয়ের

প্রবৃত্তি কমিয়া যায়। দেশের মধ্যে যদি শান্তি ও শৃঙ্খলা না থাকে অথবা বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে যদি দেশ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে লোকের সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে, যদি শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং নিরপত্তার ব্যবস্থা থাকে এবং সঞ্চিত অর্থ জমা রাখিবার সুবন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়ে। ব্যাঙ্ক থাকিলে লোকে সেখানে টাকা জমা রাখিতে পারে। বীমা প্রতিষ্ঠান থাকিলে টাকা জমাইবার আগ্রহ হয়। যৌথ কারবারী প্রথা থাকিলে লোকে শেয়ার কিনিয়া টাকা জমাইতে পারে। যে দেশ যত উন্নত সেই দেশে এইসব প্রতিষ্ঠান তত বেশী।

ভারতে মূলধনের সমস্যা (Problem of capital in India)—ভারতে লোকসংখ্যার তুলনায় জাতীয় আয় শোচনীয়ভাবে কম। ইহার প্রধান কারণ মূলধনের স্বল্পতা। অবশ্য, মূলধনের স্বল্পতার কারণও জাতীয় আয়ের স্বল্পতা। এইভাবে এক মহা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রতিবৎসর দেশের সমগ্র আয়ের শতকরা অন্তত ২০ ভাগ মূলধন হিসাবে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। কিন্তু, দেশের লোকদের সঞ্চিত এবং নিয়োজিত অর্থের পরিমাণের সহিত সরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত কর হইতে বাঁচাইয়া যে অর্থ নিয়োজিত করা হইয়াছে তাহা এবং এদেশে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন (foreign capital) যোগ করিয়া দেখা যায় যে মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করা হইয়াছে ১৯৫৬ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭·৬ ভাগ, ১৯৬১ সালে ১১ ভাগ। দুইটি সুনির্দিষ্ট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলেও এখন পর্যন্ত ইহার বেশীতে পৌঁছানো যায় নাই। তবে সরকার আশা করে যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরে ১৯৭৬ সালে সঞ্চিত এবং সরকারের আদায়-করা করের উদ্বৃত্ত অর্থ যাহা মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হইবে তাহার মোট পরিমাণ হইবে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৭·৭ ভাগ।

আমাদের দেশে মূলধনের স্বল্পতার বহু কারণ আছে। বহু লোক দুই বেলা খাইতেই পায় না, তাহারা সঞ্চয় করিবে কি উপায়ে?

যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহাদের অনেকে গহনা ইত্যাদিতে স্বর্ণরৌপ্য মজুত করে। ইহা উৎপাদনকার্যে বিনিয়োগ (invest) করা হয় না বলিয়া মূলধন গঠিত হয় না।

অনেকে উৎসব-অনুষ্ঠানে অযথা অর্থব্যয় করে। এই অর্থ সঞ্চিত করিয়া উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করিলে ভাল হয়।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যথেষ্ট প্রসার লাভ করে নাই। অর্থ গচ্ছিত রাখার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অভাবেও কেহ কেহ সঞ্চয় সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে।

লোকের আয় বাড়াইবার যত উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িতে পারে। মজুত-করা স্বর্ণ-রৌপ্যের সদ্ব্যবহার করা হইলে মূলধনের পরিমাণ বাড়ানো যায়। লোকেরা নিজেরা ইহা না করিলে সরকারের উচিত তাহাদিগকে কোন না কোন উপায়ে বাধ্য করা।

জন্মতিথি, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে খরচের পরিমাণ কমাইয়া সঞ্চয় বাড়ানো উচিত।

পল্লী অঞ্চলেও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করা উচিত। Postal Savings Bankএ টাকা রাখা ও তোলার বন্দোবস্ত আরও অনেক সহজ করা উচিত। ইহাতে সুদের হার দেশের বড় বড় ব্যাঙ্কের সুদের হারের চেয়ে কম থাকা উচিত নয়।

স্বল্পবিত্ত লোকেরাও যাহাতে সরকারী ঋণপত্র সহজে কিনিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বর্তমানে ভারত সরকার National Savings Certificate, Prize Bond ইত্যাদির মাধ্যমে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

অনেকে বলেন, ট্যাক্সের হার কমাইয়া বড়লোকদের সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু, এই কথার মধ্যে তেমন কোন যুক্তি নাই। ট্যাক্স আদায় করিয়া তাহার বেশ কিছু অংশ সরকার মূলধনে পরিণত করে। পার্থক্য এই যে, তাহাতে এই মূলধনের মালিকানা থাকে সরকারের হাতে অর্থাৎ দেশের সমগ্র জনসমষ্টির হাতে, আর ট্যাক্সের হার কমাইলে বড়লোকেরা যদি সঞ্চয় বাড়ায় তবে গঠিত মূলধনের মালিকানা থাকিবে ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের হাতে।

প্রশ্ন

1. Explain the term 'Capital'. Distinguish between (*a*) Fixed Capital and (*b*) Circulating Capital.

('মূলধন' কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। (ক) 'স্থায়ী মূলধন', এবং (খ) 'চলতি মূলধনে'র মধ্যে পার্থক্য কি ?) [৪৯-৫১ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between : (*a*) Land and Capital ; (*b*) Consumption goods and Capital goods.

((ক) জমি ও মূলধনের মধ্যে এবং (খ) উপভোগ্য বস্তু ও মূলধনাত্মক বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কি বুঝাইয়া দাও।) [৫০-৫১ পৃষ্ঠা]

3. Explain the functions of capital as a factor of production.

(উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের কার্যাবলী বিশ্লেষণ কর।) [৫১-৫২ পৃষ্ঠা]

4. Discuss the factors on which the accumulation of capital in a country depends. [৫২-৫৪ পৃষ্ঠা]

(কোন দেশে যে যে বিষয়ের উপর মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর করে তাহার আলোচনা কর।)

5. Discuss the problem of capital in India.

(ভারতে মূলধনের সমস্যা কিরূপ তাহা আলোচনা কর।) [৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা]

6. What is capital ? What measures would you adopt to increase the accumulation of capital in India ? (Higher Secondary Examination, 1960.)

(মূলধন কাহাকে বলে ? ভারতে মূলধন বাড়াইবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত ?) [৪৯-৫১, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা]

7. What are the main causes which influence the accumulation of capital in a country ? How far are those causes present in India today ? (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)

(কোন দেশে মূলধনগঠন ব্যাপারে কি কি কারণ প্রভাব বিস্তার করে ? বর্তমান ভারতে ঐ সকল কারণ কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে ?) [৫২-৫৫ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

জাতীয় আয়

(National Income)

জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় (National Product and National Income)—কোন দেশে কোন এক বৎসরে জমি, শ্রম, মূলধন এবং উদ্যোগ এই উপাদানগুলির কার্যের ফলে যে সকল জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় এবং এই সকল জিনিসপত্রের উৎপাদন ব্যাপারে যে কাজকর্ম করা হয় তাহা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল কাজকর্ম (ইহাকে সেবাকার্য—services—বলে) করা হয় তাহার সমষ্টিই হইল সেই দেশের সেই বৎসরের জাতীয় উৎপাদন (national product)। এই উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার এবং সেবাকার্য উৎপাদক উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। উপাদানগুলির মধ্যে প্রায় সবই দেশের। তবে বিদেশী উপাদানও কিছু কিছু—বিশেষ করিয়া মূলধন—উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকিতে পারে। বিদেশী উপাদানগুলির প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়া উৎপাদনের বাকি অংশ দেশের লোকের প্রাপ্য। তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, দেশে যাহা উৎপাদন করা হয় তাহার প্রায় সবটাই অন্যদিক হইতে বিচার করিলে দেশের লোকের প্রাপ্য অথবা আয় (income) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দেশের লোকের আয় ইহা ব্যতীত আরও কিছু হইতে পারে। বিদেশে নিয়োজিত দেশীয় উপাদানগুলি হইতে—বিশেষ করিয়া মূলধন হইতে—কিছু কিছু আয় হইতে পারে। দেশের লোকের বিদেশ হইতে আয় এবং বিদেশীদের এ দেশ হইতে আয়, দেশের এই রকম আয় ও ব্যয়ের (বিদেশের আয়কে এ দেশের ব্যয় বলা যাইতে পারে) কথা উপেক্ষা করিলে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে দেশের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার ও সেবাকার্য (services) এবং দেশের লোকদের প্রাপ্য দ্রব্যসম্ভার ও সেবাকার্য একই কথা। একই ব্যাপার দুই পরিপ্রেক্ষিতে—উৎপাদনের এবং প্রাপ্যের দিক হইতে—দেখা যায়। উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে ইহাকে বলা হয় জাতীয় উৎপাদন (national product) এবং প্রাপ্য অর্থাৎ আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে ইহাকে বলা হয় জাতীয়

আয় (national income)। বাস্তবিক পক্ষে, কোন কিছুর জন্য আমরা যে দাম দিই তাহা হইতেছে প্রধানত সেই জিনিসটি তৈয়ারি করার জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন হইয়াছে সেই সমস্ত উপাদানের ব্যবহারের মূল্য (factor cost)। যাহারা সেই মূল্য নেয় তাহাদের কাছে উহা আয় বলিয়া গণ্য হয়। দেশের উৎপাদনের আর্থিক মূল্য যাহা পাওয়া যায় তাহা উৎপাদনের উপাদানগুলি নিজেদের আয় হিসাবে গ্রহণ করে। জমির মালিকেরা খাজনা নেয়, শ্রমিকেরা পারিশ্রমিক নেয়, মূলধনের মালিকেরা সুদ নেয় এবং উদ্যোক্তারা লাভ নেয়।

জাতীয় উৎপাদন (জাতীয় আয়) নির্ণয়ের মাপকাঠি (Standard of Measurement of National Product)—উৎপাদন অথবা প্রাপ্য যে দিক হইতেই দেখি না কেন, আমাদের প্রথমেই বিবেচনা করিতে হইবে এই জিনিসপত্র এবং সেবাকার্যকে ঠিক জিনিসপত্র এবং সেবাকার্য হিসাবেই গণনা করিব, না ইহাদের দাম অর্থাৎ আর্থিক মূল্য হিসাবে গণনা করিব।

দ্রব্য ও সেবাকার্যের মাপকাঠি দিয়া হিসাব করিলে, জাতীয় আয় নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হয়। যদি উৎপাদনের (অথবা প্রাপ্যের) একটা তালিকা প্রস্তুত করি তাহা হইলে ইহার মধ্যে পড়ে সেই বৎসরে প্রস্তুত চাল, ডাল, নূন, তেল, জামা, কাপড়, সাবান, আসবাব পত্র, রেডিও, সেলাইয়ের কল, লোহা, সিমেন্ট, গাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। কিন্তু এইরকম একটা তালিকার মধ্যে আমরা অনেক রকম কাজের পরিমাণ ও গুরুত্ব সহজে নির্ণয় করিতে পারি না —যেমন, কতটা শিক্ষা দান করা হইল, কতটা চিকিৎসার কাজ হইল, কতটা আমোদ প্রমোদ বিতরণ করা হইল ইত্যাদি। যদি এমন একটা তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভবও হইত যাহাতে দেশের মধ্যে উৎপন্ন সব রকমের জিনিসপত্র এবং সব রকমের সেবাকার্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহা হইলেও সেটা একটা ভয়ানক জটিল তালিকা হইত।

তাহা ছাড়া, এইরকম তালিকার তারতম্য বিবেচনা করিয়া এক বৎসরের আয়ের সহিত আর এক বৎসরের আয়ের তুলনা করা কঠিন হইত। আমি যদি বলি যে আমি ১৯৪০ সালে ১০০ মণ চাল, ২৫ মণ মাছ, ১৫০ জোড়া কাপড়, ৭৫ মণ আলু এবং ১৯৬০ সালে ৫০ মণ চাল, ৩০০ মণ মাছ, ২৫ জোড়া কাপড়, ১ মণ আলু আয় করিয়াছি তাহা হইলে এই দুই বৎসরের কোন বৎসর যে আমার আয় বেশী হইয়াছে তাহা ঠিক করা কঠিন হয়। এই সব কথা বিবেচনা করিয়াই

উৎপন্ন বস্তুগুলির এবং সেবাকার্যের অর্থমূল্য ধরিয়া জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। অর্থই হইল সাধারণ মাপকাঠি এবং এই মাপকাঠির দ্বারা হিসাব করিলে জাতীয় আয় ঠিক করা তত বেশী কঠিন হয় না।

জিনিসপত্রের আর্থিক মূল্য ধরিবার সময়ে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। যে দামে বিক্রয় করা হয় (sale price) সেই দাম ধরিব, না যে দাম বাস্তবিক পক্ষে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ হইয়া যাইবে (factor cost) সেই দাম ধরিব? অনেক সময় সরকার জিনিসপত্রের উপর পরোক্ষ কর (যেমন, উৎপাদন কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি) স্থাপন করে। কোন জিনিসের উপর এই পরোক্ষ কর (indirect tax) বসিলে, বিক্রেতারা সেই জিনিসটি পূর্বে যে দামে বিক্রয় করিতেছিল তাহার উপর করের পরিমাণ বসাইয়া মূল্য বাড়াইয়া বাজারে বিক্রয় করে। পরোক্ষ করের সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকার পায়, উপাদানগুলি পায় না। সুতরাং পরোক্ষ কর সহ যে দামে জিনিসটি বিক্রয় করা হইতেছে সেই দাম ধরিলে উপাদানগুলির প্রাপ্য অর্থের বেশী অর্থ ধরা হয়। এই কথা বিবেচনা করিয়া, সব রকমের জিনিসপত্রের বিক্রয়মূল্য যোগ দিয়া তাহা হইতে দেশে প্রচলিত পরোক্ষ করগুলি বাবদ সরকারের যাহা আয় হয় তাহা বাদ দিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়।

অর্থের মাপকাঠি দ্বারা জাতীয় আয় নির্ণয় করার মধ্যেও গলদ আছে।

প্রথমত, কতকগুলি বস্তু এবং কাজের মূল্য ধরা হয় না। এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ধারণ করার সময়ে শুধু সেই সব জিনিস এবং কাজ ধরা হয় যাহা অর্থের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা হইয়াছে। কেহ যদি বাড়ীতে তাহার নিজের জন্য শাকসব্জী উৎপন্ন করে, কেহ যদি নিজের জামাকাপড় নিজেই সেলাই করে, বাড়ীর গৃহিণী যদি রান্নাবান্না এবং গৃহস্থালির কাজ করেন, ডাক্তার যদি বিনা পয়সায় আত্মীয়স্বজনের চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে এই সকল ব্যাপার জাতীয় আয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, কারণ ইহাদের জন্য আর্থিক মূল্য দেওয়া হয় নাই। ফলে যে দেশের লোকেরা নিজেদের কাজ নিজেরাই বেশী করে সে দেশের জাতীয় আয়ের প্রকৃত পরিমাণ ধরা পড়ে না, আয় অনেক কম দেখানো হয়। অর্থের মাপকাঠিতে নিজের কাজের মূল্য কেই বা দেয়?

দ্বিতীয়ত, জিনিসপত্রের দাম ওঠানামা করে। কাজেই টাকার- অঙ্ক দিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করিলে বিভিন্ন বৎসরের আয়ের (দ্রব্য হিসাবে)

তারতম্য সহজে ধরা পড়ে না। একটি বৎসরের তুলনায় অন্য একটি বৎসরে জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ, কিন্তু উভয় বৎসরে একই পরিমাণ জিনিসপত্র তৈয়ারি হইতে পারে। এই অবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে দ্বিতীয় বৎসরে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উৎপাদন একই রহিয়াছে। কেবল টাকার দাম কমিয়াছে মাত্র। সত্য সত্যই যদি তুলনা করিতে হয় তবে প্রথম বৎসরের টাকার দামের সহিত দ্বিতীয় বৎসরের টাকার দামের তুলনা করিয়া জাতীয় আয়ের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে হয়। তবে ইহাও খুব সহজ নহে।

কিন্তু অন্য পদ্ধতির চেয়ে টাকার হিসাবে জাতীয় আয় নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত ভাল।

জাতীয় আয় পরিমাপের উপায় (Method of Measurement of National Income)—প্রধানত দুইটি উপায়ের যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়ঃ (১) অর্থের হিসাবে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য যোগ দিয়া, অথবা (২) দেশের লোকদের আয়ের পরিমাণগুলি যোগ দিয়া।

যে উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) এবং মোট জাতীয় আয় (Gross National Income) ধরিলে চলিবে না।

জিনিসপত্রের দামের বেলায়, সম্পূর্ণ সমাপ্ত জিনিসের (finished products) দাম ধরিয়া তাহা হইতে ঐ জিনিস তৈয়ারি করিতে যে পরিমাণ কাঁচা মাল (raw materials) এবং অন্য জিনিস লাগিয়াছে তাহার মূল্য বাদ দিতে হইবে। যেমন, সূতার উৎপাদন নির্ণয় করিবার সময়ে যে তূলা লাগিয়াছে তাহার দাম বাদ দিতে হইবে ; কাপড়ের উৎপাদন ঠিক করিবার সময়ে যে পরিমাণ সূতা লাগিয়াছে, এবং পাড়ের জন্য যে পরিমাণ রং ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার মূল্য বাদ দিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়। উৎপাদনের সময়ে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে নিশ্চয়ই কিছু অর্থ ব্যয় হইবে। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে তাহাও বাদ দিয়া তবে ঐ দ্রব্যের আসল মূল্য ধার্য হইবে। দেশের জিনিসপত্রগুলির প্রত্যেকটির দাম হইতে এই রকম কিছু পরিমাণ অর্থ বাদ দিলে যাহা দাঁড়ায় তাহার সমষ্টিকে নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product) বলা হয়। এই রকম

বাদ না দিলে স্থায়ী মূলধন অক্ষুণ্ণ থাকিবে এই কথা ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহা ছাড়া উৎপন্ন একই জিনিসের মূল্য দুই তিনবার করিয়া গণনা করা হয়।

লোকদের আয়ের পরিমাণ বিবেচনা করিবার সময়েও কোন লোকের মোট আয় (Gross Income) হইতে সে আয় করিবার জন্যই যাহা খরচ করিয়াছে তাহা বাদ দিয়া তাহার নীট আয় (Net Income) ধরিতে হইবে। একজন ডাক্তার রোগীর নিকট হইতে ৫০৲ টাকা নিয়া যদি তাহার কম্পাউণ্ডারকে ১০৲ টাকা দেয়, তবে ডাক্তারের আসল আয় ৪০৲ টাকা ধরিতে হইবে।

একজন লোকের উৎপাদন এবং আয়ের একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইবে।

একজন চাষী তাহার লাঙ্গল এবং বলদ দিয়া চাষ করিয়া এবং পূর্ব বৎসরের সঞ্চিত ১০ সের বীজধান বপন করিয়া অথবা অন্য লোকের নিকট হইতে ১০ সের ধান কিনিয়া তাহা বপন করিয়া ১০০ মণ ধান পাইয়া উহা ১০০০৲ টাকায় বিক্রয় করিল। তাহা হইলে কিন্তু তাহার প্রকৃত উৎপাদন অথবা আয় ১০০০৲ ধরিলে ভুল হইবে। তাহার বীজ ধানের দাম ১০০৲ লাগিয়াছে। লাঙ্গলেরও কিছু ক্ষয় হইয়াছে এবং মেরামত করিয়া পুর্বাবস্থায় নিতে হয়ত এক টাকা ব্যয় হইবে। বলদের পরমায়ু হ্রাস পাইয়াছে। প্রতি বৎসর হয়ত ২৲ টাকা করিয়া জমাইয়া সে আবার বলদ কিনিতে পারিবে। কাজেই এই চাষীর আসল উৎপাদন বা আয় হইল ১০০০৲ – (১০০৲ + ১৲ + ২৲) অর্থাৎ ৮৯৭৲। আসল আয় ঠিক করিতে হইলে মোট আয় হইতে মূলধনের ক্ষয় পুরণের জন্য কিছু অর্থ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বাবদও কিছু অর্থ বাদ দিতে হয়। অবশিষ্টাংশই আসল আয়। ইহাকেই নীট আয় (Net Income) বলে।

জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার সময় নীট জাতীয় আয়ই নির্ধারণ করা উচিত। যেমন একটি ব্যক্তির আয় দেখিবার বেলায়, তেমন একটি জাতির আয় দেখিবার বেলায়ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য হইতে কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট আয় ঠিক করা উচিত। যন্ত্রপাতির ক্ষয়পুরণের জন্য কিছু টাকা বাদ দিতে হয়। ব্যবহৃত কাঁচা মালের দাম বাদ দিতে হয়। এইরূপ অন্যান্য বিষয় ভাবিয়া দেখিয়া গণনা নির্ভুল করিতে চেষ্টা করাউচিত।

কোন একটি দেশের লোকেরা বিদেশ হইতে কিছু টাকা আয় করিতে

পারে, আবার সেই দেশের আয় হইতে কিছু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতে পারে। বিদেশ হইতে আগত আয় দেশের আয়ের সঙ্গে যোগ করা উচিত। আবার বিদেশে যে আয় চলিয়া যায় তাহা বাদ দেওয়া উচিত। এইভাবে জাতীয় আয় নির্ণয় করিতে হয়।

জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় নির্ণয় করিতে গিয়া নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। শেষ পর্যন্ত কিছুটা মনগড়া হিসাবও করিতে হয়। তবে, মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, উৎপাদনের মূল্যের সমষ্টি ঠিক করিয়া অথবা লোকদের আয়ের সমষ্টি ঠিক করিয়া, এই দুইটি উপায়ের যে কোন উপায়েই জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়। ভুল না থাকিলে দুই উপায়েই সমান ফল হইবে।

তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি ঃ—জাতীয় আয়=নীট জাতীয় আয়= নীট জাতীয় উৎপাদনের বিক্রয়মূল্য – পরোক্ষ করদ্বারা সরকারী আয়+বিদেশ হইতে প্রাপ্য অর্থ – বিদেশের প্রাপ্য অর্থ=মোট জাতীয় উৎপাদনের বিক্রয় মূল্য – (ব্যবহৃত কাঁচামাল ইত্যাদির দাম+মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ) – পরোক্ষ করদ্বারা সরকারী আয়+বিদেশ হইতে প্রাপ্য অর্থ – বিদেশের প্রাপ্য অর্থ।

অথবা, জাতীয় আয়=নীট জাতীয় আয়+বিদেশ হইতে প্রাপ্য অর্থ – বিদেশের প্রাপ্য অর্থ=লোকদের আয়ের সমষ্টি—আয় সংশ্লিষ্ট খরচের সমষ্টি+ বিদেশ হইতে প্রাপ্য অর্থ—বিদেশের প্রাপ্য অর্থ।

জাতীয় আয় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা (Need of estimating National Income)—জাতীয় আয় নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বিভিন্ন বৎসরের জাতীয় আয় তুলনা করিলে সেই দেশের লোকদের আর্থিক উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে কতকাংশে ধারণা জন্মে। অন্যান্য ব্যাপার খারাপ না হইলে, যখন উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়িয়া যায় তখন দেশের উন্নতি হয় বুঝিতে হইবে। অন্যান্য অবস্থা খারাপ হইলে অবশ্য আলাদা কথা। যেমন, জাতীয় আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের লোকদের আয়ের বৈষম্যও বাড়িয়া যায় তাহা হইলে অধিকসংখ্যক লোকের উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইতে পারে। তাহা হইলেও, মোটামুটিভাবে বলা যায় জাতীয় আয় বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপায় (How to increase National Income)—কিভাবে জাতীয় আয় বাড়ানো যায় তাহা বুঝিতে হইলে কোন্ কোন্ ব্যাপারের উপর জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে তাহা বিচার করিতে হইবে। জাতীয় আয় কিরূপ হইবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

উৎপাদনের উপাদানগুলির পরিমাণ বেশী হইলে জাতীয় আয় বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পরিমাণের তারতম্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় নির্ভর করে এই উপাদানগুলির উৎকর্ষ-অপকর্ষের উপর। ভূমির উর্বরতা, শ্রমিকের দক্ষতা, মূলধনের প্রাচুর্য এবং উপযোগিতা প্রভৃতির উপর জাতীয় আয় নির্ভর করে। এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জাতীয় আয় বাড়ানো যায়। বৃষ্টিপাত ভাল না হইলে সেচকার্যের দ্বারা জলের অভাব পূরণ করা যায়। আবার, জলপ্লাবন নিয়ন্ত্রণ করারও উপায় আছে। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াইবার জন্য শিক্ষার—বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার—বন্দোবস্ত করা উচিত। আধুনিক উন্নত দেশগুলিতে কারিগরি শিক্ষা বাড়াইয়া জাতীয় আয় বাড়াইবার পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। মূলধন অতি সাধারণ রকমের হইলে জাতীয় আয় বাড়ানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ইহা যদি আধুনিক ধরণের জটিল যন্ত্রপাতি হয় তাহা হইলে আয় বাড়িবার সম্ভাবনা আছে।

জাতীয় আয় কতকাংশে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের উপরও নির্ভরশীল। রাজনৈতিক গোলযোগ ঘটিলে দেশের উৎপাদন ব্যাহত হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা না থাকিলে লোকের জীবন বিপন্ন হয়। তাহা ছাড়া, ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত বলিয়া লোকে উৎপাদনের জন্য কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে—এমন কি ঠিক রাখিতে হইলে—দেশের মধ্যে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

মাথাপিছু আয় (Per Capita Income)—জনসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে জাতীয় আয়ও যদি তদনুরূপ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সাধারণত দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয় না। জাতীয় আয় যদি জনবৃদ্ধির অনুপাতে বেশী বাড়ে তাহা হইলে ত ভালই হয়। ১৯৪৮ (১লা এপ্রিল)-১৯৪৯ (৩১শে মার্চ) সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি। সেই বৎসরে

ভারতের জাতীয় আয় ছিল ৮৬৫০ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে লোকসংখ্যা বাড়িয়া হয় ৩৮'৩ কোটি, জাতীয় আয়ও বাড়িয়া ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রচলিত দ্রব্যমূল্যের হিসাবে ১০৪৮০ কোটি টাকা হয়। জাতীয় আয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অধিক অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং এইদিক হইতে বিচার করিলে দেশের ভালই হইয়াছিল বলিতে হয়।

একটি দেশের জাতীয় আয়কে সেই দেশের জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা মাথাপিছু আয় জানা যায়। ভারতে ১৯৪৮-৪৯ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৭ টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৭৩'৬ টাকা (১৯৪৮-৪৯ সালে প্রচলিত দ্রব্যমূল্যের হিসাবে)। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে জাতীয় আয় অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছিল বলিয়া মাথাপিছু আয়ও বাড়িয়াছিল।

জাতীয় আয় বণ্টন (Distribution of National Income)—মাথাপিছু আয় বাড়িলেই যে দেশের সব লোকের উপকার হইল এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। টাকার মূল্য একই রকম থাকিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপকার অপকার বিভিন্ন রকম হইতে পারে। ধরা যাক, লোক-সংখ্যাও বাড়িয়াছে, মাথাপিছু আয়ও বাড়িয়াছে। কিন্তু জাতীয় আয় যে পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহার সবটাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক পাইয়াছে, বাকি সকলের মোট আয় আগে যাহা ছিল তাহাই আছে। তাহা হইলে বাকি সকলের মাথাপিছু আয় আগের চেয়েও কম হইবে, কারণ তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে কিন্তু আয় বাড়ে নাই। সেই অবস্থায় ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে সামান্য কয়েকজন লোক ভীষণভাবে বড়লোক হইয়াছে, অন্য সব লোক আগের চেয়েও গরীব হইয়াছে। মাথাপিছু আয় অনুসারে সব লোকের ভালমন্দ বিচার করিতে গেলে এই ব্যাপারটা ধরা পড়ে না। এই সব কথা বিবেচনা করিয়াই অনেকে মাথাপিছু আয়ের মাপকাঠিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না।

জীবন যাপনের মান (Standard of living)—জীবন যাপনের মান (Standard of living) বলিলে কি বুঝি? কোন লোকের জীবন যাপনের মান বলিলে বুঝি সে নিজে যে ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদিকে একান্ত অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করে তাহা। যে পরিমাণ খাদ্য ইত্যাদি পাইলে কোনরকমে বাঁচিয়া থাকা যায় তাহাকে জীবন যাপনের মান বলে না; যে পরিমাণ না পাইলে কেহ বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক মনে করে, তাহার পক্ষে সেই পরিমাণ দ্রব্যই জীবনযাত্রার মান।

জীবনযাত্রার মানের কোন সাধারণ মাপকাঠি নাই। এক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা। ঠিক কতটা দ্রব্যকে লোকে অপরিহার্য মনে করে সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট মত নাই। তাহা হইলেও, বিভিন্ন পরিবারের লোকেরা কি ধরণের জিনিস খায়, কিরূপ কাপড়চোপড় পরে, কিরূপ বাড়ীতে থাকে, কিরূপ সঞ্চয় করে তাহা বিবেচনা করিয়া এবং বিভিন্ন জিনিসের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করিয়া বিভিন্ন পরিবারের লোকদের জীবন যাপনের মান নির্ণয় করা যায়।

জীবনযাত্রার মানকে মোটামুটি ভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) বাঁচিয়া থাকার মান, (২) স্বাস্থ্যমান, এবং (৩) স্বাচ্ছন্দ্যমান। স্বাস্থ্য ভাল থাকুক বা না থাকুক, কোন রকমে বাঁচিয়া থাকার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে যাহারা অপরিহার্য মনে করে তাহাদের জীবনযাত্রার মানকে বাঁচিয়া থাকার মান বলে। যাহারা স্বাস্থ্যকর বাসগৃহে থাকা, সস্তা কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া, সস্তা অথচ পর্যাপ্ত কাপড়চোপড় পরা এবং কিছু পরিমাণে আমোদপ্রমোদ করাকে জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম বিবেচনা করে তাহাদের জীবনযাত্রার মানকে স্বাস্থ্যমান বলা যায়। ইহারা কোনরকম সঞ্চয় করাকে (জরুরী অবস্থার জন্যও) অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করে না। যাহারা উল্লিখিত জিনিসগুলি একটু বেশী করিয়া চায় এবং বাসগৃহে রুচির পরিচয় দিতে চায়, ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট খরচ করিতে চায়, ভবিষ্যতের জন্যও সংস্থান করিতে চায়, তাহাদের জীবনযাত্রার মানকে স্বাচ্ছন্দ্যমান বলা চলে।

জীবনযাত্রার মান জাতীয় আয়ের উপর কতকাংশে নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা চলে যে, লোকবৃদ্ধির তুলনায় যদি জাতীয় আয় বেশী বাড়ে, অর্থাৎ মাথাপিছু আয় যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে দেশের প্রায় সব লোকেরই জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

ভারতের জাতীয় আয় (National Income in India)—আমাদের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বিবেচনা করা উচিত, এই জাতীয় আয়ের উৎসগুলির (sources) মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব কিরূপ। এ কথা নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় যে কৃষিকার্য এবং ইহার আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর (যেমন—পশুপালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পর্কিত ব্যবসায় ইত্যাদি) সূত্রে জাতীয় আয়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ আসে। সরকারী হিসাব অনুসারে, ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৭·৪ অংশ কৃষি এবং ইহার আনুষঙ্গিক কার্যাবলী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। গুরুত্ব হিসাবে দ্বিতীয় স্থান

অধিকার করিতেছে যে সূত্রটি তাহা হইল খনির কাজ, কারখানার কাজ এবং কুটিরশিল্প ইত্যাদি ছোট বহরে উৎপাদনের কাজ। এগুলির মধ্যে আবার ছোট বহরে উৎপাদনের কাজের (small enterprises) গুরুত্ব বেশী। ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮.৮ অংশ আসিয়াছে ছোট বহরের কাজ হইতে, শতকরা ৮.৪ অংশ আসিয়াছে কারখানার কাজ হইতে। ইহার পর বলা যায় বাণিজ্য অর্থাৎ কেনাবেচার ব্যবসা, ব্যাঙ্ক ও বীমার ব্যবসা, রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহনের ব্যবসা এবং ডাক ও তার বিভাগের কথা। এইগুলির মধ্যে—শুধু এইগুলির মধ্যে কেন, কারখানাশিল্পের তুলনায়ও—বাণিজ্যের গুরুত্ব বেশী। জাতীয় আয়ের সর্বাপেক্ষা কম অংশ আসে বিভিন্ন পেশা ও শিক্ষকতা ইত্যাদি কার্য, সরকারী চাকুরি, গৃহস্থের বাড়ীতে চাকুরি, বাড়ীভাড়ার আয় ইত্যাদি হইতে। বৈদেশিক আয়ব্যয়ের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সাধারণত বিদেশ হইতে আমাদের আয় আমাদের দেশ হইতে বিদেশের আয়ের চেয়ে কম থাকে। সুতরাং প্রায় প্রতি বৎসরই আমাদের জাতীয় উৎপাদন হইতে কিছু বাদ দিতে হয়, কদাচিৎ আমাদের আয় একটু বেশী হয়। বিদেশের আয় আমাদের আয়ের চেয়ে ১৯৪৮-৪৯ সালে ২০ কোটি টাকা এবং ১৯৫০-৫১ সালে ২০ কোটি টাকা বেশী ছিল, ১৯৫৬-৫৭ সালে ১০ কোটি টাকা কম ছিল।

আমাদের জাতীয় আয়ের উৎসগুলির কোন্‌টি হইতে শতকরা কত ভাগ আয় হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতে পারে :—

উৎস	বৎসর		
	১৯৫০-৫১	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
কৃষি ইত্যাদি … …	৫১.৩	৪৮.৮	৪৬.৪
খনির কাজ, কারখানা ও ছোট বহরের শিল্প … …	১৬.১	১৭.৭	১৮.৬
বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি…	১৭.৭	১৭.৩	১৮.১
বাড়ীভাড়া, পেশা, সরকারী চাকুরি ইত্যাদি … …	১৫.১	১৬.১	১৬.৯

তালিকাটি ভাল করিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কৃষি এবং

ইহার আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে (নিশ্চয়ই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে) কমিতেছে। অবশ্য, এখনও জাতীয় আয়ের ইহাই প্রধান উৎস। তবে দেশে মন্থরগতিতে হইলেও শিল্পের প্রসার হইতেছে।

ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে দ্বিতীয়ত যাহা বিচার্য তাহা হইতেছে এই : লোকসংখ্যার তুলনায় ভারতের জাতীয় আয় কিরূপ এবং ভবিষ্যতে ইহার কিরূপ বাড়িবার সম্ভাবনা আছে ?

১৯৫৭ সালে প্রচলিত দ্রব্যমূল্য (সুতরাং অর্থমূল্য) অনুযায়ী হিসাব করিলে ১৯৬০ সালের জাতীয় আয়ের পরিমাণ হয় ১৩৩২০ কোটি টাকা। এই সময়ে লোকসংখ্যা হইল ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ। সুতরাং মাথাপিছু আয় ৩০৪৲ টাকা। অন্য বহু দেশের তুলনায় ইহা শোচনীয় ভাবে কম।

তবে ভরসার মধ্যে এই যে মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে একটু একটু করিয়া হইলেও বাড়িতেছে। উক্ত অর্থমূল্য অনুযায়ী হিসাব করিলে দেখা যায়, ১৯৫৫ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৭৲ টাকা। পাঁচ বছরে ইহা কিছু বাড়িয়াছে এবং তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা আশা করা হইতেছে এই যে উক্ত অর্থমূল্য অনুযায়ীই মাথাপিছু আয় ১৯৬৫ সালে হইবে ৩৫৭৲ টাকা, ১৯৭০ সালে ৪২২৲ টাকা এবং ১৯৭৫ সালে ৫২০৲ টাকা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উক্ত অর্থমূল্য অনুযায়ী ১৯৫০ সালে মাথাপিছু আয় ২৬০৲ টাকার বেশী ছিল না। সুতরাং ২৫ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, এখনই যখন মাথাপিছু আয় আমেরিকায় ৯৪০০৲ টাকা, ইংলণ্ডে ৪৩৬০৲ টাকা, এমন কি জাপানেও প্রায় ১০০০৲ টাকা, তখন ১৯৭৫ সালে আমাদের দেশে মাথাপিছু আয় ৫২০৲ টাকা হইতে পারে এইরূপ আশ্বাস পাইয়া তেমন খুশী হওয়া যায় না। এই জন্যই, অনেকে ব্যাপক ভাবে জন্মনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া জনসংখ্যার বৃদ্ধি কমাইতে বলেন।

ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। এখানে আয়-বৈষম্য ভয়ানকভাবে বেশী। কিছু সংখ্যক লোক অত্যন্ত ধনী, তাহারা রাজার হালে চলে। কিছু সংখ্যক লোক শত চেষ্টা করিয়াও কিছুই আয় করিতে পারে না, তাহারা বাধ্য হইয়াই ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করে। কেহ কেহ বলেন, ভারতের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে শতকরা মাত্র ৫ জন লোক, এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে শতকরা ৩৫ জন, আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে শতকরা ৬০ জন।

প্রশ্ন

1. What do you mean by 'National Income'? Why are National Product and National Income almost the same?

('জাতীয় আয়' বলিলে কি বোঝ? দেশের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও সেবাকার্যের মূল্য এবং জাতীয় আয় প্রায় এক হয় কেন?) [৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা]

2. By what standard is National Income measured? Does any standard give a fully correct picture?

(জাতীয় আয় কোন্ মাপকাঠির দ্বারা পরিমাপ করা হয়? কোন মাপকাঠির ব্যবহারে কি সম্পূর্ণ সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়?) [৫৮-৬০ পৃষ্ঠা]

3. How is National Income measured?

(কোন্ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়?) [৬০-৬২ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between Gross National Product and Net National Product.

(মোট জাতীয় উৎপাদন এবং নীট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।) [৬০-৬১ পৃষ্ঠা]

5. Explain the importance of calculating the National Income and Per Capita Income.

(জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দাও।) [৬২-৬৩ পৃষ্ঠা]

6. How can the National Income be increased?

(জাতীয় আয় কিভাবে বাড়ানো যায়?) [৬৩ পৃষ্ঠা]

7. What do you mean by Per Capita Income? How can it decrease even if the National Income increases?

(মাথাপিছু আয় বলিলে কি বোঝ? জাতীয় আয় বাড়িলেও মাথাপিছু আয় কিভাবে কমিতে পারে?) [৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা]

8. How can the condition of the majority of the people of a country fail to be improved even if Per Capita Income increases?

(মাথাপিছু আয় বাড়িলেও কোন দেশের বেশীর ভাগ লোকের অবস্থার উন্নতি না হইয়া পারে কিরূপে?) [৬৪ পৃষ্ঠা]

9. Discuss the importance of the question of the distribution of National Income in considering the welfare brought about by any increase in Per Capita Income.

(মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির ফলে যে উপকার হয় তাহা বিবেচনা করিতে গেলে জাতীয় আয়ের বণ্টনের প্রশ্নের গুরুত্ব আলোচনা কর।) [৬৪ পৃষ্ঠা]

10. Explain the significance of 'Standard of Living.' How is it related to Per Capita Income?

(জীবনযাপনের মান কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। মাথাপিছু আয়ের সহিত ইহার সম্পর্ক কিরূপ?) [৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা]

11. Give a brief account of the National and Per Capita Income in India.

(ভারতের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।) [৬৫-৬৭ পৃষ্ঠা]

12. Give an account of the principal sources of India's National Income.

(ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎসগুলির বিবরণ দাও।) [৬৫-৬৭ পৃষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

আর্থিক গঠন ব্যবস্থা

(Economic Structure)

কোন দেশের আর্থিক গঠন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান হইতে পারে। কৃষিপ্রধান হইলে দেশের অধিকাংশ লোকের জীবিকা কৃষিকার্য হয়, জাতীয় আয়ের বেশ একটা মোটা অংশ কৃষি হইতে আসে। দেশটি শিল্পপ্রধান হইলে দেশের অধিকাংশ লোকের জীবনধারণের উপায় শিল্পকর্ম হয়, জাতীয় আয়ের বেশ বড় একটা অংশ শিল্প হইতে আসে। দেশ কৃষিপ্রধান হইলে সাধারণত অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। দেশ শিল্পপ্রধান হইলে দেশের বেশীর ভাগ লোকই শহরে বাস করে। কৃষিপ্রধান দেশে কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে।

মূলধনের মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতেও দেশের আর্থিক গঠন ব্যবস্থার বিচার করা যায়। কোন কোন দেশ সমাজতান্ত্রিক (Socialist)। এই সব দেশে মূলধনের মালিকানা সরকারের—যেমন, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে। বেশীর ভাগ দেশ হইল ধনতান্ত্রিক (Capitalist)। এই সব দেশে মূলধনের মালিকানা ব্যক্তিগতভাবে লোকদের হাতে—যেমন ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে। কোন কোন দেশে আবার মিশ্রতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামো (Mixed Economy) আছে। এই সব দেশে মূলধনের মালিকানা কতকাংশ সরকারের, কতকাংশ ব্যক্তিগত—যেমন আমাদের দেশে।

আর্থিক গঠন ব্যবস্থা বিচার করার জন্য আজকাল দেশগুলিকে অনেক সময়ে অধোন্নত এবং উন্নত, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

অর্ধোন্নত আর্থিক গঠন কাহাকে বলে? (Under-developed Economy)—ইংলণ্ড বা আমেরিকার তুলনায় ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি দেশের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। এই দেশগুলিকে অর্ধোন্নত দেশ বলা হয়। এই সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট আছে। তবে তাহা এখনও কাজে খাটানো হয় নাই। এই প্রাকৃতিক সম্পদ উপযুক্ত ভাবে কাজে খাটাইলে প্রচুর আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা হয় নাই বলিয়া জাতীয় উৎপাদন কম হয়। মাথাপিছু আয় খুব কম। অর্ধোন্নত দেশ বলিলে বুঝায় এমন দেশ যেখানে মাথাপিছু আয় খুব কম অথচ প্রাকৃতিক সম্পদ এমন আছে যে উহা কাজে খাটাইয়া মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বেশী করার সম্ভাবনা আছে।

অর্ধোন্নত আর্থিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Features of an under-developed economy)—অর্ধোন্নত দেশগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত, এই দেশগুলি কৃষিপ্রধান। ভারতে শতকরা ৭০ জন লোকের উপজীবিকা কৃষিকার্য। এখানে যাহারা বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কাজে এবং খনির কাজে ব্যাপৃত তাহাদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১১। ইংলণ্ডে শতকরা ৮ জনের জীবিকা কৃষির সঙ্গে এবং ৬৮ জনের জীবিকা শিল্পের সঙ্গে জড়িত। ভারতের জাতীয় আয়ের ৪৬·৪ শতাংশ কৃষি এবং ইহার আনুষঙ্গিক বৃত্তি হইতে, ৮·৮ শতাংশ কুটিরশিল্প হইতে এবং ৮·৪ শতাংশ খনি এবং কারখানা-শিল্প হইতে আসে।

অর্ধোন্নত দেশগুলিতে বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। আমাদের দেশে শতকরা ৮২ জন লোক গ্রামে বাস করে, ইংলণ্ডে শতকরা ২০ জন মাত্র।

অর্ধোন্নত দেশগুলিতে কৃষিকার্যও অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে চলে। ভারতে কৃষিকার্য চালানো হয় ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জমিতে। প্রাচীন কালের লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করা হয়। হাত দিয়া বীজ ছড়ানো হয়। জমিতে ভাল সার দেওয়া হয় না। কাজেই ফসলও খুব কম হারে হয়। গড়পড়তা হিসাবে জাপানে প্রতি একর জমিতে প্রায় ২৫০০ পাউণ্ড চাল হয়, ভারতে ৮০৭ পাউণ্ড। আমেরিকায় এক একর জমিতে ২৬৫ পাউণ্ড তুলা হয়, ভারতে ৯০ পাউণ্ড। অর্ধোন্নত দেশগুলি যে কৃষিপ্রধান বলিয়াই অর্ধোন্নত তাহা নহে। এ সব দেশে উৎপাদনরীতি প্রাচীন, কাজেই কম হারে জিনিসপত্র উৎপন্ন হয়।

অর্ধোন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকদের শ্রমনৈপুণ্য উন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের নৈপুণ্যের চেয়ে অনেক কম। ইহার একটি কারণ অবশ্য শ্রমিকদের শারীরিক অক্ষমতা। কিন্তু প্রধান কারণ হইল নৈপুণ্য বাড়াইবার উপায়ের অভাব। যে দেশ যন্ত্রশিল্পে খুব উন্নত সে দেশে শ্রমিকদের শ্রমনৈপুণ্য কাজের মধ্য দিয়া এবং পরিবেশের মধ্য দিয়া আপনা হইতেই বাড়িয়া চলে।

অর্ধোন্নত দেশে মূলধনের ভয়ানক অভাব। এখানে লোকের আয় এত কম যে তাহা হইতে সঞ্চয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ভাল ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অভাব থাকে বলিয়া সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হয় বলিয়া মূলধনের উৎপত্তি কম হয়। আর যন্ত্রপাতির অভাবে কৃষি বা শিল্প কোনটারই উন্নতি হয় না।

শুধু তাহাই নহে। অর্ধোন্নত দেশে বড় বড় কারখানা-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার মত লোকের অভাব। যে কয়েকজন লোক সঞ্চয় করিতে পারে তাহারা বাণিজ্যে অর্থাৎ জিনিসপত্র কেনাবেচার কাজে টাকা খাটায়, বড় বড় কারখানা খুলিয়া যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্র কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র তৈয়ারি করিবার দিকে মন দেয় না। বাণিজ্যে কম সময়ের জন্য টাকা আটক থাকে, তাড়াতাড়ি লাভের সম্ভাবনাও থাকে। সুতরাং অর্ধোন্নত দেশের পুঁজিপতিদের টাকা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। যন্ত্র তৈয়ারির কারখানা থাকে না বলিলেই চলে। বড় কারখানা যে কয়টি থাকে তাহাতে দৈনন্দিন উপভোগের সামগ্রীই তৈয়ারি হয়। ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানই বেশী থাকে।

অর্ধোন্নত দেশে মাথাপিছু আয় খুব কম। লোকের জীবনযাত্রার মানও খুব নীচু। এ সব দেশে সামান্য কয়েকজন লোক খুব ধনী হইতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, রোগ হইলে চিকিৎসা করাইতে পারে না। এক কথায়, বেশীর ভাগ লোক জীবন্মৃত হইয়া থাকে।

অবশ্য, কৃষিপ্রধান দেশের সবগুলিই যে অর্ধোন্নত তাহা নহে। কৃষিপ্রধান দেশও উন্নত হইতে পারে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি কৃষিপ্রধান। কিন্তু এই সব জায়গায় লোকের মাথাপিছু আয় অর্ধোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী, লোকের জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু, লোকে ভাল খায়, ভাল জামা কাপড় পরে, ভাল বাড়ীতে থাকে, অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করাইতে পারে। তাহারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য করে বলিয়া এইরূপ সম্ভব হয়।

তবে উন্নত দেশগুলি সাধারণত শিল্পপ্রধান। উন্নত দেশে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে কৃষিকার্য সম্পাদিত হয়, বৃহদায়তন কারখানায় শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বেশীর ভাগ কাজ যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। শ্রমিকদের দক্ষতা বেশী এবং তাহা আরও বাড়াইবার ব্যবস্থা আছে। মাথাপিছু আয় অনেক বেশী এবং জীবন যাপনের মান খুব উঁচু।

দেশ কৃষিপ্রধান হইলে সুবিধা এই যে খাদ্যদ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয় না, বরং সম্ভবস্থলে খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানিও করা যায়। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশের অসুবিধা এই যে শিল্পোন্নতির দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত কৃষিরও অবনতি হইতে পারে। আর সামান্য সামান্য যন্ত্রপাতির জন্যও বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। দেশ শিল্পপ্রধান হইলে খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচা মালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহাতে অবশ্য যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময়ে কোন ক্ষতি হয় না।

আর্থিক উন্নয়নের উপায় (Requirements for Economic Development)—কোন দেশকে কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত করিয়া দেশের লোকদের মাথাপিছু আয় বাড়াইয়া তোলাকে আথিক উন্নয়ন (economic development) বলে। ইহা করিতে হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (natural resources) সম্পূর্ণ ভাবে কাজে খাটাইতে হয়। বলা বাহুল্য, প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকিলে কোন দেশকেই উন্নত করা সম্ভব হয় না।

আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে দেশের আথিক গঠনে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখা উচিত, অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত, কোন একটার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা উচিত নয়। দেশের জলবায়ু যদি কৃষির অনুকূল হয় এবং জমি যদি উর্বর হয়, তাহা হইলে কৃষিই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত।

কিন্তু কৃষিকে উন্নতিশীল করার জন্য বিশেষ বিশেষ শিল্পেরও উন্নতি করা দরকার। যেমন, দেশে সার তৈয়ারির কারখানা থাকা দরকার, কৃষির জন্য ট্রাক্টর ইত্যাদি দেশেই তৈয়ারি করা উচিত। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এরূপ করা হইতেছে।

কৃষিসংশ্লিষ্ট শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পেরও উন্নতি দরকার।

কুটির শিল্প ও স্বল্পায়তন শিল্পের প্রসার করাইয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকদের

অর্ধ-বেকার (under-employed) অবস্থার নিরসন করিতে হইবে। কুটির শিল্প শ্রমপ্রধান, ইহাতে মূলধন কম লাগে। আমাদের দেশের মত যে সব দেশে বেকার এবং অর্ধ-বেকার লোকের সংখ্যা খুব বেশী এবং মূলধনের ভীষণ অভাব সেই সব দেশে কুটির শিল্প মাথাপিছু আয় বাড়াইবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ভোগ্যবস্তুর সরবরাহ বাড়াইয়া কুটির শিল্পগুলি জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির অসুবিধাগুলিও দূর করে। অপেক্ষাকৃত কম মূলধনে স্বল্পায়তন শিল্পের সৃষ্টি হইতে পারে। এগুলি যদি কোন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হইয়া ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্য পরিবহনের খরচ কম পড়ে এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বল্পায়তন শিল্পে লাভ হওয়া সম্ভব। বিশেষত, মূলধনের যখন এত অভাব (যেমন ভারতে) তখন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেই হইবে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন বৃহদায়তন শিল্পের এবং তাহার মধ্যেও আবার ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি মূল-শিল্পের (key industries)। মূল-শিল্প প্রতিষ্ঠা না করিলে যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা শক্ত, আর যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করার জন্য কারখানা স্থাপন না করিলে বরাবরই বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

ভারতের মত দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশী যাহা দরকার তাহা হইল মূলধন—বিশেষ করিয়া, বৈদেশিক মুদ্রার রূপে মূলধন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে কেবল দেশীয় মুদ্রায় মূলধন বাড়াইলেই চলিবে না, বিদেশ হইতে ভোগ্যবস্তু আমদানি না করিয়া যত বেশী সম্ভব যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইবে।

যাহাই করিতে হইবে তাহা সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে ছাড়া করা সম্ভব নয়। লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিলে অনভিপ্রেত দিকে মূলধনের বিনিয়োগ হয়।

অর্ধোন্নত দেশকে উন্নত করিতে হইলে সমগ্র দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রথমেই ঠিক করিতে হইবে কৃষি ও শিল্পের অনুপাত কিরূপ হইবে, ক্রমানুসারে কোন শিল্প আগে এবং কোন শিল্প পরে হইবে। তারপর উৎপাদনের উপাদানগুলির ত্রুটি দূর করিতে হইবে। জমিতে সারের ব্যবস্থা, কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রসার, সরকারী উদ্যোগে কারখানা স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা অর্ধোন্নত দেশকেও

উন্নত করা যায়। কিন্তু এই সব একটি পূর্বপরিকল্পিত পন্থায় করিতে হয়। সেই জন্যই আজকাল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (economic planning) কথা এত বেশী শোনা যায়।

ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

আমাদের দেশ এত বেশী কৃষিপ্রধান যে এখানে শিল্পের প্রসার অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলিতেছে। মূলধনের দারুণ অভাব। যাহা আছে তাহারও যথাযথ প্রয়োগ হয় না। ধনীদের অনেকে বিলাসব্যসনে অর্থক্ষয় করে। ব্যবসায়ীদের প্রায় সকলেই কেনা-বেচার কাজেই অধিকতর উৎসাহের সহিত মূলধন খাটায়। তাঁহারা ভারী শিল্পে (heavy industries) মূলধন আটকাইয়া রাখিতে নারাজ।

আমাদের দেশে নিপুণ কারিগরের সংখ্যাও যথোপযুক্ত নয়, তবে এই সমস্যার সমাধানে বেশী সময় লাগে না। কারিগরি শিক্ষার প্রসার বেশ ব্যাপক হইলেই এই সমস্যার সমাধান হয়।

সরকার নানা রকম পন্থা অবলম্বন করিয়া এই সকল ত্রুটি দূর করিয়া ভারতকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

প্রশ্ন

1. How can the different countries be classified according to economic structure?

(অর্থনৈতিক গঠনের ভিত্তিতে দেশগুলিকে কিরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় ?) [৬৯ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish, with examples, between a 'developed economy' and an 'under-developed economy'. Is a predominantly agricultural country necessarily an under-developed country ?

(উন্নত এবং অর্ধোন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্য কি ? উদাহরণ দাও। কৃষিপ্রধান দেশ কি অর্ধোন্নত হইতে বাধ্য ?) [৭০-৭২ পৃষ্ঠা]

3. What are the principal features of an under-developed economy? Illustrate your answer with reference to Indian conditions. (Higher Secondary Examination, 1960)

(অর্ধোন্নত দেশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ? ভারতের উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।) [৭০-৭১ পৃষ্ঠা]

4. What is meant by economic development? State the principal requirements for the economic development of an under-developed country like India. (Higher Secondary Examination, 1961)

'আর্থিক উন্নয়ন' বলিলে কি বোঝ ? ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশকে উন্নত করিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহার বর্ণনা দাও।) [৭২-৭৪ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় খণ্ড

ধনবিজ্ঞান

দশম শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

W. B. SECONDARY EDUCATION BOARD

Syllabus in Economics For Class X

8. Forms of business organisation—single-owner firm—Partnership—Joint-Stock Companies.
   Co-operation—principles—different types of co-operative societies and their main features.
   Small and Large scale industries.
9. Role of the Government—economic functions of the Government—Government and development planning—Indian 5-Years Plans.
10. Government finances—taxation, expenditure and borrowing—financing of development.
11. Money—functions of money—monetary standards—creation of money—Banks—Commercial Banks—Central Bank—Functions of Banks—Bank money.
12. The general price level—measurement of changes in the general price level—simple index numbers—inflation.

দশম অধ্যায়

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান
(Forms of Business Organisation)

যে কোন ব্যবসায়ে লাভ লোকসানের সম্ভাবনা আছে। লাভও হইতে পারে, আবার লোকসানও হইতে পারে। মালিকেরা লাভের আকর্ষণে ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের লোকসানেরও ঝুঁকি লইতে হয়।

মালিকানা স্বত্ব একজন লোকের হাতে থাকিতে পারে, আবার সামান্য কয়েকজন অথবা বহু লোকের হাতে থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য, মালিকানা স্বত্ব যাহার লাভ-লোকসানও তাহারই।

আধুনিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে মালিকের সংখ্যা এবং দায়িত্ব অনুসারে মোটামুটি চার প্রকারের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

একমালিকী প্রথা (Single-owner Firm)—প্রাচীনতম ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হইল একমালিকী প্রতিষ্ঠান। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মালিক মাত্র একজন লোক। সে নিজেই ব্যবসায়ের সমস্ত মূলধন যোগায়। ব্যবসায়ের লাভক্ষতিও সে একাই ভোগ করে। সে যখন খুশি ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে, আবার যখন খুশি ইহা বন্ধ করিয়া দিতে পারে। নিজের কাজের জন্য সে নিজের কাছেই দায়ী, আর কাহারও কাছে নয়। সে যে কোন সময়ে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। ইহার ফলে সে যখন যেমন সুবিধা সেই অনুসারে কাজ করিতে পারে। তাহার প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন মালিক নাই, সুতরাং উহার গোপন তথ্যগুলিও সে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকে না।

ছোটখাট ব্যবসায়ে একমালিকী ব্যবস্থা বিশেষভাবে উপযোগী। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এমন কি কারখানাশিল্পেও এই ব্যবস্থার বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু আজকাল সাধারতঃ কুটিরশিল্প এবং খুচরা বিক্রয়ের

ব্যবসায় ব্যতীত অন্যান্য শিল্পে এই ব্যবস্থা তেমন প্রচলিত নাই। কৃষিকার্যে অবশ্য এখনও একমালিকী ব্যবস্থা চালু আছে।

ছোটখাট ব্যবসায়ে একমালিকী প্রথার অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু ইহা বৃহৎ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উপযোগী নহে। (১) একজন লোকের পক্ষে বৃহৎ ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যধিক মূলধন যোগাড় করা একপ্রকার অসম্ভব। তাহা ছাড়া, মূলধন থাকিলেও আর একটি অসুবিধা আছে। (২) একমালিকী প্রতিষ্ঠান চালাইতে গেলে খুব বেশী দায়িত্ব বহন করিতে হয়। প্রতিষ্ঠানটি যদি বাজারের ধারকর্জ শোধ দিতে না পারে তাহা হইলে মালিকের সেই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মূলধন ত যাইবেই, মহাজনেরা তাহার অন্যান্য সম্পত্তিও ক্রোক করিতে পারে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের বেলায় মালিকের অন্যান্য সম্পত্তি ঐ প্রতিষ্ঠানের দায় (liability) হইতে মুক্ত থাকে। সেইজন্য খুব বেশী মূলধনের মালিক হইলেও ব্যবসায়ীরা একমালিকী প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি লইতে নারাজ হয়। (৩) একমালিকী প্রতিষ্ঠানের—ছোটবড় সব ব্যবসায়েই—আর একটি ত্রুটি আছে। এই ব্যবস্থাতে একজন লোকের দক্ষতার উপর ব্যবসায়ের উন্নতি নির্ভর করে। এই জন্য অনেক সময়ে দেখা যায় যে সুযোগ্য মালিকের অযোগ্য পুত্রের হাতে পড়িয়া ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়।

অংশীদারী প্রথা (Partnership)—দুইজন অথবা স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন লোক একত্র হইয়া কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে উহাকে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, ইহার মেয়াদ, কি ভাবে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, অংশীদারদের পরস্পরের অধিকার এবং দায়িত্ব—এই সবই একটি দলিলে লিখিত থাকে এবং তাহাতে সকলের সম্মতি থাকে।

অংশীদারদের দায় (liability) সীমাবদ্ধ (limited) নহে। প্রতিষ্ঠানের ধারকর্জ শোধ দিবার জন্য প্রত্যেক অংশীদার তাহার যথাসর্বস্ব দিতে বাধ্য। অবশ্য, কখনও কখনও বিশেষ কোন অংশীদারের দায় লিখিতভাবে সীমিত করা যায়। অসীম দায়বদ্ধ অংশীদারদের ঝামেলা আছে। প্রতিষ্ঠানটি ইহার ধারকর্জ শোধ করিতে না পারিলে অংশীদারগণ তাহাদের অন্যান্য সম্পত্তি দ্বারা ধার শোধ করিতে বাধ্য। প্রত্যেক অংশীদারের যাবতীয় সম্পত্তির উপর হাত পড়িতে পারে। একজন অংশীদার তাহার অংশের ধার শোধ করিতে অসমর্থ হইলে তাহার অংশের বোঝাও যে অংশীদার সমর্থ তাহাকে বহন করিতে হইবে।

কয়েকজন লোক মিলিত হইয়া এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে

ইহা অনেক বেশী মূলধন যোগাড় করিতে পারে। ধারকর্জেরও সুবিধা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ব্যাঙ্ক অথবা অন্য কোন সংস্থা হইতে সহজে টাকা ধার করিতে পারে। ধারকর্জের ক্ষেত্রে একজন লোকের অসীম দায় অপেক্ষা কয়েকজন লোকের অসীম দায়ের প্রতি মহাজনদের অধিকতর আস্থা থাকে। অংশীদারী প্রথার আর একটি সুবিধা আছে। কয়েকজন লোক মিলিত হইয়া প্রতিষ্ঠানটি চালায়। সুতরাং তাহাদের সম্মিলিত দক্ষতার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন দরকারী প্রশ্ন নানা দিক দিয়া বিচার করা যায়। কাজেই যে কোন সিদ্ধান্তই লওয়া হউক না কেন তাহা বিবেচনাপ্রসূত হয়।

কিন্তু অংশীদারী প্রথার অসুবিধাও আছে। (১) অনেকের সহিত পরামর্শ করিতে হয় বলিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে অনেক সময় লাগে। (২) অসীম দায়ের ঝুঁকিও অনেকাংশে ভয়াবহ। (৩) অংশীদারী প্রথার সব চেয়ে বড় অসুবিধা হইল এই যে, যে-কোন একজন অংশীদারের মৃত্যু হইলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ভাঙ্গিয়া যায়। মৃত অংশীদারের উত্তরাধিকারিগণ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার রূপে গণ্য হয় না। অবশ্য, তাহারা পুরাতন অংশীদারগণের সহিত নূতন অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়া নূতনভাবে প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার হইতে পারে। আইন অনুসারে ইহা একটি নূতন প্রতিষ্ঠান হইবে। (৪) আবার, কোন অংশীদার সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি না ভাঙ্গিয়া তাহার অংশ বিক্রয় করিতে পারে না, কারণ কেহ পুরাতন অংশীদারদের উপর তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন নূতন অংশীদারকে চাপাইয়া দিতে পারে না।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও অংশীদারী প্রথায় অনেক সুবিধা আছে বলিয়া যৌথ মূলধনী প্রথা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অংশীদারী প্রথাতেই বড় বড় ব্যবসায় চালানো হইত। আজও ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে।

যৌথ মূলধনী প্রথা (Joint Stock Company)—যে কারণে অংশীদারী প্রথার উদ্ভব ঠিক সেই কারণে যৌথ মূলধনী কারবারের প্রচলন হইয়াছে। বড় বড় কারবারের জন্য অত্যধিক মূলধনের আবশ্যক হইল। কোন একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে ত দূরের কথা, অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও তাহা যোগাড় করা সম্ভব হইল না। তখন যৌথ কারবারী প্রথার উৎপত্তি হইল। বহুসংখ্যক লোকের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন লোক কারবারের শেয়ার কিনিয়া ইহার মালিক হয় এবং মূলধন সরবরাহ করে।

যৌথ মূলধনী প্রথার সহিত অংশীদারী প্রথার কিছুটা মিল আছে। উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকজন ভাগীদার প্রতিষ্ঠানটির মালিক এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকিও একজনের উপর না পড়িয়া কয়েকজন মালিকের উপর পড়ে। কিন্তু এই দুইটি প্রথার মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য আছে। অংশীদারী প্রথায় মালিকদের দায় অসীম, কিন্তু যৌথ কারবারী প্রথায় মালিক অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডারদের দায় শেয়ারের টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন একটি যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ধার শোধ করিতে না পারিলে শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের টাকা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার বেশী নয়। তাহাদের অন্য সব সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহা ছাড়া, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র অংশীদারদের জীবিতকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান শেয়ারহোল্ডারদের জীবনমৃত্যুর উপর নির্ভর করে না। শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য, সুতরাং প্রতিষ্ঠানটি বরাবর চলিতে থাকে।

কোন যৌথ মূলধনী কারবার চালাইতে গেলে দেশের কোম্পানী আইন অনুসারে সরকারের কাছে অনুমতি চাহিয়া আবেদন করিতে হয়। সরকারের নিকট হইতে অনুমতিপত্র পাইলে ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়।

যৌথ কারবারী প্রথায় অংশীদারী প্রথার ন্যায় ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নাই। সাধারণত যে-কোন শেয়ারহোল্ডার অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের না জানাইয়া তাহার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা কোম্পানীর কার্যালয়ে জানাইয়া নিজেকে শেয়ারহোল্ডারদের তালিকাভুক্ত করিয়া লয়। কোন শেয়ার-হোল্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ শেয়ারহোল্ডার হয়। এই হিসাবে যৌথ মূলধনী কারবার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া এইরকম প্রতিষ্ঠানের নামের পরে Ltd. (Limited) কথাটি যোগ করা থাকে।

যৌথ মূলধনী কারবারের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে বেতনভুক ম্যানেজার। শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন 'ডিরেক্টর' নির্বাচন করে। ইহারা কোম্পানীর কার্যাবলীর নীতি নির্ধারণ করে এবং মোটামুটি তত্ত্বাবধান করে।

যৌথ মূলধনী কোম্পানী দুই প্রকারের হইতে পারে। এক প্রকারের কোম্পানীতে শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা খুব কম (সাধারণত ৫০এর বেশী নয়)। এই ধরণের কোম্পানী যৌথ মূলধনী হইলেও ইহার কোন

শেয়ারহোল্ডার সমগ্র কোম্পানীর সম্মতি না লইয়া তাহার শেয়ার বিক্রয় করিতে পারে না। এই রকম কোম্পানীকে ঘরোয়া কোম্পানী (Private Limited Company) বলা হয়। আর এক ধরণের কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়—কোন নির্দিষ্ট উর্ধ্বতম সংখ্যা নাই। ইহার শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য। ইহাকে সর্বসাধারণের কোম্পানী (Public Limited Company) বলা হয়।

শেয়ারহোল্ডারগণই যৌথ মূলধনী কারবারের মালিক। তাহারা শেয়ার কিনিয়া মূলধন যোগায়। হয়ত একটি কোম্পানী দশ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এই দশ লক্ষ টাকা হইল অনুমতি-প্রাপ্ত মূলধন (authorised capital)। হয়ত আট লক্ষ টাকার শেয়ার (ধরা যাক ১০ টাকার ৮০০০০ শেয়ার) বিক্রয় করা হইল। কিন্তু এক একটি শেয়ারের নির্ধারিত সব টাকা এক সময়ে নেওয়া হইল না। কিছু (ধরা যাক ৫ টাকা) বাকি রাখা হইল—পরে দরকারমত লওয়া হইবে। এই ভাবে, হয়ত শেয়ারগুলির নির্ধারিত মূল্য আট লক্ষ টাকা হইলেও মোটের উপর চার লক্ষ টাকা আদায় করা হইল। এইরূপ অবস্থা হইলে আট লক্ষ টাকাকে বলা হইবে অঙ্গীকৃত মূলধন (subscribed capital) এবং চার লক্ষ টাকাকে বলা হইবে আদায়ীকৃত মূলধন (paid-up capital)।

শেয়ার আবার অনেক রকমের হইতে পারে। সাধারণ (ordinary) এবং অগ্রগণ্য (preference) শেয়ারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানী যাহা লাভ করিয়াছে তাহা বণ্টন করিবার সময়ে প্রথমে অগ্রগণ্য শেয়ারহোল্ডারদের যথানির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দিবে, পরে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের দিবে।

যৌথ মূলধনী কোম্পানী অনেক সময়ে ঋণপত্র (debenture) বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে। ইহা টাকা ধার করিবার অন্যতম উপায় মাত্র। যাহারা ঋণপত্র ক্রয় করে তাহারা কারবারের মহাজন মাত্র, মালিক নহে। উত্তমর্ণ হিসাবে তাহারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পায় এবং যথাসময়ে আসল টাকাও ফেরত পায়।

যৌথ মূলধনী প্রথার সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Joint Stock System)—যৌথ মূলধনী কারবারে সুবিধা হইল এই যে অল্প হারে বহু লোকের নিকট হইতে অর্থ

সংগ্রহ করিয়া প্রচুর মূলধন যোগাড় করা যায়। তাহা ছাড়া, এই প্রথার ফলে অনেক স্বল্পবিত্ত লোকও ব্যবসায়ের মালিকানা স্বত্ব লাভ করিতে পারে। অর্থবিনিয়োগের এই রকম সুযোগ থাকে বলিয়া দেশের সকলেরই অর্থ সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়ে।

কিন্তু যৌথ মূলধনী প্রথার ত্রুটিও আছে। ইহাতে বহুসংখ্যক মালিকের (শেয়ারহোল্ডারের) সঙ্গে কারবারের যোগাযোগ প্রায় থাকে না বলিলেই চলে। ডিরেক্টরগণ নিজেদের খুশিমত কাজ চালায়। শেয়ারহোল্ডারগণের অনেকে কোম্পানীর কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবরও রাখে না। কারবারের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এইরূপ বিরাট দূরত্ব থাকার ফলে কোন কোন সময়ে কারবারের অবনতি ঘটে। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও আধুনিক কালে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রধানতঃ যৌথ মূলধনী প্রথায় চলে। আজকাল বড় বহরের প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কারবার চালানো দুষ্কর। এই জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন হয়। ফলে যৌথ মূলধনী প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

সমবায় প্রথা (Co-operation)—এক ধরণের প্রতিষ্ঠান আছে যাহাতে যাহারা কাজ করে তাহারা সাধারণতঃ অনেকাংশে মালিকানা স্বত্বও ভোগ করে। ইহাকে সমবায় প্রতিষ্ঠান (Co-operative Society) বলে।

সমবায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য (Features of Co-operative Societies)—সমবায় প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা খুব কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই যাহারা শ্রমিক তাহারাই আবার প্রতিষ্ঠানের সভ্য—সুতরাং মালিক। লভ্যাংশও তাহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। সুতরাং বিবাদের কারণ থাকে না।

সমবায় প্রথার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে কোন দালালের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য প্রথায় দেখা যায় যে এক দল লোক জিনিস তৈয়ারি করে, অন্য এক দল লোক সেই সব জিনিস কম দামে কিনিয়া মজুত রাখে এবং পরে বেশী দামে বিক্রয় করে। সমবায় প্রথার উদ্ভবের ফলে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যবর্তী এই দালালশ্রেণীর অবসান ঘটে।

সমবায় প্রথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে সাধারণতঃ সমিতিগুলি ক্ষুদ্রায়তনের হয়, কারণ মালিকগণ বেশী মূলধন যোগাইতে পারে না।

সমবায় প্রথার নীতি (Principles of Co-operation)—সমবায় প্রথার একটি নীতি হইল আত্মনির্ভরতা (self-reliance)। ইহাতে বুঝায়

এই যে অন্যের সাহায্য লইলেও কাহারও উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হইবে না, নিজের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিতে হইবে। অবশ্য, অন্যের সাহায্য কিছু কিছু লইতে হয়। কিন্তু অন্যকেও বেশ সাহায্য করিতে হইবে।

এই সাহায্যের নীতিটিও একটি প্রধান নীতি। সমবায় প্রথার একটি বিশেষ নীতি হইল পারস্পরিক সহযোগিতা (mutual help)। সভ্যগণ একে অন্যকে সাহায্য করিয়া যাহাতে সকলেরই আর্থিক উন্নতির বন্দোবস্ত করিতে পারে সেই চেষ্টা করিবে।

সমবায় প্রথার আর একটি নীতি হইল সাম্য (equality)। কি ভাবে ব্যবসায় চালানো হইবে, লভ্যাংশের কতটা কিরূপে বন্টন করা হইবে ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই ধনীদরিদ্র সকল সভ্যেরই মতামতের সমান মূল্য দেওয়া হয়। যৌথ মূলধনী কারবারে একজন কিংবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক অধিকাংশ শেয়ার কিনিয়া সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। তখন কম শেয়ারের মালিকদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। সমবায় প্রথায় এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ অনেক সময়ে এক এক জন সভ্যের—সে যত শেয়ারেরই মালিক হউক না কেন—এক একটি ভোট থাকে, আবার অনেক সময়ে এক জন সভ্য কতগুলি শেয়ার কিনিতে পারিবে তাহার একটি উর্ধ্বতম সংখ্যা নিধারিত থাকে।

সমবায় সমিতির প্রকারভেদ (Types of Co-operative Societies)—বিভিন্ন প্রকারের সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে। উৎপাদন, ঋণদান, ক্রয়, বিক্রয়, সেবাকার্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি থাকিতে পারে।

অনেক সময়ে অঞ্চল অনুসারে সমবায় সমিতিগুলিকে গ্রামস্থ (rural) এবং শহরস্থ (urban) এই দুই ভাগেও ভাগ করা হয়।

সমবায় সমিতিগুলিকে আমরা কৃষিমূলক (agricultural) এবং অন্যান্য (non-agricultural) সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসাবেও ভাগ করিতে পারি।

ইউরোপে কৃষিজীবীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি এবং ইহার আনুষঙ্গিক ব্যবসায় পরিচালনা করে। ডেনমার্কে বহুদিন ধরিয়া দুগ্ধব্যবসায় সমবায়ের ভিত্তিতে (co-operative milk society) পরিচালিত হইতেছে। সেখানে কৃষকগণ নিজেদের খামার হইতে ডেয়ারীতে (dairy) দুধ পাঠায়। কে কত দুধ পাঠাইল তাহার একটা হিসাব রাখা

হয়। সেই অনুসারে ডেয়ারীজাত মাখন, ননী ইত্যাদি কাহার অংশে কত পড়িল তাহা ঠিক করা হয়। ব্যবসায়ের লভ্যাংশ সেই অনুপাতে কৃষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। আজকাল সমবায় খামার প্রথার (co-operative farming) খুব বেশী প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে জমির মালিকেরা তাহাদের পৃথক পৃথক স্বত্ব ঘুচাইয়া দিয়া সমিতির হস্তে মালিকানা স্বত্ব অর্পণ করে। জমির মালিকানার অনুপাতে তাহারা সমিতির মালিকানা ভোগ করে।

সমবায় খামার প্রথায় প্রধান লাভ হয় এই যে সকলের জমি একত্র হওয়ার ফলে সীমারেখার আল ইত্যাদি দূর হইয়া যায় এবং জমির পরিমাণ বাড়ে। তাহা ছাড়া, একসঙ্গে বৃহদায়তন জমিতে চাষকার্য চালাইবার সুবিধা পাওয়ায় আধুনিক পদ্ধতিতে ট্রাক্টর ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া অধিকতর ফসল উৎপাদন করা যায়।

চীনদেশে সমবায় খামার প্রথা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে। ভারতেও এই প্রথা প্রবর্তন করার চেষ্টা চলিতেছে।

ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের বেশীর ভাগ কৃষক সমবায় ক্রয় এবং বিক্রয় সমিতির (co-operative purchase society ও co-operative sale society) সভ্য। এইরূপ সমিতির মাধ্যমে তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি কেনে এবং নিজেদের খামারজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। ক্রয়, বিক্রয় কোন ব্যাপারেই দালালের প্রয়োজন হয় না।

ভারতে অনেক সমবায় ঋণদান সমিতি (co-operative credit society) আছে। গ্রামাঞ্চলের ঋণদান সমিতির কার্য হইল প্রধানতঃ কৃষকদের টাকা ধার দেওয়া। আমাদের দেশের কৃষকগণ এত দরিদ্র যে তাহাদের কৃষিকার্য চালাইবার মত যথেষ্ট মূলধন নাই। মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে হইলে সুদ ভীষণ বেশী দিতে হয়। এই সব কারণে সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলে কৃষিকার্যের অবস্থার উন্নতি হয়।

আজকাল বিভিন্ন স্থানে সমবায় বাসগৃহ সমিতিরও (co-operative housing societies) উদ্ভব হইয়াছে। সমবায় বাসগৃহ সমিতির কার্য হইল বাসগৃহ নির্মাণের জন্য সমিতির সভ্যদিগকে ঋণদান প্রভৃতির দ্বারা সাহায্য করা।

সমবায় প্রথার সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Co-operative System)—সমবায় নীতিতে ব্যবসায়

চালাইলে শ্রমজীবিগণ লাভের অংশ পায় বলিয়া সমিতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।

সাধারণত সকল সভ্যের মতামতের সমান মূল্য থাকে বলিয়া সভ্যগণ আগ্রহের সহিত কাজ করে। অবশ্য, প্রতিষ্ঠানটি খুব বড় হইলে সমবায় সমিতির সাধারণ সভ্যগণও যৌথ মূলধনী কারবারের সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারদের মতই উদাসীন থাকে। তবে, সাধারণতঃ সমবায় সমিতিগুলি ছোট বহরেরই হয় বলিয়া এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সমবায় সমিতিতে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও খুব কম থাকে। মালিক ও শ্রমিক প্রায়ই এক হয়। মালিকদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রমিক না হইলেও কার্যক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখিতে পারে না। ফলে মালিক-শ্রমিকের স্বাভাবিক বিরোধ গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সমবায় প্রথার ত্রুটি হইল এই যে, ইহাতে খুব বড় বহরের প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব হয় না।

তাহা ছাড়া, সমবায় সমিতিতে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরও অভাব দেখা যায়। অনেক সময়েই ম্যানেজার প্রভৃতিও নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হয় বলিয়া অক্ষম লোকও প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার লইতে পারে। আবার পদোন্নতিও কার্যদক্ষতার ভিত্তিতে না হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ভারতে সমবায় প্রথা (Co-operative System in India)— ভারতে সমবায় প্রথার সূত্রপাত হয় ১৯০৪ সালে। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র কৃষকদের দুর্দশার লাঘব করা।

তখন কৃষকগণ অত্যন্ত চড়া হারে মহাজনদের নিকট হইতে টাকা ধার করিত। সুদের হারের কোন সীমা ছিল না—সুদ বছরে আসলের সমান (অর্থাৎ শতকরা ১০০ হারে) কি তার দ্বিগুণ, তিনগুণ (অর্থাৎ শতকরা ২০০, ৩০০ হারে) হওয়াতেও কোন বাধা ছিল না। স্বভাবতই, মহাজনগণও মোটা লাভে টাকা খাটাইবার উদ্দেশ্যে ধার দিতে উদ্‌গ্রীব থাকিত। খাতক কি কাজের জন্য—বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে উড়াইবার জন্য, না লাঙ্গল, বলদ, বীজধান ইত্যাদি উৎপাদক মূলধনের জন্য—টাকা ধার করিতেছে, তাহার ধার শোধ দেওয়ার সামর্থ্য (creditworthiness) কিরূপ ইত্যাদি বিষয় মহাজনগণ তেমন বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিত না। এমন কি, খাতক সুদ

দিতে আসিলেও কোন কোন সময়ে মহাজন পরে দিতে বলিত। তারপর, পাওনার পরিমাণ বেশ মোটা অঙ্কের হইলে মহাজন কৃষকের জমিজমা, বাড়ীঘর, বলদ, লাঙ্গল যাহা কিছু থাকিত সব আত্মসাৎ করিত। কৃষকেরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িত। কৃষকদের এইরূপ দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্য ১৯০৪ সালে সরকার আইন (Co-operative Credit Societies Act) পাস করিয়া তাহাদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠনের আন্দোলন সৃষ্টি করে। যাহাতে তাহারা কম সুদে এবং নিতান্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নিজস্ব সমিতির নিকট ধার করিয়া কাজকর্ম চালাইতে পারে এবং পল্লী অঞ্চলের মহাজনগণও যাহাতে সমিতিতে টাকা জমা রাখিয়া যুক্তিযুক্ত হারে সুদ ভোগ করিতে পারে সেই দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

১৯০৪ সালের আইনে কেবলমাত্র ঋণদানের জন্যই সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন অনুসারে অন্য কোন কাজের জন্য সমিতি গঠন করা যাইত না। কয়েক বৎসর পরে, ১৯১২ সালে আর একটি আইন করিয়া অন্যান্য উদ্দেশ্যেও এবং পল্লী অঞ্চলে হউক কি শহরাঞ্চলে হউক এবং কৃষকদের মধ্যে হউক কি অন্য লোকদের মধ্যে হউক সকল ক্ষেত্রেই সমবায় সমিতি স্থাপন করিবার উৎসাহ দান করা হয়। ফলে, ১৯১২ সালের পরে ভারতে পল্লী অঞ্চলের এবং শহরাঞ্চলের (rural and urban), কৃষিসংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য (agricultural and non-agricultural), ঋণবিষয়ক এবং অন্যান্য (credit and non-credit) এইরূপ বিভিন্ন ধরণের (types) সমবায় সমিতি স্থাপন করিবার আন্দোলন প্রসার লাভ করে।

১৯১২ সালের আইনে প্রাথমিক সমিতিগুলির (primary societies) যুক্ত প্রতিষ্ঠান (union) এবং ঋণবিষয়ক কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানেরও (central, provincial, co-operative banks) ব্যবস্থা করা হয়।

১৯১২ সালের আইনের পরে ঋণবিষয়ক সমিতি ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের সমিতি স্থাপিত হইতে থাকিলেও, ভারতের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে বরাবর, যে দিক থেকেই বিচার করি না কেন সেই দিকেই—অর্থাৎ কি সমিতির সংখ্যায়, কি সভ্যের সংখ্যায়, কি চলতি মূলধনের পরিমাণে সকল বিষয়েই—ঋণবিষয়ক সমিতির প্রাধান্য রহিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বাজারে—বিশেষত কৃষিজাত দ্রব্যের

বাজারে—ভীষণভাবে মন্দা (depression) পড়ায়, ঋণদান সমিতিগুলি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। অসংখ্য ঋণদান সমিতি বিফল হইয়া যায় (failed), আমানতকারীদের টাকা ধ্বংস হয়, তাহারা সমবায় সমিতির প্রতি বিশ্বাস হারায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকিলে পুনরায় সমবায় সমিতির বিস্তার সাধন হয়। ইতোমধ্যে মহাজনদের সুদের হারও সরকার আইন পাস করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। তাহারা অনেকে সমবায় সমিতিতে টাকা জমা রাখে। কিন্তু অনেকে সেই সীমাবদ্ধ সুদের হারেই পৃথক এবং স্বাধীন ভাবে ঋণদানের কাজ চালায়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে সমবায় সমিতির প্রসার সাধনকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। ফলে, আজকাল সমবায় আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্ন ধরণের (types) সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সমবায়ের আওতার (scope) মধ্যে আনা হইয়াছে। অঞ্চল হিসাবেও পল্লী ও শহর সর্বত্রই সমবায় আন্দোলন প্রসার লাভ করিয়াছে।

ভারতের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের মূলধন খুব কম। সুতরাং কৃষিকার্য এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইত্যাদিতে সমবায় প্রথায় কাজ ভারতের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

এখনও ঋণবিষয়ক সমিতির (credit societies) গুরুত্বই সব চেয়ে বেশী।

ঋণবিষয়ক সমিতিগুলি তিন ধাপে সন্নিবিষ্ট: সাধারণতঃ এক একটি গ্রামে (অথবা খুব বেশী হইলে ১০০০ লোকের বাস যতটা জায়গায় সেখানে) একটি করিয়া প্রাথমিক ঋণদান সমিতি (primary credit society) থাকে। অনেকগুলি প্রাথমিক সমিতির উপরে সাধারণত একটি জেলায় একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (central co-operative bank) থাকে। সর্বোপরি থাকে রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক (state co-operative bank)।

ঋণবিষয়ক সমিতিগুলির মধ্যেও আবার কৃষিসম্পর্কিত সমিতিরই (agricultural societies) সংখ্যা এবং গুরুত্ব বেশী। ১৯৫৮ সালে কৃষিসম্পর্কিত ঋণবিষয়ক সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ১,৬৬,৫৪৩; মোট

সভ্যসংখ্যা (membership) ছিল ১,০২,২১,২৪৯; কার্যকরী মূলধন (working capital) ছিল ১৩৩·৭৫ কোটি টাকা। সেই বছর কৃষি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সম্পর্কিত ঋণবিষয়ক সমিতিগুলির (non-agricultural credit societies) সংখ্যা ছিল মাত্র ১০,৪৩০ এবং সভ্যসংখ্যা ছিল ৩৬·৭৪ লক্ষ, তবে কার্যকরী মূলধন ছিল ১০০ কোটি টাকারও বেশী।

কৃষিসম্পর্কিত ঋণবিষয়ক সমিতিগুলির মধ্যে এক ধরণের ব্যাঙ্ক ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করিতেছে। এই ব্যাঙ্কগুলি হইল জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (land mortgage banks)। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের কাজ হইল জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘমেয়াদী (long-term) ঋণ দান করা। পতিত জমি ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া অথবা বনজঙ্গল কাটিয়া জমি কার্যোপযোগী করিয়া তাহা হইতে লাভ পাইতে সময় লাগে। সুতরাং, এই সব কাজের জন্য যে টাকা ধার করিতে হয় তাহা তাড়াতাড়ি শোধ দেওয়া যায় না। কাজেই জমির উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক এই দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে।

ঋণবিষয়ক সমিতি ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ সমিতি আছে। জিনিসপত্র তৈরির কাজ, গুদামে জমাইয়া রাখার কাজ, বিক্রয়ের কাজ, ক্রয়ের কাজ, সেচের কাজ, ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা করার কাজ, বীমার কাজ, খামারের কাজ (farming)—এই রকম অসংখ্য কাজ আজকাল সমবায় প্রথায় চলিতেছে। এই সব ব্যাপারের মধ্যে তন্তুবায়দের সমিতি, দুগ্ধ সরবরাহকারীদের সমিতি, মৎস্যজীবীদের সমিতি, চাষআবাদকারীদের সমিতি (farming society), গো-মহিষাদি পশুবীমার সমিতি (cattle insurance society), গুদামের ব্যবস্থাকারীদের সমিতি, বিক্রয়কারীদের সমিতি (marketing society) ইত্যাদিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার বহু ধরণের কাজের সমিতিও (multi-purpose society) অনেক আছে। ইহাদের মধ্যে কৃষিকার্যে মূলধন ব্যাপারে, গুদামে জমা রাখার ব্যাপারে, বিক্রয়ের ব্যাপারে প্রভৃতি নানারকম কাজে সাহায্য করিবার জন্য এক ধরণের সমবায় সেবা সমিতির (co-operative service society) প্রচলন হইতেছে।

ভারতসরকার এবং রাজ্যসরকারগুলি নানাভাবে সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেছে। সমিতিগুলির হিসাব পরীক্ষা (audit) এবং তত্ত্বাবধানের (inspection) জন্য সরকার বহু কর্মচারী নিযুক্ত রাখে। সমবায়

আন্দোলনের উপযোগিতা এবং ইহার কার্যপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য সরকারী সমাজউন্নয়ন বিভাগের বহু কর্মচারী আছে। তাহা ছাড়া, সরকার উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমিতিগুলিকে ঋণ দান করে, কোন কোন সমিতির শেয়ারও (shares) কেনে।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের ত্রুটি (Defects of the Co-operative Movement in India)—আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন বেশ প্রসার লাভ করিতেছে, সন্দেহ নাই। ১৯৫৭-৫৮ সালে সমিতিগুলির মোট সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ। দেশের জনসংখ্যা বেশী বটে; কিন্তু তাহার তুলনায়ও সভ্যসংখ্যা নগণ্য নয়।

সমবায় আন্দোলনের এইরূপ প্রসার দেখিয়া আমরা ইহার ত্রুটিগুলির সম্বন্ধে সজাগ না থাকিতে পারি। তাহা উচিত নয়। ইহার নানারকমের ত্রুটি আছে।

প্রথমত, প্রবর্তনের সময় হইতে এখনও পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন মারাত্মকভাবে সরকারের সাহায্যপুষ্ট। ফলে, সমিতিগুলি প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া ওঠে না এবং স্বাবলম্বী হয় না। সমবায় প্রথার একটি প্রধান নীতি হইল আত্মনির্ভরতা। আমাদের দেশের অনেক সমিতিই আত্মনির্ভর হইতে শেখে না।

দ্বিতীয়ত, সরকারী সাহায্যের ফলস্বরূপ সরকারী কর্তৃত্বও রাখিতে হয়। আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের জন্য কাজকর্ম সাবলীলভাবে চলে না। এই জন্য অনেকে সমবায় প্রথার প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠে। অনেকে মহাজনদের নিকট হইতে অথবা যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে টাকা ধার করিতে পারে। তাহারা সমবায় প্রথার দিকে আকৃষ্ট হয় না। ভারতের সমবায় আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে কৃষিসম্পর্কিত ঋণদান সমিতি। কিন্তু, ভারতের মোট কৃষিসম্পর্কিত ঋণের যে অংশ এই সমিতিগুলি সরবরাহ করে তাহা তিন-শতাংশের বেশী নয়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধেও সন্দিহান হইতে হয়। সহজে ঋণদানের ব্যবস্থা থাকিলে খাতকগণ সমবায় সমিতির নিকট হইতেই ধার করিত, মহাজন কি যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইত না।

তৃতীয়ত, অনেক সমিতির অনেক সভ্য নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে

সমবায় আন্দোলনে যোগ দেয়। তাহারা সমবায় আন্দোলনের আর একটি প্রধান নীতি—পারস্পরিক সাহায্যের নীতি—লঙ্ঘন করে। এই সব সমিতির সভ্যগণ একের সহিত অন্যের সহযোগিতার পদ্ধতিতে কাজ করে না। সমিতির কাজ ব্যাহত হয়, অনেক সময়ে স্বার্থপর সভ্যদের কাজের ফলে সমিতি ভাঙ্গিয়া যায়।

এই সব নানা রকমের ত্রুটি আছে। তবে, আশা করা যায় শীঘ্রই সরকারী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হইবে এবং সরকার কর্তৃক শিক্ষাদানের ফলে সমিতিগুলি যথোপযুক্তভাবে কার্য নির্বাহ করিতে পারিবে।

ভারতে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য সমবায় পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সাহায্যে জমির উন্নতি, সমবায় সেবা সমিতির সাহায্যে উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা, সমবায় প্রথায় খামারের কাজ (co-operative farming) চালু করিয়া শতধাবিভক্ত চাষের জমি একীকরণ এবং বৃহদায়তন জমিতে ট্র্যাক্টর ইত্যাদির দ্বারা চাষের ব্যবস্থা, সমবায় প্রথায় গোমহিষাদি পশুর বীমার কাজ, সেচের কাজ, গুদামের ব্যবস্থা—এই রকম নানা ভাবে আমাদের কৃষির উন্নতির চেষ্টা করা যায়।

কুটির শিল্প ও স্বল্পায়তন শিল্প এবং অন্যান্য নানা কাজেও সমবায় প্রথা বিশেষভাবে ফলদায়ক।

প্রশ্ন

1. Give a brief description of the different forms of business organisation.

(বিভিন্ন ধরণের যে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

[৭৭-৮৩ পৃষ্ঠা]

2. What are the advantages and disadvantages of the Single-owner firm ?

(একমালিকী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?) [৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা]

3. What are the characteristics of Partnerships ? How does the system of Partnerships differ from that of Single-owner firms ?

(অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কি কি ? একমালিকী প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার পার্থক্য কি ?) [৭৭-৭৯]

4. What are the merits and defects of the system of Partnership in business organisation ?

(অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের দোষগুণ কি কি ?) [৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা]

5. What are the features of Joint Stock Companies? Distinguish between private and public limited companies.

(যৌথ মূলধনী কারবারের বিশেষত্ব কি? ঘরোয়া ধরণের যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্বসাধারণের যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য কি?) [৭৯-৮১ পৃষ্ঠা]

6. In which ways does a Joint Stock Company raise its capital?

(যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান কি কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে?) [৮১ পৃষ্ঠা]

7. Comment on the advantages and limitations of production by Joint Stock Companies, (Higher Secondary Examination, 1960)

(যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদনের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।) [৮১-৮২ পৃষ্ঠা]

8. Compare the relative advantages of the systems of a single-owner firm, partnership and joint stock company.

(একমালিকী ও অংশীদারী প্রথার গুণাগুণের সহিত যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণের তুলনা কর।) [৭৮-৭৯, ৮১-৮২ পৃষ্ঠা]

9. What are the characteristics of the system of Co-operative societies in business organisation? How does Co-operative organisation differ from Joint Stock Companies?

(সমবায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কি কি? যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার পার্থক্য কি?) [৮২-৮৩ পৃষ্ঠা]

10. Discuss the principles of the Co-operative system in business organisaton.

(সমবায় প্রথার নীতি বিশ্লেষণ কর।) [৮২-৮৩ পৃষ্ঠা]

11. What are the different types of Co-operative Societies?

(সমবায় প্রতিষ্ঠান কি কি ধরণের হইতে পারে বুঝাইয়া দাও।) [৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা]

12. What is meant by Co-operation? Describe the different types of Co-operative Societies which prevail in India. (Higher Secondary Examination, 1960)

(সমবায় প্রথা কাহাকে বলে? ভারতে যে যে ধরণের সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে তাহার বিবরণ দাও।) [৮২-৮৪, ৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা]

13. Discuss the merits and defects of the Co-operative form of business organisation.

(সমবায় প্রথার গুণাগুণ আলোচনা কর।) [৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা]

14. Describe the scope and importance of the Co-operative Society in India.

(ভারতে সমবায় প্রথার কার্যপরিসর এবং গুরুত্ব বর্ণনা কর।) [৮৫-৯০ পৃষ্ঠা]

15. Describe the part which Co-operation can play in the development of Indian agriculture. (Higher Secondary Examination, 1961)

(ভারতে কৃষিকার্যের ব্যাপারে সমবায় প্রথা যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে তাহা বর্ণনা কর।) [৮৫-৮৮, ৯০ পৃষ্ঠা]

16. Discuss the drawbacks cf the Co-operative Movement in India.

(ভারতে সমবায় আন্দোলনের ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ কর।) [৮৯-৯০ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তন
(Scale of Business)

ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান (Small-Scale and Large-Scale Business)— বিভিন্ন আকারের প্রতিষ্ঠানে জিনিসপত্র তৈয়ারি হয়। গত দেড়শত বৎসরের শিল্পোন্নতির একটি বিশেষত্ব হইল এই যে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আয়তন ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কর্মবিভাগের এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের আয়তনও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আরও একটি কারণ আছে। যৌথ মূলধনী কারবারের বহুল প্রচলন হওয়াতে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান—যাহাতে খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন—সম্ভব হইয়াছে।

বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণ (Merits and Defects of Large-Scale Business)—অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়।

প্রতিষ্ঠানটি বড় হইলে জিনিসপত্র তৈয়ারি এবং বিক্রয় করিবার খরচ গড়পড়তা হিসাবে কম পড়ে। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যে হারে বাড়ানো হয় উৎপাদনের উপাদানগুলি তাহার চেয়ে কম হারে বাড়াইলে চলে।

ধরা যাক একটি কাপড় তৈয়ারির কারখানার মালিক দ্বিগুণ কাপড় তৈয়ারি করিতে চাহিল। তাহার জমি না বাড়াইলেও চলিতে পারে। সুতরাং জমির খাজনা দ্বিগুণ হইবে না। কাঁচা মাল অর্থাৎ তূলা সে অনেক বেশী কিনিবে, সুতরাং পাইকারী দামে সে আগের চেয়ে সস্তা হারে কিনিতে পারিবে। কারখানায় তূলা লইয়া আসিবার খরচও কম হারে হইবে। মজুরও দ্বিগুণের চেয়ে কম লাগিবে। কার্য পরিচালনার ব্যাপারেও তাহার খরচের হার কম পড়িবে। যদি কোন মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠান উৎপাদন দ্বিগুণ করিতে চায় তবে নিশ্চয়ই তাহাকে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণ

করিতে হইবে না। অল্প পরিমাণে কাপড় তৈয়ারি করিতে যত জন পরিচালক ও বিশেষজ্ঞ দরকার অধিক পরিমাণে কাপড় তৈয়ারি করিতে তাহার চেয়ে তেমন অধিকসংখ্যক পরিচালক ও বিশেষজ্ঞ দরকার হয় না। কাপড়ের পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে হইলে যন্ত্রপাতি হয়ত বাড়াইতে হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও খরচ দ্বিগুণের চেয়ে কম পড়িবে। যন্ত্রের দাম দ্বিগুণের চেয়ে কম হওয়াই সম্ভব। তাহা ছাড়া, মালিক যদি ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করিয়া যন্ত্র কিনিতে চায় তাহা হইলে সম্ভবত সে কম সুদে টাকা ধার পাইবে। আয়তন বাড়িলে সেই কারখানার উপর ব্যাঙ্কের আস্থা বাড়ে এবং সেই জন্য সুদের হারও অনেক সময়েই কমায়।

তৈয়ারি কাপড় বিক্রয় করিতেও তাহার কম খরচ পড়িবে। বিজ্ঞাপনের খরচ দ্বিগুণ হওয়া ত দূরের কথা, আগের চেয়ে মোটেও না বাড়িতেও পারে। বিক্রয়ের জন্য জিনিসপত্র কারখানা হইতে পাঠাইতেও কম হারে খরচ পড়ে।

এই সব কথা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কাপড়ের পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে খরচের পরিমাণ দ্বিগুণের কম পড়িবে। ধরা যাক এক হাজার জোড়া কাপড় তৈয়ারি এবং বিক্রয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা লাগে। তাহা হইলে এক জোড়ার জন্য লাগিল পাঁচ টাকা। এইরূপ অবস্থায়, দুই হাজার জোড়া কাপড়ের জন্য মোট খরচ দশ হাজার টাকা না হইয়া আট হাজার টাকা হইতে পারে, অর্থাৎ এক জোড়ার জন্য খরচ পাঁচ টাকা না পড়িয়া চার টাকা পড়িবে।

সুতরাং আয়তন বাড়াইলে উৎপাদন এবং বিক্রয়ের জন্য কম হারে ব্যয় হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের আয়তন বাড়াইয়া অন্যের সাহায্য না লইয়াও নিজের কার্যের ফলে এইরূপ যে ব্যয় সংক্ষেপ করা হয় তাহাকে ধনবিজ্ঞানে আভ্যন্তরীণ ব্যয় সংক্ষেপ (internal economies) বলা হয়।

বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের আর একটি সুবিধা হইল এই যে আয়তন বাড়াইলে বেশী মূলধন নিয়োগ করা যায়। তাহাতে গবেষণা ইত্যাদির জন্য গুণী লোক নিযুক্ত করা যায়। তাঁহারা উন্নত ধরণের দ্রব্য উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করে। ইহার ফলে গবেষকের বেতন ইত্যাদিতে যাহা খরচ হয় মালিক শেষ পর্যন্ত তাহার চেয়ে অনেক বেশী উপকার পায়।

আয়তন বাড়াইলে কিছু কিছু অসুবিধারও সৃষ্টি হয়।

বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য। তত্ত্বাবধানের কাজ ভীষণ

ভাবে বাড়িয়া যায় এবং অনেক সময়েই কর্তৃপক্ষ এত বেশী কাজ ভাল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না।

সহজে কোনরকম পরিবর্তন সাধন করাও সম্ভব হয় না। ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার অনেক সময়ে নিজের বিবেচনামত কাজ করিতে সক্ষম হয় না। নূতন কিছু করিতে হইলে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সংস্থার নিকট অনুমতি লইতে হয়।

তাহা ছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি খুব বেশী বড় হইলে কর্তৃপক্ষ, উর্ধ্বতন কর্মচারিগণ এবং মজুরশ্রেণীর মধ্যে সাহচর্যের ভাব থাকে না।

কিছু কিছু অসুবিধা থাকিলেও মোটামুটি ভাবে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানই সুবিধাজনক।

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়তনের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Scale of Business)—আয়তন যত খুশি কেবল বাড়াইয়া চলিলেই চলে না। আয়তন কতটা বাড়ানো যায় তাহার একটা সীমা আছে। এইরূপ একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকার নানা রকম কারণ আছে।

উৎপন্ন জিনিসটির চাহিদার পরিমাণের উপর প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে। চাহিদার মোট পরিমাণ কম হইলে আয়তন বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইলে উৎপন্ন দ্রব্য উপযুক্ত দামে বিক্রি হইবে না। ব্যবসায়ে লোকসান হইবে।

আবার চাহিদা ঠিক একই ধরণের জিনিসের কিনা তাহাও বিবেচনা করিতে হয়। বড় প্রতিষ্ঠানে এক সঙ্গে অনেক জিনিস প্রস্তুত হয়। তাহাতে উৎপন্ন জিনিসটি একই রকমের হয়, কোন রকম বৈচিত্র্য থাকে না। কিন্তু ক্রেতারা যদি বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনিস চায় তাহা হইলে একই ধরণের জিনিস বহু পরিমাণে উৎপাদন করিলে ক্ষতি হয়।

সুতরাং, জিনিসটির চাহিদার পরিমাণ এবং প্রকৃতি কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া উৎপাদনের বহর ঠিক করিতে হয়।

ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের সুবিধা (Advantages of Small-Scale Business)—কোন একটি বিশেষ ধরণের জিনিস অথবা কাজের চাহিদা কম হইলে সেক্ষেত্রে বৃহদায়তন কারবার চলে না।

এই রকম ব্যাপারে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানই সুবিধাজনক। যেমন, সাজসজ্জা, খেলনা প্রভৃতির ব্যবসায়। বয়স্ক লোকই হউক অথবা বালকবালিকাই হউক,

বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি। জামা-কাপড়, গয়না, খেলনা ইত্যাদি সকলে এক রকমের চায় না। অথচ বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রের সাহায্যে একই ধরণের জিনিসই উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই একই ধরণের জিনিসের চাহিদা কম বলিয়া বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই সব জিনিস উৎপন্ন করিলে লোকসান হইতে পারে। এই সব জিনিস ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে তৈয়ারি করাই লাভজনক।

যে সব জিনিসের উৎপাদনে মূলধনের অনুপাতে শ্রমের প্রয়োজন বেশী (labour-intensive) সেই সব জিনিস অনেক সময়ে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে উৎপন্ন হয়। অনেকে অবসর সময়ে সামান্য সামান্য হাতের কাজ করিয়া সহজেই কোন কোন জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে। এই সব জিনিসের জন্য তেমন মূলধন দরকার হয় না। তুলনায় কায়িক শ্রমের দরকার বেশী। লোকেরা বাড়ীতে বসিয়া এই শ্রম সরবরাহ করে। এইভাবে ক্ষুদ্রায়তন কারবার চলিলে কোন অসুবিধা হয় না। অনেক রকম কাজেও এই ব্যবস্থা। যেমন, চুল কাটার কাজ। ইহাতে মূলধনের প্রয়োজন খুব বেশী নয়, তুলনায় শ্রমের প্রয়োজন বেশী। এই কারবার সাধারণত ক্ষুদ্রায়তনের হয়। ইহাতে অবশ্য বিভিন্ন লোকের রুচির চাহিদা মিটাইতে হয় বলিয়াও ক্ষুদ্রায়তনের হইলেই সুবিধা।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এই সকল সুযোগ-সুবিধা আছে বলিয়া এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও টিকিয়া থাকিতে পারে।

প্রশ্ন

1. Discuss the advantages and disadvantages of production on a large scale.

(বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।) [৯২-৯৪ পৃষ্ঠা]

2. What do you mean by 'internal economies'?

(আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিলে কি বোঝ?) [৯৩ পৃষ্ঠা]

3. In what manner is the scale of bussiness limited?

(ব্যবসায়ের আয়তন কি ভাবে সীমায়িত হয়?) [৯৪ পৃষ্ঠা]

4. Explain the advantages and disadvantages of production on a small scale.

(ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।) [৯৪-৯৫, ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা]

5. Account for the survival of small-scale industries in competition with large-scale industries.

(বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কি কারণে টিকিয়া থাকে বুঝাইয়া দাও।) [৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা]

দ্বাদশ অধ্যায়

উৎপাদনে বিশেষীকরণ
(Specialisation)

বর্তমান যুগ বিশেষত্ব অর্জন এবং প্রতিষ্ঠার যুগ। অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যাপারেও (organisation) এই রকম বিশেষত্বের উদ্ভব হইয়াছে। সংগঠন ব্যাপারে প্রধানত দুই রকমের বিশেষীকরণ দেখা যায়। একটি হইল উৎপাদনে শ্রমবিভাগ (division of labour), অপরটি হইল বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের সমাবেশ (localisation of industries)।

শ্রমবিভাগ (Division of Labour)—প্রাচীন কালে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য লোকেরা প্রত্যেকেই বহু রকমের কাজ করিত। একই লোক জুতাসেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল রকম কাজ করিতে বাধ্য হইত। তখন বিনিময় প্রথা ভাল ভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। এক জন লোক এক ধরণের কাজ করিয়া উৎপন্ন জিনিসপত্র কিংবা সেবাকার্য প্রয়োজন অনুসারে অন্যের উৎপন্ন জিনিসপত্র কিংবা সেবাকার্যের সহিত বিনিময় করিয়া অভাব মিটাইতে পারিত না।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় প্রথা বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজ করিয়া অর্থের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়

করিয়া অভাব মিটাইতে থাকে। কেহ ফসল ফলায়, কেহ কাঠ কাটে, কেহ কাপড় বোনে, কেহ চিকিৎসা কার্য চালায়—এই রকম বিভিন্ন কাজের ভার বিভিন্ন লোক নিতে থাকে।

ক্রমান্বয়ে, এক একটি কাজও পূর্ণাঙ্গরূপে এক এক জন লোকে না করিয়া ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন লোকে করিতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কাপড় তৈয়ারির ব্যাপারে একদল লোক তূলা উৎপাদন করে, আর একদল লোক তূলা পেঁজে, আর একদল লোক সুতা কাটে, আর একদল লোক সুতার টানা দেয়, আর একদল লোক রঙ্ দেয়, আর একদল লোক কাপড় বোনে, ইত্যাদি। আজকাল এই অংশগুলিও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ভাগ করা হইয়াছে। বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে একটি আলপিন তৈয়ারি করিতেও অন্তত ২০টি শ্রেণীর লোক পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করে। এইরূপ ছাতা, জুতা ইত্যাদি জিনিস তৈয়ারি করিবার জন্য শত শত প্রক্রিয়ায় শত শত ধরণের কাজে শ্রমিকগণ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাপৃত থাকে।

শ্রমবিভাগের গুণাগুণ (Merits and Defects of Division of Labour)—শ্রম বিভাগের ফলে যাহার যে রকম সহজাত ক্ষমতা ও অভিরুচি আছে, যাহার যে রকম শিক্ষাদীক্ষা আছে, তাহাকে সেই রকম কাজে ব্যাপৃত করা যায়। যে শিক্ষাদান কার্যে তৃপ্তি পায় তাহাকে কল চালাইতে বাধ্য করা হয় না। মনোমত কাজ পাইয়া শ্রমিকেরা সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করে। তাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। তাহা ছাড়া, যে যাহাতে বিশেষভাবে দক্ষ সে সেই কাজ করে বলিয়াও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। শুধু পরিমাণ নয়, ভাল ভাল জিনিসপত্র উৎপন্ন হয়, ভাল ভাবে সেবাকার্য চলে। লোকের সহজাত ক্ষমতারও যথাযথ ব্যবহার হয়।

শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে। একই ধরণের কাজ করিতে করিতে শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই বিশেষ ভাবে অভিজ্ঞ হইয়া ওঠে। এইরূপ দক্ষ শ্রমিকেরা উৎপাদনের উন্নতি সাধন করে। সহজাত নৈপুণ্যের সহিত কাজের মধ্য দিয়া অর্জিত নৈপুণ্য যুক্ত হওয়ায় শ্রমিকদের নৈপুণ্য খুব বাড়িয়া যায় এবং উৎপাদনেরও খুব বেশী উন্নতি হয়।

শ্রম বিভাগের ফলে একজন শ্রমিক একই জায়গায় বসিয়া একই কাজ করিতে পারে। অন্য ধরণের কাজ করিবার জন্য তাহাকে এক জায়গা হইতে উঠিয়া অন্য জায়গায় যাইতে হয় না। এইরূপ যাওয়া-আসা করিতে হইলে

তাহার কিছুটা সময় নষ্ট করিতে হইত। শ্রমের বিভাগ হওয়ায়, সময়ের এইরূপ অযথা অপব্যয় করিতে হয় না। তাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যে সব ক্ষেত্রে একই ধরণের কাজ খুব বেশী করা হয় সেই সব ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রবর্তন সম্ভবপর হয়। শ্রম বিভাগের ফলে একই ধরণের কাজ অনবরত হইতে থাকে বলিয়া সেই কাজের জন্য যন্ত্র প্রবর্তন করা যায়। যন্ত্র ব্যবহার করিলে উৎপাদন খুব বেশী বাড়িয়া যায়। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও বলা যায় যে শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন বাড়িয়া যায়।

তবে শ্রম বিভাগের ফলে কিছু কিছু অসুবিধারও সৃষ্টি হয়।

শ্রম বিভাগের প্রধান ত্রুটি হইল এই যে একই কাজ করিতে করিতে সেই কাজে শ্রমিকেরা অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেও নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। সেই কাজ তাহারা ভাল ভাবেই করিয়া চলে, কিন্তু করিতে থাকে নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত।

অন্য সব কাজ সম্পর্কে—এমন কি যে জিনিস তৈয়ারি করিবার বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার সহিত তাহারা যুক্ত আছে তাহা ছাড়া সেই জিনিস তৈয়ারি করিবারই অন্য কোন প্রক্রিয়া সম্পর্কেও—তাহারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ ও উদাসীন থাকিয়া যায়। তাহারা বৈচিত্র্যের স্বাদ পায় না। ক্রমান্বয়ে সব কাজের প্রতিই তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে এবং নিজস্ব কাজের প্রতিও যদি এইরূপ বিতৃষ্ণা আসিয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনের উন্নতি না হইয়া বরং ক্ষতি হইতে পারে।

শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিকগণ বিশেষ বিশেষ কাজে অভ্যস্ত হইয়া ওঠে। তাহারা অন্য ধরণের কাজ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু কোন একটি বিশেষ ব্যবসায়ে মন্দা (depression) পড়িলে, যে শ্রমিকেরা সেই ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের কাজে লিপ্ত আছে তাহারা বেকার হইয়া পড়ে এবং এই শ্রমিকেরা অন্য ধরণের কোন কাজ জানে না বলিয়া অন্য কাজেও বহাল হইতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে, শ্রম বিভাগের ফলে কোন কোন ধরণের শ্রমিক বহু দিন ধরিয়া অনর্থক বেকারত্বের যাতনা সহ্য করিতে বাধ্য হইতে পারে। শ্রম বিভাগের ইহাও একটি বড় ত্রুটি।

শিল্পের একদেশতা (Localisation of Industries)—অনেক সময়ে দেখা যায় যে কোন কোন জিনিস বিশেষ বিশেষ জায়গায়

(locality) খুব বেশী তৈয়ারি হয়, অন্যত্র প্রায় তৈয়ারি হয় না বলিলেই চলে। এই রকম ক্ষেত্রে যে সব শ্রমিক একটি বিশেষ জিনিসের উৎপাদনে সমর্থ এবং ইচ্ছুক তাহারা ঐ জিনিসটির উৎপাদনের স্থানে সমবেত হয়, অন্য জিনিস উৎপাদনে সক্ষম ও ইচ্ছুক শ্রমিকেরা অন্যত্র সমবেত হয়। স্পষ্টই বোঝা যায়—কোন বিশেষ শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিশেষ বিশেষ স্থানে জড় হওয়ার ফলে শ্রমিকদের একটা স্থানগত (based on locality) ভাগের (division) উদ্ভব হয়। এই জন্য, বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ শিল্পের সমাবেশকে অনেকে স্থানগত শ্রমবিভাগ (territorial division of labour) বলিয়া অভিহিত করেন। এই আখ্যা কিরূপ যুক্তিযুক্ত তাহা বিচার না করিয়াও বলা যায় যে, স্থান বিশেষে শিল্পের সমাবেশকে শিল্পের একদেশতা (localisation of industries) বলাই ভাল।

শিল্পের একদেশতার কারণ (Factors leading to the Localisation of Industries)—স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ শিল্পের সমাবেশ বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে তৈলখনির সন্নিকটে তৈল শোধনের (refinery) কারবার (আসাম, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে অথবা নিকটস্থ রাজ্যে), কলিকাতা বন্দরের সন্নিহিত স্থানে পাটের কল, লৌহখনি এবং কয়লা খনির নিকটে ইস্পাত শিল্প (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্য-প্রদেশে), বোম্বাই এবং আহম্মদাবাদে কাপড়ের কল প্রভৃতি শিল্পের সমাবেশ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন কারণে এইরূপ সমাবেশ হইয়া থাকে।

যে স্থানে কোন শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট কাঁচা মাল (raw materials) যথোপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় সেই স্থানে ঐ শিল্পের খুব বেশী পরিমাণে বাড়িয়া ওঠা স্বাভাবিক।

অন্যত্র ঐ কাঁচা মাল নিয়া যাইতে বেশ খরচ পড়ে। অনেক সময়ে পরিবহন ব্যবস্থার (transport) ত্রুটির ফলে উহা পাইতেও ভীষণ বিলম্ব হয়। এই সব ভাবিয়া সংগঠকগণ কাঁচা মালের সন্নিহিত স্থানকে শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করে। আমাদের ইস্পাতশিল্প এইভাবে বিশেষ কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

যে সব জায়গায় কল চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি (power) উৎপাদনের উপযোগী কয়লা পাওয়া যায় সেই সব জায়গায় শিল্পের সমাবেশ

হয়। যে সব জিনিসের কাঁচা মাল কয়লাখনির নিকটবর্তী স্থানে পাওয়া যায় সেই সব জিনিস উৎপাদনের শিল্প ঐ রকম স্থানে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়।

অনেক সময়ে বাজারের (market) সন্নিহিত স্থানেও শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। এমনকি কাঁচা মাল (raw materials) এবং শক্তির (power) ব্যবস্থা দূরবর্তী হইলেও যে স্থানে অতি সহজে তৈয়ারি মালটি (finished product) বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় সেই স্থানে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। এই জন্যই পাটের কলগুলি কলিকাতা অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। চট, বস্তা ইত্যাদি কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানি করা সহজ এবং দূর হইতে পাট আনিবার খরচ যোগাইতে হইলেও চট ইত্যাদি তৈয়ারি মাল কলিকাতায় নিয়া আসিতে হয় না এবং তাহাতে কিছু খরচ বাঁচে।

খুব কম হারে মজুরি (wages) দিয়া যে সব স্থানে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় সেই সব স্থানেও শিল্পের সমাবেশ হইতে পারে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা (Government patronage) প্রভৃতি বিশেষ কোন কারণে একটি বিশেষ শিল্প কোন এক স্থানে গড়িয়া উঠিলে ঐ কারণটি দূর হইলেও ঐ শিল্পের নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানগুলিও ঐ স্থানে গিয়া জড় হয়। কিছুদিন ধরিয়া ঐ শিল্পটি ঐ স্থানে চলিবার ফলে স্থানটি ঐ শিল্পের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া এরূপ হয়।

শিল্পের একদেশতার সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Localisation of Industries)—বিশেষ একটি শিল্পের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান (firms) এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হইলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই নানাভাবে—যেমন কাঁচা মাল এবং শক্তি-উৎপাদক কয়লা কেনা ও আনার ব্যাপারে এবং তৈয়ারি মাল নিয়া যাওয়া ও বেচার ব্যাপারে—কিছু কিছু ব্যয় সংক্ষেপের (economy) সুযোগ পায়। অন্যের সহযোগে এইরূপ ব্যয় সংক্ষেপকে ধন-বিজ্ঞানে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (external economies) বলা হয়। শিল্পের একদেশতার ফলে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং উৎপাদনের খরচ কিছুটা কমিয়া যায়।

স্থানটি বিশেষ একটি শিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করায় বিশেষজ্ঞ শ্রমিকেরা ঐ স্থানে কর্মপ্রার্থী হয়। তাহার ফলে বিশেষজ্ঞ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। অন্যান্য শ্রমিকেরাও ঐ স্থানে ভিড় করে এবং সকল রকম শ্রমিকই সহজলভ্য হয়।

স্থানমাহাত্ম্যের গুণে জিনিসপত্র সহজে বিক্রয় করা যায়। স্থানের খ্যাতি আছে বলিয়া স্থানের নামেই মাল কাটে, বিজ্ঞাপনের জন্য অযথা পয়সা খরচ করিতে হয় না।

একটি শিল্প এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পও ঐ স্থানে গড়িয়া ওঠে। ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস (যেমন শাড়ীর জন্য রং) কম খরচে পাওয়া যায়—অন্তত পরিবহনের খরচ লাগে না। তাহা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট কোন কোন শিল্প প্রধান শিল্পটির উপজাত জিনিসগুলি (bye products) কিনিয়া নিয়া নিজেদের উৎপাদন কার্য চালায়। এক একটি প্রতিষ্ঠান হইতে কম কম করিয়া হইলেও সবগুলি হইতে একযোগে উপযুক্ত পরিমাণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাল পায় বলিয়া ঐ সব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উপজাত জিনিসগুলি কাজে লাগাইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার উদ্ভব না হইলে প্রধান শিল্পের এক একটি প্রতিষ্ঠান অনেক সময়ে উপজাত দ্রব্য নষ্ট করিতে বাধ্য হয়।

শিল্পের একদেশতার প্রধান অসুবিধা হইল এই যে বিশেষ কোন একটি শিল্পে মন্দা (depression) আসিলে একটি অঞ্চলের অধিকাংশ লোক বেকার হইয়া পড়ে। ফলে একটি সমগ্র অঞ্চল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত (distressed) হয়। সেই অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যবস্থায়ও ভাঙন ধরে। অঞ্চলটিতে যদি অন্যান্য জিনিসপত্র তৈয়ারির প্রতিষ্ঠানও থাকিত তাহা হইলে সেই সব জিনিসের বাজারে মন্দা না আসায় সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেকারত্ব ঘটিত না এবং সেরূপ হইলে সমগ্র অঞ্চলটি একযোগে দুর্দশাগ্রস্ত হইত না। এই জন্য আজকাল অনেকে প্রত্যেক শিল্পকেন্দ্রেই বিভিন্ন রকম শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন।

প্রশ্ন

1. What do you mean by 'division of labour'? Explain the advantages and disadvantages of division of labour.

('শ্রম-বিভাগ' বলিলে কি বোঝ? শ্রম-বিভাগের সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা কর।)

[৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা]

2. What are the causes leading to the localisation of industries in particular areas? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions. (Higher Secondary Compartmental Examination, Humanities Group, 1960.)

(শিল্পের একদেশতার কারণ কি কি? বিশেষভাবে ভারতীয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।)

[৯৯-১০০ পৃষ্ঠা]

3. Account for localisation of industries. What are its advantages and dangers? (Higher Secondary Compartmental Examination, Commerce Group, 1960.)

(শিল্পের একদেশতার কারণ বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা-অসুবিধা কি কি?) [৯৯-১০১ পৃষ্ঠা]

4. What do you mean by external economies?

(বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিলে কি বোঝ?) [১০০ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকা
(Economic Role of the Government)

অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের কার্যাবলী (Economic Functions of the Government)—সরকার কেবল শাসনই করে না। ইহা নানারকম অর্থনৈতিক কার্যও পরিচালনা করে। যেমন ডাক ও তার বিভাগের কাজ। এই কাজ যে একটি ব্যবসায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই ইহার মালিক ও পরিচালক দেশের সরকার। রেলগাড়ীতে যাতায়াতের ব্যবসায়ও প্রায় সকল দেশেই সরকারের হাতে।

যে দেশ সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক—যেমন, রাশিয়া—সেখানে সব রকমের ব্যবসায়-বাণিজ্য সরকারের হাতে। সম্পূর্ণভাবে ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজে অবশ্য সরকারের হাতে কোন রকম ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজ থাকা উচিত নয়। কিন্তু এইরকম ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ আজকাল নাই বলিলেই চলে।

আজকাল ধনতন্ত্রমূলক গণতান্ত্রিক দেশের সরকারও কিছু না কিছু ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভার নেয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানারকম নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা করে।

অনেক গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ বিশেষ আইন তৈয়ারি করিয়া সেই

আইনের দ্বারা বিশেষ বিশেষ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান (statutory corporation) স্থাপন করে—যেমন, আমাদের দেশের দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (Damodar Valley Corporation)।

আবার, দেশে প্রচলিত কোম্পানী আইন অনুসারেও সরকার যৌথ মূলধনী কারবার স্থাপন করিতে পারে। এইরকম যৌথ মূলধনী কারবারের সবগুলি শেয়ারেরই মালিক সরকার—যেমন, আমাদের দেশের হিন্দুস্থান স্টীল প্রাইভেট লিমিটেড (Hindusthan Steel (Private) Ltd.)।

অনেক সময়ে সরকার জাতীয়করণের (nationalisation) দ্বারা চালু কারবার হস্তগত করে।

ইহা ছাড়া, যৌথ মূলধনী কারবারের কম-বেশী শেয়ার কিনিয়া সরকার মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতে পারে।

এইরূপ বিভিন্ন প্রকার সরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আজকাল ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও দেখা যায়।

বিভিন্ন রকম সরকারী নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা আছে। কোন মিল কিংবা ফ্যাক্টরীর কাজ হয়ত ভাল চলিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে সরকার সাময়িক-ভাবে ইহার পরিচালনার ভার নিতে পারে। শ্রমিক আইন প্রভৃতির দ্বারাও সরকার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে।

সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষে যুক্তি (Arguments for State intervention)—এ কথা ঠিক যে, ধনতান্ত্রিক দেশের মূলনীতি হইল ব্যবসায়-বাণিজ্যে জনসাধারণের স্বাধীনতা। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, সরকার একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি সর্বাঙ্গীন হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে চাহিদার তুলনায় উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অনেক বেশী হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মন্দা বাজার (depression), এমন কি অর্থনৈতিক সঙ্কটও (crisis) দেখা দিতে পারে। তাহাতে দেশের ভয়ানক ক্ষতি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ সুফলদায়ক।

আবার অনেক দেশে—বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশে—লোকে তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার জন্য এমন সব ব্যবসায় অবলম্বন করে যাহাতে মূলধন বেশী সময়ের জন্য খাটাইতে হয় না—যেমন, কেনাবেচার কারবার। কিন্তু অনেক ব্যবসায় আছে—যেমন জলবিদ্যুৎ, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদন—যাহাতে মূলধন হয়ত বেশ কয়েক বছর আটক রাখিতে হয়,

উৎপাদনে সময় লাগে। দেশের ব্যবসায়িগণ সাধারণতঃ এই সব কারবারের প্রতি উদাসীন থাকে। অথচ এইসব কারবার চালু না হইলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সরকার নিজে এই সব ব্যবসায় আরম্ভ করে তাহাতে দেশের মঙ্গল হয়।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলেও সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু আরও একটি যুক্তি আছে। অনিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পপতিগণ অন্য কোন দিকে নজর না দিয়া কেবলমাত্র লাভের লোভেই ব্যবসায়-বাণিজ্য চালায়। ইহার কুফল অনেক। যেমন, কোন শিল্পে (ধরা যাক, কয়লা) মালিকগণ একযোগে উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। এই অবস্থায় এবং অন্যান্য নানা অবস্থায় বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার, মালিকগণ মজুরদের উপর নানারকম অত্যাচার করিতে পারে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদেরও অপব্যবহার করিতে পারে। একথা অবশ্য ঠিক যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন বিশেষ শিল্পে সরকারের চেয়ে সাধারণ মালিকগণ অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত অধিকতর উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেও অন্য অনেক রকম ত্রুটি দেখা দেয়। সুতরাং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সব শিল্পও আজকাল সরকার অনেক সময়ে করায়ত্ত করে।

সরকারের সমাজকল্যাণের দায়িত্ব আছে। সেই জন্য, অর্থনৈতিক যুক্তি তেমন অকাট্য না হইলেও সরকার আজকাল ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে খুব বেশী হস্তক্ষেপ করে। যেমন, অনেক সময়ে দেখা যায় যে যন্ত্রপাতির অদলবদল করিয়া মজুরের সংখ্যা অনেক কমাইয়া দিলে উৎপাদনের খরচ কমে, অথচ সরকার ব্যবসায়ের মালিকদিগকে হঠাৎ এরকম কাজ করিতে দেয় না, কারণ হঠাৎ ইহা করিলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। অবশ্য ধীরে ধীরে এরূপ পরিবর্তন করিতে দেওয়া হয়। আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিই এমন যে, কোন একটি শিল্পের অর্থনৈতিক উন্নতি কিছুদিনের জন্য মন্থর করিতে বাধ্য হইলেও সমাজের উপকারের জন্য সরকার সেই শিল্পটি নিয়ন্ত্রণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।

সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে যে ব্যাপারটি সরকারের প্রধান লক্ষ্য তাহা হইল বেকার সমস্যার সমাধান। দেশের জনগণের পূর্ণ নিয়োগ (full employ-

ment) যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই প্রয়োজন তাহা নহে। বেকার লোক থাকা সমাজের পক্ষে একটি গ্লানিবিশেষ। সেই গ্লানিমোচনের জন্যই পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করা দরকার। লোকে বেকার থাকিলে তাহাদের মনে একটা ব্যর্থতা আসে। এই ব্যর্থতা হইতে আসে ভয় এবং ভয় হইতে আসে ঘৃণা। সমাজে বাস করিয়াও তাহারা সমাজকে ঘৃণা করে। এই ভয়ানক অবস্থা দূর করিবার জন্য দেশের সরকারের পক্ষে পূর্ণ নিয়োগ নীতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। ইহা করিতে গিয়া সরকার বেসরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অনেক সরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান চালু করে। এই সব বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্য জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য লইয়াই সরকার লোকের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে।

সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা (Government and Development Planning)—অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ উন্নয়ন পরিকল্পনার (Development Planning) সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অনেক সময়ে সরকার দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে কৃষি, শিল্প, পরিবহন, সমাজসেবা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েক বৎসরের জন্য কতকগুলি লক্ষ্য বা নিশানা (target) ঠিক করিয়া সেই অনুসারে মূলধন-বিনিয়োগ এবং অন্যান্য কাজের একটি সংকল্প রচনা করিয়া লয়। এইরূপ সংকল্পকে উন্নয়ন পরিকল্পনা (development plan) বলে। উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে যাহাতে কাজকর্ম চলে তাহা দেখার দায়িত্ব সরকারের।

সাধারণতঃ, অধোন্নত (under-developed) দেশের উন্নতিসাধনের জন্যই এইরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। সেই জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কথাটি সাধারণতঃ অর্ধোন্নত দেশের প্রসঙ্গেই প্রয়োগ করা হয়। তবে, অতি উন্নত (highly developed) দেশেরও অধিকতর উন্নতি প্রয়োজন। নতুবা সেই দেশ পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং উন্নত এবং অতি উন্নত দেশেও উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইতে পারে।

প্রচলিত অর্থে পরিকল্পনা (plan) বলিলে লিখিত (written) এবং সামগ্রিক (total) সংকল্পকেই বুঝায়। তবে একটু তলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় যে একটি পরিকল্পনা লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া না লইলেও, সব দেশের সরকারকেই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ

করিতে হয় এবং সেইজন্য বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি স্পষ্ট ধারণা গঠন করিতে হয়। পূর্ব হইতে প্রস্তুত এইরূপ ধারণাকেও পরিকল্পনা বলা চলে। তবে ইহা অলিখিত। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে সরকার দেশের উন্নতির জন্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সংকল্প প্রস্তুত করা অথবা ভাবিয়া রাখা দরকার মনে করে না, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সংকল্প গ্রহণ করে। এই সব ক্ষেত্রে সরকার যে সংকল্প লিখিয়া লয় অথবা ভাবিয়া লয় তাহাকে আংশিক (partial) পরিকল্পনা বলা চলে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে সরকারকে একটি পরিকল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। বর্তমানে কি কাজ করিলে ভবিষ্যতে কিরূপ ফল হইতে পারে তাহা ভাবিতে হয়। দেশের ধনসম্পদ ও জনসম্পদ কিরূপভাবে কাজে লাগাইলে চিরকালের জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল ফল লাভ করা যায় তাহা ঠিক করিতে হয়।

পরিকল্পনা কোন্ দেশে কিরূপ হইবে তাহা সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক গঠন এবং সরকারের রূপ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অবশ্য, উদ্দেশ্য সব দেশেই এক। দেশের অগ্রগতি কিসে হয় সব দেশের সরকারই তাহাই ভাবে।

সামগ্রিক পরিকল্পনা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় সোভিয়েট রাশিয়ায়। সেখানে সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সরকারের হস্ত প্রসারিত। এই ব্যবস্থায় বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কোন স্থান নাই।

ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত গণতান্ত্রিক দেশে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, এরূপ দেশেও আজকাল সরকারী নিয়ন্ত্রণ চলিতেছে এবং এই নিয়ন্ত্রণের পশ্চাতে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ভাব রহিয়াছে।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা দুই রকমের হইতে পারে। একটি হইল—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে খুব আলগাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন, আমেরিকায় যখন ভীষণভাবে মন্দা দেখা দিয়াছিল (১৯৩০-৩৫) তখন মন্দার প্রকোপকে প্রশমিত করার জন্য সরকার কতকগুলি নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। আর একটি হইল—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া না দিলেও তাহার উপর বিভিন্ন ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করা। যেমন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংলণ্ডে কয়লার খনি ইত্যাদির জাতীয়করণ হইয়াছে এবং অন্য অনেক শিল্পের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দুই দেশেই সরকার

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করিয়া গতানুগতিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্গতি অনেকাংশে দূর করিয়াছে।

দ্বিতীয় রকমের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা অধিকতর কেন্দ্রীভূত এবং বিধিবদ্ধ। ইহা সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার মত তত কঠোর নহে, তবে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মত ততখানি ধনতন্ত্র-ঘেঁষাও নহে। ভারতবর্ষে এই দ্বিতীয় ধরণের সমাজকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলিতেছে।

ভারতের আর্থিক অবস্থা ইংলণ্ডের মত উন্নত নয়। আমাদের কৃষি, শিল্প, জাতীয় আয় প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিলেই বোঝা যাইবে, আমরা আধুনিক উন্নত দেশগুলির অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এইরূপ অনগ্রসর আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটাইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ধ্বংস করা হয়। ইহাতে শেষ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের সর্বাপেক্ষা অধিক তুষ্টিবিধান এবং মঙ্গলসাধন করা সম্ভব হয় কি না সন্দেহ। অনেকে মনে করেন তাহা সম্ভব নয়। সুতরাং মোটা-মুটি ভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামো ঠিক রাখাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। গণতন্ত্র ঠিক রাখিতে হইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার যথাসম্ভব অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এই সব কথা বিবেচনা করিয়া আমাদের দেশে দ্বিতীয় ধরণের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে। ভারতীয় পরিকল্পনায় একদিকে যেমন সরকারী স্বত্বাধীনে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিকেও যথানির্দিষ্ট গতিতে উন্নত করার জন্য উৎসাহ দান করা হইতেছে। সরকারী এবং বেসরকারী ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্যক্ষেত্র পৃথক। এই দুইয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করার চেষ্টা চলিতেছে। এই ধরণের ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা হয়।

ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ (Main Requirements for the Development of an Underdeveloped Country like India)—ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য সরকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (economic planning) অত্যাবশ্যক। ভারত অনগ্রসর দেশ বলিয়া ইহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের চেয়েও বেশী। অর্ধোন্নত দেশের জন্য অর্থ-

নৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। অর্ধোন্নত দেশের লোকদের আয় এবং উৎপাদনক্ষমতা অত্যন্ত কম, জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় আয়ের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করা সম্ভব নহে। পরিকল্পনার সাহায্যে শুধু বর্তমানের নহে, সুদূর ভবিষ্যতের জন্যও উন্নতি এবং কল্যাণের ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়।

ভারত এবং অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে গিয়া কৃষি এবং কুটিরশিল্পের উন্নতির কথা ভবিতে হয়। সেচ কার্যেরও উন্নয়ন দরকার। শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিতে হয় মৌলিক শিল্পের (basic industries—যেমন, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, ইত্যাদি) উপর। পরিবহন ব্যবস্থার এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। মৌলিক শিল্প বেশী হইলে নূতন নূতন শিল্পের প্রসার হইবে এবং দেশ সত্বর অগ্রসর হইবে। মৌলিক শিল্পে খুব বেশী মূলধন প্রয়োগ করিতে হয় এবং প্রথম দিকে লাভ বলিয়া তেমন কিছু থাকে না। সেই জন্য সাধারণতঃ শিল্পপতিগণ এই ধরণের শিল্প চালু করিতে চাহে না। কাজেই ভিত্তি-মূলক মৌলিক শিল্পের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় অপরিহার্য। বৈদ্যুতিক শক্তি এবং পরিবহন ব্যবস্থাতেও সরকারী প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উপযোগী। অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এই সব নিতান্ত প্রয়োজন এবং সাধারণ শিল্পপতিগণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সরকারেরই এই সব কাজ হাতে নিতে হয়।

ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশে মূলধন এবং নিপুণ কারিগরের খুবই অভাব। উন্নয়নের প্রথম দিকে, এই দুইটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য অতি উন্নত দেশগুলি হইতে সাহায্য লইতে হয়। পরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায়।

অর্ধোন্নত দেশে যখন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হয় তখন শিল্পের ব্যাপারে গোড়ার দিকে মৌলিক শিল্প ইত্যাদি গঠন করিয়া উৎপাদক মূলধন (production goods) সংগ্রহ করার দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়, দৈনন্দিন উপভোগ্য সামগ্রীগুলির (consumption goods) প্রতি তেমন বেশী দৃষ্টি দেওয়া যায় না। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী বাড়ানো সম্ভবপর হয় না। কিন্তু পরিকল্পনার ফলে লোকের আয় বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন উপভোগ্য জিনিসপত্রের চাহিদাও খুব বেশী বাড়িয়া যায়। এমতাবস্থায় দুইটি কাজ করা দরকার।

প্রথমতঃ, ভবিষ্যতের উন্নতির কথা বিবেচনা করিয়া জনসাধারণের উচিত দৈনন্দিন উপভোগ্য জিনিস যথাসম্ভব কম কেনা।

দ্বিতীয়তঃ, কুটির শিল্পকে সাহায্য এবং উৎসাহ দান করিয়া এই শিল্পের প্রসার ঘটাইয়া জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে হয়। কুটির শিল্পের প্রসার হইলে বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হয়। পরে যখন দেশে মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যন্ত্রপাতি বেশী উৎপন্ন হইতে থাকে এবং বৈদ্যুতিক শক্তিও যখন সস্তায় পাওয়া যায় তখন কুটিরশিল্পগুলিকে ছোট ছোট কারখানায় পরিণত করা যায়। পরিণামে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহাতে দেশের শিল্প এবং কৃষির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করিতে হয়। শিল্পের উন্নতি না হইলে কৃষির উন্নতি হয় না, আবার কৃষির উন্নতি না হইলে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। শিল্পের উন্নতি না হইলে যে সব যন্ত্রপাতির দ্বারা কৃষির উন্নতি করা সম্ভব সেগুলি তৈয়ারী হইবে না। আবার কৃষিজাত দ্রব্যাদি যথোপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন না হইলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অভাব ঘটিবে এবং দাম বাড়িবে, খাদ্যদ্রব্যেরও অনটন ঘটিবে এবং দাম বাড়িবে। মনে রাখিতে হইবে যে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি বেশী লোক কাজ পায় তবে তাহাদের আয় বাড়ে। আগে যাহারা অল্পাহারে অভ্যস্ত ছিল তাহারাও বেশী খাদ্য কিনিতে পারে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা (demand) বাড়ে এবং যোগান (supply) সমানুপাতে না বাড়িলে দামও বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দাম খুব বেশী বাড়িয়া গেলে মজুরেরা আরও বেশী মজুরি চাহিবে, না পাইলে ধর্মঘট ইত্যাদি দ্বারা উৎপাদন ব্যাহত করিবে। এই সব কারণে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হয়।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় আরও একটি দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। জনসাধারণ যেন বুঝিতে পারে যে, পরিকল্পনা অনুসারে যে কাজ হইতেছে তাহাতে তাহাদের উপকারই হইতেছে। সেই জন্য কৃষি, শিল্প ইত্যাদির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদের দেহমনের উন্নতিরও বন্দোবস্ত করিতে হয়। কৃষি, সেচ, পরিবহন, বৈদ্যুতিক শক্তি, কুটির শিল্প ও মৌলিক শিল্প প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে

সঙ্গে জনকল্যাণমূলক কাজও করা দরকার। অর্থাৎ জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া দরকার।

প্রশ্ন

1. What are the economic functions of the Government?

(অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের কাজ কি কি ধরণের হইতে পারে?) [১০২-১০৩ পৃষ্ঠা]

2. Analyse the reasonableness of the increasing role of the Government in economic affairs.

(অর্থনৈতিক ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান সরকারী কাজকর্মের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ কর।) [১০৩-১০৫ পৃষ্ঠা]

3. What is meant by 'development planning'? How does communist planning differ from democratic planning? Which of these two types has been adopted in India?

(উন্নয়ন পরিকল্পনা বলিলে কি বুঝায়? সাম্যবাদী পরিকল্পনা ও গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য কি? এই দুই ধরণের পরিকল্পনার মধ্যে ভারতে কোনটি গ্রহণ করা হইয়াছে?) [১০৫-১০৭ পৃষ্ঠা]

4. What are the characteristics of planning for the development of under-developed countries?

(অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কি কি?) [১০৭-১১০ পৃষ্ঠা]

5. What is meant by 'economic development'? State the principal requirements for the development of an under-developed country like India. (Higher Secondary Examination, 1961)

(আর্থিক উন্নয়ন বলিলে কি বুঝায়? ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য কি কি বিষয়ের প্রয়োজন আছে?) [১০৫-১০৬, ১০৭-১১০ পৃষ্ঠা]

6. Indicate the importance of village and small-scale industries in our economy. (Higher Secondary Examination, 1960)

(আমাদের দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব কিরূপ?) [১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা]

7. Estimate the place of small-scale and cottage industries in the economy of India. (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960.)

(ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং কুটির শিল্পের স্থান নির্ণয় কর।) [১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা]

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতে উন্নয়ন পরিকল্পনা
(Dovelopment Planning in India)

ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা—ব্রিটিশ আমলে সরকার ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই। খাদ্যজাতীয় ও কাঁচামালজাতীয় কৃষি, উৎপাদক বস্তু তৈয়ারির শিল্প (producer goods industry) ও ভোগ্য বস্তু তৈয়ারির শিল্প (consumer goods industry), পরিবহন ব্যবস্থা (transport), কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির মধ্যে একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য রাখিয়া সরকার দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করে নাই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উন্নয়ন করা হয় নাই।

তখন সরকার যাহা কিছু করিয়াছে সবই করিয়াছে ব্রিটিশ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—যেমন, অনেকগুলি রেল লাইন খোলা হইয়াছিল কেবলমাত্র সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য। দেশের লোকের সুবিধা কি উন্নতির দিকে সরকারের দৃষ্টি ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য যে সামান্য চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও ব্রিটিশদের যুদ্ধ চালাইবার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া।

সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে, ব্যবসায়িগণ খুশিমত চলিয়াছিল। তাহাদিগকে অবাধ গতিতে চলিতে দেওয়ার ফলে, ভারতে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক কাঠামো (balanced economy) গড়িয়া ওঠে নাই। কোন কোন জিনিস তৈয়ারির ব্যাপারে বেশ আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ হইয়াছে—যেমন, কয়লা, চা, পাটশিল্প এবং শেষের দিকে কলের কাপড়ের ব্যাপারে। তুলনা করিলে দেখা যায়, জিনিস তৈয়ারির কাজের চেয়ে জিনিসপত্র কেনাবেচার কাজে (commerce) অনাবশ্যকভাবে অনেক বেশী মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে। কৃষিকর্ম প্রাচীন পদ্ধতিতে চলিতে চলিতে

অন্য দেশের তুলনায় ভীষণভাবে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। মৌলিক শিল্পের (basic industry) প্রসার করা হয় নাই। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদক বস্তু তৈয়ারির দিকে নজর দেওয়া হয় নাই। বিদেশ হইতে আমদানির ব্যাপারেও ব্যবসায়িগণ যন্ত্রপাতি আনিয়া কারখানা স্থাপন না করিয়া আশুভোগ্য পণ্য (consumer goods) আনিয়া বিক্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি লাভের অঙ্ক বাড়াইয়াছে।

সরকার ইচ্ছা করিলে ভোগ্যবস্তুর উপর আমদানি শুল্ক বসাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশেও অনাবশ্যক ভোগ্যবস্তুর কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স দান বন্ধ করিয়া ব্যবসায়িগণকে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে এবং উৎপাদক বস্তু তৈয়ারি করিতে বাধ্য করিতে পারিত। কিন্তু সরকার তাহা করে নাই। ভারতে ব্রিটিশ ভোগ্য বস্তুর আমদানি কমিলে ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইত।

দেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা না থাকায় এবং বিদেশ হইতেও যন্ত্রপাতির আমদানি খুব কম হওয়ায়, শিল্পের প্রসার হয় নাই। ভারতীয়দের সঞ্চয় অবশ্য খুব কম। কিন্তু সেই সামান্য সঞ্চয়ও যথোপযুক্তভাবে উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করার বন্দোবস্ত করা হয় নাই।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূত্রপাত (Beginning of Planning)— ১৯৩৪ সালে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া 'Planned Economy for India' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের আর্থিক উন্নয়নের দিকে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি একটি দশবার্ষিকী পরিকল্পনাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তারপর, ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস National Planning Committee নামে একটি কমিটি স্থাপন করিয়া ইহার উপর অর্থনৈতিক ও তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার দেয়। এই কমিটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয়ে ইহার মতামত প্রকাশ করে।

১৯৪১ সালে ভারত সরকারও যুদ্ধোত্তর ভারতের বিভিন্ন দিকের পুনর্গঠনের উপায় নির্ধারণ করিবার জন্য কয়েকটি Reconstruction Committee স্থাপন করে। অবশেষে, ১৯৪৪ সালে একটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ (Planning and Development Department) খোলা হয়। কোন ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা ইহার উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য

ছিল, যুদ্ধের দুর্যোগে যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিয়া যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় আসার সম্ভাবনা ছিল তাহা রোধ করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের শিল্পপতিগণ একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ইহা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। ইহাতে মোটামুটি ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আর্থিক কাঠামোর ইঙ্গিত আছে। তবে, ইহাতে জনগণের চেয়ে ব্যবসায়িগণের উন্নতির দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল।

অপর পক্ষে, ঠিক এই সময়েই শ্রী এম্, এন্, রায় 'জনগণের পরিকল্পনা' (People's Plan) নামে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। শ্রী এস্, এন্, আগরওয়ালও 'গান্ধীপন্থী পরিকল্পনা' নাম দিয়া একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

স্বাধীন ভারতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা (Planning in Free India)—১৯৫০ সালের মার্চ মাসে স্বাধীন ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) স্থাপন করে। উদ্দেশ্য ছিল, কি করিলে দেশের ধনসম্পদ এমনভাবে কাজে খাটানো যায় যে বিভিন্ন দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয় এবং বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে চলে তাহা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে সরকার একটি পূর্বপরিকল্পিত ছক অনুসারে দেশের উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবে। প্রথমে ঠিক করা হইয়াছিল যে ছয়বৎসরব্যাপী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে। কিন্তু, পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five-Year Plan) প্রস্তুত করা হয়।

১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতেই ভারত সরকার পরিকল্পনা অনুসারে আর্থিক উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অবশ্য তখনও প্রকাশ করা হয় নাই। তথাপি, মোটামুটি ভাবে এই পরিকল্পনায় নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও উপায় অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিলকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আরম্ভ তারিখ ধরা হয়।

১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় শেষ হইয়াছে এবং ১লা এপ্রিল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু হইয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তে পরবর্তী কিছু কালের পরিকল্পনার কাঠামো এবং ফলাফলের ইঙ্গিতও রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনার

মাধ্যমে উন্নয়নের বেলায় একটু বেশী দিনের কথাই ভাবিতে হয় এবং আমাদের পরিকল্পনা কমিশনও মোটামুটি ভাবে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সময়ের কথা ভাবিয়া রাখিয়াছে।

পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের প্রাক্কালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition of India on the eve of Planning)—১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু হইয়াছে। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা না থাকিলে পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাইবে না। আমাদের কৃষিকার্য, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প, পরিবহন ও সংসরণ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির অবস্থা—এই সব বিষয়ে মোটামুটি ভাবে কিছু ধারণা থাকা দরকার।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভারত একটি অর্ধোন্নত দেশ। অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রতি ক্ষেত্রেই ভারত উন্নত দেশগুলির অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই দুরবস্থা পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কমিশন ত্রুটিগুলি দূর করিয়া উন্নতির উপায় নির্ধারণ করে।

কৃষি (Agriculture)—অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কৃষিকার্যের উন্নতি অপরিহার্য। ১৯৫০ সালে দেখা গেল, বিদেশ হইতে প্রচুর খাদ্য ও কাঁচা মাল আমদানি না করিলে দেশের লোকের খাদ্য সরবরাহ করা যায় না, প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিও (যেমন তুলা না হইলে কাপড়ের কল, পাট না হইলে পাটের কল) চালু রাখা যায় না। সরকার বুঝিল, কৃষির উন্নতি করিয়া খাদ্য ও কাঁচা মালের ব্যাপারে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficient) করিতে পারিলে এবং এই খাদ্য ও কাঁচা মালের আমদানি করিবার জন্য যে অর্থ খরচ করিতে হয় তাহাদ্বারা যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া শিল্পের উন্নতি করিতে পারিলে কোন বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না।

কৃষি-ব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটির জন্য আমাদের দেশের জমির ফসলের পরিমাণ অত্যন্ত কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা হিসাবে ৮০৭ পাউণ্ড চাল জন্মে, জাপানে ইহার তিন গুণ। এমন কি, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলেও আমরা প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা হিসাবে যে ফসল আশা করি তাহার পরিমাণ হইল ১০৩০ পাউণ্ড মাত্র। কৃষি ব্যাপারে ত্রুটি অনেক ছিল এবং

এখনও কিছু কিছু আছে। প্লাবন রোধের ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। সেচ ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল—১৯৫০ সাল পর্যন্ত সেচকার্যে ব্যবহার্য ভারতের নদীজলসম্পদের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ কাজে লাগানো হইয়াছিল। সার দেওয়ার ব্যবস্থাও খুব কম ছিল। গোবর ছাড়া অন্য সারের ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। এই গোবরেরও আবার অনেকটাই জমিতে না দিয়া জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হইত। চাষের যন্ত্র বলিতে লাঙ্গল-বলদই বুঝাইত। গভীরভাবে চাষের পক্ষে ইহা মোটেই উপযোগী নয়। ট্র্যাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার ছিল না। জঙ্গল পরিষ্কার, পতিত জমির উদ্ধার প্রভৃতির ব্যবস্থা খুব কম ছিল। এই সব কাজের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তাহা দরিদ্র কৃষকগণ যোগাড় করিতে পারিত না। আর একটি বড় ত্রুটি হইল এই যে আমাদের দেশে মালিকানার ভিত্তিতে ভূমি-বিন্যাস এইরূপ যে কাহারও একার পক্ষে ট্র্যাক্টর ইত্যাদি কাজে খাটানো সম্ভব নয়। অনেক মালিকেরই জমির পরিমাণ কম। আবার এই স্বল্প জমিও বহুধা বিভক্ত—একটি বড় মাঠের মধ্যে অন্য মালিকদের ছোট ছোট টুকরাগুলি হইতে আল দিয়া পৃথক করা ছোট একটি টুকরা এবং অনেক দূরে আর একটি বড় মাঠের মধ্যে সেইভাবে বিন্যস্ত আর একটি ছোট টুকরা, এই রকম কতকগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত টুকরায় ভাগ করা। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায়ও ভয়ানক ত্রুটি ছিল। বেশীর ভাগ জমির মালিকেরা এক এক জন বহু জমির মালিকানাস্বত্ব ভোগ করিত কিন্তু চাষ আবাদের সহিত কোন সংস্রব রাখিত না। তাহারা কেবল পাওনা আদায় করিত, চাষ আবাদের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দিত না। যাহারা বাস্তবিক চাষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল সেই কৃষক পরিবারগুলির অর্ধেকেরও বেশীর এক টুকরাও জমি ছিল না। যে সব কৃষক পরিবারের জমি ছিল তাহাদের জমির পরিমাণও এত কম ছিল যে বছরের খোরাকও জুটিত না। মোটের উপর দেখা যাইত এই যে, বেশীর ভাগ কৃষক পরের জমি চাষ করিত এবং সেই জন্য জমির উন্নতি করিতে অথবা অধিকতর ফসল ফলাইতে উৎসাহ বোধ করিত না। যে সব চাষীর জমি ছিল তাহাদের জমিও এত কম এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল যে চাষের উন্নতির তেমন অবকাশ ছিল না। যে সব জায়গায় জমিদারি প্রথা ছিল (যেমন পশ্চিম বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে) সে সব জায়গায় জমির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকেরা যে খাজনা দিত সরকার তাহার এক-চতুর্থাংশও পাইত না।

বাকি তিন-চতুর্থাংশ জমিদারেরা এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা ভোগ করিত। সরকারের হাতে খাজনার এত কম অংশ পৌছিবার ফলে জমির উন্নতি কিংবা চাষীদের অন্যান্য উন্নতি করা সরকারের পক্ষে কষ্টকর ছিল। জমিদারেরা এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা জমির উন্নতির প্রতি উদাসীন ছিল। চাষ আবাদের পদ্ধতি ছিল অতি প্রাচীন—লাঙ্গল ও বলদ দিয়া চাষ করিয়া যে কোন রকমের বীজ বপন করা হইত। এই অবস্থা এখনও প্রায় সমানভাবে চলিতেছে, তবে আজকাল ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করিয়া ভাল বীজ বপন করিবারও চেষ্টা হইতেছে। কৃষি বিষয়ে চাষীদের জ্ঞান ছিল বংশপরম্পরাগত, সুতরাং সংস্কারাচ্ছন্ন। এই বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানবিস্তারের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ফলে ত্রুটিগুলি দূর করা হইতেছে। সারের ব্যবস্থা করা হইতেছে। জমিদারি প্রথা লোপ করা হইয়াছে। কেহ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বেশী ভোগ করিতে পারিবে না এই রকম আইন করিয়া উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইতেছে। সমবায় প্রথায় কৃষি-কার্যের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণদান এবং সমবায় সেবাসমিতির ও সমবায় খামার প্রথার প্রচলন ইত্যাদির দ্বারা উৎপাদন ও বিক্রয় প্রভৃতি নানা দিকে কৃষিকার্যের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Cottage Industry and Small-Scale Industry)—১৯৫০ সালে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—বিশেষত, কুটির শিল্প—মৃতকল্প অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজদের দেশ হইতে অবাধগতিতে ভোগ্য বস্তু আমদানী হওয়ার ফলে আমাদের দেশের কুটির শিল্পের মৃত্যুদশা উপস্থিত হয়। দেশের মধ্যেও বৃহদায়তন শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় কুটির শিল্প দুর্দশাগ্রস্ত হয়। কুটির শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অবশ্য কম ছিল না। প্রায় ২ কোটি লোক—একমাত্র হস্তচালিত তাঁত শিল্পেই ৫০ লক্ষ লোক—কুটির শিল্পে আত্মনিয়োগ করিত। কিন্তু ইহাদের আয় ছিল অত্যন্ত কম। অন্য কোন উপায় ছিল না বলিয়াই ইহারা কুটির শিল্পের সাহায্যে কিছু কিছু আয় করিতে চেষ্টা করিত। পারিশ্রমিক হিসাবে যাহা জুটিত তাহা অতি নগণ্য।

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কুটির শিল্পের এবং স্বল্পায়তন শিল্পের গুরুত্ব খুব বেশী। এখানে জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ জন কৃষিকার্যের উপর

নির্ভরশীল। কৃষিকার্যে এত লোকের দরকার হয় না। তবুও, অনেকে অন্য কিছু জোটে না বলিয়া জমি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। পল্লী অঞ্চলে কুটির শিল্প এবং স্বল্পায়তন শিল্প প্রসার লাভ করিলে এই উদ্বৃত্ত জনগণের অন্য একটা আয়ের পথ (alternative occupation) সৃষ্টি হইতে পারে। তাহা ছাড়া, কৃষিকার্যে যে লোকের দরকার তাহারাও বার মাস কার্যে লিপ্ত থাকিতে পারে না। কৃষিকার্য বছরের বার মাসের ব্যাপার নয়। ইহা সাময়িক। সুতরাং কৃষকগণকে বাধ্য হইয়া বছরে অন্তত ছয় মাস অলসভাবে কাটাইতে হয়। কুটিরশিল্পের ব্যবস্থা থাকিলে এই কৃষকগণের দ্বিতীয় একটা কাজের (subsidiary occupation) ব্যবস্থা হয়, তাহাদের কিছু কিছু আয় হয় এবং দারিদ্র্যের লাঘব হয়।

আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নের সময়ে কুটির শিল্প এবং স্বল্পায়তন শিল্পের উপযোগিতা বিশেষ করিয়া অনুভব করা যায়। এই অবস্থায় প্রথম দিকে ভারী ভারী মূল শিল্পের প্রসার করিয়া যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদক সামগ্রী (producer goods) তৈয়ারি করা হয়। মূলধন যাহা কিছু জোটে তাহা মূল শিল্পে বিনিয়োগ করিয়া দ্রুতগতিতে দেশকে উৎপাদক সামগ্রীর ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়। ভোগ্য বস্তুর (consumer goods) উৎপাদন বাড়াইবার ব্যাপারে বেশী রকমের মূলধনের বিনিয়োগ স্থগিত রাখিতে হয়। অথচ মূল শিল্পে কর্মরত লোকেরা পয়সা আয় করে এবং তাহারা বেশী করিয়া ভোগ্য বস্তু কিনিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হয়। ভোগ্য বস্তুর চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্পের মাধ্যমে এই ভোগ্য বস্তুর সরবরাহ বাড়ানো সম্ভবপর হয় না, কারণ বৃহদায়তন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন উৎপাদক সামগ্রীর উৎপাদনে খাটাইতে হয়। সরবরাহ না বাড়াইলে ভোগ্য বস্তুর দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, বহু লোকের অসুবিধা হয়, সকলেই বেতন বাড়াইবার জন্য আন্দোলন করে, নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায়, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্য বস্তুর (যেমন কাপড়চোপড়, তৈল, সাবান, পাউডার, পুতুল, খেলনা ইত্যাদির) উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব ও উচিত। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মূলধন খুব কম লাগে, বড় বড় কারখানায় জড় না হইয়া অপেক্ষাকৃত পছন্দমত পরিবেশে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত কাজ করার ব্যবস্থা থাকায় পারিশ্রমিকের হারও কিছু কম। সুতরাং মূল শিল্পের প্রসারসাধনে কুটির শিল্প

ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারসাধন ব্যাহত হয় না—বিশেষত, শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে অফুরন্ত। বরং, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প মূল শিল্পের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করে। মূল শিল্পের প্রসার সাধনের সময়ে এই ছোট ধরণের শিল্পগুলির মাধ্যমে ভোগ্য বস্তুর সরবরাহ বাড়াইয়া বাজারদরের ক্রমবৃদ্ধি রোধ করা কর্তব্য।

কুটির শিল্পের আর একটি উপযোগিতা চিরকালই আছে এবং থাকিবে। বস্তুতপক্ষে কুটিরশিল্প যে সর্বত্রই বৃহদাকার শিল্পের সহিতও প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকে তাহার প্রধান কারণ হইল ইহার এই রকমের উপযোগিতা। কুটির শিল্পের মাধ্যমে একই নক্সার (pattern) বহু জিনিস তৈয়ারি করার প্রয়োজন হয় না। ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন নক্সার জিনিস তৈয়ারি করা যায়। ফলে, ইহা বিভিন্ন রুচির লোকের চাহিদা মিটাইতে পারে। নানা রকমের সূক্ষ্ম কাজ বৃহদায়তন শিল্পে নিয়োজিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। তাহা কুটির শিল্পের মাধ্যমে সম্ভবপর হয়।

এই সব বিবেচনা করিয়া, পরিকল্পনা কমিশন কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ত্রুটিগুলি দূর করিয়া ইহাদের উন্নয়নের চেষ্টা করে।

পরিকল্পনা কমিশন বুঝিতে পারে যে উপযুক্ত মূলধনের অভাব আছে বলিয়া লোকেরা সহজে কাঁচা মাল এবং সামান্য সামান্য যন্ত্রপাতি কিনিতে পারে না। পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতের অভাব আছে বলিয়া খুব বেশী দরকার হইলেও কোন রকম উৎপাদক শক্তির (power) সাহায্য পাওয়া যায় না। তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করিতে গিয়া বাজারদর পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা না থাকায় অত্যন্ত সস্তা দরে বিক্রয় করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই মূলধনের অভাবে এবং বিক্রয়ের বন্দোবস্তের অভাবে ফড়িয়া, দালাল ইত্যাদির নিকট হইতে দাদন লইয়া তাহাদের ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করিতে হয়।

এই সব কারণে, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা কমিশন পল্লী অঞ্চলেও শক্তি সরবরাহের (power supply) জন্য, প্রধানত সমবায় পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল সংগ্রহ করার ও তৈয়ারি মাল বাজারে বিক্রয় করার বন্দোবস্তের জন্য এবং পল্লী অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুপারিশ করে।

সরকার উপযুক্ত ক্ষেত্রে কুটিরশিল্পকে আর্থিক সাহায্য (subsidy) দান

করিতে পারে। তাহা ছাড়া, সরকার বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত করিতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে অভিজ্ঞ কারিগর আনাইয়া তাহাদের দ্বারাও কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে। সরকার আর একটি কাজ করিয়াও কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার ঘটাইতে পারে। একই ধরণের জিনিস (যেমন কাপড়) তৈয়ারির ব্যাপারে সরকার যদি বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর বৈষম্যমূলক (অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে অব্যাহতি দিয়া) উৎপাদন কর (cess) বসায় তাহা হইলে বৃহদায়তনশিল্পজাত দ্রব্যের দাম বাড়ে এবং প্রতিযোগিতায় কুটির শিল্পের এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে প্রস্তুত দ্রব্য সহজে বাজারে বিক্রয় হয় এবং কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসার লাভ করে। সরকারী বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিবার বেলায় কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য কিনিবার নীতি অবলম্বন করিলেও কুটির শিল্পের সুবিধা হয়। পল্লী অঞ্চলের লোকদের নিয়োগের বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ঐ সব অঞ্চলে শিল্পালয় (industrial estates) স্থাপন করিতে পারে। কম দামে অথবা কম ভাড়ায় জমি এবং কারখানা ঘরের ব্যবস্থা করিয়া এবং শক্তি সরবরাহ ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়েও সুবন্দোবস্ত করিয়া সরকার ঐ সব অঞ্চলে ছোট ছোট কারবার খুলিতে উৎসাহ দান করিতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের আলোচনায় এই সব বিষয়েরও ইঙ্গিত ছিল।

উল্লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইহার বৈশিষ্ট্যের (যেমন, কোন কোন দিক দিয়া কম উৎপাদনব্যয়, রুচি অনুযায়ী জিনিস তৈয়ারি ইত্যাদি) দ্বারা বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে। শুধু তাহাই নয়, ইহাতে কুটির-শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কাজ করিবে।

বৃহদায়তন শিল্প (Large-Scale Industries)—১৯৫০ সালের পূর্বে ভোগ্য বস্তুর উৎপাদনের জন্য অধিকতর মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছিল। উৎপাদক দ্রব্যের (producer goods) এবং শক্তির (power) উৎপাদন খুব কম হইত।

কোন দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন কয়লা, বিদ্যুৎ, তৈল প্রভৃতির দ্বারা শক্তির সরবরাহ করা এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দ্বারা জিনিসপত্র তৈয়ারির জন্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারির জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ারির

ব্যবস্থা করা। ১৯৫০ সালে আমাদের দেশে তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা একমাত্র আসামে প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য সামান্য কিছু ছিল। বিদ্যুতের উৎপাদনও যথোপযুক্ত ছিল না। কয়লার উৎপাদন মোটামুটি ভাল ছিল বটে, কিন্তু খনির মালিকেরা যথেচ্ছভাবে কাজ চালাইত বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট ভয় ছিল। যন্ত্রপাতি তৈয়ারির জন্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ করার কারখানা ছিল না। অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা কিছু কিছু স্থরু হইয়াছিল মাত্র। ইস্পাত তৈয়ারি হইত মাত্র ১১ লক্ষ টন। ইহাতে প্রয়োজন মিটিত না।

কিন্তু ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পোন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট। কয়লা ব্যতীত ভূগর্ভে নিহিত সম্পদের—বিশেষত তৈলের—অধিকাংশ অনাবিষ্কৃত ছিল। স্বাভাবিক জলপ্রবাহও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে খাটানো হয় নাই। সহজেই বলা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্য শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই।

ভারতে আসল অভাব হইল মানুষের তৈয়ারি মূলধনের। কারিগরি নৈপুণ্যেরও অবশ্য অভাব ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু মূলধনের অভাবই শিল্পোন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়।

আধুনিক জগতে উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হইতে হইলে মৌলিক শিল্পে স্বাবলম্বী হইতে হয়। মৌলিক শিল্প গড়িয়া না উঠিলে শিল্পোন্নতি সম্ভব নয়। শিল্পোন্নতি না হইলে দেশরক্ষা সম্ভবপর হয় না, জাতীয় আয় বাড়ানো যায় না এবং বর্তমান জগতের উপভোগ্য বস্তুগুলি হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

শিল্পোন্নতির ব্যবস্থায় সরকার উদাসীন থাকিলে অতিপ্রয়োজনীয় অনেক শিল্প যথাযথভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে না ইহা বুঝিতে পারায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার একটি শিল্পনীতি (industrial policy) ঘোষণা করে।

১৯৪৮ সালের ঘোষণায় বলা হয় যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য দেশের যে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, এমন কি দখল করিবার অধিকার সরকারের থাকিবে। তবে, নির্দিষ্ট কয়েকটি শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবকাশ থাকিবে। অস্ত্রতৈয়ারির কারখানা, আণবিক শক্তি সম্পর্কিত (atomic power) ব্যাপার এবং রেলপথ ইত্যাদি যাহা পূর্ব হইতেই একমাত্র সরকারী মালিকানায় ছিল তাহা সেইরূপই থাকিবে। তাহা ছাড়া, কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ

নির্মাণ প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে নূতন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত মালিকানায় স্থাপিত হইতে পারিবে না—পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর জাতীয় স্বার্থে দরকার না হইলে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে নূতন প্রতিষ্ঠান একমাত্র সরকারের স্থাপন করিবার অধিকার থাকিবে। তবে এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারিবে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার মিশ্রতান্ত্রিক আর্থিক সংগঠনের (mixed economy) নীতি অবলম্বন করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আরম্ভের সময়ে ১৯৫৬ সালে সরকার একটি পরিবর্তিত শিল্পনীতি ঘোষণা করে। প্রথমে পার্লামেণ্ট ভারতে সমাজতান্ত্রিক রকমের সমাজ-ব্যবস্থা (socialistic pattern of society) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে। ইহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে উল্লিখিত শিল্পগুলির সহিত আরও বহুবিধ শিল্প (যেমন বিদ্যুৎ-তৈয়ারি ও সরবরাহ) যোগ করিয়া ঘোষণা করে যে এই নির্দিষ্ট শিল্পগুলিতে একমাত্র সরকারী মালিকানায়ই নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারিবে, ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হইবে না। ইহা ছাড়া, আরও কতকগুলি নির্দিষ্ট শিল্পের (যেমন সার তৈয়ারির কাজ, রাস্তায় ও সমুদ্রপথে চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি) ব্যাপারে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রসার লাভে বাধা না দেওয়া হইলেও ক্রমান্বয়ে সরকারী মালিকানায় কাজ বাড়াইবার চেষ্টা হইবে—ঘোষণাটিতে এই কথাও পরিষ্কার ভাবে বলা হয়। নির্দিষ্ট শিল্পগুলি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবকাশ দেওয়া হয়। তবে ইহাও বলা হয় যে সরকারী মালিকানায় যে কোন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার অধিকার সরকারের থাকিবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে মূলধন এবং কারিগরের অভাব দূর করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারী মূলশিল্পের উন্নয়নের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়।

পরিবহন ও সংসরণ ব্যবস্থা (Transport and Communications)—আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে পরিবহন কার্যের গুরুত্ব খুব বেশী। গ্রামাঞ্চল হইতে শহরাঞ্চলে এবং খুব কম দামের অঞ্চল হইতে খুব বেশী

দামের অঞ্চলে খাদ্য বহন করা প্রয়োজন। আবার, কয়লা, কাঁচা মাল ইত্যাদিও যথাস্থানে ঠিক সময়ে পৌছানো দরকার। তৈয়ারি মালও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিতে হয়। শিল্পাঞ্চল এবং বন্দর হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রামাঞ্চলে নিতে হয়। বিদেশ হইতে জিনিসপত্র আনয়ন এবং বিদেশে জিনিস-পত্র প্রেরণ নিজেদের জাহাজে করিতে পারিলে বিদেশী জাহাজের মালিককে ভাড়া হিসাবে অজস্র টাকা দিতে হয় না। শুধু তাহা কেন, জাহাজ চলাচলের ব্যবসা (shipping) উন্নত করিতে পারিলে অন্য দেশগুলিরও একটি হইতে আর একটিতে পরিবহনের কাজ চালাইয়া অনেক অর্থ আয় করা যায়। বিমানে পরিবহনের কাজেরও প্রয়োজন আছে। দেশের রাস্তাঘাটগুলি উন্নত করিয়া বাস, লরী ইত্যাদির সাহায্যে রেলপথের কাজের পরিপূরক হিসাবে কাজ করানো যাইতে পারে।

আর্থিক ব্যাপারে উন্নতধরণের সংসরণ ব্যবস্থারও প্রয়োজন। ডাক (post), তার (telegraph) এবং টেলিফোন (telephone) ইত্যাদির সাহায্যে খবরের আদান প্রদান সহজ না হইলে আর্থিক জগতের অনেক কথা (যেমন, বিভিন্ন স্থানে দামের ওঠা-নামা) সত্বর ও সহজে জানা যায় না।

১৯৫০ সালে আমাদের পরিবহন ও সংসরণ ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুপাতে অনেক কম ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ঐ সময়ে রেলপথে বছরে ১০ কোটি টনের বেশী মাল বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। ঐ সময়ে ডাকঘর ছিল মাত্র ৩৬০০০।

শিক্ষা (Education)—শ্রমনৈপুণ্য অর্জনের জন্য সাধারণ শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষার ফলে বুদ্ধিবৃত্তি সজাগ হয় এবং তাহাতে কর্মদক্ষতা বাড়ে। কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন আরও বেশী।

১৯৫০ সালে আমাদের দেশে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত শোচনীয় ভাবে কম ছিল। ৬ হইতে ১১ বছর বয়সের বালকবালিকাদের মধ্যেও অনেকেই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইত না। এই বয়সের বালকবালিকাদের সংখ্যার শতকরা মাত্র ৪৩ জন স্কুলে যাইতে পারিত। কারিগরি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা এত সীমাবদ্ধ ছিল যে সমগ্র ভারতে বছরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে ৪১১৯ জন, ডিপ্লোমা লাভের উদ্দেশ্যে ৫৯০৩ জন।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা (Health and Medical Relief)—

কর্মদক্ষতার জন্য শরীর সুস্থ রাখা প্রয়োজন। ১৯৫০ সালে টিকা দেওয়া, ম্যালেরিয়া নিবারণ ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষামূলক কাজের ব্যবস্থা খুব কম ছিল। চিকিৎসার ব্যবস্থাও তদ্রূপ। সমগ্র ভারতে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,১৩,০০০। Primary health unit একটিও ছিল না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য (Aims and Objects of the Five-Year Plans)—

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল লোকসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় উৎপাদন (সুতরাং জাতীয় আয়) অধিকতর হারে বাড়াইয়া মাথাপিছু আয় অতি সত্বর বাড়াইয়া তোলা। ১৯৫৭ সালের টাকার মূল্য অনুযায়ী হিসাব করিলে বলিতে হয় ১৯৫০ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল বছরে ২৬০ টাকা। ঐ সময়ে আমেরিকায় মাথাপিছু আয় ছিল বছরে প্রায় ৯৪০০ টাকা, ইংলণ্ডে প্রায় ৪৪০০ টাকা, এমন কি জাপানেও ১০০০ টাকার বেশী। সুতরাং, আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়াইয়া অদূর ভবিষ্যতে উন্নত দেশগুলির কাছাকাছি যাওয়ার কথা কেহ ভাবিতে পারে নাই। সেরূপ ভাবনা নিতান্ত অলীক কল্পনামাত্র হইত। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ে লক্ষ্য (target) ঠিক করা হইয়াছিল যে ১৯৭৭ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণে পরিণত করা হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল পরিকল্পনা কমিশন তখন আর একটু আশাবাদী হইয়া লক্ষ্য (target) আর একটু বাড়াইয়া তুলিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে স্থির করা হইল যে জাতীয় আয় ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে এবং মাথাপিছু আয় ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়া উঠিবে।

জাতীয় উৎপাদন (জাতীয় আয়) বাড়াইবার জন্য জাতীয় সঞ্চয়ের হারও বাড়াইবার চেষ্টা করা হইল। উন্নত দেশে বছরে জাতীয় আয়ের ২০ হইতে ৩০ শতাংশ সঞ্চয় করিয়া মূলধন হিসাবে উৎপাদনে বিনিয়োগ (invest) করা হয়। আমাদের আয় কম বলিয়া অত বেশী সঞ্চয়ের আশা করা যায় নাই। ১৯৫০ সালে জাতীয় আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ সঞ্চয় করা হইত। পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্য হইল এই হার বাড়াইয়া ১৯৭৫ সালে ১৭·৫ শতাংশে পরিণত করা। আবার, জাতীয় সঞ্চয় বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিকে বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণ মূলধন ধার করিয়া উৎপাদনকার্যে বিনিয়োগের কথাও বলা হইয়াছিল।

জীবনধারণের মান উন্নত করাও পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সঞ্চয়ের হার বাড়িতে থাকিলেও, মাথাপিছু আয় এমনভাবে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে আশা করা যায়, অর্থমূল্য সমান ধরিয়া ১৯৭৫ সালে ভোগ্য বস্তুর জন্য মাথাপিছু খরচ ১৯৫০ সালের সেইরূপ খরচের অন্তত দেড়গুণ হইবে, অর্থাৎ, ১৯৭৫ সালে গড়পড়তা হিসাবে আমরা ১৯৫০ সালের দেড়গুণ ভোগ্য বস্তু ব্যবহার করিতে পারিব।

এতক্ষণ কেবল গড়পড়তা হিসাবের কথাই বলা হইল। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য শুধু উৎপাদন বাড়ানোই নয়। জাতীয় উৎপাদনের বণ্টনে যে বৈষম্য বিরাজমান তাহা লাঘব করাও পরোক্ষভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য। আমাদের সংবিধানে সমাজ সেবার আদর্শের ইঙ্গিত আছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই আদর্শকে কিছুটা রূপ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ কাজে ধনবৈষম্য (inequality in wealth) হ্রাস করা যায় এবং পরোক্ষভাবে আয়ের অসমতা (inequality in income) কমানো যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে পার্লামেণ্ট সমাজতান্ত্রিক রকমের সমাজ গঠন করিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও এই আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার ফলে, আর্থিক উন্নয়নের সময়ে যে ধনবৈষম্য বাড়িয়া যাইতে পারে তাহা রোধ করার সম্ভাবনা আছে।

উন্নয়নের সময়ে যাহাতে আর্থিক সংগঠনের কোন কোন দিকে খুব বেশী উন্নতি করিয়া কোন কোন দিকে অবহেলা দেখানো না হয়, অর্থাৎ সকল দিকেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উন্নতি হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষি, শিল্প, পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল ব্যাপারের প্রতি যথাযথভাবে দৃষ্টি দিয়া ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাম্য। তাহা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস আছে। যাহাতে রাজ্যগুলির (States) প্রত্যেকটিরই অগ্রগতির ব্যবস্থা হয় সেই ধরণের সামঞ্জস্য-বিধানও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির বড় একটি উদ্দেশ্য হইল ন্যায্য পারিশ্রমিকে সাধারণ লোকদের কর্মের (employment) সংস্থান করিয়া তাহাদের অভাব অনটন হ্রাস করা। ইহার ফলে এমন একটি পরিবেশের

সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে অগণিত নিঃস্ব নিস্তেজ ভারতবাসী নিজেদের সত্তাকে বিকশিত করিতে পারিবে, আবার তাহারা ভারতকে জগৎসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

যে উদ্দেশ্যটির কথা এতক্ষণ বলা হয় নাই তাহা হইল সকল অর্ধোন্নত দেশেরই উন্নয়নপরিকল্পনাকারীদের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। কোন অর্ধোন্নত দেশই কিছু না কিছু বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই রকম সকল দেশেরই উদ্দেশ্য হইল যত শীঘ্র সম্ভব বিদেশীদের সাহায্য বাদ দিয়া দেশকে অগ্রসর করা। ভারতেও উন্নয়ন পরিকল্পনা আরম্ভ করার সময়েই পরিকল্পনাকারিগণ যে স্থির লক্ষ্যে পৌছিতে চাহিয়াছেন তাহা হইল এই যে, কিছুকালের মধ্যেই আর্থিক ব্যাপারে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বয়ংক্রিয় (self-generating) অগ্রগতির পথে চলিতে হইবে। কৃষির উন্নতি এমনভাবে করিতে হইবে যে খাদ্য এবং কাঁচা মালের জন্য যেন অন্য দেশের সাহায্য লইতে না হয়। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া আর্থিক মূলধন গড়িয়া তুলিতে হইবে। মৌলিক শিল্পগুলির ব্যাপক প্রসার করাইয়া বস্তুগত মূলধনের অভাব মিটাইতে হইবে। মূলধনের পরিমাণ বাড়িতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের গতিবেগ ত্বরান্বিত (accelerated) হয়। তখন অন্যনিরপেক্ষ হইয়া দেশের উৎপাদক সংস্থানের সাহায্যেই উৎপাদন বাড়ানো যাইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আরম্ভের সময়ে পরিকল্পনাকারিগণ পাঁচটি পরিকল্পনার ফলে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে মাথাপিছু আয়, সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে কখন কি লক্ষ্যে পৌছিবার সম্ভাবনা আছে তাহা স্থির করেন। আসল কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে লক্ষ্য বা নিশানা (target) ঠিক করা হয়। কার্যক্ষেত্রে এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে এই নিশানাগুলির কিছু কিছু রদবদল করা হইয়াছে। এখন এগুলি যে আকারে পরিণত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

১৯৫১ সাল হইতে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত আয় ও মূলধন বিনিয়োগের বৃদ্ধি :
(১৯৫৭-১৯৫৮ সালে প্রচলিত দাম অনুসারে)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মূলধন বিনিয়োগের বেলায় জাতীয় সঞ্চয়ই একমাত্র কথা নয়। মনে রাখিতে হইবে, জাতীয় সঞ্চয়ের সহিত বৈদেশিক মূলধনও যোগ দেওয়া হইতেছে এবং যে মূলধন বিনিয়োগ (invest) করা হইতেছে তাহা হইল এই দুইটির সমষ্টি।

বিষয়	১৯৫০-৫১ সাল—১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে (বাস্তব)	১৯৫৫-৫৬ সাল—১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (বাস্তব)	১৯৬০-৬১ সাল—২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (মোটামুটিভাবে বাস্তব)	১৯৬৫-৬৬ সাল—৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (আনুমানিক)	১৯৭০-৭১ সাল—৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (আনুমানিক)	১৯৭৫-৭৬ সাল—৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (আনুমানিক)
জাতীয় আয় (কোটি টাকা)	৯২৮৭	১১০১০	১৩৩১০	১৭১৬০	২২৩০০	২৯৬০০
জাতীয় সঞ্চয়ের হার (জাতীয় আয়ের শতকরা)	৫	৭·৩	৮·৫	১১·৫	১৫	১৭·৫
জনসংখ্যা	৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ	৩৮ কোটি ৩০ লক্ষ	৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ	৪৮ কোটি	৫২ কোটি ৮০ লক্ষ	৫৬ কোটি ৮০ লক্ষ
গড়পড়তা মাথাপিছু আয় (সমস্ত বৎসরে)	২৬০ টাকা	২৮৭ টাকা	৩০৪ টাকা	৩৫৭ টাকা	৪২২ টাকা	৫২০ টাকা

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের ও সেবাকার্যের উৎপাদনের হিসাব। যে সব ক্ষেত্রে টাকার কথা আছে, সেই সব ক্ষেত্রে ১৯৬০-৬১ সালে প্রচলিত টাকার মূল্য (সুতরাং জিনিসপত্রের মূল্যস্তর) অনুসারে হিসাব করা হইয়াছে :—

	১৯৫০-৫১ সাল	১৯৫৫-৫৬ সাল— ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর	১৯৬০-৬১ সাল— ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর	১৯৬৫-৬৬ সাল— ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (নিশানা)	১৯৭০-৭১ সাল— ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (নিশানা)
খাদ্যশস্য	৫ কোটি টন	৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টন	৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন	১০ কোটি টন	১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টন
তুলা	২৯ লক্ষ গাঁইট (bales)	৪০ লক্ষ গাঁইট (bales)	৫১ লক্ষ গাঁইট	৭০ লক্ষ গাঁইট	
পাট	৩৩ লক্ষ গাঁইট	৪২ লক্ষ গাঁইট	৪৩ লক্ষ গাঁইট	৬২ লক্ষ গাঁইট	
চা	৬১ কোটি ৩০ লক্ষ পাঃ	৬৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাঃ	৭২ কোটি ৫০ লক্ষ পাঃ	৮৫ কোটি পাউণ্ড	
সেচকার্য	৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর	৫ কোটি ৬২ লক্ষ একর	৭ কোটি একর	৯ কোটি একর	
সমাজ উন্নয়ন কার্য (Community Development) যত লোককে সেবার আওতায় আনা হইয়াছে তাহার সংখ্যা		৭ কোটি ৮০ লক্ষ লোক	২০ কোটি লোক	৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ লোক	
বৈদ্যুতিক শক্তি (যে পরিমাণ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে)	২৩ লক্ষ kw	৩৪ লক্ষ kw	৫৮ লক্ষ kw	১ কোটি ২৭ লক্ষ kw	২ কোটি ১০ লক্ষ kw
কয়লা	৩ কোটি ২০ লক্ষ টন	৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন	৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন	৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন	১৭ কোটি টন
ইস্পাত (Steel)	১১ লক্ষ টন	১৩ লক্ষ টন	২৬ লক্ষ টন	৬৯ লক্ষ টন	

	১৯৫০-৫১ সাল	১৯৫৫-৫৬ সাল—১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর	১৯৬০-৬১ সাল—২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর	১৯৬৫-৬৬ সাল—৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (নিশানা)	১৯৭০-৭১ সাল—৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (নিশানা)
এলুমিনিয়াম	৩৭০০ টন	৭৩০০ টন	১৭০০০ টন	৮৭৫০০ টন	২৩০০০০ টন
ডিজেল ইঞ্জিন (Diesel Engine)	৫ হাজার ৫ শতটি	১০ হাজারটি	৩৩ হাজারটি	৬৬ হাজারটি	
ট্র্যাক্টর	০	০	২ হাজার	১০ হাজার	
সিমেন্ট তৈয়ারির যন্ত্রপাতি	০	৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের	৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের	৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের	
চিনির কলের যন্ত্রপাতি	০	১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের	৪ কোটি ৪০ টাকা মূল্যের	১০ কোটি টাকা মূল্যের	
মটর গাড়ী	১৬৫০০	২৫৩০০	৫৩৫০০	১ লক্ষ	
মিলের কাপড়	৩৭২ কোটি গজ	৫১০ কোটি গজ	৫০০ কোটি গজ	৫৮০ কোটি গজ	
চিনি	১১ লক্ষ টন	১৯ লক্ষ টন	২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন	৩০ লক্ষ টন	
রেলপথের কাজ (যে পরিমাণ জিনিসপত্র বহনের ব্যবস্থা আছে)	৯ কোটি ১০ লক্ষ টন	১১ কোটি ৪০ লক্ষ টন	১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন	২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টন	৩৮ কোটি টন
৬ হইবে ১১ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদিগের শতকরা যত জন স্কুলে যায়	৪৩	৫১	৬০	৮০	

	১৯৫০-৫১ সাল	১৯৫৫-৫৬ সাল—১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র শেষ বৎসর	১৯৬০-৬১ সাল—২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর	১৯৬৫-৬৬ সাল—৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (নিশানা)	১৯৭০-৭১ সাল—৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর (নিশানা)
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর জন্য যে সংখ্যক ছাত্রের ভর্তি হইবার ব্যবস্থা আছে	৪১১৯	৫৮৮৮	১৩১৬৫	১৮৫০০	
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমার জন্য যে সংখ্যক ছাত্রের ভর্তি হইবার ব্যবস্থা আছে	৫৯০৩	১০৪৮৪	২৪০২০	৩৪০০০	
হাসপাতালে যে সংখ্যক বেডের ব্যবস্থা আছে	১ লক্ষ ১৩ হাজার	১ লক্ষ ২৫ হাজার	১ লক্ষ ৬০ হাজার	১ লক্ষ ৯০ হাজার	
পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা	০	৭২৫	২৮০০	৫০০০	

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অর্থবরাদ্দের প্রকারভেদ—এক একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট যে টাকা খরচ করিয়া আর্থিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া ধার্য করা হয় তাহা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটি হইল সরকারী খরচ (public sector outlay), আর একটি হইল ব্যক্তিগত মালিকানায় মূলধন গঠনের জন্য খরচ (private sector investment)।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে খরচের (Public Sector Outlay) প্রকারভেদ—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের মোট খরচকে (total outlay) দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখানো হয়। সরকারী খরচের বেশীর ভাগই খরচ করা হয় মোটামুটিভাবে স্থায়ী মূলধন গঠনের জন্য (investment)। তবে কিছু টাকা মূলধনকে চালু রাখার জন্য এবং সাহায্য হিসাবে বছরের পর বছর খরচ করিয়া যাইতে হয়। ইহাতে কোন স্থায়ী মূলধন সৃষ্টি হয় না। পূর্ব হইতেই এই খরচ চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও এই খরচের ভার বহন করিতে হইবে (recurring expenditure)।

প্রথম ধরণের খরচকে—এবং ইহার গুরুত্বই বেশী—মূলধনগঠনমূলক খরচ (investment outlay) এবং দ্বিতীয় ধরণের খরচকে চলতি খরচ (current outlay) বলা হয়। যেমন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে পাঁচ বৎসরে সরকার কর্তৃক যে ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে তাহার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকা মূলধন গঠনের জন্য এবং ১২০০ কোটি টাকা চলতি খরচ বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী (private sector) যে খরচের কথা বলা হয় তাহার সবটাই মূলধন গঠনের খরচ (investment) বলিয়া ধরা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five-Year Plan)—ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১ এপ্রিল-১৯৫৬ মার্চ) প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। এই জন্য লক্ষ্য ছিল অধিকতর উৎপাদন করা এবং আয়ের বৈষম্য দূর করা। পরিকল্পনা কমিশন একটি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইহাতে ঠিক হয় যে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানই দেশের শিল্পোন্নতির জন্য কাজ করিবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী প্রতিষ্ঠান

ক্রমশ বাড়ানো হইয়াছিল। এই সময়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরও সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে আরোপিত হয়। অবশ্য, তাহার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সবই যে জাতীয়করণ করা হইয়াছিল তাহা নহে। সরকারী তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহাতে সরকারী খরচের খুব বেশী অংশ কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এবং পরিবহন ও সংসরণ ব্যাপারে, আর খুব কম অংশ শিল্প ও খনির কাজের জন্য ধার্য করা হইয়াছিল। শিল্পোন্নয়নের ভার বেসরকারী উদ্যোক্তাদের হাতে দেওয়া হইয়াছিল।

পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল যে সরকার মোটের উপর (অর্থাৎ চলতি খরচ এবং মূলধন গঠনের জন্য খরচ একত্র করিয়া) ২৩৫৬ কোটি টাকা খরচ করিবে এবং বেসরকারী (private sector) উদ্যোক্তাগণ ১২০০ কোটি টাকা খরচ (সবটাই মূলধন গঠনের জন্য) করিবে।

সরকারী মোট খরচ (total outlay) নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছিল :—

বিষয়	মোট খরচের শতকরা অংশ
1. কৃষি ও তৎসংলগ্ন ব্যাপার এবং সমাজোন্নয়ন (Agriculture etc. and community development)	১৫·১%
2. সেচ (Irrigation)	১৬·৩%
3. প্লাবন নিয়ন্ত্রণ (Flood control)	·৭%
4. শক্তি (Power)	১১·১%
5. গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Village and small industries)	১·৩%
6. বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্প (Large and medium industries)	৬·৩%
7. পরিবহন (Transport)	২১%
8. সংসরণ (Communications)	২·৬%
9. সমাজ-সেবা (Social services)	১৬·৮%
10. পুনর্বাসন (Rehabilitation)	৫·৮%
11. বিবিধ (Miscellaneous)	৩%

কার্যত, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে পাঁচ বৎসরে সরকারী তরফ হইতে মোট ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। বেসরকারী তরফ হইতে পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট টাকা সম্পূর্ণভাবেই খরচ করা হইয়াছিল।

সরকারী মোট খরচের মধ্যে কৃষি ও সমাজোন্নয়নের খাতে ১৪.৮%, শিল্প ও খনিজের খাতে মাত্র ৫%, সমাজসেবায় ২১%, পরিবহন ও সংসরণের খাতে ২৬.৪%, বিবিধের খাতে ৩.৭% কার্যত খরচ করা হইয়াছিল।

১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রচলিত দামের হিসাবে ৮৮৫০ কোটি টাকা (১৯৫০-৫১ সালে) হইতে বাড়িয়া ১০৪৮০ কোটি টাকায় (১৯৫৫-৫৬ সালে) পরিণত হইয়াছিল। অর্থাৎ, জাতীয় আয় পাঁচ বৎসরে শতকরা ১৮ ভাগের বেশী বাড়িয়াছিল। উক্ত ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রচলিত দামের হিসাবে মাথাপিছু আয় পাঁচ বৎসরে ২৪৬ টাকা (১৯৫০-৫১) হইতে বাড়িয়া ২৭৩.৬ টাকায় (১৯৫৫-৫৬ সালে) পরিণত হইয়াছিল।

মোটের উপর বলা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় গড়ে প্রতি বৎসর ৩% করিয়া এবং মাথাপিছু আয় গড়ে প্রতি বৎসর ২% করিয়া বাড়িয়াছিল।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হওয়ার ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ একর বেশী জমিতে কৃষিকার্য আরম্ভ করা সম্ভব হইয়াছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচকার্যের ফলে প্রায় এক কোটি একর বেশী জমিতে কিছুটা উপকার হইয়াছিল। কারখানা শিল্পেরও প্রসার হইয়াছিল। কারখানা শিল্পের উৎপাদন পাঁচ বৎসরে শতকরা ৪৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনও প্রায় দেড়গুণ হইয়াছিল। সিমেন্টের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। সরকারী তরফ হইতে যে সব শিল্পের কারখানা খুলিবার কথা ছিল সেইগুলির পরিকল্পনা শেষ করা হইয়াছিল এবং বেসরকারী বিভাগেও শিল্পের প্রসার হইয়াছিল।

মোটের উপর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সন্তোষজনক হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Second Five-Year Plan)—প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শেষ হইয়াছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে। ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ ইহার কাজ শেষ হয়।

এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল প্রথম পরিকল্পনায় যাহা করা হইয়াছে তাহাকে সুসংগঠিত করা এবং দেশের অগ্রগতির পথ সুগম করা। মোটামুটি-ভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল :—

(১) জাতীয় আয় বছরে অন্তত ৫% হারে বাড়াইয়া জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন ;

(২) দ্রুত শিল্পপ্রসার—বিশেষ করিয়া বৃহৎ এবং ভারী শিল্পের প্রসার ;

(৩) পরিকল্পনাকালে অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে অন্তত ১ কোটি কর্মপ্রার্থীর নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ;

(৪) আয়ের বৈষম্য কমানো এবং আর্থিক সঙ্গতির ন্যায্য বণ্টন।

ইহা হইতেই বোঝা যায় যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোতে দ্রুত শিল্পপ্রসার।

শিল্পের দ্রুত প্রসার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার জন্য প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর-কারী মোট খরচের অনেক বেশী অংশ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। প্রথম পরি-কল্পনায় কৃষি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপার, সমাজোন্নয়ন, সেচ এবং প্লাবননিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী মোট খরচের ৩২·১% অংশ ধার্য করা হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ সব ব্যাপারে সরকারী মোট খরচের মাত্র ২১·৯% অংশ ধার্য করা হয়। আর বৃহৎ, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের (খনিজ সহ) জন্য প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী মোট খরচের মাত্র ৭·৬% অংশ নেওয়া হয়, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী মোট খরচের ১৮·৫% অংশ ধার্য করা হয়।

স্পষ্টই বোঝা যায়, সরকারী উদ্যোগের ঝোঁক বেশী ছিল প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারের দিকে আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের (industries) দিকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্পের খাতে সরকারী খরচের ১২·৯% ধার্য হইয়াছিল। এই সময়ে মৌলিক শিল্পের (basic industries) উন্নয়নের জন্য প্রবল চেষ্টা চলে।

কিন্তু, মৌলিক শিল্প এবং অন্যান্য ভারী শিল্প মূলধন-প্রধান (capital intensive)। ইহাতে খুব বেশী লোক নিযুক্ত হইতে পারে না। অথচ সমগ্র সরকারী ব্যয়ের ফলে সাধারণ ভোগ্য বস্তুর চাহিদা বাড়িবার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই সেই চাহিদা মিটানোর জন্য কুটির শিল্পের প্রসারের দিকে বিশেষভাবে

দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। কুটির শিল্পে বেশী লোক নিয়োগ করিয়া গ্রামাঞ্চলের বেকার লোকের কর্মসংস্থান করার চেষ্টা করাও হয়। এইভাবে কুটির শিল্প যাহাতে ভারী শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য সরকারী মোট খরচের ৪·১% বরাদ্দ করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী (মূলধনগঠনমূলক এবং চলতি এই উভয়বিধ) এবং বেসরকারী (সবটাই মূলধনগঠনমূলক) খরচের মোট পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৮১০০ কোটি টাকা।

ইহার মধ্যে সরকারী খরচের পরিমাণ ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খরচের পরিমাণ ৩৩০০ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছিল।

সরকারী মোট খরচের মধ্যে ৩৮০০ কোটি টাকা মূলধন গঠনের খরচ এবং বাকী ১০০০ কোটি টাকা চলতি খরচ বলিয়া ধার্য হইয়াছিল। সুতরাং মূলধন গঠনের কাজে সরকারী এবং বেসরকারী এই দুই দিক হইতে মোটের উপর ৭১০০ (৩৮০০+৩৩০০) কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ঠিক করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে এই বিষয়ে সরকারী এবং বেসরকারী মোট খরচের সরকারী খরচ ৫৩·৫% এবং বেসরকারী খরচ ৪৬·৫% ধার্য করা হয়।

সরকারী মোট খরচ (মূলধনগঠনমূলক এবং চলতি এই উভয়বিধ) নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করা হয়:—

বিষয়	মোট খরচের শতকরা অংশ
1. কৃষি ও তৎসংলগ্ন ব্যাপার এবং সমাজোন্নয়ন (Agriculture, Forest, Fisheries, Co-operation etc. and Community Development)	১১·৮%
2. সেচ (Irrigation)	৭·৯%
3. প্লাবন নিয়ন্ত্রণ (Flood control)	২·২%
4. শক্তি (Power)	৮·৯%
5. গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Village and small industries)	৪·১%

বিষয়	মোট খরচের শতকরা অংশ
6. বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্প (Large and medium industries)	১২·৯%
7. খনিজ (Minerals)	১·৫%
8. পরিবহন (Transport)	২৭·৩%
9. সংসরণ (Communications)	১·৬%
10. সমাজসেবা (Social services)	১৭·৮%
11. পুনর্বাসন (Rehabilitation)	১·৯%
12. বিবিধ (Miscellaneous)	২·১%

বেসরকারী খরচ নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন খাতে ব্যয় (সবটাই মূলধন গঠনে) করা হইবে বলিয়া আশা করা হয় :—

খাত	ব্যয়ের পরিমাণ
1. কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Agriculture and Village and Small Industries)	৯০০ কোটি টাকা
2. ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিবহন (Private Transport)	১৩৫ কোটি টাকা
3. শক্তি (Power)	৪০ কোটি টাকা
4. শিল্প ও খনিজ (Organised Industries and Mining)	৭২৫ কোটি টাকা
5. গৃহনির্মাণ—বাসগৃহ, দোকানঘর, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি (Construction-houses, shops, schools, hospitals etc.)	১০০০ কোটি টাকা
6. মজুত মালে বিনিয়োগ (Additional investment in stocks)	৫০০ কোটি টাকা
মোট (Total)	৩৩০০ কোটি টাকা

দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে কিছু দিন কাজ চলিবার পর সরকার কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হইল। ১৯৫৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে

কৃষির ভয়ানক ক্ষতি হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ভয়ানক কমিয়া যায় এবং এই সমস্ত দ্রব্যের দাম বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসেরও দাম বাড়ে। ফলে, সরকার বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া উন্নয়নের আশা করিয়াছিল তাহা সম্ভব হইবে না বলিয়া বোঝা গেল। এই আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধির চেয়েও বেশী মারাত্মক হইল উন্নয়নের জন্য বিদেশ হইতে যে সকল অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইতেছিল তাহার অসম্ভাব্য মূল্য-বৃদ্ধি। বিদেশী যন্ত্রপাতির আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির ফলেও বিভিন্ন খাতে সরকারের খরচের পরিমাণ যথানির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী হইতে লাগিল। পরিকল্পনা কমিশন বুঝিতে পারিল যে পুর্বনির্দিষ্ট বস্তুসমূহের নিশানা (physical targets) ঠিক রাখিতে হইলে ৪৮০০ কোটি টাকার বেশী খরচ করিতে হইবে। কিন্তু আর একটি বিশেষ বাধার জন্য সরকারের পক্ষে পুর্বনির্দিষ্ট ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ করাও সম্ভব হইবে না বলিয়া বোঝা গেল। সেই বিশেষ বাধাটি হইল এই যে, বিদেশে মালপত্র বিক্রয় করিয়া ভারত যে পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছিল সেই অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই, কারণ মালপত্র সেই রকম ভাবে বিদেশে বিক্রয় হয় নাই। বৈদেশিক সাহায্যও আশানুরূপ ভাবে পাওয়া যায় নাই।

এই জন্য ১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি পুনর্বিবেচনা করিয়া কিছুটা রদবদল করে।

বেসরকারী খরচের আনুমানিক পরিমাণ (৩৩০০ কোটি টাকা) ঠিকই রাখা হয়। কিন্তু সরকারী খরচের মোট পরিমাণ পুর্বনির্দিষ্ট ৪৮০০ কোটি টাকা হইতে কমাইয়া ৪৫০০ কোটি টাকায় ধার্য করা হয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে বস্তুগত নিশানা (physical targets) অধিক অনুপাতে কমাইতে হয়। তবে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের নিশানা না কমাইয়া বরং বাড়ানো হয়।

পরিবহন এবং সংসরণের খাতে যে পরিমাণ সরকারী অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা প্রায় ঠিক রাখা হয়। কিন্তু অন্য সব খাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কিছু কিছু কমানো হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে যাহা মূল (core) বলিয়া পরিগণিত হয়—অর্থাৎ ইস্পাত ও কয়লা—তাহার উৎপাদনের নিশানা ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়। শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাহা শিল্পের

জন্য অপরিহার্য নয় এই ধরণের কয়েকটি প্রস্তাব (project) বাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে যাহা উন্নতি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষণ করা যায় :—

১৯৫৭-৫৮ সালে প্রচলিত দামের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয় হইয়াছে ১৩৩১০ কোটি টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালের দামের হিসাবে রূপান্তরিত করিলে ১৯৫৫-৫৬ সালের জাতীয় আয় দাঁড়ায় ১১০১০ কোটি টাকায়। সুতরাং জাতীয় আয় পাঁচ বছরে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় ৪% বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রচলিত দামের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালে মাথাপিছু আয় ৩০৪ টাকা হইয়াছে। ঐ হিসাবে রূপান্তরিত করিলে ১৯৫৫-৫৬ সালের মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৭ টাকা। সুতরাং পাঁচ বছরে মাথাপিছু আয় ১৭ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ বছরে গড়ে শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকসংখ্যা হঠাৎ খুব বাড়িয়া না গেলে (১৯৫৫-৫৬ সালে ৩৮ কোটি ৩০ লক্ষ, আর ১৯৬০-৬১ সালে ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ) মাথাপিছু আয় অনেক বেশী হারে বাড়িত।

১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপন্ন জিনিসপত্রাদির সহিত ১৯৬০-৬১ সালে উৎপন্ন জিনিসপত্রের পরিমাণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বাড়িয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে পাঁচ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৪%, তুলার উৎপাদন ২৮%, ইস্পাতের উৎপাদন ১০০%, মোটর গাড়ীর উৎপাদন ১১১%, রেল ইঞ্জিনের উৎপাদন ১২৯% এবং সিমেন্টের উৎপাদন ২০২% বাড়িয়াছে।

সঞ্চয়ের হারও বাড়িয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়ের ৭·৩% সঞ্চয় করা হইত, ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয়ের ৮·৫% সঞ্চয় করা হইয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Third Five-Year Plan)— তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল হইল ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ।

নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়কে প্রধান উদ্দেশ্য (principal aims) হিসাবে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

(ক) জাতীয় আয় প্রতিবৎসর শতকরা অন্তত ৫ হারে বাড়াইতে

হইবে। এমন ভাবে নূতন মূলধন স্থষ্টি করা হইবে যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার যেন ভবিষ্যতেও ইহার চেয়ে কম না হয়।

(খ) যাহাতে সকলে সমানভাবে আয় বাড়াইবার স্থযোগ (opportunity) পায় ক্রমান্বয়ে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। বিভিন্ন লোকের আয় ও ধনৈশ্বর্যের মধ্যে যে বৈষম্য (inequality) আছে তাহা হ্রাস করা হইবে।

(গ) খাদ্যশস্যের উৎপাদন এমনভাবে বাড়ানো হইবে যে ভারত এই বিষয়ে ১৯৬৬ সালের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficient) হইবে। কৃষিজাত অন্যান্য জিনিসেরও উৎপাদন বাড়াইয়া একই সঙ্গে দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কাঁচা মাল সরবরাহ করা হইবে আবার বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় ক্রমবর্ধমান রপ্তানির ব্যবস্থাও করা হইবে।

(ঘ) ইস্পাত (steel), রাসায়নিক দ্রব্য (chemicals), তাপ-উৎপাদক দ্রব্য (fuel), শক্তি (power), যন্ত্রপাতির নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন এমন ভাবে বাড়ানো হইবে যে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মধ্যে) প্রধানত দেশে উৎপন্ন জিনিসপত্রাদির দ্বারাই ভারতকে আরও বেশী শিল্পসমৃদ্ধ (further industrialised) করা যাইবে।

(ঙ) এই পাঁচ বৎসরে যে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক কাজ খুঁজিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে তাহার মধ্যে ৩৫ লক্ষ কৃষিকার্যে আয়ের উপায় অবলম্বন করিবে এবং অন্তত ১ কোটি ৫ লক্ষ বেকারকে কৃষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য কার্যে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে। ৩০ লক্ষ লোককে হয়ত বেকারই থাকিতে হইবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী (মূলধনগঠনমূলক এবং চলতি এই উভয়বিধ) এবং বেসরকারী (সবটাই মূলধনগঠনমূলক) খরচের মোট পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১১৬০০ কোটি টাকা।

ইহার মধ্যে সরকারী (public sector) খরচের পরিমাণ ৭৫০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী (private sector) খরচের পরিমাণ ৪১০০ কোটি টাকা।

সরকারী খরচের মোট পরিমাণ ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকা মূলধন গঠনের (investment) জন্য এবং ১২০০ কোটি টাকা চলতি (current) খরচ।

বেসরকারী খরচের সবটাই অর্থাৎ ৪১০০ কোটি টাকা মূলধন গঠনের জন্য

ব্যয় করা হইবে। সুতরাং মূলধন গঠনের কাজে মোট ১০৪০০ (৬৩০০+৪১০০) কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

সরকারের মূলধনগঠনমূলক কাজের জন্য নির্দিষ্ট ৬৩০০ কোটি টাকার ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী মালিকানার প্রতিষ্ঠানে সাহায্যস্বরূপ দেওয়া হইবে। সুতরাং বেসরকারী মালিকানায় মোট ৪৩০০ (৪১০০+২০০) কোটি টাকার মূলধন গঠিত হইবে বলিয়া ধার্য হইয়াছে। তবে বেসরকারী মালিকেরা নিজেরা ইহার ৪১০০ কোটি টাকা যোগাড় করিবে। বাকি ২০০ কোটি টাকা সরকার দিবে।

সরকারের মোট খরচ (মূলধনগঠনমূলক এবং চলতি) ৭৫০০ কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইয়াছে :—

খাত	মোট টাকার শতকরা হার		
	মূলধনগঠন-মূলক	চলতি খরচ	মোট হার
1. কৃষি, ছোট ছোট সেচের কাজ এবং সমাজোন্নয়ন (Agriculture, minor irrigation and community development)	৯·৭%	৪·৬%	১৪·৩%
2. মাঝারি এবং বড় ধরণের সেচ-ব্যবস্থা (Medium and major irrigation)	৮·৬%	·১%	৮·৭%
3. শক্তি (Power)	১৩%	—	১৩%
4. গ্রামীণ শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Village and small industries)	২·২%	১·২%	৩·৪%
5. বৃহদায়তন শিল্প এবং খনিজ (Industry and minerals)	২১%	—	২১%
6. পরিবহন এবং সংসরণ (Transport and communications)	১৯·৬%	—	১৯·৬%
7. সমাজসেবামূলক কার্য (Social services)	৮%	৮%	১৬%
8. জমা মাল (Inventories)	২·৭%	—	২·৭%
9. বিবিধ (Miscellaneous)	১·৩%	—	১·৩%

তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সরকারী খরচের মোট পরিমাণ ৭৫০০ কোটি টাকা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আছে :—

উপায়	টাকার পরিমাণ
1. চলতি করসমূহের ভিত্তিতে রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত (Balance from the revenues on the basis of existing taxation)	৩৮৪ কোটি টাকা
2. রেলওয়ের উদ্বৃত্ত হইতে চলতি প্রাপ্তির ভিত্তিতে প্রাপ্য (Contributions from the Railways on the existing basis)	১০৮ কোটি টাকা
3. রেলওয়ে ব্যতীত অন্যান্য সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে চলতি আয়ের ভিত্তিতে প্রাপ্য (Surpluses of other public enterprises on the existing basis)	৪৪৯ কোটি টাকা
4. নূতন কর এবং সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা (Additional taxation and measures to increase the surplus of public enterprises)	১৭৫৭ কোটি টাকা
5. দেশের লোকের নিকট হইতে মোটা রকমের ঋণ (Loans from the public)	৮৫০ কোটি টাকা
6. দেশের লোকের নিকট হইতে স্বল্পাকারে সঞ্চয় মারফৎ ঋণ (Small savings)	৫৮৫ কোটি টাকা
7. প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি হইতে (Provident Funds, Betterment Levies, Steel Equalisation Fund and Miscellaneous Capital Receipts)	৬১৭ কোটি টাকা
8. প্রধানত ঋণ এবং কতকাংশে দান বাবদ প্রাপ্য বৈদেশিক সাহায্য (Budgetary receipts corresponding to external assistance)	২২০০ কোটি টাকা
9. বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত নোট ছাপানো (Deficit financing)	৫৫০ কোটি টাকা

মোট— ৭৫০০ কোটি টাকা

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনার নির্দেশ অনুসারে সরকারের যে সকল অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিতে হইবে সেইগুলির চলতি দাম ধরিয়া দেখা যায় যে সরকারের খরচ করিতে হইবে অন্তত ৮০০০ কোটি টাকা। কিন্তু যে অর্থ সংগ্রহ করার কথা হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ হইল মাত্র ৭৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং, সরকারের যে অর্থ প্রয়োজন এবং যে অর্থ সংগ্রহ করার সম্ভাবনা দেখানো হইয়াছে তাহার মধ্যে ৫০০

কোটি টাকার ব্যবধান (gap) রহিয়াছে। তবে পরিকল্পনাকারিগণ মনে করেন যে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলিতে থাকিলে সরকার উপরোক্ত ৫০০ কোটি টাকাও সংগ্রহ করিতে পারিবে।

বেসরকারী খরচের (private sector outlay) সবটাই মূলধন গঠনে বিনিয়োগ করা হইবে। তাহাদের মোট খরচ ৪১০০ কোটি টাকা নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে :—

খাত	মোট টাকার শতকরা হার
1. কৃষি, ছোট ছোট সেচের কাজ এবং সমাজোন্নয়ন (Agriculture, minor irrigation and community development)	১৯·৭%
2. মাঝারি এবং বড় ধরণের সেচ ব্যবস্থা (Medium and major irrigation)	०
3. শক্তি (Power)	১·২%
4. গ্রামীণ শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Village and small industries)	৭·৫%
5. বৃহদায়তন শিল্প এবং খনিজ (Industry and minerals)	২৫·৬%
6. পরিবহন এবং সংসরণ (Transport and communications)	৬%
7. সমাজসেবামূলক কার্য (Social services)	২৬%
8. জমা মাল (Inventories)	১৪%
9. বিবিধ (Miscellaneous)	०

আর্থিক উন্নয়নের ব্যাপারে, যে মূলধন গঠিত হইবে তাহার গুরুত্বই বেশী ; চলতি খরচের গুরুত্ব খুব বেশী নয়।

সরকারী (public sector) এবং বেসরকারী (private sector) এই উভয়বিধ মালিকানায় মোট যে পরিমাণ অর্থ মূলধন গঠনের জন্য বিনিয়োগ (investment) করা হইবে তাহা বিভিন্ন খাতে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে :—

খাত	মূলধন গঠনের জন্য বিনিয়োগ করা মোট অর্থের শতকরা হার
1. কৃষি, ছোট ছোট সেচের কাজ এবং সমাজোন্নয়ন (Agriculture, minor irrigation and community development)	১৪%
2. মাঝারি এবং বড় ধরণের সেচ ব্যবস্থা (Medium and major irrigation)	৬·২%
3. শক্তি (Power)	১০·৩%
4. গ্রামীণ শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Village and small industries)	৪·২%
5. বৃহদায়তন শিল্প এবং খনিজ (Industry and minerals)	২৪·৩%
6. পরিবহন এবং সংসরণ (Transport and communications)	১৬%
7. সমাজসেবামূলক কার্য (Social services)	১৬%
8. জমা মাল (Inventories)	৮%
9. বিবিধ (Miscellaneous)	১%

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছে যে মাথাপিছু আয় পাঁচ বৎসরে ১৭% অর্থাৎ গড়ে বছরে ৩% বাড়িবে। ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রচলিত দামের হিসাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে মাথাপিছু আয় ৩৫৭ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বস্তুগত নিশানা (physical target) যাহা ঠিক করা হইয়াছে তাহাতে বোঝা যায় যে ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৩%, কয়লার উৎপাদন ৮৩%, ইস্পাতের উৎপাদন ১৬৫%, মোটর গাড়ীর উৎপাদন ৮৭% বাড়িবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা যাইবে বলিয়া কোন রকম আশা পোষণ করা হয় নাই। পরিকল্পনার কার্যকালে অর্থাৎ ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে সমগ্র ভারতে অন্তত ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক কর্মপ্রার্থী হইবে।

ইহাদের মধ্যে ৩৫ লক্ষ লোক জমি চাষের কাজে, ৭'২০ লক্ষ লোক বন-বিভাগের কাজে এবং মৎস্যচাষ প্রভৃতি কাজে, ৯ লক্ষ লোক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কাজে, ২৩ লক্ষ লোক রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদি তৈয়ারির কাজে, ১'৫ লক্ষ লোক সরকারী চাকুরীতে, ১'৪০ লক্ষ লোক রেলপথের কাজে, ৭'৫০ লক্ষ লোক বৃহদায়তন শিল্প ও খনির কাজে, ১লক্ষ লোক সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে, ৮'৮০ লক্ষ লোক সংসরণ এবং রেলপথ ব্যতীত অন্যান্য পরিবহনের কাজে, ৫'৯০ লক্ষ লোক শিক্ষাদানের কাজে, ১'৪০ লক্ষ লোক স্বাস্থ্যবিষয়ক কাজে এবং ৩৮'৬০ লক্ষ লোক কেনাবেচা প্রভৃতি বাণিজ্য বিষয়ক কাজে এবং অন্যান্য নানা রকমের কাজে বহাল হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। কিন্তু এই আশা পুরণ হইলেও মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। বাকী ৩০ লক্ষ লোক বেকার জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে।

প্রশ্ন

1. Point out the defects of India's economic development during British rule.

(ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির ত্রুটিগুলি নির্দেশ কর।) [১১১-১১২ পৃষ্ঠা]

2. Discuss the defects of Indian agriculture and suggest remedies.

(ভারতীয় কৃষির ত্রুটিগুলি বর্ণনা কর এবং সংশোধনের উপায়ের ইঙ্গিত দাও।)

[১১৪-১১৩ পৃষ্ঠা]

3. Indicate the importance of the village and small-scale industries in our economy. What measures would you suggest so that they may develop side by side with our large-scale industries? (Higher Secondary Examination, 1960)

(আমাদের দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির গুরুত্ব নির্দেশ কর। এইগুলি যাহাতে আমাদের দেশের বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত মনে কর?) [৭২-৭৩, ৯৪-৯৫, ১০৮-১০৯, ১১৬-১১৯ পৃষ্ঠা]

4. Estimate the place of small-scale and cottage industries in the economy of India. How would you propose to plan the future development of such industries? (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960.)

(ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্পের স্থান নির্দেশ কর। এই ধরণের শিল্পের উন্নয়নের জন্য কি রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত?) [৭২-৭৩, ৯৪-৯৫, ১০৮-১০৯, ১১৬-১১৯ পৃষ্ঠা]

5. Discuss the importance of basic industries in the industrial development of India.

(ভারতে শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে মৌলিক শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর।) [১০৮, ১১৯-১২০ পৃষ্ঠা]

6. What measures would you suggest for the development of industries in India ?

(ভারতে শিল্পের উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত ?) [১০৮-১০৯, ১১৮-১২১ পৃষ্ঠা]

7. Explain the Industrial Policy of the Government of India.

(ভারত সরকারের শিল্পনীতি বিশ্লেষণ কর।) [১২০-১২১ পৃষ্ঠা]

8. Give a brief account of the aims and objectives of India's Five-Year Plans. (Higher Secondary Examination, 1960)

(সংক্ষেপে ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।) [১২৩-১২৯ পৃষ্ঠা]

9. Distinguish between 'Investment' and 'Current Outlay' mentioned in the Five-Year Plans of India.

(ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে যে "মূলধন বিনিয়োগ" এবং "চলতি খরচের" উল্লেখ আছে তাহার পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।) [১৩০ পৃষ্ঠা]

10. Describe the main provisions of India's First Five-Year Plan. How far did the First Plan attain success ?

(ভারতীয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বর্ণনা কর। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি কতটা সফল হইয়াছিল ?) [১৩০-১৩২ পৃষ্ঠা]

11. Sketch the outline of India's Second Five-Year Plan. How did it differ from the First Five-Year Plan ?

(ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সহিত ইহার পার্থক্য কিরূপ ছিল ?) [১৩২-১৩৭ পৃষ্ঠা]

12. Discuss the achievements of the Second Five-Year Plan.

(দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য আলোচনা কর।) [১৩৫-১৩৭ পৃষ্ঠা]

13. Describe India's Third Five-Year Plan and point out its principal aims and targets.

(তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিবরণ দাও এবং ইহার প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও নিশানাগুলি উল্লেখ কর।) [১৩৭-১৪৩ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

সরকারী আয়ব্যয়

(Government Finances)

সরকারের অর্থব্যয় (Public Expenditure)—সকল দেশের সরকারকেই নানারকম কাজ করিতে হয়। এই কাজগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলি কাজ হইল সংরক্ষণমূলক। সেনাবাহিনী,

নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী রাখিয়া বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হয়। পুলিশ, আদালত এবং জেলখানার ব্যবস্থা করিয়া দেশের মধ্যে ন্যায় ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়। বিভিন্ন রকমের কর্মচারী রাখিয়া অগ্নিকাণ্ড, ঝড় এবং অন্যান্য দুর্যোগের কবল হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

সরকারের অন্য কতকগুলি কাজ হইল উন্নয়নমূলক—যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার বেসরকারী কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করা ছাড়া নিজের মালিকানাস্বত্বেও প্রতিষ্ঠান চালু করিতে পারে।

এই সব নানারকম কাজের জন্য সরকারের অর্থ ব্যয় করিতে হয়। অর্থাগমের উপায় দুইটি—বিভিন্ন উপায়ে উপার্জন এবং দরকার অনুসারে ঋণগ্রহণ।

সরকারের আয়ের রকম-ভেদ (Classification of Public Income)—সরকার যখন কোন ব্যবসায় চালায়—যেমন, ট্রেন কিংবা এরোপ্লেনে যাতায়াতের ব্যবসায়, পোস্টকার্ড প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবসায়, জল অথবা জলবিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি—তখন সরকার সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের নীতি অনুসারে ক্রয়বিক্রয়ের কার্য চালায় এবং লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নেয়। সরকারের উৎপন্ন দ্রব্য যে ক্রয় করে তাহাকে দাম দিতে হয়, যে ক্রয় করে না তাহাকে দাম দিতে হয় না। ডাকবিভাগের কথাই ধরা যাক। সরকার চিঠিপত্র, পার্সেল ইত্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করে। যে এই সুবিধা গ্রহণ করিতে চায় তাহাকে একটা নির্দিষ্ট দাম দিতে হয়। সরকার যে টাকা পায় তাহা হইতে এই বিভাগের খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা তাহার লাভ হয়। এই ভাবে সরকার কিছু আয় করে। অবশ্য লোকসানও হইতে পারে। যাহাই হউক, এই সব ব্যাপারে যে আয় হয় তাহা দামের (price) মাধ্যমে হয়। ইহাকে সাধারণ ব্যবসায়ীর আয়ের মতই গণ্য করা যায়।

সরকারের আর এক রকম আয়ও অনেকটা কাজ বিক্রয় করিয়া আয়ের মত। কোন বিশেষ লোকের জন্য কোন বিশেষ একটি কাজ করিয়া দিয়া সরকার সেই লোকের নিকট হইতে কিছু অর্থ আদায় করিল। এই কাজ করিতে যাহা খরচ পড়িয়াছে ঠিক তাহাই আদায় করা হইল, বেশী কিছু আদায়

করিয়া লাভের ব্যবস্থা করা হইল না। এই রকম আয়কে ফি (fee) বলে। যেমন, কোর্ট ফি। সরকার মামলা-মকদ্দমার বিচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই জন্য বিচারক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন, বাড়ীভাড়া, কাগজপত্রের দাম ইত্যাদি বাবদ সরকারের কিছু খরচ হয়। যাহারা বিচারকার্যের সুযোগ গ্রহণ করে তাহাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায় করিয়া সরকার এই খরচ তুলিতে চেষ্টা করে। তবে, এ বিষয়ে শুধুমাত্র খরচের টাকাই যাহাতে ওঠে সরকার তাহাই দেখে, কিছু লাভ করিতে চায় না। কোর্ট ফি আদায় করিয়া সরকার এই টাকা তোলে। ইহা বিশেষ বিশেষ লোকের জন্য (মকদ্দমাকারীর জন্য) বিশেষ বিশেষ কাজ (বিচারকার্য) করার বিনিময়ে পাওয়া গেল। এক দিক হইতে দেখিলে ইহা ব্যবসায়ক্ষেত্রের আয়ের মত মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা ভুল। ব্যবসায়ক্ষেত্রে লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দাম ঠিক করা হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ কাজটি করার জন্য যখন যাহা খরচ হয় বলিয়া বিবেচনা করা হয় কেবলমাত্র তাহাই দাম (এক্ষেত্রে ফি) বলিয়া ধার্য হয়, মুনাফার জন্য চেষ্টা করা হয় না।

নির্দিষ্ট কোন বিশেষ একটি কাজের জন্য নহে, সামগ্রিকভাবে সরকারের যাবতীয় কাজের জন্য দেশের লোকদের নিকট হইতে যে টাকা আদায় করা হয় তাহাকে কর (tax) বলা হয়।

ধনতান্ত্রিক সরকারের প্রধান আয় 'কর' হইতে। ধনতান্ত্রিক সরকার ব্যবসায় হইতে বেশী আয় করে না, ফি হইতে আয় ত খুবই কম। সেই জন্য, সরকারী আয় বলিলে অনেকে কর বসাইয়া যাহা আয় হয় তাহাই বোঝে। কর কোন বিশেষ কাজের বিনিময়ে আদায় করা হয় না। কোন কাজ নির্দিষ্ট না করিয়া সকল রকম কাজের বিনিময়ে ইহা আদায় করা হয়।

করের নীতি (Principle of Taxation)—সরকার কোন্ নীতি অনুসারে কর আদায় করিবে? অর্থাৎ, দেশের লোকদের মধ্যে করভার কি ভাবে বণ্টন করা হইবে? ধরা যাক, একটি দেশের লোকসংখ্যা এক কোটি এবং সরকারের একশত কোটি টাকা কর আদায় করা দরকার। সরকার প্রত্যেকের নিকট হইতে ১০০৲ আদায় করিতে পারে। কিন্তু, তাহা হইলে একজন কোটিপতিও ১০০৲ দিবে—ইহাতে তাহার তেমন কোন ক্ষতি হইবে না; আবার নিঃস্ব একজন লোককেও যে ভাবে হউক ১০০৲ দিতে

হইবে—ইহাতে তাহার ক্লেশের অন্ত থাকিবে না। এই সব কথা বিবেচনা করিয়া মনীষিগণ বলেন যে সম্পত্তি ও আয় অনুসারে যাহার যে রকম সামর্থ্য (ability) তাহার নিকট হইতে সেই রকম কর আদায় করা উচিত। কিন্তু এই সামর্থ্যের পরিমাণ সম্বন্ধেও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে।

ক্রমবর্ধমান হার (Progressive Rate)—পঁচিশ হাজার টাকার মালিকের সামর্থ্য কি এক হাজার টাকার মালিকের সামর্থ্যের মাত্র পঁচিশ গুণ, না পঁচিশের চেয়ে বেশী গুণ? প্রত্যেকেরই বাঁচিয়া থাকার জন্য কতকগুলি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই জিনিসগুলি (অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি) এক হাজার টাকার মালিকেরও যে পরিমাণ প্রয়োজন, পঁচিশ হাজার টাকার মালিকেরও সেই পরিমাণ প্রয়োজন, বেশী নয়। অথচ এই প্রয়োজন মিটাইতেই হাজার টাকার মালিক গলদ্‌ঘর্ম হয়, তাহার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এই সব প্রয়োজন স্বচ্ছন্দে মিটাইয়াও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত রাখা সম্ভব। তাহার উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রথমোক্ত ব্যক্তির উদ্বৃত্তের পরিমাণের পঁচিশ গুণের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। সুতরাং সরকারকে দেওয়ার সামর্থ্যও তাহার পঁচিশ গুণের চেয়ে বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

সেই জন্য সাধারণত অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, একজন লোকের তুলনায় আর একজন লোকের সম্পত্তি এবং আয় যত গুণ, কর দেওয়ার ক্ষমতা তাহার চেয়ে বেশী গুণ আছে। অর্থাৎ হাজার টাকার মালিকের নিকট হইতে যদি শতকরা দুই টাকা হারে কর আদায় করা হয় তাহা হইলে পঁচিশ হাজার টাকার মালিকের নিকট হইতে শতকরা দুইয়ের বেশী (ধরা যাক, তিন কি চার) টাকা হারে কর আদায় করা উচিত। এইরূপ করিলে দ্বিতীয় লোকটির মোট কর প্রথম লোকটির মোট করের পঁচিশ গুণের চেয়ে বেশী হইবে। এই রকম করের হারকে ক্রমবর্ধমান হার (progressive rate) বলে।

আজকাল প্রায় সকল দেশেই প্রযোজ্য স্থলে ক্রমবর্ধমান হারের রীতি গৃহীত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে সামর্থ্যের নীতি (principle of ability) এই রীতির দ্বারাই সফল করা যায়।

ক্রমহ্রাসমান হার (Regressive Rate)—মুস্কিল এই যে ক্রমবর্ধমান হারের রীতি সর্বত্র প্রয়োগ করা যায় না। লবণ করের কথা ধরা যাক।

সের প্রতি ২ পয়সা হারে লবণের উপর কর বসানো হইল। এখন, পঁচিশ হাজার টাকার মালিক ত আর এক হাজার টাকার মালিকের চেয়ে বেশী লবণ খায় না। দুই জনই হয়ত এক সের লবণ খায়। তাহা হইলে দুইজনই দুই পয়সা করিয়া কর দিল। ইহাতে বিত্তের হিসাবে এক হাজার টাকার মালিককে যে হারে কর দিতে হইল পঁচিশ হাজার টাকার মালিককে তাহার চেয়ে অনেক কম হারে কর দিতে হইল।

করের এই রকম হারকে ক্রমহ্রাসমান হার (regressive rate) বলা হয়। বাধ্য হইয়া সরকারকে এই হারও প্রচলিত রাখিতে হয়। ইহা বন্ধ করিতে হইলে দেশের প্রত্যেক লবণের দোকানে কর্মচারী রাখিয়া ক্রেতার বিত্তের পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ণয় করাইয়া কর ধার্য করাইতে হয়। কিন্তু তাহা ত আর সম্ভব নয়। লোকের হয়রানির অন্ত থাকে না। আবার লবণকর বাবদ যে আয় হয় আদায়কারীদের বেতন বাবদ তাহার চেয়ে অনেক বেশী খরচ হয়। কোন দেশেই এ রকম হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি করা হয় না। কথা উঠিতে পারে যে, যে সব করে ক্রমহ্রাসমান হার ছাড়া অন্য কোন হার প্রযোজ্য নহে সে সব কর বসানো হয় কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সরকারের এত বেশী আয়ের প্রয়োজন যে করের সবগুলি উৎসই কাজে লাগাইতে হয়। তাহা ছাড়া, সামর্থ্যের নীতি অনুসারে এইসব কর বর্জনীয় মনে হইলেও অন্য দুই একটি কারণে গ্রহণযোগ্য। যেমন, এইসব কর টের পাওয়া যায় না বলিয়া যাহারা দেয় তাহাদের গায়ে লাগে না। এইসব কর আদায় করিতেও খরচ কম পড়ে।

সমহার (Equal Rate)—বিত্তনিরপেক্ষভাবে যদি একই হারে কর আদায় করা হয় তাহা হইলে সেই হারকে সমহার (equal rate) এবং দেয় মোট করকে সমানুপাতিক কর (proportional tax) বলা হয়। যদি এক হাজার টাকার মালিক মোট কুড়ি টাকা, এবং পঁচিশ হাজার টাকার মালিক মোট পাঁচশত টাকা (দুইজনেই শতকরা দুই টাকা হারে) কর দেয় তাহা হইলে তাহারা সমহারে কর দিল এবং তাহাদের মোট কর সমানুপাতিক হইল।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Taxes)—কোন কোন করের বেলায়, সরকার যাহার নিকট হইতে কর আদায় করে সে আবার অন্যের নিকট হইতে ঐ কর বাবদ দেয় অর্থ আদায় করিয়া নিজের

ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়। যেমন, বিক্রয় কর (sales tax)। সরকার বিক্রেতা দোকানদারের নিকট হইতে কর আদায় করে, কিন্তু দোকানদার আবার ইহা ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করে। এক্ষেত্রে করের ভার বহন করিল শেষ পর্যন্ত ক্রেতা। কিন্তু সে ইহা সোজাসুজি সরকারকে দিল না, দোকানদারের মাধ্যমে দিল। সরকারকে কর দিল দোকানদার। কিন্তু দোকানদার ইহা ক্রেতার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারিল। এইরূপ করকে অপ্রত্যক্ষ কর (indirect tax) বলে।

কিন্তু, কোন কোন করের বেলায়, সরকার যাহার নিকট হইতে কর আদায় করে সে নিজেই ইহার ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, অন্যের উপর চাপাইতে পারে না। যেমন আয় কর (income tax)। যাহাদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী আয় আছে তাহাদের এই কর দিতে হয়। আমাদের দেশে আজকাল কৃষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য ভাবে যাহার বাৎসরিক আয় ৩০০০ টাকার বেশী তাহাকে আয় কর দিতে হয়। সরকার এইরকম লোকের নিকট হইতে কর আদায় করে। করদাতা নিজেই ইহার ভার বহন করিতে বাধ্য হয়। সে অন্য কোন লোকের নিকট হইতে ইহা আদায় করিয়া নিজের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারে না। এক্ষেত্রে সরকার যাহার নিকট হইতে কর আদায় করিল সে নিজেই ইহার ভার বহন করিল, অন্য কাহারও উপর ভার চাপাইতে পারিল না। যে করের ভার বহন করিল সেই সরাসরিভাবে ইহা সরকারকে দিল। এই রকম করকে প্রত্যক্ষ কর (direct tax) বলে।

যে সব করের বেলায় করদাতা নিজেই ইহার ভার বহন করে সেই সব কর প্রত্যক্ষ। যে সব করের বেলায় করদাতা নিজে ইহার ভার বহন করে না, অন্য লোক ইহার ভার বহন করে, সেই সব কর অপ্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ করের গুণাগুণ (Merits and Defects of Direct Taxes)—প্রত্যক্ষ করের প্রধান গুণ হইল এই যে এই করের বেলায় ক্রমবর্ধমান হার (progressive rate) প্রয়োগ করা যায়। তাহার ফলে সামর্থ্য (ability) অনুসারে করের ভার বণ্টন করা যায়। সামর্থ্য অনুসারে কর আদায় করা হইল করস্থাপনের প্রধান নীতি। প্রত্যক্ষ কর দ্বারা এই নীতিটি যথাযথভাবে পালন করার উপায় আছে। পরোক্ষ কর দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। পরোক্ষ কর স্থাপন করিলে সামর্থ্যের নীতিটির ঠিক বিপরীত নীতি—অর্থাৎ যাহার সামর্থ্য যত বেশী তাহার নিকট হইতে তত কম হারে

কর আদায়—অবলম্বন করিতে হয় ; কারণ পরোক্ষ করের বেলায় ক্রমহ্রাসমান হার (regressive rate) ছাড়া অন্য কোন হার প্রয়োগ করার উপায় নাই। আয় করের (income tax) দ্বারা সামর্থ্য-নীতি পালন করা যায়, লবণ করের (salt tax) দ্বারা এই নীতির বিপরীত নীতি গ্রহণ করিতেই হয়।

প্রত্যক্ষ করের আর একটি গুণ হইল এই যে ইহার মধ্যে নিশ্চয়তা (certainty) আছে। করদাতারা সোজাসুজি টের পায় তাহাদের কি পরিমাণ কর দিতে হইতেছে এবং হইবে। তাহারা ইহা পরিষ্কারভাবে জানে বলিয়া নিজেদের জীবনযাত্রার খরচও যথাযথভাবে ঠিক করিয়া লইতে পারে।

প্রত্যক্ষ করের বেলায় করদাতারা নিজেদের দেয় করের সম্বন্ধে সচেতন থাকে বলিয়া প্রত্যক্ষ করের একটি রাজনৈতিক সুফল আছে। করদাতারা সরকারের খরচ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। যাহাতে তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ সরকার বেপরোয়া ভাবে খরচ না করে সেই উদ্দেশ্যে করদাতারা সরকারের কার্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে। ইহাতে গণতন্ত্রের পদ্ধতি উন্নত হয়।

প্রত্যক্ষ করের একটি অসুবিধা হইল এই যে ইহার জন্য করদাতারা সরকারের প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠে। ইহা সোজাসুজি গায়ে লাগে। সেই জন্য করদাতারা সরকারের প্রতি রুষ্ট হইয়া ওঠে।

প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিলে সরকারের আর একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সোজাসুজি ভাবে করের আক্রমণ টের পায় বলিয়া করদাতারা প্রত্যক্ষ কর এড়াইতে (evade) চেষ্টা করে। তাহারা কর ফাঁকি দেওয়ার নানারকম উপায় খুঁজিয়া বাহির করে। অনেক সময়ে সরকারের পক্ষে এই সব উপায় বন্ধ করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আয় কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য অনেকে যে মিথ্যা হিসাব দাখিল করে তাহার মধ্যে গলদ ধরা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। করদাতারা ফাঁকি দিতে চাহে এবং পারে বলিয়া প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সরকারের আয় আশানুরূপ পরিমাণে হয় না।

প্রত্যক্ষ করের আর একটি অসুবিধা হইল এই যে ইহার দ্বারা দেশের সকল লোকের নিকট হইতে কর আদায় করা যায় না। বহু লোক প্রত্যক্ষ করের আওতার বাহিরে থাকে। অথচ তাহারাও সরকারের কার্যাবলীর সুবিধা

ভোগ করে এবং সেই জন্য তাহাদেরও কিছু পরিমাণ কর দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর দ্বারা তাহাদের ধরা ছোঁয়া যায় না।

পরোক্ষ করের গুণাগুণ (**Merits and Defects of Indirect Taxes**)—পরোক্ষ করের প্রধান গুণ হইল এই যে করদাতারা ইহার আক্রমণ সোজাসুজি ভাবে টের পায় না বলিয়া সরকারের প্রতি তেমন রুষ্ট হইয়া ওঠে না। বাস্তবিক পক্ষে, এই জন্যই সরকার পরোক্ষ করের পক্ষপাতী।

ইহার আর একটি গুণ হইল এই যে করদাতাদের খুব গায়ে লাগে না বলিয়া তাহারা ইহা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে না। অবশ্য চেষ্টা করিলেও ইহা এড়ানো যায় না। ফলে, সরকার আশানুরূপ কর আদায় করিতে পারে।

পরোক্ষ করের মাধ্যমে দেশের সকল লোকের নিকট হইতেই কর আদায়ের ব্যবস্থা করা যায়। পরোক্ষ করের ইহাও একটি গুণ।

পরোক্ষ করের প্রধান দোষ হইল এই যে ইহার ফলে ধনীরা কম হারে এবং গরীবেরা বেশী হারে কর দিতে বাধ্য হয়। ইহার দ্বারা সামর্থ্য-নীতির ঠিক বিপরীত একটি নীতি অবলম্বন করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এই দোষ আছে বলিয়াই অর্থনীতিবিদগণ সাধারণত পরোক্ষ কর সমর্থন করেন না।

পরোক্ষ করের আর একটি ত্রুটি হইল এই যে করদাতারা যে কর দিতেছে তাহা তীব্রভাবে অনুভব করে না বলিয়া সরকারী ব্যয়ের প্রতি উদাসীন থাকে। ফলে সরকারী ব্যয়ের তেমন কঠিন সমালোচনা হয় না। ইহাতে গণতন্ত্রের উন্নতি ব্যাহত হয়।

উভয়ের গুণাগুণ বিচার করিয়া বলা যায়, পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ কর ভাল। তবে আয় বাড়াইবার জন্য প্রত্যেক সরকারই দুই ধরণের করই বসায়।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত, ভারত সরকারের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। ভারত সরকার মোট করের বেশীর ভাগ পরোক্ষ করের মাধ্যমে আদায় করে। ব্রিটিশ আমলেও এইরূপ ছিল। স্বাধীন ভারতে পরোক্ষ করের অনুপাত আরও বেশী বাড়িয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সরকারের ঋণ গ্রহণ (**Public Debts**)—নানাবিধ কর হইতে সরকারের যে আয় হয় তাহা দিয়া অনেক সময়ে সরকার তাহার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারে না। তখন সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে।

বিভিন্ন কারণে সরকারের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। বিশেষ সঙ্কট অবস্থা ছাড়া সাধারণ অবস্থায়ও অনেক সময়ে আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে। হয়ত ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশী হইল, হয়ত আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হইল। কয়েক বৎসরের হিসাব ধরিলে হয়ত দেখা যায় যে কোন কোন বৎসরের বাড়তি দিয়া কোন কোন বৎসরের ঘাটতি পূরণ করা যায়। তবে হঠাৎ কোন কারণে সরকারের ব্যয় খুব বেশী হইয়া পড়িতে পারে অথবা আয় যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তাহার চেয়ে অনেক কম হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারকে ঋণ দ্বারা ঘাটতি পূরণ করিতে হয়।

যুদ্ধ প্রভৃতি সঙ্কটের সময়ে সরকারকে অসম্ভব রকম খরচ করিতে হয়। তখন সাধারণ সময়ে প্রযুক্ত করের দ্বারা এই বিপুল ব্যয় সঙ্কুলান করা যায় না। সরকারকে তখন অন্য নানারকম সঙ্কটকালীন কর বসাইতে হয়। তাহাতেও খরচ কুলায় না। তখন সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সাধারণ লোকের ঋণের সঙ্গে সরকারী ঋণের পার্থক্য এই যে ঋণ গ্রহণ করিতে গেলে সাধারণ লোককে কিছু বন্ধক রাখিতে হয়—যেমন, জীবন-বীমার পলিসি বন্ধক দিয়া অথবা গহনা বন্ধক দিয়া অথবা জমি, বাড়ী ইত্যাদি বন্ধক দিয়া লোকে টাকা ধার করে। যদি সে ঠিক সময়ে টাকা শোধ দিতে না পারে তাহা হইলে মহাজন বন্ধকী জিনিস বিক্রয় করিয়া তাহার পাওনা লইতে পারে। কিন্তু সরকারের পক্ষে এরূপ কোন জিনিস বন্ধক দিতে হয় না। অবশ্য, সরকার যদি দুর্বল হয় তবে বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণ লইতে গেলে অনেক সময়ে কিছু বন্ধক দিতে বাধ্য হয়।

আরও একটি পার্থক্য আছে। সরকারের পক্ষে সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক কম সুদে টাকা ধার করা সম্ভব। সরকারের সুনাম এত বেশী যে সরকারকে টাকা ধার দেওয়া লোকের পক্ষে একটি নিরাপদ লগ্নি কারবার। সরকারী ঋণপত্র বাজারে সব সময়েই কেনা-বেচা চলে। কাজেই কাহারও নগদ টাকা দরকার হইলে সে তাহার ঋণপত্র যে-কোনও সময়ে বিক্রয় করিতে পারে অথবা ঋণপত্র বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিতে পারে।

বাজেট (Budget)—প্রত্যেক সরকারী আয়-ব্যয়ের বৎসরের (financial year—সাধারণত প্রত্যেক বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে তাহার পরবর্তী বৎসরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) অব্যবহিত পূর্বে সরকার সেই আগামী

বৎসরে তাহার কি রকম আয় এবং ব্যয় হইতে পারে তাহার একটি আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করে। এই আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাবকে বাজেট (budget) বলে।

উন্নয়নের জন্য অর্থসংগ্রহ (The Financing of Development)— কোন অনগ্রসর দেশকে উন্নত করিতে গেলে সরকারের প্রচেষ্টা দরকার হয়। নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা, পুরাতন শিল্পের প্রসার, বেশী বেশী লোক নিয়োগ ইত্যাদির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সরকারের সাধারণত যে আয় হয় তাহা দিয়া এই ব্যয় সংকুলান করা যায় না। কাজেই নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথমত, সরকার অধিক কর বসায়। পুরাতন করের হার বাড়ানো হয় এবং নূতন নূতন কর বসানো হয়।

সরকার যখন শিল্পোন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করে তখন লোকদের আয় বাড়িয়া যায়। লোকদের আয় বাড়িয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, লোকের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ে। ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ সাধারণত একই অনুপাতে বাড়ে না। কাজেই তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় অধিক কর স্থাপন করিয়া সরকার লোকের হাত হইতে অত্যধিক ক্রয়ক্ষমতা কাড়িয়া লয়। ইহাতে একদিকে যেমন দ্রব্যমূল্য তেমন বাড়িতে পারে না, অন্যদিকে তেমন সরকারের আয়-বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয় সরকার শিল্পোন্নতির জন্য ব্যয় করিতে পারে।

উন্নয়নের জন্য অর্থসংগ্রহের দ্বিতীয় উপায় হইল আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ। শিল্পোন্নতির জন্য সরকার দেশের লোকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ইহারও উদ্দেশ্য দুইটি। লোকে যাহাতে অত্যধিক খরচ না করে, লোকের যাহাতে সঞ্চয়স্পৃহা বর্ধিত হয় সরকার সেই দিকে দৃষ্টি দেয়। আবার, সরকারী তহবিলে টাকাও বাড়ানো হয়।

তৃতীয় উপায় সোজা কথায় নোট ছাপানো। সরকারী ঘাটতি পূরণের একটি বিশিষ্ট উপায় হইতেছে অধিক সংখ্যক নোট ছাপানো। আজকাল দেশের অর্থ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের উপর। সরকার অথবা সরকারের নির্দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট ছাপায়। যদি কেবলমাত্র বাজেটের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যেই নোট ছাপানো হয় তাহা হইলে সেই প্রক্রিয়াকে ঘাটতি মিটানো (deficit financing) বলা হয়। নোট ছাপাইবার ভার

যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে থাকে, তবে সরকারকে ঋণ দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট ছাপাইতে থাকে। কিন্তু এই ঋণ নামেমাত্র ঋণ। এজন্য সরকার কোন সুদ দেয় না। আসলও যদি শোধ দেওয়ার কথা ওঠে তখন সরকার নিজের ছাপমারা অর্থ দ্বারা তাহা শোধ দিতে পারে। কাজেই, প্রকারান্তরে ইহা সরকারের নিজেরই নোট ছাপাইয়া চলা। তবে অবাধে নোট ছাপাইয়া চলিলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি (inflation) ঘটিতে পারে এবং দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব বলিয়া সরকার যথেষ্ট সাবধানতার সহিত এই প্রক্রিয়ার সাহায্য লয়।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য এই যে, বৈদেশিক সাহায্যেরও আশ্রয় লইতে হয়। অনেক সময়ে বৈদেশিক দান এবং ঋণ দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা যায়। বিদেশী সাহায্য আসিতে পারে মূলধন এবং অন্যান্য দ্রব্যের মারফৎ। যদি কোন দেশ আর একটি দেশকে আর্থিক সাহায্য দিতে চায়, তবে ঐ দেশের উন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি, ঔষধ, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বিনামূল্যে দান (grant) হিসাবে প্রেরণ করিতে পারে। যদি ঋণ (loan) হিসাবে পাঠায়, তবে সেটা কিছুকাল পরে শোধ দিতে হয়। শোধ দিবার সময়ে খাতক দেশকে স্বর্ণ অথবা অন্যান্য জিনিসপত্রের দ্বারা শোধ দিতে হয়।

ভারতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার জন্য সরকারের যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা যোগাড় করিবার জন্য উল্লিখিত সব কয়টি নিয়মই অবলম্বন করা হইয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী তরফ হইতে পাঁচ বৎসরে মোট ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা (total outlay) হইবে। এই টাকা উক্ত পাঁচ বৎসরে নিম্নলিখিত উপায়ে সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে :—

উপায়	টাকার পরিমাণ
1. চলতি করসমূহের ভিত্তিতে রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত (Balance from the revenues on the basis of existing taxation)	৩৮৪ কোটি টাকা
2. চলতি প্রাপ্তির ভিত্তিতে রেলওয়ের উদ্বৃত্ত হইতে প্রাপ্য— (Contributions from the Railways on the existing basis)	১০৮ কোটি টাকা

উপায়	টাকার পরিমাণ
3. রেলওয়ে ব্যতীত অন্যান্য সরকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে চলতি আয়ের ভিত্তিতে প্রাপ্য (Surpluses of other public enterprises on the existing basis)	৪৪৯ কোটি টাকা
4. নূতন কর এবং সরকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে চলতি আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা (Additional taxation and measures to increase the surplus of public enterprises)	১৭৫৭ কোটি টাকা
5. দেশের লোকের নিকট হইতে মোটা রকমের ঋণ (Loans from the public)	৮৫০ কোটি টাকা
6. দেশের লোকের নিকট হইতে স্বল্পাকারে সঞ্চয় মারফৎ ঋণ (Small Savings)	৫৮৫ কোটি টাকা
7. প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি হইতে (Provident Funds, Betterment Levies, Steel Equalisation Fund and Miscellaneous Capital Receipts)	৬১৭ কোটি টাকা
8. প্রধানত ঋণ এবং কতকাংশে দান বাবদ প্রাপ্য বৈদেশিক সাহায্য (Budgetary receipts corresponding to external assistance)	২২০০ কোটি টাকা
9. বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত নোট ছাপানো (Deficit financing)	৫৫০ কোটি টাকা
মোট	৭৫০০ কোটি টাকা

প্রশ্ন

1. In what different ways does the Government collect money?
(সরকার কি কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে?) [১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা]

2. What is the difference between fees and taxes?
(ফি ও করের মধ্যে পার্থক্য কি?) [১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা]

3. What is the main principle of taxation?
(সর্বপ্রধান কোন্ নীতিটির ভিত্তিতে কর বসানো উচিত?) [১৪৬-৪১৭ পৃষ্ঠা]

4. Explain and illustrate the distinction between the equal, progressive and regressive rates of taxation.
(উদাহরণ দ্বারা করের সমহার, ক্রমবর্ধমান হার এবং ক্রমহ্রাসমান হারের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।) [১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা]

5. Explain, with reasons, whether you would prefer the equal or the progressive or the regressive rate of taxation

(করের সমহার, ক্রমবর্ধমান হার এবং ক্রমহ্রাসমান হারের মধ্যে কোন্‌টি বাঞ্ছনীয় তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দাও।) [১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা]

6. What is a tax ? How should the burden of taxes be distributed among the people ? (Higher Secondary Examination, 1961.)

('কর' কাহাকে বলে ? কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে করভার বণ্টন করা উচিত ?) [১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা]

7. Distinguish between a direct and an indirect tax. Give examples of both from the Indian tax system. (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)

(প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের পার্থক্য কি ? ভারতীয় করব্যবস্থা হইতে এই দুই প্রকার করের উদাহরণ দিও।) [১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা]

8. Define a tax. Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes. (Higher Secondary Examination, 1960)

('কর'-এর সংজ্ঞা নির্ণয় কর। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের গুণাগুণ আলোচনা কর।) [১৪৬, ১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠা]

9. Why does the Government borrow money ? Distinguish between private debts and public debts.

(সরকার ঋণ গ্রহণ করে কেন ? সাধারণ লোকের ধারকর্জ এবং সরকারী ধারকর্জের মধ্যে পার্থক্য কি ?) [১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা]

10. How does a Government generally finance development projects ? What arrangements in this respect does the Government of India make ?

(উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সরকার সাধারণত কি ভাবে অর্থ যোগাড় করে ? ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে কোন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে ?) [১৫৩-১৫৫ পৃষ্ঠা]

ষোড়শ অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাঙ্ক

(Money and Banking)

দ্রব্যবিনিময় প্রথা (Barter System)—অতি প্রাচীনকালে লোকে বিভিন্ন জিনিসের পরিবর্তে বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করিত। কেহ হয়ত গরু দিয়া ভেড়া পাইল, চাউল দিয়া ডাল পাইল, মাছ দিয়া তরকারী পাইল। এইরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন একটি জিনিস অনুসারে অন্যান্য জিনিসের মূল্য নিরূপিত

হইত না। একজন লোকের যে সব জিনিস উদ্বৃত্ত থাকিত সেই সব নানারকমের জিনিস অন্যান্য লোকদের দিয়া তাহাদের নিকট হইতে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লইত। এইরূপ রীতিকে দ্রব্য-বিনিময় প্রথা বলে।

এই প্রথায় নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। একজন লোকের উদ্বৃত্ত জিনিস দিয়া অন্য লোকের উদ্বৃত্ত জিনিস কিনিতে হইলে প্রথমোক্ত লোকের এমন জিনিস যথোপযুক্ত পরিমাণে উদ্বৃত্ত রাখিতে হয় যাহা দ্বিতীয়োক্ত লোকের অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু একজন লোকের সরবরাহ এবং চাহিদার সহিত অন্য আর একজন লোকের চাহিদা এবং সরবরাহ অনেক সময়ে খাপ খায় না। একজন লোক হয়ত গরু দিয়া ভেড়া কিনিতে চাহিল। কিন্তু ভেড়ার মালিকের কোন গরুর দরকার নাই। তখন কি হইবে?

এই সব অসুবিধার ফলে ক্রমান্বয়ে লোকে বুঝিতে পারিল যে কোন একটি বিশেষ জিনিস অনুসারে অন্যান্য সকল জিনিসের মূল্য ধার্য করিয়া সেই বিশেষ জিনিসটির দ্বারা ক্রয়বিক্রয় কার্য চালাইলে সুবিধা হয়।

অর্থ (Money)—বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন পদার্থের মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় কার্য আরম্ভ হইল।

অনেক জায়গায় কড়ি দিয়া কাজ চলিল। কড়ির হিসাবে গরু, ঘোড়া, চাল, ডাল প্রভৃতি সকল জিনিসের দাম ঠিক করা হইল। কড়ি দিয়াই এই সব জিনিস কেনাবেচা হইতে লাগিল। অর্থাৎ কড়ি হইল বিভিন্ন জিনিসের মূল্যের মান এবং বিনিময়ের মাধ্যম।

যে জিনিসটির দ্বারা অন্যান্য জিনিসের মূল্য ধার্য করা হয় এবং অন্যান্য জিনিসের ক্রয়বিক্রয় চলে তাহাকে অর্থ (money) বলে।

অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা অনুসারে যাবতীয় পদার্থের মূল্য নিরূপণ করা হয়, ইহা দ্বারা যাবতীয় পদার্থ ক্রয় করা হয়, এবং ইহা গ্রহণ করিয়া লোকে যাবতীয় পদার্থ বিক্রয় করে।

দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া একটি জিনিসকে অর্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল।

কোন্ জিনিসটি অর্থের কাজ চালাইবার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা লইয়া নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত, অধিকাংশ স্থানে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অথবা এক সঙ্গে এই দুইটি ধাতুকেই অর্থোপযোগী পদার্থ বলিয়া পরিগণিত করা হইল।

একটি দেশে কোন্ জিনিসটিকে অর্থ বলিয়া ধরা হইবে তাহা অবশ্য সেই দেশের সরকার ঠিক করিয়া দিল। সরকার একটি জিনিসের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া অর্থের একক হিসাবে চালাইতে লাগিল।

কালক্রমে সরকারী মুদ্রাঙ্কিত কাগজের নোটও দেশের মধ্যে অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল।

ফলে, আজকাল অর্থ বলিলে আমরা মোটামুটি সেই জিনিসকে বুঝি যাহা সরকারী নির্দেশে দেশের মধ্যে মূল্যের মান এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। যেমন, আমাদের দেশে অর্থ বলিলে আমরা টাকা এবং ইহার ভগ্নাংশ নয়া পয়সা বুঝি। আইন অনুসারে এক টাকার নোটও অর্থ।

অর্থের কাজ (Functions of Money)—অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করে (measure of value)। কার্যের মূল্যও ইহার দ্বারাই নিরূপিত হয়।

ইহার ফলে, বিভিন্ন জিনিস এবং কাজের কোন্‌টির কিরূপ মূল্য তাহাও অর্থের দ্বারা তুলনা করা (compare) হয়। যদি এক মণ চালের দাম ২০৲ এবং এক মণ ডালের দাম ১০৲ হয় তাহা হইলে আমরা চালের মূল্য ডালের মূল্যের দ্বিগুণ এইরূপ বলিয়া এই দুইটি জিনিসের মূল্যের তুলনা করি। সেইরকম যদি একজন মজুর মাসে ৬০৲ এবং একজন কেরানী মাসে একই রকম সময়ে কাজ করিয়া ১২০৲ পায় তাহা হইলে আমরা কেরানীর কাজের মূল্য মজুরের কাজের মূল্যের দ্বিগুণ বলিয়া তুলনা করি।

অর্থের আর একটি প্রধান কাজ হইল এই যে ইহা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম (medium of exchange)। আমাদের দেশে আমরা টাকা পয়সা অনুসারে বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নিরূপণ ত করিই, তাহা ছাড়া দৈনন্দিন ব্যাপারেও এই টাকা পয়সা ব্যবহার করিয়াই জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয় করি। টাকাকে মূল্যমান ধরিয়া অর্থাৎ টাকা অনুসারে জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারিত করিয়া আমরা হয়ত দেখিলাম যে চালের মূল্য ডালের মূল্যের দ্বিগুণ। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা ১ সের চাল কিনিতে হইলে ২ সের ডাল লইয়া বাজারে যাই? আমরা টাকা পয়সা লইয়াই বাজারে যাই। জিনিসের মূল্য যেমন টাকা পয়সা অনুসারে ঠিক করিয়াছি তেমন আবার ক্রয়কার্য ও বিক্রয়কার্য টাকা পয়সার মাধ্যমেই চালাই, সমমূল্য অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে নয়।

অর্থের আরও একটি কাজ আছে। ইহার দ্বারা মূল্য সঞ্চয়ের (store of

value) স্থবিধা হয়। আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হইলে উদ্বৃত্ত ধন সঞ্চিত হয়। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত ধন জিনিসপত্রের আকারে সঞ্চয় করা অসম্ভব। নানা রকমের জিনিস সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য নানা রকমের জায়গা দরকার। এইরকম প্রচুর জায়গা কোথায় ? তাহা ছাড়া, অনেক জিনিসই টিকিয়া থাকে না, পচিয়া যায়। ধান, চাল, মাছ, তরকারী, এইসব কি পঁচিশ ত্রিশ বছর জমাইয়া রাখা যায় ? জিনিসপত্র সঞ্চয় করিতে নানা রকম অস্থবিধা আছে বলিয়া আমরা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় করি, অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করি এবং উদ্বৃত্ত ধন অর্থের আকারে সঞ্চয় করি। অর্থের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে—জিনিসপত্র সঞ্চয় করিলেও এরকম দুরবস্থা হইতে পারে —কিন্তু অর্থ কখনও পচিয়া যায় না। ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য স্থানাভাবও হয় না।

অর্থের আর একটি কাজও উল্লেখযোগ্য। অর্থ থাকার ফলে ধারকর্জ করিয়া পরে শোধ দেওয়ার উপায় (means of deferred payments) পাওয়া যায়। আমার প্রতিবেশী হয়ত আমাকে খুব বিশ্বাস করে এবং সে কাঠের ব্যবসায় করিয়া এমন বড়লোক হইয়াছে যে আমাকে ধার দিতে প্রস্তুত। আমার হয়ত ধানের দরকার। অর্থের প্রচলন না থাকিলে আমি কাঠ ধার করিতে পারি, ধান ধার করার স্থবিধা পাই না। আবার কিছুদিন বাদে ধার শোধ দিতে গিয়া আমার প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয় পদার্থের দ্বারাই শোধ দিতে হইবে। এই অবস্থায় ধার দেওয়ায় এবং ধার শোধ দেওয়ায় অস্থবিধা হয়। অর্থের সাহায্যে এই রকমের অস্থবিধা দূর হয়। আমার প্রতিবেশী কাঠ বিক্রয় করিয়া আমাকে অর্থ ধার দিল। এই অর্থ দিয়া আমি আমার প্রয়োজনীয় ধান কিনিলাম। পরে আমার উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ লাভ করিলাম তাহা দ্বারা আমি ধার শোধ করিলাম। অর্থের প্রচলন না থাকিলে এরকম করা যায় না।

অর্থের মান (Monetary Standard)—অনেকে বলেন, অর্থের মান বলিলে কোন একটি জিনিস (সাধারণত স্বর্ণ অথবা রৌপ্য) অনুসারে অর্থের সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্য বুঝায়। কিন্তু এই রকম ধারণায় ত্রুটি আছে ; কারণ আজকাল অনেক দেশের সরকার বিশেষ কোন একটি জিনিসের অনুপাতে অর্থের মূল্য স্থির রাখে না এবং যে সব দেশের সরকার ঐ রকম

ভাবে অর্থের মূল্য ধার্য করে সেই সব দেশেও সরকার দেশের মধ্যে অর্থের পরিবর্তে ঐ জিনিসের নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদান করে না।

অর্থের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে কোন দেশের সরকার আইন করিয়া যে জিনিসকে অর্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে সেই দেশে তাহাই অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন, আমাদের দেশে টাকা (ধাতব মুদ্রা হিসাবেই হউক অথবা কাগজের নোট হিসাবেই হউক) এবং ইহার ভগ্নাংশ নয়া পয়সা, ইংলণ্ডে পাউণ্ড এবং ইহার ভগ্নাংশ শিলিং, পেনি ইত্যাদি, আমেরিকায় ডলার এবং ইহার ভগ্নাংশ সেণ্ট দেশের আইন অনুসারে অর্থ বলিয়া গণ্য হয়।

যে দেশে যাহা অর্থ বলিয়া পরিগণিত সেই দেশের লোক তাহা আইনত লইতে বাধ্য (legal tender)। জিনিস কিনিতে অথবা দেনা শোধ করিতে গিয়া ক্রেতা অথবা খাতক ইহা দিলে দেশের মধ্যে বিক্রেতা অথবা মহাজন ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে না।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম জিনিস অর্থ বলিয়া পরিগণিত। সেই জন্য, এক দেশের অর্থ অন্য দেশে অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় না। আমাদের টাকার নোট ইংলণ্ডে সাধারণ কাগজরূপে এবং ইংলণ্ডের পাউণ্ড নোট আমাদের দেশে সাধারণ কাগজরূপেই গণ্য হইবে। ফলে, এক দেশের সহিত আর এক দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে নানারকম অসুবিধা ঘটে।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রত্যেক দেশই যে সব দেশের সহিত ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য আছে সেই সব দেশের অর্থের সহিত ইহার অর্থের একটি অনুপাত রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। যেমন, আমাদের দেশের সহিত ইংলণ্ডের খুব ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে বলিয়া আমাদের এক টাকা ইংলণ্ডের দেড় শিলিং-এর সমমূল্য এইরূপ একটি সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য, ইংলণ্ড অথবা ভারত যে কোন দেশ যে কোন সময়ে এই অনুপাত বদলাইতে পারে।

আবার ভারত, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি কতকগুলি দেশ একটি চুক্তি করিয়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) স্থাপন করিয়াছে। এই ভাণ্ডারের কাজ হইল চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির অর্থের মূল্যের অনুপাত (ratio) রক্ষা করা। সোনা অনুসারে বিভিন্ন দেশের অর্থের এক একটি নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য হইয়াছে। যেমন, আমাদের এক টাকার

মূল্য ধরা হইয়াছে ০·১৮৬৬২১ গ্রাম স্বর্ণ। এই রকম পাউণ্ড স্টার্লিং-এরও একটি স্বর্ণমূল্য ঠিক করা হইয়াছে। তাহা হইতেই এক টাকা দেড় শিলিং-এর সমান এইরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অনুমতি না লইয়া চুক্তিবদ্ধ কোন দেশ ইহার অর্থের আনুপাতিক মূল্য বদলাইতে পারে না। অবশ্য, এই ভাণ্ডারের সভ্যপদে ইস্তফা দিলে সব কিছুই করিতে পারে।

আমাদের একটি টাকার মূল্য কি তাহা হইলে ০·১৮৬৬২১ গ্রাম স্বর্ণ? আমি এক টাকার কাগজী নোট দিলে ভারত সরকার কি আমাকে ০·১৮৬৬২১ গ্রাম স্বর্ণ দিতে বাধ্য? মোটেই নহে। ভারত সরকার কাহাকেও টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে বাধ্য নহে। আমাদের মানমুদ্রা (standard money) টাকা—এক টাকার ধাতব মুদ্রা অথবা কাগজী নোট। মানমুদ্রা বলিলে অবশ্য সেই অর্থকে বুঝায় যাহা পাওনাদার দেনাদারের নিকট হইতে লইতে বাধ্য। ইহার পরিবর্তে যে সরকার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের অন্য কোন জিনিস দিতে বাধ্য থাকিবে এরূপ কোন কথা নাই।

কিন্তু আমাদের মানমুদ্রার মূল্য কি? উত্তরে শুধু বলা যায় যে, এক টাকায় যে জিনিসের যে পরিমাণ কিনিতে পারা যায় সেই জিনিসের সেই পরিমাণই হইল আমাদের একটি টাকার মূল্য। একটি টাকা দিয়া যদি ১ সের চিনি, ২ সের ডাল, ·১৫ গ্রাম স্বর্ণ কিনিতে পারি তাহা হইলে বলিব এক টাকার মূল্য ১ সের চিনি, ২ সের ডাল, ·১৫ গ্রাম স্বর্ণ ইত্যাদি। একটি জিনিস নহে, বিভিন্ন জিনিসের পরিমাণ অনুসারে আমাদের মানমুদ্রার মান নির্ণয় করা যাইবে। ইহাও অবশ্য সাময়িক ভাবে। আজ হয়ত আমাদের টাকার মান ·১৫ গ্রাম স্বর্ণ, ১ সের চিনি ইত্যাদি, কালই আবার ·১ গ্রাম স্বর্ণ, ২ সের চিনি ইত্যাদিও হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, এই রকম বিভিন্ন জিনিস অনুসারে মূল্য বিচার করিলে এবং সেই মূল্যও এই রকম পরিবর্তনশীল হইলে আমরা ইহাকে অর্থের কোন স্থিতিশীল মূল্য বলিতে পারি না।

অর্থের মান (monetary standard) বলিলে সেইরকম বিশেষ একটি জিনিসকে বুঝানো উচিত যাহার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কেবলমাত্র অর্থের এককের (unit) মূল্য হিসাবে নির্ধারিত থাকিবে না, সেই নির্দিষ্ট পরিমাণটি সরকার অর্থের এককের বিনিময়ে সর্বদা দিতেও বাধ্য থাকিবে। যদি কোন সরকার ঠিক একটি জিনিসের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ (বিভিন্ন জিনিস

নহে·) আইনত অর্থের এককের পরিবর্তে দিতে বাধ্য থাকে, তাহা হইলে সেই জিনিসটিকে আমরা সেই দেশের অর্থের মান বলিব।

কিছুকাল পূর্বে বহু দেশে অর্থের মান ছিল স্বর্ণ। যে দেশে ইহা প্রচলিত থাকে সেই দেশের সরকার ইহার মানমুদ্রার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণের স্বর্ণ দিতে বাধ্য থাকে।

আজকাল আর স্বর্ণমান (gold standard) নাই বলিলেই চলে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালাইবার জন্য কোন কোন দেশের সরকার স্বর্ণ অনুসারে ইহার অর্থের একটি নির্দিষ্ট মূল্য মোটামুটিভাবে মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে। এই কথায় অবশ্য ইহা বুঝায় না যে সরকার ইহার অর্থের বিনিময়ে সেই পরিমাণ স্বর্ণ দিতে বাধ্য থাকে।

আজকাল এক দেশের অর্থের মান বলিতে সেই দেশের অর্থই বুঝায়। তবে, সরকার দিতে বাধ্য না থাকিলেও যদি সাধারণত স্বর্ণ অনুসারে দেশের অর্থের একটি মূল্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে সেই অর্থের একটি মান আছে বলিলে খুব বেশী ভুল হইবে না। যেমন, আমরা যদি বলি যে আমাদের দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত আছে তাহা হইলে আমাদের কথা ভুল হইবে ঠিকই। কিন্তু, যেহেতু ভারত সরকার স্বর্ণ অনুসারে অন্য অনেক দেশের অর্থের সহিত আমাদের অর্থের একটি অনুপাত (ratio) রক্ষা করে, সেই জন্য আমরা সম্পূর্ণ নির্ভুল না হইলেও মোটামুটিভাবে বলিতে পারি যে আমাদের এক টাকার মূল্য ০·১৮৬৬২১ গ্র্যাম স্বর্ণ এবং আমাদের টাকার মান স্বর্ণ।

তবে এইরূপ বলিলে সম্পূর্ণ নির্ভুল কথা বলা হইবে না। সেই জন্য জানিয়া রাখা ভাল যে আমাদের টাকার মান টাকা এবং এই টাকা ধাতব মুদ্রাও হইতে পারে, কাগজের নোটও হইতে পারে।

ব্যাঙ্ক-প্রথা (Banking System)—নিজের ও দেশের উন্নতির জন্য অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। ইহা দ্বারা সঞ্চয়কারী নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করিয়া রাখে। সঞ্চিত অর্থ আবার ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজে খাটানো হয়। তাহাতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়।

অর্থের সঞ্চয় এবং ব্যবসায়ে ইহার প্রয়োগ—এই দুইটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় কাজের সুবিধার জন্য এক রকম প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে। এই রকম প্রতিষ্ঠানকেই ব্যাঙ্ক বলা হয়।

ব্যাঙ্কের প্রকার-ভেদ (Types of Banks)—ব্যাঙ্ক অনেক রকমের আছে।

(১) দেশের মধ্যে যত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে সবগুলিকে সাহায্য এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (central bank) থাকে।

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সরকারের অর্থ আমানত রাখে, দরকার হইলে সরকারকে ধারও দেয়।

(৩) দেশের অন্য সব ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখে, বিশেষ প্রয়োজন হইলে ধারও পায়। তবে সব ব্যাঙ্কই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। ইহাই ব্যাঙ্কিং প্রথার শীর্ষস্থানে অবস্থিত।

(৪) লাভ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের লক্ষ্য নয়। কাজেই ইহা ব্যাঙ্কিং কার্যে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করে না।

(৫) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট ছাপায় এবং এই ব্যাঙ্ক নোট অর্থের সমতুল্য কাজ করে।

(৬) দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) বৈদেশিক মুদ্রার (money) সহিত দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার (exchange rate) ঠিক রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ দায়িত্ব।

আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank)। ইহার মালিক ভারত সরকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত আর সব ব্যাঙ্ক ইহাদের গঠন ও কাজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সমবায় পদ্ধতিতে গঠিত ব্যাঙ্ককে বলা হয় সমবায় ব্যাঙ্ক (co-operative bank)। যৌথমূলধনী পদ্ধতিতে গঠিত ব্যাঙ্ককে বলা হয় যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক (joint stock bank)।

আবার যে সব ব্যাঙ্ক দীর্ঘ মেয়াদের চুক্তিতে টাকা আমানত রাখে ও ধার দেয় সেগুলিকে বলে মর্টগেজ ব্যাঙ্ক (mortgage bank)। যে সব ব্যাঙ্ক স্বল্প মেয়াদের চুক্তিতে টাকা আমানত রাখে ও ধার দেয় সেগুলিকে বলে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (commercial bank)।

এক ধরণের কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রধানত এক দেশের অর্থের বিনিময়ে অন্য দেশের অর্থ সরবরাহ করে। ইহাকে বিনিময় ব্যাঙ্ক (exchange bank) বলে।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of Banks)—ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ হইতেছে লোকের গচ্ছিত অর্থ আমানত (deposit) রাখা। আমানত সাধারণত তিন রকমের হয়।

এক রকমের হইল চলতি হিসাব (current account)। চলতি হিসাবে টাকা রাখিলে আমানতকারী প্রত্যেক সপ্তাহে যত বার খুশি এবং যত পরিমাণে খুশি (অবশ্য আমানতের পরিমাণ না ছাড়াইয়া) টাকা তুলিতে পারে। চলতি হিসাবে যাহা আমানত রাখা হয় তাহার জন্য ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে কোন স্থদ দেয় না।

আর এক রকম আমানত আছে, তাহাকে বলে সঞ্চয়ের হিসাব (savings bank account)। এখানে টাকা তোলার বার এবং পরিমাণ সম্পর্কে কিছু কিছু বিধিনিষেধ থাকে। হয়ত এমন নিয়ম থাকে যে সপ্তাহে এক বারের বেশী এবং সেই এক বারে মোট আমানতের এক-চতুর্থাংশের বেশী তোলা যাইবে না। আবার এ রকম নিয়মও থাকিতে পারে যে সপ্তাহে এক বারের বেশী তোলা যাইবে না, তবে পরিমাণ যত খুশি তোলা যাইবে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রকমের নিয়ম বলবৎ রাখে। তবে কোন না কোন নিয়ম আরোপ করা হয়ই। সঞ্চয়ের হিসাবে আমানত রাখিলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে স্থদ দেয়।

অন্য এক রকম আমানতকে বলা হয় স্থায়ী আমানত (fixed deposit)। ইহাতে নির্দিষ্ট একটা সময় (৬ মাসও হইতে পারে, ৬ বৎসরও হইতে পারে) অতিক্রান্ত না হইলে আমানতকারী বিনা লোকসানে তাহার আমানত তুলিয়া লইতে পারে না। স্থায়ী আমানতের বেলায় ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে নির্দিষ্ট হারে স্থদ দেয় এবং এক্ষেত্রে স্থদের হার সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টের চেয়ে বেশী হয়। নিয়ম ভঙ্গ করিয়াও আমানত তোলা যায়, তবে এরূপ করিলে আমানতকারীর আর্থিক লোকসান হয়।

ব্যাঙ্ক যেমন লোকের গচ্ছিত অর্থ আমানত রাখে তেমনই আবার লোককে ধারও দেয়। ধারের বেলায় ব্যাঙ্ক সব ক্ষেত্রেই স্থদ আদায় করে। তবে সব ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের কড়ারে ধার দেওয়া হয়। চলতি হিসাবে (current account) আমানতকারী কোন লোক ব্যাঙ্ককে এমন চুক্তিতে ধার দেয় (অর্থাৎ ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখে) যে চাহিবামাত্রই সে ইহা ফেরত পাইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্ক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় (১ দিনও হইতে

পারে, ২০ বৎসরও হইতে পারে) অতিক্রান্ত না হইলে ইহার খাতকের নিকট হইতে ঋণ-দেওয়া অর্থ আদায় করিতে পারে না।

সুদের পদ্ধতি দুই রকমের আছে। যদি ধার দেওয়ার পরে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সুদ আদায় করা হয় তাহা হইলে সেই সুদকে 'ইন্টারেস্ট' (interest) বলা হয়। আর, যদি ধার দেওয়ার সময়েই (পরে নহে) আসল হইতে সুদের পরিমাণ কাটিয়া লইয়া বাকিটা খাতককে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই সুদকে 'ডিস্কাউন্ট' (discount) বলা হয়। যেমন, সুদের বাৎসরিক হার যদি ডিস্কাউন্ট হিসাবে শতকরা ২ টাকা হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ১ বৎসরের কড়ারে ১০০ টাকা ধার দিবার সময়ে খাতককে ৯৮ টাকা দিবে, এক বৎসর পরে খাতক ব্যাঙ্ককে ১০০ টাকা দিয়া ধার শোধ করিবে।

ডিস্কাউন্টের হার সর্বত্রই ইন্টারেস্টের হারের চেয়ে কম হয়।

কোন কোন ব্যাঙ্ক ধার দিয়া কৃষি ও শিল্পের মূলধন যোগায়। এইরূপ ধার একটু দীর্ঘমেয়াদী (long-term) না হইলে চলে না। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত এই রকম দীর্ঘ-মেয়াদী ধারের কারবার চালায় না। সাধারণত এগ্রিকালচারাল বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মর্টগেজ ব্যাঙ্কগুলি এই কার্য করে।

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি প্রধানত স্বল্পমেয়াদী (short-term) ধারের ব্যবসায় করে।

ব্যাঙ্ক (বিশেষত, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক) কিভাবে ধার দেয় তাহা জানা দরকার। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, তিনটি উপায়ের যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া ব্যাঙ্ক ধার দেয়।

একটি উপায় হইল ওভারড্র্যাফ্‌ট (overdraft) পদ্ধতি। কোন কোন আমানতকারীর উপর কোন কোন ব্যাঙ্কের এত বেশী আস্থা থাকে যে সে আমানতের টাকা ছাড়াইয়াও নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা দরকারমত ক্রমান্বয়ে বা একসঙ্গে তুলিবার সুযোগ পায়। যখন সে এইরূপ কিছু তোলে তখন ইহার জন্য ব্যাঙ্ক সুদ পায়।

ধার দেওয়ার আর একটি পদ্ধতি হইল জিনিস বন্ধক (security) রাখিয়া এবং প্রতিজ্ঞাপত্র (promissory note) লইয়া, অথবা কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া, ধার দেওয়া। মনে করা যাক, আমাদের দেশের এক চালের ব্যবসায়ী ৩ মাসের জন্য ৫০০০০৲ ধার চায়। একটি ব্যাঙ্ক তাহাকে সর্তানুযায়ী ধার দিতে রাজী হইল। সর্ত সাধারণত এই রকমের

হয় :—চালের ব্যবসায়ী বিশ্বস্ত কোম্পানীর কিছুসংখ্যক শেয়ার অথবা যেখানে তাহার চাল আছে সেই গুদামের রসিদ অথবা অন্য কোন জিনিস (ধার সময়মত শোধ না হইলে যাহা বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় হইতে পারে) ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখিবে এবং সেই সঙ্গে এক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবে যে তিন মাস পরে সে উক্ত ৫০০০০্ শোধ দিবে। ব্যাঙ্ক ঐ বন্ধকী জিনিস এবং প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া তাহাকে টাকা ধার দিল। যদি ইণ্টারেস্টের (ধরা যাক, বছরে ৬% হারে) চুক্তি থাকে তাহা হইলে চালের ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক হইতে ৫০০০০্ নিয়া তিন মাস পরে ব্যাঙ্ককে ৫০৭৫০্ দিবে। যদি ডিস্কাউণ্টের (ধরা যাক বছরে ৫·৭% হারে) চুক্তি থাকে তাহা হইলে চালের ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক হইতে ৪৯২৮৭·৫্ নিয়া তিন মাস পরে ব্যাঙ্ককে ৫০০০০্ দিবে।

ব্যাঙ্কগুলি আর একটি পদ্ধতিতেও ধার দিয়া থাকে। ইহা হইল বিভিন্ন প্রকারের বিল (bills) অথবা সরকারী ঋণপত্র (Government security) ক্রয় করিয়া ধার দেওয়া। বিল হইল সেই ধরণের প্রতিজ্ঞাপত্র যাহা স্বাক্ষর করিয়া একজন দেনাদার (debtor) একজন পাওনাদারকে (creditor) একটি নির্দিষ্ট সময় পার হওয়া মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই রকমের অনেক বিল বেশ বিশ্বাস-যোগ্য হয়। এখন, পাওনাদারের ঐ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। সে তখন ইহা ব্যাঙ্কের নিকট লইয়া যায়। ব্যাঙ্ক ডিস্কাউন্ট হিসাবে কিছু কাটিয়া উক্ত পাওনাদারকে অর্থ দান করে। এই ভাবে ব্যাঙ্ক বিলটি কিনিয়া লয় এবং যথাসময়ে উক্ত দেনাদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করে। ইহাতে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এই যে, বিল কিনিয়া ব্যাঙ্ক উক্ত দেনাদারের মহাজন (creditor) হইল। ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া সরকারের মহাজনও হইতে পারে।

শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং প্রথা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করিয়া ব্যাঙ্কগুলি মূলধন যোগাইয়া উৎপাদনে সাহায্য করে। সকল দেশেই কৃষি এবং কারখানাশিল্পের উন্নয়নে এগ্রিকাল-চারাল এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মর্টগেজ ব্যাঙ্কের প্রচুর অবদান রহিয়াছে।

আবার, স্বল্পমেয়াদী ঋণ দান করিয়া ব্যাঙ্কগুলি ক্রয়-বিক্রয় কার্যে সাহায্য করে। পাইকারী বিক্রেতাদের অনেক সময়ে নগদ টাকার দরকার হয়। কিন্তু তাহারা খুব কম সময়েই নগদ দামে বিক্রয় করিতে পারে। এই

অবস্থায় বিল ডিস্কাউণ্ট করিবার উপায় থাকায় তাহারা ব্যবসায়কার্যে সাহায্য পায়। পাইকারী বিক্রেতার নিকট হইতে যাহারা জিনিস কেনে তাহারাও নগদ দাম দিতে পারে না, জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া পরে দাম দিতে পারে। বিল প্রথা চালু হওয়ায় তাহারাও সাহায্য পায়। মোটের উপর বলা যায় যে ইহাতে কেনাবেচার কার্য সহজ হয় এবং বেশী জিনিস কেনাবেচার সুযোগ হয়।

ব্যাঙ্কগুলি গচ্ছিত ধন আমানত রাখিয়া লোকের সঞ্চয়ের সুবিধা করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সহজ করিয়া দেয়। আবার ইহারা লগ্নি কারবার করিয়া আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে ইহার চেয়েও বড় দান করে। এই লগ্নি কারবারের ফলে মূলধন পাওয়া যায়, উৎপাদনকার্য উন্নতি লাভ করে। ইহার ফলে ক্রয়বিক্রয় কার্যও বাড়িয়া চলে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল টাকা জমা রাখা এবং ধার দেওয়া। কিন্তু অনেক ব্যাঙ্ক অন্যান্য কিছু কাজও করে।

ব্যাঙ্ক অনেক সময়ে কিছু কমিশন লইয়া লোকের জন্য শেয়ার ক্রয় অথবা বিক্রয় করে।

অনেক সময়ে ব্যাঙ্ক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভারও নেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর নোট ছাপাইবার ভার থাকে। অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্বও মোটামুটি ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের।

আস্থাপত্র (Credit Instruments)—যে লোকের কোন ব্যাঙ্কে (সাধারণত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে) কিছু আমানত আছে সে সেই ব্যাঙ্কে চেক (cheque) কাটিয়া আমানতী টাকা তুলিতে পারে। ব্যাঙ্ক আমানত রাখিয়া আমানতকারীকে চেক বই দেয়। আমানতকারী এক একটি চেকের মাধ্যমে ব্যাঙ্ককে বলে যে, অমুক লোককে অথবা সেই লোক যাহার কথা বলে তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ দেওয়া হউক। ব্যাঙ্ক সেই অনুসারে কাজ করে।

ধরা যাক, কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কে রামের ১০০০০৲ আমানত আছে। শ্যামের নিকট হইতে জিনিস কিনিয়া শ্যামকে তাহার এক হাজার টাকা দিতে হইবে। সে শ্যামকে নগদ টাকা না দিয়া একখানি চেকে লিখিয়া দেয় যে শ্যামকে অথবা শ্যাম যাহার কথা বলে তাহাকে এক হাজার টাকা দেওয়া হউক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে শ্যাম ভারত সরকারের মুদ্রাঙ্কিত টাকার (যাহা সে লইতে অস্বীকার করিতে পারে না) পরিবর্তে চেক নিতে রাজী হইল কেন? সাধারণত পাওনাদারগণ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া চেক লইতে

হয় :—চালের ব্যবসায়ী বিশ্বস্ত কোম্পানীর কিছুসংখ্যক শেয়ার অথবা যেখানে তাহার চাল আছে সেই গুদামের রসিদ অথবা অন্য কোন জিনিস (ধার সময়মত শোধ না হইলে যাহা বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় হইতে পারে) ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখিবে এবং সেই সঙ্গে এক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবে যে তিন মাস পরে সে উক্ত ৫০০০০৲ শোধ দিবে। ব্যাঙ্ক ঐ বন্ধকী জিনিস এবং প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া তাহাকে টাকা ধার দিল। যদি ইন্টারেস্টের (ধরা যাক, বছরে ৬% হারে) চুক্তি থাকে তাহা হইলে চালের ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক হইতে ৫০০০০৲ নিয়া তিন মাস পরে ব্যাঙ্ককে ৫০৭৫০৲ দিবে। যদি ডিস্কাউন্টের (ধরা যাক বছরে ৫·৭% হারে) চুক্তি থাকে তাহা হইলে চালের ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক হইতে ৪৯২৮৭·৫৲ নিয়া তিন মাস পরে ব্যাঙ্ককে ৫০০০০৲ দিবে।

ব্যাঙ্কগুলি আর একটি পদ্ধতিতেও ধার দিয়া থাকে। ইহা হইল বিভিন্ন প্রকারের বিল (bills) অথবা সরকারী ঋণপত্র (Government security) ক্রয় করিয়া ধার দেওয়া। বিল হইল সেই ধরণের প্রতিজ্ঞাপত্র যাহা স্বাক্ষর করিয়া একজন দেনাদার (debtor) একজন পাওনাদারকে (creditor) একটি নির্দিষ্ট সময় পার হওয়া মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই রকমের অনেক বিল বেশ বিশ্বাস-যোগ্য হয়। এখন, পাওনাদারের ঐ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। সে তখন ইহা ব্যাঙ্কের নিকট লইয়া যায়। ব্যাঙ্ক ডিস্কাউন্ট হিসাবে কিছু কাটিয়া উক্ত পাওনাদারকে অর্থ দান করে। এই ভাবে ব্যাঙ্ক বিলটি কিনিয়া লয় এবং যথাসময়ে উক্ত দেনাদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করে। ইহাতে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এই যে, বিল কিনিয়া ব্যাঙ্ক উক্ত দেনাদারের মহাজন (creditor) হইল। ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া সরকারের মহাজনও হইতে পারে।

শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং প্রথা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করিয়া ব্যাঙ্কগুলি মূলধন যোগাইয়া উৎপাদনে সাহায্য করে। সকল দেশেই কৃষি এবং কারখানাশিল্পের উন্নয়নে এগ্রিকাল-চারাল এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মর্টগেজ ব্যাঙ্কের প্রচুর অবদান রহিয়াছে।

আবার, স্বল্পমেয়াদী ঋণ দান করিয়া ব্যাঙ্কগুলি ক্রয়-বিক্রয় কার্যে সাহায্য করে। পাইকারী বিক্রেতাদের অনেক সময়ে নগদ টাকার দরকার হয়। কিন্তু তাহারা খুব কম সময়েই নগদ দামে বিক্রয় করিতে পারে। এই

অবস্থায় বিল ডিস্কাউণ্ট করিবার উপায় থাকায় তাহারা ব্যবসায়কার্যে সাহায্য পায়। পাইকারী বিক্রেতার নিকট হইতে যাহারা জিনিস কেনে তাহারাও নগদ দাম দিতে পারে না, জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া পরে দাম দিতে পারে। বিল প্রথা চালু হওয়ায় তাহারাও সাহায্য পায়। মোটের উপর বলা যায় যে ইহাতে কেনাবেচার কার্য সহজ হয় এবং বেশী জিনিস কেনাবেচার সুযোগ হয়।

ব্যাঙ্কগুলি গচ্ছিত ধন আমানত রাখিয়া লোকের সঞ্চয়ের সুবিধা করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সহজ করিয়া দেয়। আবার ইহারা লগ্নি কারবার করিয়া আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে ইহার চেয়েও বড় দান করে। এই লগ্নি কারবারের ফলে মূলধন পাওয়া যায়, উৎপাদনকার্য উন্নতি লাভ করে। ইহার ফলে ক্রয়বিক্রয় কার্যও বাড়িয়া চলে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল টাকা জমা রাখা এবং ধার দেওয়া। কিন্তু অনেক ব্যাঙ্ক অন্যান্য কিছু কাজও করে।

ব্যাঙ্ক অনেক সময়ে কিছু কমিশন লইয়া লোকের জন্য শেয়ার ক্রয় অথবা বিক্রয় করে।

অনেক সময়ে ব্যাঙ্ক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভারও নেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর নোট ছাপাইবার ভার থাকে। অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্বও মোটামুটি ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের।

আস্থাপত্র (Credit Instruments)—যে লোকের কোন ব্যাঙ্কে (সাধারণত কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে) কিছু আমানত আছে সে সেই ব্যাঙ্কে চেক (cheque) কাটিয়া আমানতী টাকা তুলিতে পারে। ব্যাঙ্ক আমানত রাখিয়া আমানতকারীকে চেক বই দেয়। আমানতকারী এক একটি চেকের মাধ্যমে ব্যাঙ্ককে বলে যে, অমুক লোককে অথবা সেই লোক যাহার কথা বলে তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ দেওয়া হউক। ব্যাঙ্ক সেই অনুসারে কাজ করে।

ধরা যাক, কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কে রামের ১০০০০৲ আমানত আছে। শ্যামের নিকট হইতে জিনিস কিনিয়া শ্যামকে তাহার এক হাজার টাকা দিতে হইবে। সে শ্যামকে নগদ টাকা না দিয়া একখানি চেকে লিখিয়া দেয় যে শ্যামকে অথবা শ্যাম যাহার কথা বলে তাহাকে এক হাজার টাকা দেওয়া হউক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে শ্যাম ভারত সরকারের মুদ্রাঙ্কিত টাকার (যাহা সে লইতে অস্বীকার করিতে পারে না) পরিবর্তে চেক নিতে রাজী হইল কেন? সাধারণত পাওনাদারগণ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া চেক লইতে

রাজী হয়। প্রথমত, দেনাদারের উপর এই আস্থা আছে যে তাহার দেয় অর্থ ব্যাঙ্কটিতে আমানত আছে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কটির উপর এই আস্থা আছে যে ইহার ঐ অর্থ দানের ক্ষমতা আছে। শ্যাম আইনত চেক লইতে বাধ্য নহে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস আছে যে ব্যাঙ্কটিতে রামের অন্তত এক হাজার টাকা আমানত আছে এবং ব্যাঙ্কটিরও ঐ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এইরূপ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই চেকের দ্বারা জিনিস কেনার কাজ চলিল। এই জন্য চেককে আস্থাপত্র (credit instrument) বলে।

চেক ছাড়া আরও অনেক রকমের আস্থাপত্র আছে। যেমন, ব্যাঙ্ক নোট, আভ্যন্তরীণ ট্রেড বিল, বিল অফ এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি।

কিছুকাল পূর্বে অনেক দেশে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি নিজেরা নোট ছাপাইয়া তাহা বাজারে চালাইত। এই নোট অবশ্য এক ধরণের প্রতিজ্ঞাপত্র। যে ব্যাঙ্ক এই নোট তৈয়ারি করিত সেই ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুতি দিত যে চাহিবামাত্র ব্যাঙ্ক নোটের পরিবর্তে সরকারী মুদ্রাঙ্কিত অর্থ দান করিবে। ব্যাঙ্কের এই রকম প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করিত বলিয়া লোকে ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। আজকাল সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য ব্যাঙ্ক নোট ছাপায় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট বাহির করে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (যাহার নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) দুই এবং তদূর্ধ্ব টাকার নোট ছাপায় এবং বাজারে ছাড়ে। এই নোটগুলিতে লেখা থাকে যে চাহিবামাত্র ব্যাঙ্ক নোটের বাহককে সরকারী মুদ্রাঙ্কিত টাকা (এক টাকার ধাতব মুদ্রা বা নোট) দিবে। কোন কোন দেশে হয়ত পাওনাদার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নোট গ্রহণ করিতে আইনত বাধ্য। সেক্ষেত্রে সেই ব্যাঙ্ক-নোটকে আস্থাপত্র বলিব না, সঙ্কীর্ণভাবে দেখিলেও অর্থ বলিব।

ধারে বিক্রয় না করিলে ব্যবসায় চলে না। বাস্তবিক পক্ষে, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধারে বিক্রয়ের পদ্ধতি (credit system) প্রসার লাভ করার ফলে আজকাল ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ধারে বিক্রয় অবশ্যপ্রয়োজনীয়। অনেক সময়ে খরিদ্দার খুচরা দোকানদারকে একই সঙ্গে সমস্ত জিনিসের দাম দিতে পারে না। কিছুদিন পরে শোধ করিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া সে তাহার পরিচিত দোকানদারকে কিছু পরিমাণে ধারে বিক্রয় করিতে প্ররোচিত করে। খুচরা বিক্রয়ের দোকানদারও পাইকারী দোকানদারের কাছে তাহার সব দেনা মিটাইতে না পারিয়া তাহাকে

কিছুদিনের কড়ারে—ধরা যাক ৩ মাস—ধারে বিক্রয় করিতে রাজী করে। খুচরা দোকানদারের আশা এই যে মাসতিনেক পরে সে যখন তাহার পাওনাগুলি পাইবে তখন তাহার নিজের এই দেনা শোধ করিবে। পাইকারী দোকানদারও শিল্পপতিগণকে মাসতিনেকের কড়ারে ধারে বিক্রয় করিতে রাজী করে। শিল্পপতিগণ উৎপন্ন দ্রব্যাদি সত্বর বিক্রয়ের তাগিদে সাধারণত ধারে বিক্রয় করিতে রাজী হয়। আজকাল এই রকম পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে। এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্যও এইভাবে চলে। ইহার আসল কথা হইল এই যে, লোকে একটি নির্দিষ্ট সময় (সাধারণত দুই তিন মাস) পার হওয়া মাত্র দাম দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া জিনিসপত্র কেনে। ব্যবসায়িগণ বিল স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞাটি পাকাপোক্ত করিয়া লয়। দেনাদার এবং পাওনাদার একই দেশের অধিবাসী হইয়া সেই দেশের সরকারী মুদ্রায় দেনাপাওনা মিটাইতে রাজী হইয়া যে বিল তৈয়ারি করে তাহাকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিল (internal trade bill), আর দেনাদার ও পাওনাদার দুই দেশের অধিবাসী হইয়া নির্দিষ্ট একটি দেশের সরকারী মুদ্রায় দেনাপাওনা মিটাইতে রাজী হইয়া বিল তৈয়ারি করিলে তাহাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিল (bill of exchange)।

আস্থাপত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, ঠিক যখন জিনিসপত্র কেনাবেচা হয় তখন ইহার মাধ্যমে হয়, সরকারী মুদ্রাঙ্কিত অর্থ ব্যবহার করা হয় না। অবশ্য, পাওনাদার ইহা গ্রহণ করিতে আইনত বাধ্য নয়, ইহা বিশ্বাসের উপর চলে। তথাপি ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে অনেক সময়েই আস্থাপত্রের দ্বারা পাওনাদারের হিসাব মিটানো হয়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, আস্থাপত্রগুলি অর্থের একটি বিশিষ্ট কাজ করে—ইহারা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। আস্থাপত্রগুলি legal tender money নহে। কিন্তু এগুলি অনেক ক্ষেত্রে moneyর কাজ করে।

ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট অর্থ (Bank Money)—সঙ্কীর্ণভাবে দেখিলে চেককে অর্থ বলা যায় না। তবে, একটু ব্যাপকভাবে দেখিলে—ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে বিচার করিলে—চেককেও অর্থের সমতুল্য বলিতে পারি।

একটি ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ সরকারী মুদ্রাঙ্কিত অর্থ আমানত করা হইয়াছে সেই ব্যাঙ্কের মোট আমানত যদি তাহার চেয়ে বেশী না হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ব্যাঙ্ক চেক কাটার অধিকার দান করিয়া অর্থ কিংবা অর্থতুল্য

জিনিসের পরিমাণ বাড়ায় নাই। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। 'ক' নামক ব্যাঙ্কে বিভিন্ন লোক যে সরকারী মুদ্রাঙ্কিত টাকা জমা রাখিল, ধরা যাক তাহার মোট পরিমাণ ৫ কোটি। ব্যাঙ্কের মোট আমানতও যদি ঠিক ৫ কোটি টাকা হয় তবে ইহার দাবীতে যে চেকগুলি কাটা হয় সেগুলি প্রতিনিধি হিসাবে সরকারী মুদ্রাঙ্কিত অর্থের করণীয় কাজই করিল মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অর্থের সমতুল্য কিছু তৈয়ারি করিল না।

তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্ক যাহাকে ধার দেয় তাহাকে সোজাসুজি সরকারী মুদ্রাঙ্কিত অর্থ দেয় না, তাহার নামে একটি আমানতের হিসাব খোলে। ধরা যাক 'ক' ব্যাঙ্ক রাম, শ্যাম, যদু, মধু কয়েক জনকে টাকা ধার দিয়াছে। ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে নগদ টাকা দেয় না। ব্যাঙ্ক যাহাকে যত টাকা ধার দিল তাহার নামে তত টাকা আমানত রাখিল। খাতক আমানতকারীতে পরিণত হইয়া চেক বই পাইল। সে প্রয়োজন মত চেক কাটিয়া টাকা তুলিবে। এই ব্যবস্থায় 'ক' ব্যাঙ্কের আমানত ৫ কোটি হইতে বাড়িয়া ধরা যাক ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হইল, এবং এই ৫ লক্ষ টাকা তুলিবার জন্যও চেক কাটিবার অধিকার দেওয়া হইল। আমানতকারিগণ (দেনাদার ও পাওনাদার এই উভয়বিধ) সকলে মিলিয়া একই সঙ্গে তাহাদের সব টাকা তুলিয়া লয় না। সেই জন্য, ব্যাঙ্কগুলি গচ্ছিত নগদ আমানতের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণের আমানতের ব্যবস্থা করিতে পারে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে যে চেকগুলি এই পাঁচ লক্ষ টাকার কাজ চালাইল সেগুলি কিসের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে? সরকারী মুদ্রাঙ্কিত অর্থের নিশ্চয়ই নয়। ইহারা ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট আমানতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। ব্যাঙ্ক ধার দিয়া আমানত সৃষ্টি করিয়াছে, সেই আমানতের দাবীতে অর্থতুল্য জিনিসের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং বলিতে পারি ব্যাঙ্কই অর্থতুল্য জিনিস সৃষ্টি করিল।

বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক প্রথা আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে, ব্যাঙ্কগুলি কর্জের ভিত্তিতে আমানত সৃষ্টি করিয়া বহু পরিমাণ চেক কাটিবার অধিকার তৈয়ারি করে।

কর্জমূলক আমানত সাধারণত সরকারী মুদ্রাঙ্কিত অর্থের ভিত্তিতে গঠিত আমানতের চেয়ে বেশী হয়। কর্জমূলক আমানতকে অনেক সময়ে ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট অর্থ (bank money) বলা হয়।

অর্থ সৃষ্টি (Creation of Money)—সঙ্কীর্ণভাবে দেখিলে আমরা

যাহাকে অর্থ বলিয়াছি তাহা সৃষ্টি করে সরকার। আমাদের দেশে ভারত সরকার টাকা তৈয়ারি করে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভারত সরকার কেন অনর্গল নোট ছাপাইয়া তাহার জিনিসপত্র ক্রয় করার এবং কর্মচারীদের বেতন দিবার কার্য চালায় না?

এরূপ করিলে কোন লাভ হয় না, বরং দেশের ক্ষতি হয়, সেই জন্যই সরকার এরূপ করে না। আজ হয়ত মোট ১০০০ কোটি টাকার নোট (১ টাকার নোট) চলিত আছে। কাল যদি নোটের পরিমাণ মোট ২০০০ কোটি টাকার হয়, অথচ জিনিসপত্রের উৎপাদন মোটেই না বাড়ে, তাহা হইলে জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা আছে। তখন সকলে দ্বিগুণ বেতন চাহিবে। ভারত সরকারকে দ্বিগুণ দামে জিনিস কিনিতে হইবে, কর্মচারিগণকে দ্বিগুণ বেতন দিতে হইবে। বিদেশে ত আমাদের নোটের কোন দামই নাই। সুতরাং সরকার মোটামুটি ভাবে দামের স্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নোট ছাপায়।

যদি বলি যাহা অর্থের কোন কোন কাজ করে তাহাই অর্থ, তাহা হইলে বলিব ব্যাঙ্কগুলি কর্জের ভিত্তিতে গঠিত আমানত এবং ব্যবসায়িগণ বিল ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়ায়।

প্রশ্ন

1. What are the disadvantages of the barter system? How has money facilitated purchase and sale of commodities?

(দ্রব্যবিনিময় প্রথায় অসুবিধা কি কি? অর্থের প্রচলনের ফলে কি ভাবে ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা হইয়াছে?) [১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা]

2. What is money? Describe the functions of money. (Higher Secondary Examination, 1961)

(অর্থ কাহাকে বলে? অর্থের কার্যাবলীর বিবরণ দাও।) [১৫৭-১৫৯ পৃষ্ঠা]

3. What is the precise significance of money standard? What is the standard of the Indian Rupee?

(অর্থের মান বলিলে ঠিক কি বোঝা যায়? ভারতীয় টাকার মান কি?) [১৫৯-১৬২ পৃষ্ঠা]

4. What is a bank? What are its services to society for which you consider it useful? (Higher Secondary Examination, 1961)

(ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে? ইহা সমাজের কোন্ কোন্ প্রয়োজন মিটায়?) [১৬২, ১৬৪-১৬৭ পৃষ্ঠা]

5. What are the functions of banks? Carefully explain their importance in modern business. (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)

(ব্যাঙ্কের কার্যাবলী কি কি? আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব কিরূপ বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।) [১৬৪-১৬৭ পৃষ্ঠা]

6. Discuss the functions of a central bank. (Higher Secondary Examination, 1960)

(কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী আলোচনা কর।) [১৬৩ পৃষ্ঠা]

7. How does a commercial bank lend money?

(কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কি ভাবে ধার দেয়?) [১৬৪-১৬৬ পৃষ্ঠা]

8. Explain, with illustrations, what you mean by credit instruments.

(আস্থাপত্র কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।) [১৬৭-১৬৯ পৃষ্ঠা]

9. Explain the functions of: (a) cheque, (b) internal trade bills, (c) bills of exchange

(ক) চেক, (খ) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিল এবং (গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিলের কার্যাবলী বুঝাইয়া দাও। [১৬৭-১৬৯ পৃষ্ঠা]

10. What do you mean by bank money?

(ব্যাঙ্কসৃষ্ট অর্থ বলিলে কি বোঝা যায়?) [১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা]

11. In what ways is money created?

(অর্থের সৃষ্টি কি কি ভাবে হয় বুঝাইয়া দাও।) [১৭০-১৭১ পৃষ্ঠা]

সপ্তদশ অধ্যায়

সাধারণ দর-দাম

(General Prices)

সাধারণ মূল্যস্তর (General Price Level)—অর্থের মূল্য (value of money) কি ভাবে ঠিক করা যায়? ইহার একটির পরিবর্তে অন্য কোন জিনিসের যে কয়টি পাওয়া যায় তাহাই অর্থের মূল্য। যদি এক টাকায় দুই সের চাল, আধ সের তৈল, আট সের লবণ ইত্যাদি পাওয়া যায়,

তাহা হইলে বলিব এক টাকার মূল্য দুই সের চাল, আধ সের তৈল, আট সের লবণ। এই ভাবে বিভিন্ন জিনিস অনুসারে টাকার মূল্য কত তাহা বলিতে পারি।

সাধারণ ভাবে অর্থের মূল্য কত এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হইলে আমাদের অসংখ্য জিনিসের তালিকা দিতে হয়, কারণ অর্থের মাধ্যমে অসংখ্য জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই জন্য, অর্থের মূল্য কত তাহা একটি আনুমানিক হিসাব দ্বারা বলা হয়। দেশের যাবতীয় জিনিসপত্র এবং কাজকর্মকে ইহাদের কেনাবেচার পরিমাণের অনুপাত অনুসারে কেবলমাত্র একটি দ্রব্য বলিয়া কল্পনা করা হয়। অবশ্য, ইহা একেবারেই মন-গড়া হিসাব। তবে এইরকম না করিলে অর্থের মূল্য কত তাহা বলা দুষ্কর। এই রকম করিলে, বলা যায় দ্রব্যটির পরিমাণকে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলে অর্থের মূল্য পাওয়া যাইবে।

এই কথাটি অত্যন্ত সহজবোধ্য। এ বছর আমাদের দেশে যে সব জিনিস-পত্র ও কাজকর্মের কেনাবেচা চলিল তাহার পরিমাণ যদি এক হাজার কোটি 'দ্রব্যাদি' হয় এবং এই জন্য যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক টাকার মূল্য নিশ্চয়ই $\frac{\text{১০০০ কোটি}}{\text{৫০০০ কোটি}}$ দ্রব্যাদি অর্থাৎ দ্রব্যটির এক-পঞ্চমাংশ। এই কথাটিই আবার ঘুরাইয়া বলা যায় যে দ্রব্যটির দর (price) পাঁচ টাকা। কোন দ্রব্যের দর বলিলে কয়টি অর্থ দ্বারা ইহার একটি কেনা যায় তাহাই বুঝায়। দেশে যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকা প্রয়োগ করিয়া দ্রব্যাদির কেনাবেচা চলে এবং দ্রব্যাদির পরিমাণ যদি হয় এক হাজার কোটি, তাহা হইলে একটি দ্রব্যাদির দর নিশ্চয়ই হইবে $\frac{\text{৫০০০ কোটি}}{\text{১০০০ কোটি}}$ টাকা অর্থাৎ পাঁচ টাকা। এখন কথা হইল এই যে, 'দ্রব্যাদি' এই কথাটি মন-গড়া। দ্রব্য অসংখ্য রকমের এবং বিভিন্ন পরিমাণের। সেগুলিকে দ্রব্যাদি নামক একটি জিনিসে রূপান্তরিত করা যায় না। মনগড়া এই দ্রব্যাদির দরকে সাধারণ মূল্য স্তর (general price level) বলে।

সাধারণ মূল্যস্তরের ধারণার গুরুত্ব (Importance of the Concept of General Price Level)—অর্থনীতিবিদগণ এই সাধারণ দরের কথা ধরিয়া লইয়া একটি বিশেষ দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে

চাহেন। তাঁহারা বলেন, দ্রব্যাদির পরিমাণকে অর্থের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে অর্থের মূল্য (value of money) এবং অর্থের পরিমাণকে দ্রব্যাদির পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে দ্রব্যাদির দর (general price level) পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সাধারণত দ্রব্যাদির পরিমাণ ঠিক রাখিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়াইলে, অথবা দ্রব্যাদির পরিমাণ কমাইয়া অর্থের পরিমাণ ঠিক রাখিলে, দরবৃদ্ধি (rise in the general price level) ঘটিবে। পক্ষান্তরে, দ্রব্যাদির পরিমাণ ঠিক রাখিয়া অর্থের পরিমাণ কমাইলে, অথবা দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াইয়া অর্থের পরিমাণ ঠিক রাখিলে দরহ্রাস (fall in the general price level) ঘটিবে।

সাধারণত দেখা যায় যে একটা জিনিসের দর বাড়িলে অন্য জিনিসগুলিরও দর বাড়ে। সমান অনুপাতে না বাড়িলেও, অল্প হউক বেশী হউক, বাড়ে। পক্ষান্তরে, একটা জিনিসের দর কমিলে অন্যগুলিরও দর কমে। দরের হ্রাস-বৃদ্ধির বেলায় সব জিনিসের প্রকৃতি প্রায় এক। সুতরাং সাধারণ দরের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিবার সময়ে সবগুলি জিনিসপত্র এবং কাজকর্মকে এক কথায় 'দ্রব্যাদি' বলিলে খুব বেশী ভুল হয় না। দ্রব্যাদির দর বাড়িয়াছে দেখিলে বলিব সব জিনিসের দর বাড়িয়াছে, দ্রব্যাদির দর কমিয়াছে দেখিলে বলিব সব জিনিসের দর কমিয়াছে। তবে, মনে রাখিতে হইবে যে এখানে বিশেষ কোন একটি জিনিসের দরের (price) হ্রাসবৃদ্ধির কথা বিবেচনা করা হইতেছে না। সমস্ত জিনিসকে একীভূত করিয়া ভাবা হইতেছে। সমস্ত জিনিসের এই একীভূত রূপকে 'দ্রব্যাদি' বলা হইতেছে।

এই দ্রব্যাদির দর কখন বাড়ে, কখন কমে, তাহা মোটামুটি ভাবে দেখানো হইল। সুতরাং সাধারণ দরের (কোন একটি বিশেষ জিনিসের দরের নহে) হ্রাসবৃদ্ধির কারণও মোটামুটি ভাবে বুঝানো হইল। ইহা হইতে দেশের নায়কগণ সাধারণ দরবৃদ্ধি এবং সাধারণ দরহ্রাসের কারণ দূর করিয়া মোটামুটি ভাবে এক রকম দর (constant price level) রাখিবার পথের নির্দেশ পান।

বলা বাহুল্য, অর্থের পরিমাণ যতগুণ বাড়ে দ্রব্যাদির পরিমাণও যদি ঠিক ততগুণ বাড়ে, অথবা অর্থের পরিমাণ যতগুণ কমে দ্রব্যাদির পরিমাণও যদি ঠিক ততগুণ কমে, তাহা হইলে দরের স্তর (price level) একই থাকে—কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

অর্থাৎ, দর-দাম ঠিক রাখিতে হইলে সরকারের উচিত, জিনিসপত্র এবং কাজকর্মের বহর যে অনুপাতে বাড়ে বা কমে অর্থের সরবরাহ ঠিক সেই অনুপাতে বাড়ানো বা কমানো। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, সরকার এই নীতি উপেক্ষা করিয়া অর্থ সরবরাহ (supply of money) করেন বলিয়া সাধারণ দরের হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

সাধারণ মূল্যস্তরের সূত্র (Quantity Theory of Money)—সাধারণ মূল্যস্তরের (general price level) নিয়মটি একটি সূত্রের সাহায্যে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। খুব সহজ আকারে সূত্রটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ—ধরা যাক, সাধারণ মূল্যস্তর হইল P; অর্থের পরিমাণ হইল M; দ্রব্যাদির পরিমাণ হইল T। তাহা হইলে

$$P=\frac{M}{T}$$

এখন P কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাড়িতে পারে? প্রথমত, M বাড়িয়াছে কিন্তু T একরকম আছে, এরূপ ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, M বাড়িয়াছে (ধরা যাক তিন গুণ হইয়াছে) কিন্তু T বাড়িলেও সেই অনুপাতে বাড়ে নাই (ধরা যাক দ্বিগুণ হইয়াছে), এরূপ ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, M বাড়িয়াছে কিন্তু T কমিয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে। চতুর্থত, M কমিয়াছে (ধরা যাক, অর্ধেক হইয়াছে) কিন্তু T অধিকতর অনুপাতে কমিয়াছে (ধরা যাক, এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে), এরূপ ক্ষেত্রে। পঞ্চমত, M এক রকম আছে কিন্তু T কমিয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে।

এইরূপ ভাবে P কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কমিতে পারে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একই রকম থাকিতে পারে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ মূল্যস্তরের এই নিয়মটিকে অর্থের পরিমাণের নিয়ম (Quantity Theory of Money) বলা হয়।

সাধারণ মূল্যস্তরের নিয়ন্ত্রণ—দর যাহাতে বেশী ওঠানামা না করে ইহাই সকলে চায়। অর্থাৎ সকলেই চায় যে দর-দাম মোটামুটি ভাবে এক রকম (stable) থাকুক।

অনেকে মনে করেন, দেশের সরকার চেষ্টা করিলে এই রকম অবস্থা তৈয়ারি করিতে পারে। সরকারই প্রধানত অর্থের স্রষ্টিকর্তা। সুতরাং, কি পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করা হইবে তাহা ঠিক করে সরকার। সরকার যদি জিনিসপত্র এবং কাজকর্মের বহরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থসরবরাহের কার্য

নিয়ন্ত্রণ করে তাহা হইলে জিনিসপত্রের দাম বেশী ওঠানামা করিতে পারে না। যখন উৎপাদন বাড়িতেছে, তখন সেই অনুপাতে নোট ছাপানো বাড়াইতে হয়। যখন উৎপাদন কমিতেছে, তখন সেই অনুপাতে কম নোট চালু রাখিতে হয়। আবার, উৎপাদন একই পরিমাণে চলিতে থাকিলে একই পরিমাণে নোট চালু রাখিতে হয়।

এই আসল কথাটি বুঝাইবার জন্যই 'দ্রব্যাদি' বলিয়া একটি জিনিসের কল্পনা করিয়া সাধারণ মূল্যস্তরের কথা বলা হইয়াছে।

অর্থস্ফীতি (Inflation)—'দ্রব্যাদি' কথাটি অনেকটা অলীক। সুতরাং, এই ভাবে হিসাব করিয়া জিনিসপত্রের দর-দামের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করিতে গেলে নানারকম ত্রুটি ধরা পড়ে। দর-দাম নানারকম কারণের সংমিশ্রণে বাড়ে কমে। আবার একটি জিনিসের দাম খুব বেশী বাড়িয়া গেল, আর একটি জিনিসের দাম বাড়িলেও খুব কম বাড়িল, এই রকম অবস্থাও প্রায়ই দেখা যায়।

এই সব কথা বিবেচনা করিলে বোঝা যায় যে, কি পরিমাণ অর্থ চালু রাখিলে দর-দাম স্থিতিশীল (stable) থাকে তাহা নির্ণয় করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

তবে, মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, আশুভোগ্য পণ্য (consumer goods) যে অনুপাতে বাড়িয়াছে, এই পণ্য ক্রয়ের জন্য নিয়োজিত অর্থ যদি সেই অনুপাতের চেয়ে বেশী অনুপাতে বাড়ানো হয়, তাহা হইলে আশুভোগ্য পণ্যের দর বাড়িবে।

পণ্যদ্রব্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রাখিয়া অত্যধিক অর্থ প্রচলনের ফলে যদি পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে তাহা হইলে অর্থস্ফীতি (inflation) ঘটে। অর্থস্ফীতি হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে, জিনিসপত্রের দর-দাম বাড়িয়াছে এবং এই বৃদ্ধির কারণ হইল যথোপযুক্ত পরিমাণের চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থের সরবরাহ।

অর্থস্ফীতির জন্য প্রধানত সরকার দায়ী, কারণ আসলে সরকারই অর্থের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, ব্যাঙ্কগুলিও একযোগে সুদের হার কমাইয়া কর্জদানের মাধ্যমে খুব বেশী আমানত সৃষ্টি করিয়া অর্থস্ফীতি ঘটাইতে পারে।

অর্থস্ফীতির ফলাফল (Effects of Inflation)—অর্থস্ফীতির

ফলে কোন কোন শ্রেণীর লোকের উপকার হয়, কিন্তু কোন কোন শ্রেণীর লোকের ক্ষতি হয়।

ব্যবসায়ীদের (businessmen) খুব লাভ হয়। জিনিসপত্রের দাম যে অনুপাতে বাড়ে, উৎপাদনের খরচ, অন্তত প্রথম দিকে, সেই অনুপাতে বাড়ে না। জমির খাজনা সাধারণ মূল্যস্তরের সঙ্গে সঙ্গে ত বাড়েই না, যখন বাড়ে তখনও সমান অনুপাতে বাড়ে না। আর্থিক মূলধনের সুদ, বাড়া তো দূরের কথা, বরং কমে; কারণ অর্থস্ফীতির সঙ্গে সুদের হারের (interest rate) হ্রাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মজুরদের বেতন বাবদ উৎপাদনের খরচের কথা ধরা যাক। জিনিস-পত্রের দাম বাড়িলে মজুরেরা বেশী বেতন চাহিবে, এ কথা ঠিক। কিন্তু দেশে যদি বেকারের সংখ্যা খুব বেশী থাকে তাহা হইলে বেতন সামান্য কিছু বাড়াইলে ত চলেই, মোটে না বাড়াইলেও চলা অসম্ভব নয়। বেকারের সংখ্যা বেশী না থাকিলে মজুরি বাড়াইতে হয় বটে। কিন্তু ঠিক যে সময়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িল তাহার কিছুদিন পরে মজুরি বাড়ানো হয়। মজুরদের দাবি লইয়া আলাপ আলোচনা ইত্যাদিতে বেশ কিছুদিন সময় যায়। ইতোমধ্যে খুব লাভ করিয়া নেওয়া যায়। তাহা ছাড়া, অনেক সময়েই দেখা যায়, জিনিসপত্রের দাম যত গুণ বাড়িয়াছে মজুরি ঠিক তত গুণ বাড়ে নাই।

এই সব কারণে, কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, দেশের মধ্যে জিনিস-পত্রের দাম হয়ত গড়পড়তা হিসাবে তিন গুণ হইয়াছে, কিন্তু শেয়ার-হোল্ডারদের লাভের পরিমাণ পাঁচ গুণ হইয়াছে।

কৃষিজীবিগণ (farmers) মোটামুটি ভাবে উপকৃত হয়। তাহাদের খাজনা বাড়ে না বলিলেই চলে। মূলধনের সুদের হার ত কমাই সম্ভব। অথচ কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে। সুতরাং যে অনুপাতে দর-দাম বাড়িয়াছে কৃষিজীবিগণ তাহার চেয়ে বেশী অনুপাতে লাভ ভোগ করিতে পারে।

পেশাদার শ্রেণীর লোকেরা (men in professions—যে সব উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ইত্যাদি চাকরি না করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাজ চালায়) লাভবান না হইলেও শেষ পর্যন্ত তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ঠিক প্রথমেই হয়ত তাহারা একটু অসুবিধা ভোগ করে। কিন্তু, তাহারা অতি সত্বর প্রায় সমান অনুপাতে (কেহ কেহ বেশী অনুপাতে) 'ফি' বাড়ায় এবং দর-বৃদ্ধির সঙ্গে আয়-বৃদ্ধির সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে।

মজুরেরা (wage-earners) প্রথম দিকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্তও তাহাদের আয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরবৃদ্ধির সমান তালে বাড়ে না।

চাকরিজীবিগণ (salary-earners) প্রথম দিকে ত খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শেষ পর্যন্তও তাহাদের আয় দরবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম অনুপাতেই বাড়ে।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের (teachers) কথা বলা যায়। কোন নিয়োগকর্তাই (employer) আন্দোলন না করিলে বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহে না। শিক্ষকগণ মজুরদের মত তীব্র ভাবে ত আন্দোলন করিতে পারেই না, এমন কি কেরানী প্রভৃতি অন্য ধরণের চাকরিজীবিগণের মতও সজোরে দাবি পেশ করিতে দ্বিধা বোধ করে। ফলে, তাহাদের বেতন অনেক দিনের আবেদন-নিবেদনের পরেও কম অনুপাতে বাড়ে। তাহারা দর-বৃদ্ধির দুর্ভোগ প্রথম দিকে ভীষণ ভাবে অনুভব করে।

যাহাদের আয়ের পরিমাণ চিরকালের জন্য সুনির্দিষ্ট তাহারা (men of fixed income) সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্ভোগ ভোগ করে। পেন্সন-ভোগী লোকেরা এবং যাহারা সুদের আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তাহারা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

যে লোক ১০০৲ পেন্সন পায়, সে মুদ্রাস্ফীতির পূর্বে যে সব জিনিস কিনিতে পারিত এখন হয়ত তাহার এক-পঞ্চমাংশ কিনিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলেও সাধারণত পেন্সনের পরিমাণ বাড়ে না। সুতরাং পেন্সনভোগী লোকের অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

উত্তমর্ণ শ্রেণীর লোকদেরও (creditors) একই দশা। মুদ্রাস্ফীতির পূর্বে সে যে টাকা যে রকম সুদে ধার দিয়াছিল এখন আসল হিসাবে ঠিক সেই পরিমাণ টাকা ফেরত পাইবে এবং সুদের টাকাও সেই পরিমাণে পাইবে। কিন্তু টাকার মূল্য ত অনেক কমিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সাধারণত সুদের হার কমিয়া যায়। সুতরাং কোন উত্তমর্ণ যদি এই সময়ে আরও টাকা ধার দিতে চায় তাহা হইলে টাকার অঙ্ক হিসাবেও সে কম সুদ পাইবে।

উত্তমর্ণদের যেমন ক্ষতি হয়, অধমর্ণদের (debtors) তেমন লাভ হয়। মুদ্রাস্ফীতির পূর্বে যে পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিয়া তাহারা দেয় সুদ (এবং আসলও) দিতে পারিত এখন তাহার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিয়া উহা শোধ করিতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে কিছুদিনের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়িতে থাকে। চাকরির সংখ্যাও বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে বেকারদের সুবিধা হয়। বেকারত্ব কমিয়া যায়। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম যাহা ছিল এখন তাহার কয়েকগুণ হইয়াছে। চাকরিজীবীদের আয় সেই অনুপাতে খুব কমই বাড়িয়াছে। কিন্তু তখন অনেককেই প্রাপ্তবয়স্ক অথচ বেকার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয় ইত্যাদিকে পোষণ করিতে হইত। আজকাল এই রকম আত্মীয়-স্বজনেরা কিছু কিছু আয় করে। আগে ইহাদের আয় ছিল শূন্য। এখন যাহাই হউক কিছু আয় করে। এই আয় যৌথ পরিবারের ভাণ্ডারে যোগ হওয়ার ফলে চাকরিজীবী গৃহকর্তার কষ্টের লাঘব হয়। দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্ব কমিয়াছে বলিয়াই আমাদের দেশের মজুর এবং ভদ্রলোক চাকরিজীবিগণ আজও বাঁচিয়া আছে, নতুবা ইহাদের পক্ষে জীবন ধারণ করাই অসম্ভব হইত। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে জিনিসপত্রের দাম চার গুণ হইলেও দশ জন লোকের একটি চাকরিজীবী যৌথ পরিবারের আয় পাঁচ ছয় গুণ হইয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে দরবৃদ্ধি চাকরিজীবীদের পক্ষেও ক্ষতিকর না হইয়া বরং লাভজনকই হইয়াছে।

আজকাল কল্যাণকর রাষ্ট্রের একটি প্রধান লক্ষ্য হইল পূর্ণনিয়োগের (full employment) ব্যবস্থা করা। মনে হয়, মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীত এইরূপ ব্যবস্থা সফল করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অনেক দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকারের লাভক্ষতি হইলেও মুদ্রাস্ফীতির নীতি চালু হইয়াছে।

সাধারণ মূল্যস্তরের তারতম্যের পরিমাপ (Measurement of Changes in the General Price Level)—'দ্রব্যাদি' বলিয়া কোন বাস্তব জিনিস নাই। সুতরাং, একটি বিশেষ সময়ে দরের স্তর (general price level) কত তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে কতকগুলি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এক সময়ে কিরূপ ছিল এবং অন্য সময়ে কি হারে বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া এই পরিবর্তনের একটি গড়পড়তা হিসাব বাহির করা যায়।

এই হিসাব দেখাইয়া দর কিরূপ বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে মোটামুটি ভাবে তাহার একটা আভাস দেওয়া যায়।

দরের হ্রাসবৃদ্ধির সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়, কারণ জিনিসপত্র অসংখ্য, ইহাদের দামের পরিবর্তনও সমান ভাবে হয় না, এমন কি প্রয়োজনীয় জিনিসও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কিছুটা বিভিন্ন রকমের এবং বিভিন্ন পরিমাণের।

তথাপি সামান্য একটু আভাস দেওয়ার জন্য সূচক সংখ্যা (Index Number) বলিয়া কথিত এক রকমের তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

দর পরিবর্ত্তনের সূচক সংখ্যা (Index Number)—সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য নহে। প্রথমে একটি বৎসর লইতে হয় এবং সেই বৎসরে কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লিখিতে হয়। এই বৎসরকে ভিত্তি বৎসর (base year) বলা হয়। এই ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেকটি জিনিসের দামকে '১০০' ধরিতে হয়।

যে বৎসরের কথা জানিতে চাই সেই বৎসরে প্রত্যেকটি সম-পরিমাণ জিনিসের দাম কিরূপ বাড়িল বা কমিল তাহা এই '১০০'র উপর কত বাড়িল বা কমিল তাহার দ্বারা সূচিত হয়।

বিবেচ্য বৎসরে যদি জিনিসগুলির দামের গড় কষিয়া দেখা যায় যে তাহা '১১০' হইয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জিনিসপত্রের দাম ১০% বাড়িয়াছে। এই ভাবে জিনিসগুলির দামের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। আমাদের দেশে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে) এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি জিনিসের দাম কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই পরিবর্তন বোঝা যাইবে। বলা বাহুল্য, ১৯৬০ সালে দর বাড়িয়াছে।

সূচক সংখ্যা

জিনিস	পরিমাণ	১৯৩৮ সালে দাম	সূচক	১৯৬০ সালে দাম	সূচক
চাউল	১/ মণ	৫৲	১০০	২৫৲	৫০০
চিনি	/১ সের	।০	১০০	১৲	৪০০
কয়লা	১/ মণ	।৵০	১০০	২।০	৬০০
সরিষার তৈল	/১ সের	।৵০	১০০	২।০	৬০০
কাপড়	১ খানা	২৲	১০০	৮৲	৪০০
		৫	৫০০	৫	২৫০০
			১০০		৫০০

উল্লিখিত ছক হইতে দেখা যায় যে মোটামুটি ভাবে জিনিসপত্রের দাম ৫ গুণ হইয়াছে অর্থাৎ দরবৃদ্ধি ৪০০% হইয়াছে। অর্থের বিনিময়মূল্য কোন একটি জিনিস বা কাজ দিয়াই যথার্থ ভাবে নিরূপণ করা যায়। তাই খুব অল্প-সংখ্যক জিনিস এবং একই জাতীয় জিনিসের দামের হিসাব লইলে সূচক সংখ্যা দ্বারা ঠিকভাবে দরদামের পরিবর্তন ধরা পড়ে।

প্রশ্ন

1. What is meant by the general price level? Explain the utility of finding out the general price level.

(সাধারণ মূল্যস্তর বলিলে কি বুঝায়? সাধারণ মূল্যস্তর নির্ণয়ের সার্থকতা কি?) [১৭২-১৭৬ পৃষ্ঠা]

2. On what factors does the general price level depend?

(সাধারণ মূল্যস্তর কিসের উপর নির্ভর করে?) [১৭২-১৭৩, ১৭৫ পৃষ্ঠা]

3. What do you mean by inflation? What are its effects?

(অর্থস্ফীতি বলিলে কি বুঝায়? অর্থস্ফীতির ফলাফল বিশ্লেষণ কর।) [১৭৬-১৭৯ পৃষ্ঠা]

4. What is inflation? How does inflation affect businessmen and wage-earners? (Higher Secondary Examination, 1960)

(অর্থস্ফীতি বলিলে কি বুঝায়? ব্যবসায়িগণ এবং মজুরগণের উপর অর্থস্ফীতির ফলাফল কিরূপ? ১৭৬-১৭৯ পৃষ্ঠা]

5. How will a period of rising prices affect the following groups in the population :—

(a) Farmers ; (b) Wage-earners ; (c) Teachers? (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)

(নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকদের উপর সাধারণ মূল্যস্তরের বৃদ্ধির ফলাফল কিরূপ হইবে বুঝাইয়া দাও :—

(ক) কৃষিজীবিগণ ; (খ) মজুরগণ ; (গ) শিক্ষকগণ।) [১৭৬-১৭৮ পৃষ্ঠা]

6. How are changes in the general price level measured? Prepare an index number of prices.

(সাধারণ মূল্যস্তরের তারতম্য কিভাবে নির্ণীত হয়? দর-পরিবর্তনের সূচক সংখ্যা তৈয়ারি কর।) [১৭৯-১৮১ পৃষ্ঠা]

W. B. SECONDARY EDUCATION BOARD

Syllabus in Economics for Class XI

1. International Trade : Territorial division of labour—Balance of Trade and Balance of Payments—Protection and Free Trade.
2. Markets—forms of markets—Competition and Monopoly.
3. Price determination under different market conditions—factors governing demand : price changes and income variations, elasticity of demand—factors governing supply and supply price : increasing and diminishing returns.
4. Different types of factor incomes : wages, interest, rent and profit—Collective bargaining and trade unions.

N. B. The subject is to be treated with special reference to Indian conditions.

তৃতীয় খণ্ড

ধনবিজ্ঞান

একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

অষ্টাদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(International Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে ? (What is International Trade ?) প্রাচীনকালে যাতায়াত ও মালচলাচলের জন্য তেমন কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। বাহির হইতে জিনিসপত্র আমদানি করা এবং বাহিরে জিনিসপত্র রপ্তানি করা কষ্টসাধ্য ছিল। সেই জন্য, বিভিন্ন এলাকা অর্থনৈতিক দিক হইতে বহুলাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficient) ছিল। লোকদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রায় সবই নিকটবর্তী অঞ্চলে উৎপন্ন হইত, তাহাতেই চাহিদা মিটাইতে হইত।

উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের (division of labour) রীতি চালু হইবার পূর্বে যেমন একই লোক প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের কাজ করিত, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সেইরকম আমদানি-রপ্তানির বন্দোবস্ত সহজ হইবার পূর্বে একই অঞ্চল বিভিন্ন ধরণের জিনিস তৈয়ারি করিয়া স্থানীয় চাহিদা মিটাইত।

স্বয়ংসম্পূর্ণতার ত্রুটিগুলি অনুভূত হওয়ার ফলে লোকে ক্রমে আমদানি-রপ্তানির বন্দোবস্ত উন্নত করিল। কোন একটি এলাকায় যে সব জিনিস কম আয়াসে (অর্থাৎ বেশী সুবিধায়) তৈয়ারি করা যায় সেই সব জিনিস তৈয়ারি করিয়া অন্যান্য এলাকায় রপ্তানি করিতে লাগিল। আবার এই অঞ্চলের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অন্যান্য যে সব অঞ্চলে কম আয়াসে উৎপন্ন হয় সেই সব অঞ্চল হইতে আমদানি করিতে লাগিল। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (international trade) উৎপত্তি হইল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিলে একটি রাষ্ট্রীয় এলাকার সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় এলাকার বাণিজ্য অর্থাৎ মালপত্রের আমদানি-রপ্তানি বুঝায়।

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (Territorial Division of Labour)—একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শ্রমবিভাগের একটি বিশেষ রূপ। শ্রমবিভাগে বুঝায় যে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধরণের কাজ করে,

একটি লোক বহু ধরণের কাজ করে না। যে লোক যে কাজ অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে সম্পন্ন করিতে পারে সে শুধু সেই কাজই করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও বুঝায় যে একটি দেশের শ্রমিকগণ দেশের প্রয়োজনীয় সকল পদার্থ উৎপন্ন করে না, যে সব পদার্থ স্বদেশে অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে উৎপন্ন করিতে পারে সেই সব পদার্থ উৎপন্ন করে এবং সাধারণত তাহার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সুবিধাজনক সর্তে অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি করে। ইহার ফলে সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকদের মধ্যে অঞ্চল অনুসারেও এক ধরণের কর্মবিভাগ হইয়াছে। একটি অঞ্চলের শ্রমিকগণ হয়ত গম উৎপাদন করিল, চা উৎপাদন করিল না। আবার, আর একটি অঞ্চলের লোকেরা চা উৎপাদন করিল, গম উৎপাদন করিল না। এই ভাবে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ দেখা দিল।

আপেক্ষিক সুবিধার অথবা ব্যয়ের নিয়ম (Law of Comparative Advantages or Comparative Costs)—সাধারণত (অর্থাৎ, বিভিন্ন কারণে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, আমদানি-রপ্তানির অসুবিধা কিংবা অত্যধিক খরচ, ইত্যাদি না থাকিলে), একটি দেশ বিশেষ কতকগুলি জিনিস আমদানি করে, আবার বিশেষ কতকগুলি জিনিস রপ্তানি করে। কোন্ কারণে কোন্ দেশ কোন্ কোন্ জিনিস আমদানি বা রপ্তানি করিবে তাহা উল্লিখিত আলোচনা হইতেই মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারা যায়। তবু বিশদ করিয়া বলিলে বোঝা যাইবে যে এই আমদানি-রপ্তানির কার্য একটি সাধারণ নিয়ম অনুসারে চলে।

বলা বাহুল্য, যদি কোন দেশ শত চেষ্টা করিয়াও একটি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারি করিতে না পারে তাহা হইলে সেই দেশটি ঐ জিনিস আমদানি করিবেই। ফ্রান্সের পক্ষে পাট উৎপাদন করা অসাধ্য বলিলেই চলে। সুতরাং ফ্রান্সের লোকেরা ভারত অথবা পাকিস্তান হইতে পাট ক্রয় করিতে বাধ্য।

কিন্তু এই রকম জিনিসের সংখ্যা খুব কম। প্রত্যেক দেশই প্রায় সব জিনিসই তৈয়ারি করিতে পারে। কোন কোন জিনিস তৈয়ারি করিতে ভীষণ বেগ পাইতে হয়, কোন কোন জিনিস সহজে তৈয়ারি হয়। সুতরাং, আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে, অসাধ্য জিনিসের কথা বাদ দিয়া বলাই ভাল। তাহা হইলে কোন্ জিনিসটি তৈয়ারি করিতে অধিক অথবা অধিকতর সুবিধা (advantage) ভোগ করা যায়, অর্থাৎ কোন্ জিনিসটি করিতে স্বল্প

অথবা স্বল্পতর বেগ (cost) পাইতে হয়, তাহাই কেবল বিবেচনা করিতে হইবে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় যে জিনিসটি কম আয়াসে অর্থাৎ বেশী সুবিধায় তৈয়ারি হয় তাহা তৈয়ারি করিয়া অন্যান্য দেশে চালান দেওয়া হয়।

একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইবে। ধরা যাক, একজন উকিলের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে নিজে যে ঐ দরজা কোনমতেই মেরামত করিতে পারে না তাহা নহে। কিন্তু তাহার পক্ষে উহা বেশ আয়াসসাধ্য। অথচ ওকালতির কার্য অপেক্ষাকৃত কম আয়াসসাধ্য। দরজা মেরামত করিতে হয়ত তাহার এক ঘণ্টা লাগিল। এক ঘণ্টায় ওকালতি করিয়া সে হয়ত দশ টাকা আয় করিতে পারে। তাহা হইলে দরজা মেরামত করিতে তাহার দশ টাকা খরচ পড়িল। এক জন মিস্ত্রি ডাকিয়া মেরামত করাইলে দশ মিনিটে কাজ হইয়া যাইতে পারে এবং নানা কারণে মিস্ত্রির পারিশ্রমিক উকিলের পারিশ্রমিকের চেয়ে কম বলিয়া খরচ হইল হয়ত আট আনা মাত্র। মিস্ত্রির আবার আইনের পরামর্শ দরকার হইলে উকিলকে পারিশ্রমিক দিয়া পরামর্শ নেয়; কারণ, নিজে বইপত্র পড়িয়া আইন বুঝিবার কাজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

স্পষ্টই বোঝা যায়, একটি লোকের পক্ষে বিশেষ একটি কাজ বেশী সহজে অর্থাৎ কম খরচে করা সম্ভব হয় এবং এইরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া একে অন্যের কাজ ক্রয় করে।

বিভিন্ন দেশগুলির কথা ভাবিলেও দেখা যায় যে অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান আছে।

ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি দেশের ব্যাপারে কয়লা ও তুলার উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের কথা ভাবা যাক।

ধরা যাক, ১ একক উৎপাদক নিয়োগ করিয়া ভারত ৩০ মণ ও পাকিস্তান ২০ মণ কয়লা এবং ভারত ১ মণ ও পাকিস্তান ২ মণ তুলা উৎপাদন করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ভারত যদি তাহার ২ একক উৎপাদকই কয়লার উৎপাদনে এবং পাকিস্তান তাহার ২ একক উৎপাদকই তুলার উৎপাদনে প্রয়োগ করে তাহা হইলে ভারতে ৬০ মণ কয়লা এবং পাকিস্তানে ৪ মণ তুলার উৎপাদন হইবে।

তখন ভারতের পক্ষে ২৫ মণ কয়লার বিনিময়ে পাকিস্তান হইতে ১ মণ তুলা আমদানি করা এবং পাকিস্তানের পক্ষে ১ মণ তুলার বিনিময়ে ভারত হইতে ২৫ মণ কয়লা আমদানি করা লাভজনক হইবে—অবশ্য, আমদানি-রপ্তানির অসুবিধা এবং খরচ ইত্যাদি অত্যন্ত নগণ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে। বিনিময়ের পরে, ভারতের রহিল ৩৫ মণ কয়লা এবং ১ মণ তুলা, আর পাকিস্তানের রহিল ২৫ মণ কয়লা এবং ৩ মণ তুলা। অথচ দুইটি দেশই ২ একক করিয়া উৎপাদক নিয়োগ করিল।

যদি এই দুইটি দেশ লইয়াই পৃথিবী গঠিত বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে পৃথিবীতে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণও বাড়িয়া গেল। ভারত যদি কয়লা এবং তুলা দুইটি জিনিসই এবং পাকিস্তানও যদি কয়লা এবং তুলা দুইটি জিনিসই উৎপাদন করিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে মোট ৫০ মণ কয়লা এবং ৩ মণ তুলা উৎপন্ন হইত। কিন্তু ভারত কয়লা এবং পাকিস্তান তুলা উৎপাদন করিলে পৃথিবীতে মোট ৬০ মণ কয়লা এবং ৪ মণ তুলা উৎপন্ন হইবে।

এই দৃষ্টান্তটির দ্বারা বোঝা যায়, একটি দেশে যে জিনিস অন্য দেশের চেয়ে বেশী সহজে অর্থাৎ কম খরচে উৎপন্ন হয় সেই দেশটি সেই জিনিসই উৎপাদন করিয়া অন্য দেশে রপ্তানি করে এবং অন্য দেশে যাহা বেশী সহজে অর্থাৎ কম খরচে উৎপন্ন হয় তাহা সেখান হইতে আমদানি করে। তাহাতে পৃথিবীর মোট উৎপাদন বাড়িয়া যায় এবং বিনিময়ের হারও এমন ভাবে ঠিক হয় যে উভয় দেশেরই লাভ হয়।

কিন্তু, এমন অবস্থাও হইতে পারে যে একটি দেশে বিভিন্ন জিনিসই অন্য একটি দেশের তুলনায় বেশী সুবিধায় অর্থাৎ কম খরচে উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায়ও এই দুই দেশের পক্ষেই কোন একটি কিংবা কয়েকটি জিনিস উৎপাদনের দিকে নজর দিয়া পরস্পর আমদানি-রপ্তানি কার্য চালানো লাভজনক হইতে পারে।

ধরা যাক, ১ একক উৎপাদক নিয়োগ করিলে ভারত ৩০ মণ ও পাকিস্তান ২০ মণ কয়লা এবং ভারত ১ মণ ও পাকিস্তান ½ মণ তুলা উৎপাদন করিতে পারে। মনে করা যাক, ভারত ও পাকিস্তান ১ একক উৎপাদক কয়লার উৎপাদনের জন্য এবং ২ একক উৎপাদক তুলার উৎপাদনের জন্য—মোট এই ৩ একক করিয়া উৎপাদক নিয়োগ করিতেছে। তাহা হইলে ভারতে ৩০ মণ কয়লা ও ২ মণ তুলা এবং পাকিস্তানে ২০ মণ কয়লা ও ১ মণ তুলা উৎপন্ন হইবে।

যদি ভারত তাহার ৩ একক উৎপাদকই তুলার উৎপাদনে এবং পাকিস্তান তাহার ৩ একক উৎপাদকই কয়লার উৎপাদনে খাটায় তাহা হইলে ভারতে ৩ মণ তুলা এবং পাকিস্তানে ৬০ মণ কয়লা উৎপন্ন হইবে।

এই রকম করিলে, ভারত ১ মণ তুলার বিনিময়ে পাকিস্তান হইতে ৩৫ মণ কয়লা আমদানি করিতে পারে। তাহার ফলে ভারতের থাকিবে ৩৫ মণ কয়লা এবং ২ মণ তুলা, আর পাকিস্তানের থাকিবে ২৫ মণ কয়লা এবং ১ মণ তুলা।

ইহাতে পৃথিবীর মোট উৎপাদনও বাড়িবে এবং ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই লাভ হইবে।

সেই জন্য, এইরূপ অবস্থায়ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত মনে হইতে পারে যে কয়লা ও তুলা দুইটি জিনিসের উৎপাদনেই ভারত পাকিস্তানের চেয়ে অধিক সুবিধা ভোগ করে বলিয়া পাকিস্তান হইতে সে এই দুইটি জিনিসের কোনটিই আমদানি করিবে না। কিন্তু সুবিধারও তারতম্য আছে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুইটি জিনিসের ব্যাপারেই ভারত অধিক সুবিধা (স্বল্প খরচ) ভোগ করে, তাহা হইলেও তুলার ব্যাপারে সে অধিকতর (কয়লায় দেড়গুণ, তুলায় দ্বিগুণ) সুবিধা (স্বল্পতর খরচ) ভোগ করে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে অধিকতর সুবিধা আছে বলিয়াই ভারত কয়লা উৎপাদন না করিয়া তুলা উৎপাদন করে এবং কম অসুবিধা আছে বলিয়াই পাকিস্তান তুলার বদলে কয়লা উৎপাদন করে।

এই অবস্থায়ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে।

এই সকল কাল্পনিক দৃষ্টান্ত অনুধাবন করিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে একটি সূত্র পাওয়া যায়। পরিবহনের খরচের (cost of transport) কথা এবং নানা কারণে সরকার কর্তৃক বাধাদানের কথা উপেক্ষা করিলে বলা যায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি সাধারণ নিয়মে চলে।

এই নিয়মটিকে আপেক্ষিক (অধিক কিংবা অধিকতর) সুবিধার নিয়ম (law of comparative advantages) অথবা আপেক্ষিক (স্বল্প কিংবা স্বল্পতর) ব্যয়ের নিয়ম (law of comparative costs) বলা হয়।

বহির্বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Foreign Trade)—বিভিন্ন দেশের বহির্বাণিজ্যের (foreign

trade) সামগ্রিক রূপকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। বহির্বাণিজ্য দুই রকমের হইতে পারে—(১) অবাধ (free) অথবা (২) নিয়ন্ত্রিত (regulated)।

একটি দেশ আমদানি-রপ্তানির (import and export) ব্যাপারে কোন রকম বিধিনিষেধ আরোপ না করিয়া বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইলে বলা হয় যে সেই দেশটি অবাধ বাণিজ্যের নীতি (policy of free trade) গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থায় আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়ম (অবশ্য, পরিবহনের খরচ উপেক্ষা করিলে) পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী হয়।

কিন্তু কোন দেশ যদি অন্যান্য সুবিধার—যেমন, দেশকে শিল্পসম্পন্ন (industrialised) অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficient) করার সুবিধার—কথা বিবেচনা করিয়া আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়মটি উপেক্ষা করে এবং বহির্বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, তাহা হইলে বলা হয় যে সেই দেশটি নিয়ন্ত্রিত বহির্বাণিজ্যের নীতি (policy of regulated foreign trade) গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থায়ও বহির্বাণিজ্য চলে, দেশটির আমদানি-রপ্তানির কাজ বন্ধ হইয়া যায় না। তবে, এই আমদানি-রপ্তানির কাজে (বিশেষত, আমদানির কাজে) আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়ম অনুসরণ করা হয় না।

অবাধ কিংবা নিয়ন্ত্রিত যে রকমেরই হউক না কেন, বহির্বাণিজ্যের কয়েকটি সুফল সর্বদাই অনুভব করা যায়। এই সব সুফল আছে বলিয়াই বিভিন্ন দেশের বহির্বাণিজ্য অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

এমন অনেক জিনিস আছে যাহা দেশে মোটেই পাওয়া যায় না। এই সব জিনিস বিদেশ হইতে আমদানি না করিলে দেশের ক্ষতি হইতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যবস্থা থাকায় স্বদেশে অপ্রাপ্য এই সব জিনিস লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলে এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হয়। জিনিসপত্র কেনা-বেচার মধ্য দিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহার ফলে এক দেশ অন্য দেশের আর্থিক সংগঠন, উৎপাদন-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে ত পরিচয় লাভ করেই, তাহা ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি, সাহিত্য-দর্শন-চারুকলা ইত্যাদিরও সন্ধান পায়। এক দেশের উন্নততর পদ্ধতি অন্য দেশ গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ ভাবে, শেষ পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক ধরণের সংস্কৃতিও গড়িয়া ওঠে।

আবার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি চলে তাহার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে। যে কোন প্রকারের বহির্বাণিজ্যের ইহাও একটি সুফল।

কোন কোন সুফল নিয়ন্ত্রিত বহির্বাণিজ্যে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র অবাধ বহির্বাণিজ্যেই পাওয়া যায়।

অবাধ বহির্বাণিজ্য (free trade) আপেক্ষিক সুবিধার নিয়মে চলে। ইহার সুফল আপেক্ষিক সুবিধার নিয়মের মধ্যেই পরিস্ফুট।

অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধগতিতে চলিলে সমগ্র পৃথিবীর এবং প্রত্যেকটি দেশেরই উপকার হয়।

তাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃতিক কারণে এবং শ্রমিকের বিশেষ ধরণের দক্ষতার ফলে এক একটি দেশে কোন কোন জিনিস বেশ ভাল ভাবে তৈয়ারি হয়, কিন্তু কোন কোন জিনিস মোটেই তৈয়ারি হয় না অথবা হইলেও আনুপাতিক ভাবে খুব বেশী খরচে তৈয়ারি হয়। সুতরাং, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধ ভাবে চলিলে আমদানিকারক দেশ অপ্রাপ্য জিনিস পায় এবং অপেক্ষাকৃত কম দামে অন্যান্য জিনিস পায় এবং রপ্তানিকারক দেশও যে জিনিস তৈয়ারি করিতে বেশী সুবিধা তাহা প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি এবং বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কারণ প্রত্যেক দেশই যে জিনিস তৈয়ারি করিতে বেশী সুবিধা সেই জিনিস তৈয়ারি করে এবং তাহার ফলে সেই জিনিসটি পৃথক ভাবে বিভিন্ন দেশে তৈয়ারি হইলে যে পরিমাণে তৈয়ারি হইত তাহার চেয়ে বেশী পরিমাণে তৈয়ারি হয়।

এই ধরণের অর্থনীতিবিদগণই আপেক্ষিক সুবিধার অথবা আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়মের কথা বলেন। কিন্তু ইহাদের ধারণার মধ্যে গলদ আছে।

প্রথমত, অবাধ বাণিজ্যনীতির বিশেষ একটি কুফল হইল এই যে একটি দেশ মাত্র একটি অথবা সামান্য কয়েকটি জিনিস তৈয়ারি করার মধ্যে ইহার উৎপাদন-ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ রাখিলে দেশটি বিপন্ন হইতে পারে।

আর্থিক জগতে এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যে, এই নির্দিষ্ট একটি অথবা সামান্য কয়েকটি জিনিসের দাম ভীষণভাবে কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য জিনিসের দাম তেমন কমে নাই। তখন এই দেশের আর্থিক জীবনে বিপর্যয় আসে। দেশে তৈয়ারি জিনিস খুব কম দামে বিদেশে বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস দেশে মোটেই তৈয়ারি হয় না বলিয়া

বিদেশ হইতে বেশী দাম দিয়াও আনাইতে হয়। দেশের বহুসংখ্যক শ্রমিক বেকার হইয়া দুর্দশাগ্রস্ত হয়। অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে নাই বলিয়া তাহারা নিয়োগের সুযোগও পায় না।

দেশটি আর এক ভাবেও বিপন্ন হইতে পারে। এই দেশ যে সব দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি করে অথবা যে সব দেশে জিনিসপত্র রপ্তানি করে সেই সব দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে আমদানি-রপ্তানির কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। সেই অবস্থায় দেশটির ভয়ানক ক্ষতি হয়।

দ্বিতীয়ত, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আর একটি কুফল হইল এই যে ইহার ফলে কোন কোন দেশ ভাল ভাবে ইহার প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান লয় না এবং যথোপযুক্তভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না।

কোন কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এত বেশী থাকিতে পারে যে ইহার সদ্ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বিদেশ হইতে ঐ সকল শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করিতে অভ্যস্ত হইয়া এই সব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে না। এই জন্য, ঐ দেশগুলির উন্নয়ন হয় না। সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের পরিমাণও কম থাকিয়া যায়।

তৃতীয়ত, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আর্থিক লাভ হইলেও দেশরক্ষার (defence) ব্যাপারে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সামরিক শক্তির উন্নতির জন্য বিভিন্ন রকম কৃষিজাত ও শিল্পজাত জিনিসের প্রয়োজন। কোন কোন সময়ে কোন কোন জিনিস বিদেশ হইতে আমদানি করিতে—বিশেষত, সামরিক প্রয়োজনে—বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। অথচ, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিলে অনেক জিনিসের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেই হয়। ফলে, সামরিক শক্তি লাভের চেষ্টা ব্যাহত হইতে পারে।

অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই সব কুফল আছে বলিয়া সকল দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কিছু না কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে।

বাস্তবিক পক্ষে, প্রত্যেক দেশই নিজের স্বার্থ অনুসারে বহির্বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করে।

বিভিন্ন স্থানে নিজেদের শিল্পজাত দ্রব্য বিনা বাধায় সহজে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজগণ অবাধ বহির্বাণিজ্যনীতির জয়গান গাহিয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই আমেরিকা ও জার্মেনী নিজেদের কারখানা-

শিল্প উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে অবাধ বহির্বাণিজ্য নীতির নিন্দা করিয়াছে। সহজেই বোঝা যায় যে এই বিষয়ে সর্ববাদিসম্মত কোন সিদ্ধান্ত নাই।

আজকাল সকল দেশই অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তি (trade pact) করিয়া নিজেদের বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করে। তাহা ছাড়া, প্রায় সকল দেশই সংরক্ষণ নীতি (policy of protection) অবলম্বন করিয়াছে।

সংরক্ষণ নীতি (Policy of Protection)—অনেক অর্থনীতিবিদ অবাধ বহির্বাণিজ্যের পক্ষে নানা রকম যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহারা আপেক্ষিক সুবিধার নিয়মের উল্লেখ করিয়া অবাধ বহির্বাণিজ্যের সুফল ব্যাখ্যা করেন।

এই ধরণের অর্থনীতিবিদগণ কয়েকটি বিষয় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লন। তাঁহারা মনে করেন, একটি দেশের পক্ষে কোন কোন জিনিস তৈয়ারি করিবার অসুবিধা বরাবরই থাকিবে, এক দেশ হইতে আর এক দেশে মাল চলাচলের ব্যবস্থা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে, বিভিন্ন জিনিসের বিনিময়হার বরাবর এক রকম থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক লাভের আশায় দেশরক্ষার বন্দোবস্তেও অবহেলা করা অসঙ্গত নয়, ইত্যাদি।

কিন্তু এই অনুমানগুলির কোনটিই যুক্তিসহ নহে। এই অনুমানগুলির মধ্যে কোন ত্রুটি না থাকিলে অবাধ বহির্বাণিজ্য বাস্তবিকই প্রত্যেক দেশের পক্ষে লাভজনক হইত। কিন্তু এই অনুমানগুলির মধ্যে ত্রুটি আছে এবং এই সব ত্রুটির ফলে অবাধ বহির্বাণিজ্যের অসুবিধাগুলি পরিস্ফুট হয়। অনুমানগুলির ত্রুটি দেখাইয়া অনেকেই অবাধ বহির্বাণিজ্যের বদলে সংরক্ষণ নীতি (policy of protection) অবলম্বন করিতে বলেন।

ভারতের কথাই ধরা যাক। আজ হয়ত চা ও সাইকেল এই দুইটি জিনিসের মধ্যে ইংলণ্ডের পক্ষে সাইকেল এবং ভারতের পক্ষে চা-এর উৎপাদন তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য। কিন্তু ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িবার ফলে এবং যন্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে সাইকেলের উৎপাদনও তুলনামূলকভাবেই সহজসাধ্য হইতে পারে। সুতরাং, ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা থাকিলে, শৈশবাবস্থায় ভারতে সাইকেল উৎপাদনের কাজ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষা করা উচিত।

এই জন্য অনেকে শিশুশিল্প সংরক্ষণের (protection of infant industries) নীতি সমর্থন করেন। বলা বাহুল্য, এই নীতির সমর্থকগণ কেবলমাত্র কিছু দিনের জন্য (কেবলমাত্র শৈশবাবস্থায়) এবং কেবলমাত্র কয়েকটি শিল্পের (ভবিষ্যতে অবাধ বহির্বাণিজ্য চালু করিলেও সেগুলির বিদেশী শিল্পের সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা আছে) সংরক্ষণ করিতে বলেন।

অনেকে আবার শিশুশিল্প ছাড়া অন্য অনেক শিল্পও রক্ষা করিতে বলেন। তাঁহাদের মতে, শুধু কিছুদিনের জন্য নহে, দরকার হইলে চিরকালের জন্য, এবং কেবলমাত্র বাছিয়া বাছিয়া (discriminating) কয়েকটি শিল্প নহে, বহু রকমের শিল্পই রক্ষা করা উচিত।

তাঁহারা বলেন, বিভিন্ন কারণে প্রত্যেক জাতিরই স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficient) হওয়া উচিত। বিদেশী জিনিসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে।

যে দেশ হইতে জিনিসটি আমদানি করা হইতেছে অথবা যে দেশে মাল রপ্তানি করা হইতেছে সেই দেশটি যুদ্ধরত হইলে কিংবা বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে মালপত্র যোগাড় করা অথবা মালপত্র বিক্রয় করা অসম্ভব হইবে।

তাহা ছাড়া, আজ আমরা একটি জিনিসের একটি পরিমাণের বদলে বিদেশী একটি জিনিসের যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাইতেছি কিছুদিন পরে হয়ত তাহার অর্ধেকও পাইতে পারি। ইহার কারণ এই যে, বিভিন্ন জিনিসের আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার সর্বদা এক রকম থাকে না। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জগৎব্যাপী যে মন্দার বাজার আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কাঁচা মালের দাম আরও বেশী কমিয়াছিল। ফলে ভারত প্রভৃতি যে সব দেশ কাঁচা মাল রপ্তানি করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি হইতে তৈয়ারি মাল (finished goods) আমদানি করিত সেই সব দেশ ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই রকম অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে বিভিন্ন ধরণের জিনিস উৎপাদনের (diversification of industries) দিকে দৃষ্টি দিতে হয় এবং সেই জন্য অনেক রকমের জিনিসের উৎপাদন সংরক্ষিত করিতে হয়। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (national self-sufficiency) কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণে নহে, দেশরক্ষার (defence) কার্যের জন্যও

প্রয়োজন। দেশরক্ষার কার্যের জন্য খাদ্য, উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করা দরকার। সুতরাং, সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য ও সর্ববিধ যন্ত্রশিল্পের উন্নতি করা দরকার। দেশরক্ষার মত একটি অবশ্যকর্তব্য কার্যের জন্য বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছু পরিমাণ ক্ষতি—সে ক্ষতি চিরস্থায়ী হইলেও—স্বীকার করা কর্তব্য।

সংরক্ষণ নীতির ফলে অন্ততঃ সাময়িকভাবে কিছু লোকের কিছু পরিমাণ ক্ষতি অবশ্যই হয়।

দেশের কোন শিল্প সংরক্ষণ করিতে হইলে দুইটি উপায়ের যে কোন একটি অথবা দুইটিই অবলম্বন করিতে হয়।

একটি উপায় হইল শিল্পটিকে এমন ভাবে অর্থসাহায্য (bounty) দেওয়া যাহাতে ঐ শিল্পজাত মাল অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রীত হইয়া বিদেশী মালের সহিত সমপর্যায়ে প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

কিন্তু সরকার ত এই সাহায্যের টাকা দেশের লোকের নিকট হইতেই কর প্রভৃতির দ্বারা আদায় করে। ইহাতে করদাতাদের কিছু ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

আর একটি উপায় হইতেছে বিদেশী মালের আমদানি একেবারে বন্ধ করা অথবা এত বেশী আমদানি-শুল্ক (import duty) বসানো যে শুল্কসহ ঐ মালের দাম দেশী মালের দামের চেয়ে কম ত থাকেই না, বরং অনেক বেশী হইয়া যায়। সাধারণতঃ বিদেশী জিনিসের উপর খুব বেশী আমদানি-শুল্ক বসাইয়াই দেশী জিনিসের উৎপাদন ও বিক্রয়ে সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ দেশী শিল্প সংরক্ষণ করা হয়।

ইহাতে ক্রেতারা বেশী দামে জিনিসটি কিনিতে বাধ্য হয়। তাহাতে তাহাদের কিছু ক্ষতি হয়ই, কিন্তু দেশের সকল করদাতার ক্ষতি হয় না।

সংরক্ষণ নীতির এই সব কুফল থাকিলেও আজকাল সকল দেশই অন্ততঃ মোটামুটি ভাবে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্যনীতি—বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারত সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

সংরক্ষণের পক্ষে যত রকমের যুক্তি দেখানো হয়, সবই ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য।

ভারত অর্ধোন্নত দেশ (under-developed country)। তবে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (natural resources) যথেষ্ট। সুতরাং, ইহার উন্নয়ন (development) সম্ভব। ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উন্নয়ন সফল করিতে চেষ্টা করিতেছে। উন্নয়নের সময়ে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও—বিশেষত, মৌলিক শিল্পের (key industries)—উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু অর্ধোন্নত ভারতের বেশীর ভাগ শিল্পই শিশু-শিল্প (infant industries)। সযত্নে সংরক্ষণ না করিলে শিশু-শিল্পগুলি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অথচ এই শিল্পগুলির উন্নতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার সার্থকতা আছে।

তাহা ছাড়া, ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ (self-sufficient) না করিলে যে সব দেশের সহিত আমাদের আমদানি-রপ্তানি চলিতেছে সেই সব দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে অথবা আমরা যে সব জিনিসপত্র রপ্তানি করি তাহার দাম বেশী অনুপাতে কমিয়া গেলে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হইতে পারে। দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ না করিলে দেশরক্ষার (defence) কাজও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে।

১৯২১ সালে স্বল্পাকারে সংরক্ষণ নীতির কথা ওঠে। কিছু দিনের মধ্যেই বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির (policy of discriminating protection) প্রবর্তন হয়। এই সময়ে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি শিল্পকে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, সরকারের উদ্দেশ্য ছিল শিশু-শিল্পকে সংরক্ষিত করা।

১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতের সরকার ব্যাপকভাবে সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করে।

বর্তমান নীতি হইল এই যে, দেশরক্ষার সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত শিল্পগুলি এবং মৌলিক শিল্পগুলি সংরক্ষিত করিবার ব্যাপারে বাছ-বিচারের কথা উঠিবে না এবং অন্যান্য শিল্পগুলিও উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংরক্ষিত করা হইবে।

সুতরাং, আজকাল কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে বটে, কিন্তু কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবেই।

বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (**Balance of Trade**)—একটি দেশ বিদেশের সহিত আর্থিক সম্পর্কের দ্বারা উন্নতির দিকে যাইতেছে, না অবনতির দিকে যাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার কতকগুলি সহজ উপায় আছে।

একটি উপায় হইল স্বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল জিনিস আমদানি এবং রপ্তানি করা হইয়াছে তাহার মূল্যতালিকা।

ভারতের কথাই ধরা যাক। একটি নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত এক বৎসর) মধ্যে ভারত যে সকল জিনিস রপ্তানি করিয়াছে তাহার মোট মূল্য হইতে যে সকল জিনিস আমদানি করিয়াছে তাহার মোট মূল্য বাদ দিতে হইবে। বিয়োগফল ধনাত্মক (+) হইতে পারে, আবার ঋণাত্মকও (−) হইতে পারে। যাহাই হউক না কেন, বিয়োগফলটিকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (balance of trade) বলা হইয়া থাকে। এই উদ্বৃত্ত ধনাত্মক হইলে তাহাকে অনুকূল উদ্বৃত্ত (favourable balance of trade) এবং ঋণাত্মক হইলে তাহাকে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (unfavourable balance of trade) বলা হয়।

ভারত যদি ১০০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানি করিয়া ৯০০ কোটি টাকার মাল আমদানি করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার ১০০ কোটি টাকা অনুকূল উদ্বৃত্ত হইল। কিন্তু ১০০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানি করিয়া ১২০০ কোটি টাকার মাল আমদানি করিলে তাহার ২০০ কোটি টাকা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইবে।

অনেক সময়ে মনে হইতে পারে যে, বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকূল উদ্বৃত্ত হইলেই দেশের লাভ হইতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত জানিলে কেবলমাত্র জিনিসপত্রের—তাহাও স্বর্ণ ব্যতীত—আমদানি-রপ্তানির কথাই জানা যায়। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহু খাতে বিদেশের সহিত দেনাপাওনা চলে। সেই সব বিবেচনা না করিলে দেশের মোট লাভক্ষতির কথা সঠিকভাবে জানা যায় না।

বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্ত (**Balance of Payments**)—পণ্য বস্তুর আমদানি-রপ্তানি ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারের মাধ্যমেও বিদেশের সহিত দেনা-পাওনার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জাহাজ ভাড়া হিসাবে আয় অথবা ব্যয়,

মাল চলাচলের জন্য ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর প্রাপ্য বাবদ আয় অথবা ব্যয়, পর্যটকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আয় অথবা ব্যয়, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিদেশে গচ্ছিত অর্থ বাড়ানো অথবা কমানো, কর্জ হিসাবে বিদেশ হইতে অর্থ আনানো অথবা বিদেশকে অর্থ দেওয়া, সুদ হিসাবে দেনাপাওনা, বিদেশে স্থিত দেশীয় সম্পত্তি হইতে অর্থলাভ অথবা দেশে স্থিত বিদেশী মালিকদের সম্পত্তি হইতে তাহাদের অর্থলাভ—এই রকম বিভিন্ন খাতেও একটি দেশের দেনাপাওনা হইতে পারে।

স্বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য মালপত্রের আমদানি-রপ্তানি এবং উল্লিখিত সকল রকমের হিসাব করিয়া একটি দেশ এক বৎসরে মোট যে অর্থ পাইয়াছে তাহা হইতে সেই দেশটি মোট যে অর্থ অন্যান্য দেশে দিয়াছে তাহা বাদ দিলে বিয়োগফলটিকে বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্ত (balance of payments) বলা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের ন্যায় বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্তও অনুকূল (favourable) কিংবা প্রতিকূল (unfavourable) হইতে পারে।

কোন দেশের বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে, যে পরিমাণ অনুকূল হইয়াছে দেশটি ঠিক সেই পরিমাণ স্বর্ণ পাইবে। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে দেশটিকে বিদেশে স্বর্ণ পাঠাইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, স্বর্ণের আমদানি-রপ্তানিও হিসাবের মধ্যে ধরিলে বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্ত সকল স্থলেই শূন্য হইতে বাধ্য।

বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্ত জানিলেও দেশের আর্থিক লাভক্ষতি সম্পর্কে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

ভারতের কথাই ভাবা যাক। ভারত হয়ত বিদেশ হইতে টাকা ধার করিয়া এবং বিদেশে স্থিত ভারতীয় মূলধন (যেমন, বিদেশে গচ্ছিত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থ) খরচ করিয়া হিসাবের উদ্বৃত্তের তালিকায় আয়ের খাত পুষ্ট করিল এবং ইহার ফলে হয়ত তাহার উদ্বৃত্ত প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলই হইল। কিন্তু ইহাতে ভারতের উন্নতি হইতেছে কিংবা অবনতি হইতেছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই ব্যবস্থার ফলে ভারত তাহার বিদেশে স্থিত মূলধন হারাইতেছে এবং তদুপরি বিদেশের খাতক হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে বিদেশে অর্থ পাঠাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে।

এই জন্য অনেকে মূলধনের খাতটি বাদ দিয়া হিসাবের উদ্বৃত্ত বিচার করেন।

কর্জ দেওয়া-নেওয়া এবং বৈদেশিক সম্পত্তি বাড়ানো-কমানো—এই রকম যে সকল ব্যাপার মূলধনের পর্যায়ে পড়ে তাহা ব্যতীত অন্যান্য দেনা-পাওনার তালিকা ঠিক করিলে বৈদেশিক চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত (balance of current payments) পাওয়া যায়।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে এই বৈদেশিক চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে নিঃসন্দেহভাবে দেশের লাভ হইতেছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of India's Foreign Trade)—ভারত সাধারণভাবে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছে। তবে জাতিসঙ্ঘের (Commonwealth of Nations) অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারত সরকার আমদানির উপর অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক ধার্য করে। ইহা একটি বিশেষ ধরণের চুক্তির ফল।

ভারত বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি (trade agreements) সম্পন্ন করিয়া বহির্বাণিজ্যের প্রসার করিতে চেষ্টা করে।

আজকাল আমরা যে সব জিনিস আমদানির জন্য অর্থ ব্যয় করি তাহার মধ্যে সব চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করা হয় যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে আমরা বছরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করি, আমদানি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যন্ত্রপাতির অনুপাত ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৫৬ সাল হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসরের মোট আমদানির ২০ হইতে ২৫ শতাংশ হইল যন্ত্রপাতি। কিন্তু ১৯৫২ সালে যন্ত্রপাতি মোট আমদানির ১৪ শতাংশেরও কম ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, আমদানির প্রকৃতি বদলাইতেছে। ভোগ্যবস্তুর তুলনায় যন্ত্রপাতির অনুপাত বাড়িয়া যাইতেছে। যন্ত্রপাতির পরে মূল্যের গুরুত্বের ক্রমানুসারে ভারত যাহা আমদানি করে তাহা হইল লৌহ ও ইস্পাত, পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্য, গম ও চাল, তুলা, ইত্যাদি। আমরা কিছু কিছু মূল্যের কাগজ, রঙ, কাপড়-চোপড়, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র, তাম্র এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ, পাট ইত্যাদিও আমদানি করি। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে

দেশ-বিভাগের পরে ভারত প্রথম দিকে পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করিতে বাধ্য হইত, কিন্তু পাটের চাষ ক্রমান্বয়ে উন্নত করিয়া এখন ভারত পাট বিষয়ে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে। আজকাল আমরা খুব কম পাট (৫।৬ কোটি টাকার) আমদানি করি।

আজকাল আমরা যে সব জিনিস রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে অর্থ উপার্জন করি তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি জিনিস হইল চা এবং পাটজাত দ্রব্য (চট, বস্তা ইত্যাদি)। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, জিনিসপত্র রপ্তানির ফলে আমাদের মোট যে টাকা আয় হয় তাহার ২০ শতাংশ চা হইতে এবং ২০ শতাংশ পাটজাত দ্রব্য হইতে আসে। রপ্তানির ব্যাপারে তৃতীয় স্থান দখল করিয়া আছে কাপড়-চোপড়। মোট রপ্তানির টাকার ১০ শতাংশ কাপড়-চোপড় হইতে আসে। ইহা ছাড়া আমরা তুলা, পশম, চিনি, তামাক, সুতা, কফি, চামড়া, কয়লা ইত্যাদি রপ্তানি করিয়াও কিছু কিছু টাকা আয় করি। আমাদের শিল্পজাত তৈয়ারি মালের (finished products) রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যাইতেছে।

আমাদের আমদানি-রপ্তানির সম্পর্ক কোন্ কোন্ দেশের সহিত কি পরিমাণে হয় তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমদানি এবং রপ্তানি এই উভয় ক্ষেত্রেই ইংলণ্ডের প্রাধান্য এখনও প্রবল রহিয়াছে। টাকার হিসাবে মোট আমদানির প্রায় ২৫ শতাংশ ইংলণ্ড হইতে আসে। রপ্তানির প্রায় ২৫ শতাংশ ইংলণ্ডে যায়। আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র) দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়াছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, মোট আমদানির ১৫ শতাংশ আমেরিকা হইতে আসে এবং মোট রপ্তানির ১৫ শতাংশ আমেরিকায় যায়। আমদানির ব্যাপারে তৃতীয় স্থান পশ্চিম জার্মেনীর, চতুর্থ স্থান জাপানের। রপ্তানির ব্যাপারে তৃতীয় স্থান জাপানের, চতুর্থ স্থান অস্ট্রেলিয়ার এবং সপ্তম স্থান পশ্চিম জার্মেনীর। রাশিয়ার স্থান আমদানির ব্যাপারে অষ্টম, রপ্তানির ব্যাপারে পঞ্চম। পাকিস্তান হইতে আমরা যে টাকার জিনিস কিনি পাকিস্তান সাধারণত তাহার অর্ধেক টাকার জিনিস আমাদের নিকট হইতে কেনে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের সহিত আমাদের আমদানি-রপ্তানির সম্পর্ক আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত (balance of trade) প্রতি বৎসরই প্রতিকূল হইয়া আসিতেছে।

নিম্নলিখিত তালিকাটি হইতে ইহা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাইবে :—

ভারতের পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত

(India's Balance of Merchandise Trade)

সাল		উদ্বৃত্তের পরিমাণ
১৯৫০-৫১	...	−২২·০১ কোটি টাকা
১৯৫১-৫২	...	−২১০·১৪ কোটি টাকা
১৯৫২-৫৩	...	−৯২·৫১ কোটি টাকা
১৯৫৩-৫৪	...	−৪১·৩১ কোটি টাকা
১৯৫৪-৫৫	...	−৬২·৭২ কোটি টাকা
১৯৫৫-৫৬	...	−৯৫·৪০ কোটি টাকা
১৯৫৬-৫৭	....	−২১৯·৯৩ কোটি টাকা
১৯৫৭-৫৮	...	−৩৭২·২৭ কোটি টাকা
১৯৫৮-৫৯	...	−২৭৫·৮৮ কোটি টাকা

ভারতের বৈদেশিক চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত (India's Balance of Current Payments)—বৈদেশিক বাণিজ্যে আমাদের যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (unfavourable balance of trade) হইতেছে তাহা পূরণ করিবার জন্য বিদেশে স্থিত আমাদের মূলধন হ্রাস করিয়া এবং বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ছাড়া অন্যান্য ধরণের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আয় নাই। অর্থাৎ আমাদের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত (balance of current payments) ভয়ানকভাবে প্রতিকূল।

এই জন্যই ভারত সরকার আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেছে এবং রপ্তানি বাড়াইবার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

আমদানির সঙ্কোচন ও রপ্তানির প্রসারণ না করিতে পারিলে ভারতের আর্থিক অবস্থা সঙ্কটজনক হইবে। আজকাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে অর্থ বিদেশে (প্রায় সবটাই ইংলণ্ডে) গচ্ছিত আছে তাহা হইতে খরচ করিয়া, অন্যান্য ভাবে মূলধন ভাঙ্গিয়া এবং বিদেশ হইতে ধারকর্জ করিয়া আমাদের চলতি হিসাবের ঘাটতি (প্রতিকূল উদ্বৃত্ত) পূরণ করা হইতেছে। এই অবস্থা

বেশী দিন চলিতে পারে না। তবে, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র ছাড়া অন্য সব জিনিসের আমদানি বন্ধ করিতে পারিলে এবং দেশে তৈয়ারি জিনিসপত্রের রপ্তানি বাড়াইতে পারিলে অবস্থার উন্নতি হইবে।

প্রশ্ন

1. What is meant by International Trade ? How does it indicate a form of division of labour ?

['আন্তর্জাতিক বাণিজ্য' বলিলে কি বুঝায় ? আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে শ্রমবিভাগের একটি বিশেষ রূপ বলা হয় কেন ?] [১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা]

2. Explain and illustrate the principle on the basis of which international trade is generally carried on.

[যে নিয়মের ভিত্তিতে সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে সেই নিয়মটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।] [১৮৬-১৮৯ পৃষ্ঠা]

3. Explain and illustrate : (a) Law of Comparative Advantages ; (b) Law of Comparative Costs.

[(ক) আপেক্ষিক সুবিধার নিয়ম, এবং (খ) আপেক্ষিক ব্যয়ের নিয়ম বলিলে কি বুঝায় ?] [১৮৬-১৮৯ পৃষ্ঠা]

4. Discuss the advantages and disadvantages of foreign trade. (Higher Secondary Examination, 1961)

[বহির্বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।] [১৮৯-১৯৩ পৃষ্ঠা]

5. Discuss the merits and defects of Free Trade.

[অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দোষগুণ আলোচনা কর।] [১৯১-১৯৩ পৃষ্ঠা]

6. Explain the arguments advanced in favour of Protection.

[সংরক্ষণ নীতির পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় সেই সকল যুক্তি বিশ্লেষণ কর।] [১৯৩-১৯৫ পৃষ্ঠা]

7. On what grounds would you justify the present policy of protection of industries of the Government of India ? (Higher Secondary Examination, Commerce Group, 1960)

[ভারত সরকারের বর্তমান শিল্প সংরক্ষণ নীতি কি কি যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে পার ?] [১৯৩-১৯৬ পৃষ্ঠা]

8. Discuss the present policy of the Government of India in the matter of foreign trade.

[বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারত সরকারের বর্তমান নীতি বিশ্লেষণ কর।] [১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা]

9. Distinguish between (a) Balance of Trade and (b) Balance of Payments and between (a) Balance of Payments and (b) Balance of Current Payments.

[(ক) বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও (খ) বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্তের মধ্যে, এবং (ক) বৈদেশিক হিসাবের উদ্বৃত্ত ও (খ) বৈদেশিক চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝাইয়া দাও] [১৯০-১৯৯ পৃষ্ঠা]

10. Describe the main features of India's foreign trade.

[ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।] [১৯৯-২০১ পৃষ্ঠা]

11. Discuss India's present problem of the unfavourable balance of current payments.

[ভারতে বর্তমানে যে প্রতিকূল চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত হইতেছে সেই বিষয়ে আলোচনা কর।]
[২০১-২০২ পৃষ্ঠা]

উনবিংশ অধ্যায়

বাজার
(The Market)

'বাজার' কথাটির তাৎপর্য (Significance of the Term 'Market')—সাধারণ কথাবার্তায় 'বাজার' শব্দটি দুই ভাবে ব্যবহৃত হয়। (১) যে কোন স্থান যেখানে কেনাবেচা হয় তাহাকে বাজার বলা হয়। যেমন, কলিকাতায় কলেজ স্ট্রীটের বাজার অথবা হাতীবাগান বাজার অথবা গড়িয়াহাট বাজার, ইত্যাদি। এইরূপ প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে এমন একটি বা একাধিক জায়গা আছে যেখানে বাজার বসে অর্থাৎ কেনাবেচা হয়। (২) দ্বিতীয়ত, বাজার শব্দটির দ্বারা আমরা অনেক সময়ে বুঝি কোন একটি জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ—যেমন, আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি 'বাটা'র (Bata) জুতার বাজার খুব বড়। ইহাতে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, বাটার জুতা খুব বেশী বিক্রয় হয়।

ধনবিজ্ঞানে বাজার শব্দটি একটি বিশেষ এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাজার বলিতে বুঝায় এমন কোন ব্যবস্থা যাহার দ্বারা ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ পরস্পর যোগাযোগ রাখিতে পারে।

ইহার অর্থ এ নয় যে ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ একটি বাড়ীতে মিলিত হইবে। তাহারা টেলিফোন, টেলিগ্রাম ইত্যাদির মারফৎ পরস্পর যোগাযোগ রাখিতে পারে। যেমন, লোকে কলিকাতায় থাকিয়া সুইজারল্যাণ্ডে সোনা কিনিতে পারে। কলিকাতার ব্যবসায়ী সুইজারল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীর কাছে টেলিগ্রাম করিয়া সোনা কিনিতে নির্দেশ দিতে পারে। ইহার জন্য তাহার সুইজারল্যাণ্ডে যাওয়ার দরকার করে না। কলিকাতায় থাকিয়া বিলাতের বিদেশী কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে পারা যায়। তাহার জন্য বিলাতে যাওয়ার দরকার করে না।

ইহা হইতেই বোঝা যায় যে বাজার কথাটির আসল অর্থ হইল ক্রয়-বিক্রয়। কাজেই সব রকমের কেনাবেচার কাজের সমষ্টিকে বাজার বলা হয়।

বাজারের প্রকারভেদ (Forms of Markets)—ক্রয়বিক্রয়ের কথাটাই বাজার শব্দটির আসল অর্থ হইলেও বস্তুর তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন ধরণের বাজার হইতে পারে।

স্থান-বিশেষেও বাজার নানারূপ হইতে পারে।

তারপর সময়-বিশেষেও বাজারের তারতম্য হয়।

ক্রয়বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের তারতম্য অনুসারেও বাজারের প্রকারভেদ হইতে পারে।

যেখানে উৎপাদনের উপাদানের ক্রয়বিক্রয় হয় সেটা হইল উপাদানের বাজার (fatcor market)। যেমন, শ্রম একটি উপাদান। এই শ্রমের ক্রয়বিক্রয়কে আমরা বলি শ্রমের বাজার।

যে সব জিনিস সরাসরি উপভোগ করা যায় (consumer goods) সেগুলির ক্রয়বিক্রয়কে আমরা উপভোগ্য বস্তুর বাজার অথবা চরম বস্তুর (final products) বাজার বলি। যদি উপভোগ্য বস্তু খুচরা বিক্রয় হয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে খুচরা বিক্রয় বাজার (retail market) বলি। যদি সেটা পাইকারী দরে বিক্রয় হয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে পাইকারী বাজার (wholesale market) বলি।

যখন কোন জিনিস তৈয়ারি হইয়া আরও অধিক উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত

হয় তখন সেই জিনিসের ক্রয়বিক্রয়কে আমরা মধ্যবর্তী জিনিসের বাজার (market for intermediate goods or producer goods) বলি।

টাকাকড়ি লেনদেনের বাজার (loan market) আছে। শেয়ারের বাজার (share market) আছে। এখানে শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় হয়।

তেমনি, মুদ্রা বিনিময়েরও বাজার (exchange market) আছে। এখানে বিদেশী মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় হয়।

স্থানের তারতম্য অনুসারেও বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। জিনিসটির ক্রয়বিক্রয় কোন একটি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ, না পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তীর্ণ—এই বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থান অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ ঠিক করা হয়।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে পৃথিবীর সর্বত্রই যে কোন জিনিসেরই বাজার ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে। পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে জিনিসপত্র চালান করা সহজ হইয়াছে। কাজেই জিনিসপত্র পৃথিবীর নানা স্থানে ক্রয়বিক্রয় করা চলে। ইহা সত্ত্বেও কোন কোন জিনিসের বাজার খুব সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

কোন জিনিসের বাজারের পরিধি বিস্তৃত হইবে কিনা সেটা নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার উপর। বাজারের পরিধির বিস্তৃতির জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি আবশ্যক :—

(১) জিনিসটির চাহিদা খুব বিস্তৃত হওয়া চাই। যতই বিভিন্ন জায়গার লোকে জিনিসটি চাহিবে ততই তাহার বাজার বিস্তৃত হইবে। যেমন, ঘড়ি। পৃথিবীর সব জায়গায় ইহার চাহিদা আছে। কাজেই ইহার বাজার বিশ্ব-জোড়া।

(২) জিনিসটি সহজে এবং কম খরচে এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় আনা-নেওয়া সম্ভব হওয়া দরকার। এরূপ হইলে জিনিসটির বাজার বিস্তীর্ণ হইবে। যে সকল জিনিসের দাম ইহাদের ওজনের তুলনায় খুব বেশী সেই সকল জিনিসের বাজারও খুব বিস্তীর্ণ হয়। সোনা ও কয়লার তুলনা করিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। ১০০ টাকায় যে পরিমাণ সোনা (হয়ত এক তোলা মাত্র) পাওয়া যায় তাহার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ কয়লা (হয়ত ৫০ মণ) মিলিবে। সুতরাং কয়লার তুলনায় সোনা অনেক সহজে এবং কম খরচে আনা নেওয়া যায়। তাই সোনার বাজার পৃথিবী-জোড়া, কিন্তু কয়লার বাজার সীমাবদ্ধ।

(৩) আবার জিনিসটি যেন সহজেই পচিয়া না যায়। যে সব জিনিস সহজেই পচিয়া যায়, বেশী দিন তাজা থাকে না, সেগুলির বাজার খুব সীমাবদ্ধ। এই জন্য, শাক-সবজি, মাছ, ফল—ইহাদের বাজার খুব সীমাবদ্ধ। আজকাল অবশ্য বরফ দিয়া মাছ বেশী দিন তাজা রাখিতে পারা যায়, ফলও টিনে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়, কিন্তু এই সব প্রক্রিয়ার বহুল প্রসার না হইলে ইহাদের বাজার সীমাবদ্ধই থাকিবে।

(৪) জিনিসটি গুণানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা চাই এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্য নমুনা রাখা চাই। তাহা হইলে দূর দেশ হইতে লোকে নমুনা দেখিয়া জিনিসটির জন্য অর্ডার দিতে পারিবে। ইহাতে জিনিসটির বাজার বিস্তীর্ণ হইবে।

উপরিলিখিত কারণগুলি হইতেই বোঝা যায়, কেন সোনা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর বাজার খুব বেশী বিস্তৃত। সেগুলির নমুনা দেখিয়া সহজেই চেনা যায়, ওজনের তুলনায় ইহাদের দাম বেশী, এক দেশ হইতে অন্য দেশে সহজে চালান করা যায়। অন্য দিকে মাছ, তরকারি, দুধ, ফল—ইহাদের বাজার খুব সীমাবদ্ধ। গম, তুলা, লোহা ইত্যাদি জিনিসেরও বাজার বিস্তৃত হইতে পারে, কেননা ওজনের তুলনায় দাম কম হইলেও দূর দেশের লোকে নমুনা দেখিয়া বুঝিতে পারে কি ধরণের জিনিস কিনিতেছে।

ক্রয়বিক্রয়ের উপর বিধিনিষেধের অস্তিত্ব অনুসারেও বাজারের প্রকার-ভেদ হইতে পারে। খোলা বাজার (open market) অথবা অবাধ বাজার (free market) বলিতে বুঝায় যে ক্রয়বিক্রয়ের উপর কোন বিধিনিষেধ নাই। যে যতটা খুশি কিনিতে পারে, যে যতটা খুশি বিক্রয় করিতে পারে, এবং দামও যাহা খুশি হইতে পারে। অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণ (control) নাই। যদি কোন জিনিসের যোগান খুব কম থাকে, তাহা হইলে দেশের সরকার (Government) জিনিসটি সম্বন্ধে রেশনিং (rationing) আরম্ভ করিতে পারে, অর্থাৎ আইন করিয়া দিতে পারে যে কোন ক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী বিক্রয় করা হইবে না। সরকার রেশনিং না করিয়াও জিনিসের দাম বাঁধিয়া দিতে পারে। রেশনিং করিলে দাম এবং পরিমাণ দুইটিই নির্দিষ্ট থাকে।

সময়-বিশেষেও বাজারের তারতম্য হয়। এই হিসাবে বাজার অল্প-মেয়াদী (short period) অথবা দীর্ঘ-মেয়াদী (long period) হইতে পারে। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, কোনও জিনিসের দাম তাহার চাহিদা ও যোগানের

দ্বারা নির্ধারিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে চাহিদার তারতম্য ঘটিলে যোগানের পরিবর্তন বিশেষ করা যায় না। তাই, অল্পমেয়াদী বাজারে চাহিদার প্রাধান্য। অর্থাৎ যোগান প্রায় স্থিরই থাকিবে এবং এই অবস্থায় চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়িয়া যাইবে এবং চাহিদা কমিলে দাম কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে দীর্ঘমেয়াদী বাজারে যোগানেরই বিশেষ প্রাধান্য। দীর্ঘ কালের মধ্যে চাহিদার তারতম্য অনুসারে যোগানের পরিবর্তন করা যায় এবং সেইজন্য উৎপাদনের ব্যয় অনুসারে জিনিসের দামের তারতম্য হয়।

নীতি হিসাবেও বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এই হিসাবে আদর্শ অথবা পূর্ণাঙ্গ বাজার (perfect market) অথবা আদর্শবিচ্যুত বা অসম্পূর্ণ বাজার (imperfect market) হইতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ বাজারের বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিম্নরূপ :—

যে জিনিসের বাজার অর্থাৎ যে জিনিসটির ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কথা, সেই জিনিসটির প্রত্যেকটি এককই একরূপ। বিভিন্ন এককের মধ্যে গুণের তারতম্য ঘটে না, তাই দামেরও পার্থক্য হয় না। জিনিসটির বিভিন্ন একক একই দামে বিক্রীত হয়। যেমন, তুলার বাজার। যদি আদর্শ বাজার হয় তাহা হইলে ১ গাঁট তুলার দাম সর্বত্রই এক হইবে।

দ্বিতীয়ত, জিনিসটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় এবং ক্রয়বিক্রয় চলে। যেমন, তুলা। তুলা এক মণও কেনা যায় আবার এক সেরও কেনা যায়। কিন্তু মোটর গাড়ী (½) আধখানা অথবা (¼) সিকিখানা কেনা যায় না।

তৃতীয়তঃ, বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিবে, অর্থাৎ বাজারে জিনিসটির ক্রেতা এবং বিক্রেতার সংখ্যা অনেক থাকিবে। ইহার ফলে কোন এক জন বিক্রেতা তাহার নিজস্ব যোগান কমাইয়া বা বাড়াইয়া জিনিসটির যোগান কমাইতে বা বাড়াইতে পারিবে না, কোন এক জন ক্রেতা তাহার নিজস্ব চাহিদা কমাইয়া বা বাড়াইয়া সমগ্রভাবে জিনিসটির চাহিদা কমাইতে বা বাড়াইতে পারিবে না। ইহাতে কোন এক জন ক্রেতা বা বিক্রেতা জিনিসটির দামের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিবে না।

চতুর্থত, জিনিসটি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে হইলে বেশী খরচ লাগিবে না এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই জানিবে অন্য ক্রেতা বা বিক্রেতা কি দাম দিতেছে বা পাইতেছে। এই অবস্থায় বাজারের

সর্বত্রই জিনিসটি এক দামে বিক্রীত হয়। আদর্শ অথবা পূর্ণাঙ্গ বাজার অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার—এ সবই এক কথা।

কার্যক্ষেত্রে এইরূপ আদর্শ বাজার নিতান্তই অসম্ভব। আদর্শ আদর্শই। বাস্তব ক্ষেত্রে বহু প্রকারের অসম্পূর্ণতা দেখা দেয়। অর্থনীতিবিদগণ তাঁহাদের আলোচনার সুবিধার জন্য আদর্শ বাজারের কল্পনা করেন, তাই আদর্শ বাজার যদি কোথাও থাকে সে অর্থনীতিবিদগণের মনে।

বাস্তব ক্ষেত্রের বাজার অসম্পূর্ণ। যেমন, ধরা যাক খুচরা বিক্রয়ের বাজার। লোকে সমস্ত দোকান ঘুরিয়া ঘুরিয়া জিনিসের দাম যাচাই করিবার জন্য সময় নষ্ট করে না। সমস্ত ক্রেতারও পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। কাজেই কোথায় জিনিসটি সব চেয়ে কম দামে বিক্রয় হইতেছে সেটা সকলে জানিতে পারে না। এজন্য দামের তারতম্য হয়। একই জিনিস বিভিন্ন দামে বিক্রীত হইতে পারে। তারপর, অনেক সময়ে লোকে নিকটবর্তী কোন দোকান হইতে জিনিস কেনে, যদিও তাহারা জানে যে অন্য একটি দোকানে সেই জিনিসটি একটু সস্তায় পাওয়া যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু হয়ত দোকানটি কাছে, অথবা দোকানদার একটু খাতির করে।

কিংবা এমনও হইতে পারে যে লোকের মনে বিশ্বাস যে, দোকানটিতে বেশী ভাল জিনিস পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে জিনিসটির বিভিন্ন একক ঠিক এক প্রকার নয়। দ্রব্যগুণের তারতম্য হইতে পারে।

ক্রেতা বা বিক্রেতার সংখ্যা অল্প থাকিলেও বাজার অসম্পূর্ণ হইতে পারে। যেমন, বহু প্রাচীন মুদ্রার বাজার। এখানে বাজার অসম্পূর্ণ, কারণ এক জন ক্রেতা বা বিক্রেতা কেহই জানে না অন্য ক্রেতা বা বিক্রেতা কি দামে জিনিসটি ক্রয় করিতেছে অথবা বিক্রয় করিতেছে। কাজেই যে যে দামে পারে ক্রয় অথবা বিক্রয় করে।

যে জিনিস এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় সহজে চালান করা যায় না সেই জিনিসের বাজার অসম্পূর্ণ হয়। যেমন, ঘর-বাড়ী। বিভিন্ন শহরে একই ধরণের বাড়ীর দাম বিভিন্ন হয়। সস্তার শহর হইতে দামী শহরে ঘর-বাড়ী চালান করা সম্ভব নয়।

অনেক সময়ে সরকার ইচ্ছা করিয়া একটি জিনিসের দামের তারতম্য ঘটাইতে পারে। যেমন, কোন জিনিসের উপর ট্যাক্স বসাইলে সেই জিনিসের

দাম বাড়িয়া যায়। কাজেই জিনিসটি যেখানে ট্যাক্স নাই সেখানে কম দামে বিক্রয় হইবে এবং যেখানে ট্যাক্স আছে সেখানে বেশী দামে বিক্রয় হইবে।

জিনিসপত্র চলাচলের খরচের জন্যও একই জিনিস বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে।

অসম্পূর্ণতা চরমে ওঠে তখন, যখন বাজার একচেটিয়া ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। একচেটিয়া বাজার বলিতে বুঝায় যে, কোন এক জন বিক্রেতা জিনিসটির যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই সে নিজের ইচ্ছামত দাম বসাইতে পারে। অর্থনীতিতে এইরূপ বিশ্লেষণের বিশেষ উপযোগিতা থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে এইরূপ একচেটিয়া বাজার সচরাচর দেখা যায় না। তেমনি মাত্র এক জন ক্রেতা এবং বহু বিক্রেতা--এমন অবস্থায় ক্রেতাই জিনিসের দাম নির্ধারণ করিবে—এইরূপ বাজারের অস্তিত্বও কল্পনার জগতেই সম্ভব।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া বাজারের পার্থক্য হইতেছে এই যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে জিনিসটির বহু অনুরূপ সামগ্রী (substitutes) থাকে, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে জিনিসটির অনুরূপ পদার্থ থাকে না। অন্য সব পার্থক্য এই একটি পার্থক্য হইতেই উদ্ভূত।

যাহা হউক, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া ব্যবসায়—ইহাদের কোনটিই বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যাহা দেখা যায় তাহা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা।

প্রশ্ন

1. What is meant by the term 'market' in Economics ? Describe the different classifications of 'markets'.

[ধনবিজ্ঞানে 'বাজার' বলিতে কি বুঝায় ? বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে বাজারের প্রকারভেদ নির্ণয় কর।] [২০৩-২০৯ পৃষ্ঠা]

2. What are the conditions that govern the extent of a market ?

[বাজারের পরিধি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?] [২০৫-২০৬ পৃষ্ঠা]

3. Explain the characteristics of a perfect market. How does a perfect market differ from an imperfect market ?

[পূর্ণাঙ্গ বাজারের বৈশিষ্ট্য কি কি ? পূর্ণাঙ্গ বাজারের সহিত অসম্পূর্ণ বাজারের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।] [২০৭-২০৯]

বিংশ অধ্যায়

চাহিদা (Demand)

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand)—যে কোন জিনিসেরই মূল্য তাহার চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে। জিনিসের দামের সহিত তাহার চাহিদার একটি সম্পর্ক আছে। চাহিদা অর্থ শুধু পাইবার ইচ্ছা নয়—দাম দিয়া কিনিবার ইচ্ছা এবং সঙ্গতি।

সাধারণত দেখা যায় যে, কোনও জিনিসের দাম কমিলে লোকে সেই জিনিসটি বেশী কেনে, আবার দাম বাড়িলে কম কেনে। অবশ্য ধরিয়া লইতে হয় যে, যে সময়ের মধ্যে দাম কমিল অথবা বাড়িল সেই সময়ের মধ্যে লোকের আয়ের (income) কোন তারতম্য হয় নাই। এই ব্যাপারটিকে ধনবিজ্ঞানের একটি নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা চলে।

সব সময়ে যে এই নিয়মটি খাটে তাহা নহে। এমনও হইতে পারে যে দাম কমুক বা বাড়ুক লোকে কোন বিশেষ একটি জিনিস একই পরিমাণে কিনিতেছে। কিংবা, দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে আরও বেশী পরিমাণে সেই জিনিস কিনিতেছে। তবে, এই ধরণের ব্যতিক্রম বেশী নয়।

দামের সঙ্গে চাহিদার সম্পর্ক বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

যখন কোন জিনিসের দামের পরিবর্তন হয় তখন তাহার ফল দুই প্রকার হইতে পারে। যদি কোন জিনিসের দাম কমে আর সেই জিনিসের অনুরূপ অন্য সকল জিনিসের (substitutes) দাম না কমে, তাহা হইলে এই জিনিসটি অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে। কাজেই লোকে অন্য সকল অনুরূপ জিনিসের পরিবর্তে এই জিনিসটিই কিনিবে। ঠিক কতটা বেশী কিনিবে সেটা নির্ভর করে জিনিসটির অনুরূপ অন্য জিনিসগুলি কি ধরণের তাহার উপরে। যদি ভেটকী মাছের দর কমিয়া যায় এবং অন্য মাছের দর না কমে, তাহা হইলে লোকে ভেটকী মাছ বেশী খাইবে। তবে জামা কাপড়ের জন্য খরচ না করিয়া লোকে নিশ্চয়ই ভেটকী মাছ খাইবে না।

দামের তারতম্য অনুসারে লোকের ক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।

কাজেই কোন জিনিসের দাম কমিলে লোকে সেই জিনিসটি বেশী কিনিবে। কিন্তু, এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি লোকে সব সময়ে প্রায় একই পরিমাণে ক্রয় করে। যেমন, দাম যাহাই হউক না কেন লোকে লবণ খায় প্রায় সমান পরিমাণে। দাম বাড়িলেও যে লবণ না খাইয়া সে অন্য কিছু খাইবে এমন উপায় নাই। দাম কমিলে সে যে অন্য জিনিস খাওয়া বাদ দিয়া লবণ বেশী করিয়া খাইবে এমন নহে। তাহা ছাড়া, লোকে তাহাদের আয়ের অতি অল্প অংশ লবণের জন্য ব্যয় করে। কাজেই লবণের দাম কমিলে বেশী লবণ কিনিয়া তৃপ্তির পরিমাণ বাড়ানো হয় না।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand)—কোন কোন জিনিসের যদি দাম কমে বা বাড়ে তাহা হইলে লোকে সাধারণত সেই জিনিস আরও বেশী বা কম কেনে। যেখানে একটি জিনিসের পরিবর্তে আরও একটি জিনিস ক্রয় করিয়া অভাব মিটানো যায়, অথবা যেখানে কোন একটি জিনিস বেশী ক্রয় করিলে তৃপ্তির পরিমাণ বেশী হয়, সেখানে জিনিসটির দাম কমিলে লোকে সেই জিনিস অনেক বেশী কিনিবে। যেখানে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই সেখানে লোকের ক্রয়ের পরিমাণ তেমন কমিবে না অথবা বাড়িবে না।

দামের পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রয়ের পরিমাণের সম্বন্ধ নির্দেশ করিতে গিয়া তিন রকম অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় :—

(১) দাম কমিল অথবা বাড়িল অথচ ক্রয়ের পরিমাণ কিছুই পরিবর্তিত হইল না।

(২) দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল এবং দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিল।

(৩) দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল এবং দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের পরিমাণ ভীষণ ভাবে কমিয়া গেল।

দামের সঙ্গে ক্রয়ের পরিমাণের এই সম্বন্ধকে ধনবিজ্ঞানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity of demand) নাম দেওয়া হয়।

যেখানে দাম কমিলেও ক্রয়ের কোন তারতম্য হয় না সেখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য (০)। যেখানে দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের পরিমাণ সীমাহীন ভাবে বৃদ্ধি পায় সেখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশী অসীম)।

কার্যত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য এবং অসীম এই দুই-এর মধ্যে। প্রায় সব জিনিসেরই দাম কমিলে চাহিদা কিছু কিছু বাড়ে, কিন্তু কখনই সীমাহীন ভাবে বাড়ে না।

ধনবিজ্ঞানে জিনিসগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ঃ (১) যেগুলির চাহিদা বেশী স্থিতিস্থাপক, এবং (২) যেগুলির চাহিদা কম স্থিতিস্থাপক—সংক্ষেপে যথাক্রমে স্থিতিস্থাপক (elastic) এবং অস্থিতিস্থাপক (inelastic)। কম এবং বেশী স্থিতিস্থাপকতা অনুসারে চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক এবং অস্থিতিস্থাপক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

এক জন লোকের ক্ষেত্রে যে জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক তাহার দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটির জন্য লোকটির মোট খরচ বাড়িয়া যাইবে এবং জিনিসটির দাম বাড়িলে জিনিসটির জন্য তাহার মোট খরচ কমিয়া যাইবে। যেমন একজন লোকের বেলায়, তেমনি সমগ্র বাজারের বেলায়ও এই কথা খাটে। অপর পক্ষে, যদি চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে দাম কমিলে সেই জিনিসটির জন্য খরচ কমিয়া যায় এবং দাম বাড়িলে মোট খরচ বাড়িয়া যায়।

মনে রাখা উচিত যে, যেখানে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেখানেও দাম কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ কিছুটা বাড়ে বটে, কিন্তু তাহা এত কম যে সেই জিনিসের জন্য মোট খরচ কমিয়া যায়। যে অনুপাতে দাম কমে সেই অনুপাতে কিংবা তাহার চেয়ে বেশী অনুপাতে ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে না।

কিন্তু, যেখানে চাহিদা স্থিতিস্থাপক সেখানে দাম কমিলে লোকে জিনিসটি এত বেশী কেনে যে মোট খরচ বাড়িয়া যায়। যে অনুপাতে দাম কমে তাহার চেয়ে বেশী অনুপাতে লোকে জিনিস কেনে।

কোন জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক সেটা জানা ব্যবসায়ীর পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। সে যে দ্রব্য প্রস্তুত করে যদি সেই দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী হয় অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে জিনিসের দাম কমানোই বেশী লাভজনক। পক্ষান্তরে, যদি তাহার জিনিসের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হয় অর্থাৎ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে জিনিসের দাম বাড়ানোই বেশী লাভজনক।

জিনিস অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—খুব সাধারণ ভাবে বলা যায় যে বিলাসের উপকরণের চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

কিন্তু, কোন্‌টা যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টা বিলাসের উপকরণ সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, চাল, ডাল, গম, তরিতরকারি, বাসগৃহ—এগুলির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ; এবং রেডিও সেট, থিয়েটারের টিকেট, আইসক্রীম ইত্যাদির চাহিদা মোটামুটি স্থিতিস্থাপক।

আমাদের মূল বক্তব্য এই যে দাম কমিলে জিনিস বেশী বিক্রয় হয় এবং দাম বাড়িলে কম বিক্রয় হয়। এটা সাধারণ ভাবে প্রমাণিত। অবস্থার পরিবর্তন না হইলে এই নিয়ম খাটে। যদি ক্রেতার রুচির কোন পরিবর্তন না হয়, যদি ফ্যাশন না বদলায় তাহা হইলে চাহিদার এই নিয়মের কোনও পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু যদি ফ্যাশন বদলায় বা রুচির পরিবর্তন হয় তাহা হইলে জিনিসের চাহিদা এই নিয়মে চলিবে না। কাজেই কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে পূর্বাহ্লেই বলা শক্ত যে তাহার জিনিসের চাহিদা কিরূপ হইবে। যদি ক্রেতাদের রুচির কোন সামঞ্জস্য না থাকে তাহা হইলে লোকের প্রতিক্রিয়াকে কোন রকম নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না। ফলে, জিনিসপত্রের চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক তাহা নির্ণয় করাও অত্যন্ত কঠিন হইয়া ওঠে।

চাহিদার যে নিয়মের কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রমও আছে। কখনও কখনও লোকে কোন জিনিস হয়ত বেশী দামে বেশী কেনে। যদি কোন জিনিসের দাম বাড়িয়া যায় এবং লোকে মনে করে ভবিষ্যতে সেই জিনিসের দাম আরও বাড়িবে তাহা হইলে লোকে সেই জিনিস আরও বেশী ক্রয় করে। যেমন, যদি লোকে মনে করে যে চালের দাম আরও বাড়িবে তাহা হইলে যে যতটা পারে বেশী বেশী চাল কিনিতে আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে চালের দাম আরও বাড়িয়া যায়। অপর পক্ষে, যদি কোন জিনিসের দাম কমে এবং লোকে মনে করে যে সেই জিনিসের দাম আরও কমিবে, তাহা হইলে দাম আরও বেশী কমিবে এই আশায় লোকে সেই জিনিসটি কম কেনে। এরূপ ক্ষেত্রে, চাহিদা ভীষণ ভাবে অস্থিতিস্থাপক হয়।

এখন একটি উদাহরণের সাহায্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও অস্থিতিস্থাপকতা বুঝানো যাইতে পারে।

স্থিতিস্থাপক চাহিদা

বস্তু	দাম	চাহিদা	মোট খরচ
থিয়েটারের টিকেট	৫৲ (এক খানার)	১,০০০ খানা	৫,০০০৲
	১৲ (এক খানার)	১০,০০০ খানা	১০,০০০৲
	৭৲ (এক খানার)	৩০০ খানা	২,১০০৲

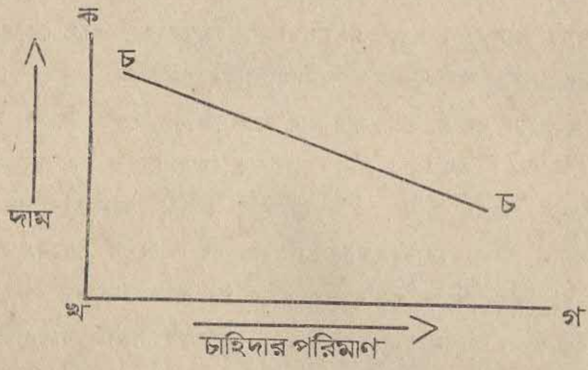

অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

বস্তু	দাম	চাহিদা	মোট খরচ
লবণ	৫৲ (এক মণের)	১০০ মণ	৫০০৲
	১৲ (এক মণের)	১২৫ মণ	১২৫৲
	৬৲ (এক মণের)	৯০ মণ	৫৪০৲

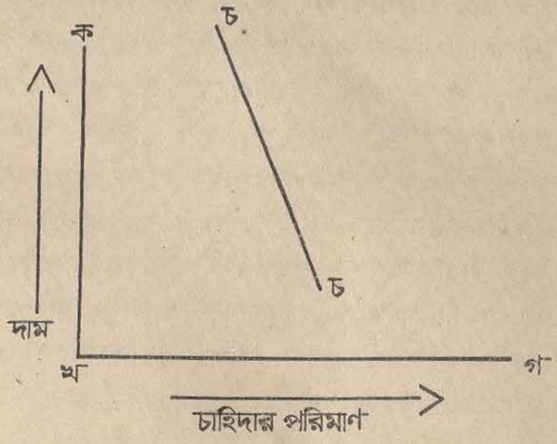

আয় অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand)—দামের হ্রাস অথবা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার যেরূপ বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইতে পারে এতক্ষণ তাহার আলোচনাই করা হইয়াছে। দামের পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত চাহিদার এইরূপ পরিবর্তনকে দাম অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (price elasticity of demand) বলে।

কিন্তু, লোকের আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও তাহার চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। লোকের আয় বাড়িয়া গেলে, দাম এক রকম থাকিলেও, চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, আয় কমিয়া গেলে, দাম এক রকম থাকিলেও, লোকে চাহিদার পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়। আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত চাহিদার পরিবর্তনকে আয় অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (income elasticity of demand) বলে।

চাহিদা, উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ (Demand, Utility, Marginal Utility)—লোকে কোন জিনিস যখন কিনিতে চায় তখন বুঝিতে হইবে সে এই জিনিসটির অভাব বোধ করে এবং জিনিসটি পাইলে তাহার অভাব মিটিবে, সে তৃপ্তি পাইবে। এই অভাব মিটানোর ক্ষমতাকেই ধনবিজ্ঞানে উপযোগ (utility) বলা হয়।

কোন জিনিসের অতিরিক্ত একক হইতে লোকে যে তৃপ্তি আশা করে বা পায় তাহাকে ঐ জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) বলা হয়। প্রকারান্তরে বলা যায় যে, কোন একটি জিনিসের বহু এককের সমষ্টি হইতে একটি একক সরাইয়া লইলে যে পরিমাণ তৃপ্তি কমিয়া যায় তাহাই হইল ঐ জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগ। যাহার একই রকমের ১০টি জামা আছে তাহাকে যদি ঐ রকমেরই আরও একটি জামা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ১১শ জামার উপযোগিতা যাহা, তাহাই হইল ঐ লোকের নিকট জামার প্রান্তিক উপযোগ।

প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশই কমিয়া আসে। যাহার মাত্র একটি জামা আছে তাহার নিকট সেই একটি জামার উপযোগ খুব বেশী। দ্বিতীয় একটি জামা পাইলে তাহার উপযোগ প্রথম জামার উপযোগ হইতে কম হইবে। এইরূপে পরবর্তী প্রত্যেক একক হইতে সে ক্রমশ কম কম উপযোগ পাইবে।

কাজেই ইহা হইতে একটা সাধারণ নিয়মে পৌছিতে পারা যায়। সেটা

হইতেছে এই যে, কোন বস্তুর সমষ্টির পরিমাণ যত বেশী হইবে তাহার প্রান্তিক উপযোগ তত কম হইবে। একটি জিনিসের সমগ্র উপযোগ যত বাড়িয়া যাইবে প্রান্তিক উপযোগ তত কম হইবে।

প্রান্তিক উপযোগই মানুষের চাহিদাকে সীমিত করে। অর্থাৎ লোকে কোন একটি জিনিসের জন্য এমন দাম দিতে চাহিবে না যাহা তাহার প্রান্তিক উপযোগের চেয়ে বেশী। জিনিসের দাম দেওয়া থাকিলে লোকে ঠিক সেই পরিমাণে জিনিসটি কিনিবে যেখানে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান। চা-এর দাম ৩৲ পাউণ্ড থাকিলে কেহ যদি ৪ পাউণ্ড চা কেনে তাহার অর্থ এই যে চতুর্থ পাউণ্ড চা হইতে সে যে তৃপ্তি পাইবার আশা করে তাহার আর্থিক পরিমাণ ৩৲। ৪৲ পাউণ্ড থাকিলে সে হয়ত ৩ পাউণ্ড চা কিনিত, কারণ তৃতীয় পাউণ্ড চা-এর উপযোগের আর্থিক পরিমাণ ৪৲র সমান। ৬৲ পাউণ্ড থাকিলে ২ পাউণ্ড কিনিত, কারণ দ্বিতীয় পাউণ্ড চা-এর উপযোগ ৬৲র সমান। ১২৲ পাউণ্ড থাকিলে ১ পাউণ্ড কিনিত, কারণ চা খাইবার ইচ্ছা এত প্রবল যে বরং ১২৲ দিয়া ১ পাউণ্ড চা কিনিবে, তবু না কিনিয়া ছাড়িবে না।

মনে রাখা উচিত যে এই প্রান্তিক উপযোগের ব্যাপারটা একেবারেই একটা মানসিক হিসাবের ব্যাপার। দোকানে গিয়া কেহই এক এক বারে এক একটি করিয়া জিনিস কেনে না—যদি কোন এক দিন ৪ পাউণ্ড চা কেনে তাহা হইলে একবারেই ৪ পাউণ্ড কিনিবে। প্রথমে ১ পাউণ্ড, তারপর আর এক পাউণ্ড, এইরূপে ক্রমান্বয়ে কিনিবে না। তবে লোকে কেন একটি বিশেষ দামে একটি বিশেষ পরিমাণ জিনিস কেনে তাহা প্রান্তিক উপযোগের ধারণার (concept) দ্বারা মোটামুটি ভাবে বোঝা যায়।

জিনিসের উপযোগের পরিমাণ অর্থের ভিত্তিতে নির্ণয় করাই সুবিধাজনক। একটি জিনিসের জন্য লোকে যতটা দাম দিতে রাজী আছে তাহা দিয়া ঐ জিনিসটির উপযোগের পরিমাণ সহজে বোঝা যায়। যেমন, ১ পাউণ্ড চা-এর জন্য কেহ যদি ১২৲ দিতে রাজী থাকে, তাহার অর্থ এই যে সে ঐ এক পাউণ্ড চা হইতে যে পরিমাণ তৃপ্তি পাইবে আশা করে তাহার আর্থিক মূল্য ১২৲।

প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র উপযোগ (Marginal Utility and Total Utility)—আমরা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে পারি যে মোট

উপযোগ (বা সমগ্র উপযোগ) যতই বাড়ে প্রান্তিক উপযোগ ততই কমে।

চা	বাজার দর	সমগ্র উপযোগ (Total utility) (আর্থিক মূল্য)	প্রান্তিক উপযোগ (Marginal utility) (আর্থিক মূল্য)
১ পাউণ্ড	৩৲ (পাউণ্ড প্রতি)	১২৲	১২৲
২ পাঃ	৩৲ (" ")	১৮৲	৬৲
৩ পাঃ	৩৲ (" ")	২২৲	৪৲
৪ পাঃ	৩৲ (" ")	২৫৲	৩৲

উপরের উদাহরণ হইতে বোঝা যায় যে যতই জিনিসের পরিমাণ বাড়িতেছে ততই তাহার মোট উপযোগ বাড়িতেছে, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসিতেছে। ৪র্থ পাউণ্ড চা-এর উপযোগ ৩৲র সমান। চা-এর বাজার দরও ৩৲ পাউণ্ড। কাজেই চা-পিপাসু ব্যক্তি ৪ পাউণ্ডের বেশী কিনিবে না। চা-এর প্রান্তিক উপযোগ বাজার দরের সমান হইয়াছে।

প্রশ্ন

1. Discuss the law of demand in relation to prices.

(দামের সঙ্গে চাহিদার সম্পর্ক বিষয়ে যে নিয়মটি আছে তাহা বিশ্লেষণ কর।)

[২১০-২১১ পৃষ্ঠা]

2. What do you understand by 'elasticity of demand'? Consider the elasticity of demand in the cases of (*a*) rice, (*b*) salt, (*c*) watches, (*d*) radio, (*e*) cinema tickets.

(চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিলে কি বুঝায়? (ক) চাল, (খ) লবণ, (গ) ঘড়ি, (ঘ) রেডিও, (ঙ) সিনেমার টিকেট—এইগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ হইবে বুঝাইয়া দাও।) [২১১-২১৫ পৃষ্ঠা]

3. Distinguish between

   (*a*) elastic demand and inelastic demand ;

   (*b*) price-elasticity of demand and income-elasticity of demand.

(ক) স্থিতিস্থাপক চাহিদা ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে, এবং (খ) দাম অনুসারে স্থিতিস্থাপকতা ও আয় অনুসারে স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে পার্থক্য কি? [২১১-২১৫ পৃষ্ঠা]

4. What is meant by : (*a*) utility, (*b*) marginal utility? Explain and illustrate the relation between marginal utility and total utility.

(ক) উপযোগ এবং (খ) প্রান্তিক উপযোগ বলিলে কি বুঝায়? প্রান্তিক উপযোগ এবং সমগ্র উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক কি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। [২১৫-২১৭ পৃষ্ঠা]

একবিংশ অধ্যায়

যোগান

(Supply)

যোগানের নিয়ম (Law of Supply)—দামের সঙ্গে চাহিদার যেমন একটা সম্বন্ধ আছে, যোগানেরও সেইরূপ সম্বন্ধ আছে। খুব সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, দাম বাড়িলে যোগান বাড়িবে এবং দাম কমিলে যোগান কমিবে। কিন্তু কতটা বাড়িবে বা কমিবে সেটা নির্ভর করে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply)—যদি দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিবর্তন খুব বেশী হয়, অর্থাৎ যে হারে দামের পরিবর্তন হইল তার চেয়ে বেশী হারে যোগানের পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যোগান স্থিতিস্থাপক (elastic)। অপর পক্ষে, যদি দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিবর্তন কম হয়, অর্থাৎ যে হারে দামের পরিবর্তন হইল তার চেয়ে কম হারে যোগানের পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যোগান অস্থিতিস্থাপক (inelastic)।

চাহিদার পরিবর্তনের ফলে জিনিসের দাম কিরূপ হইবে সেটা নির্ভর করে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদার পরিবর্তন হইলেও, যোগান যত স্থিতিস্থাপক হইবে দামের পরিবর্তন ততই কম হইবে এবং যোগান যত অস্থিতিস্থাপক হইবে দামের পরিবর্তন ততই বেশী হইবে।

কালের দীর্ঘতার উপর যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে।

যদি চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে, বেশী পরিমাণে বিক্রয়ে আশায় এবং দাম বাড়ারও সম্ভাবনা থাকায়, শিল্পে নিযুক্ত কারখানাগুলি নিজেদের উৎপাদন বাড়াইয়া যোগান বাড়ানোর চেষ্টা করে। এই শিল্পের জন্য নূতন নূতন কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইভাবে যোগান বাড়ে। আবার, যদি যোগান কমাইতে হয় তাহা হইলে শিল্পে নিযুক্ত কারখানাগুলি

তাহাদের উৎপাদন কমাইবে। অনেক প্রতিষ্ঠান এই শিল্পে উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। এইভাবে চাহিদা অনুসারে যোগান বাড়ানো বা কমানো সহজসাধ্য নয় এবং ইহাতে সময় লাগে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, যথোপযুক্তভাবে দীর্ঘ সময় ধরিলে, যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু খুব কম সময়ের কথা ভাবিলে, যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়, কারণ সেই সময়ের মধ্যে যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না।

চিত্রের সাহায্যে ইহা বুঝানো হইল :—

স্থিতিস্থাপক যোগান :

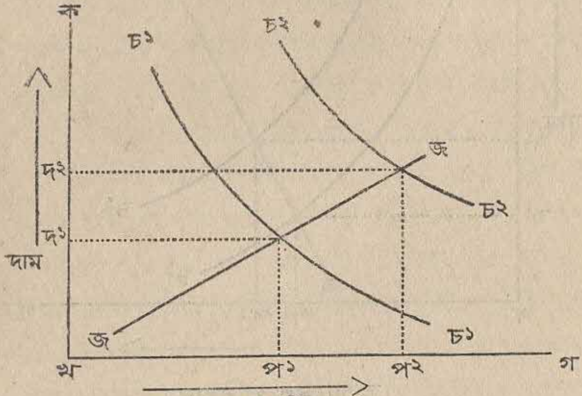

যোগানের পরিমাণ

চ১ চ১ রেখা এবং চ২ চ২ রেখা চাহিদাসূচক। জজ এই রেখা যোগানসূচক। ক খ এই সরলরেখার উপর জিনিসের দামের বিভিন্ন স্তর (খ দ১ এবং খ দ২) দেখানো হইয়াছে। খ গ এই সরল রেখায় জিনিসের বিভিন্ন পরিমাণ দেখানো হইয়াছে। চিত্রটির দ্বারা বুঝানো হইতেছে এই যে, চাহিদার পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু যোগানের পরিমাণও তৎক্ষণাৎ অপেক্ষাকৃত বেশী অনুপাতে বাড়িয়া গিয়াছে। দাম সামান্য বাড়ার ফলে যোগান খ প১ হইতে বাড়িয়া খ প২-এ পৌঁছিয়াছে।

অতএব যোগান স্থিতিস্থাপক। এই চিত্র হইতে বেশ বোঝা যায় যে, চাহিদা যখন বাড়িয়া (চ২ চ২) গেল তখন সে বর্ধিত চাহিদা পূরণ করিতে যেভাবে যোগান আসিবে তাহাতে দাম বেশী বাড়িবে না।

অস্থিতিস্থাপক যোগান :

যোগানের পরিবর্তনের অনুপাত দামের পরিবর্তনের অনুপাতের চেয়ে কম হইলে বুঝিতে হইবে যে সেই ক্ষেত্রে যোগান অস্থিতিস্থাপক ।

নিম্নের চিত্র হইতে বোঝা যায়, দাম বাড়িলেও যোগান সেই অনুপাতে বাড়ে নাই ;

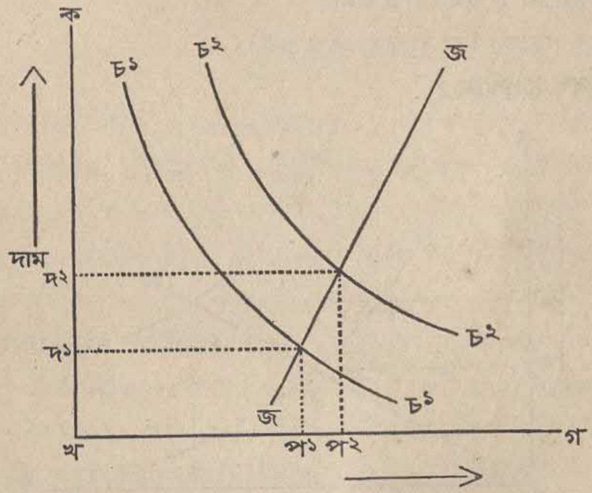

যোগানের পরিমাণ

উৎপাদন ব্যয় (**Cost of Production**)—উৎপাদনকারিগণ কি দাম চাহিবে সেটা নির্ভর করে উৎপাদনের ব্যয়ের উপর। উৎপাদনের ব্যয় সর্বক্ষেত্রে সমান থাকে না। কখনও কখনও উৎপাদন বাড়াইলে মোট খরচ সমান হারে বাড়ে, কখনও বেশী হারে বাড়ে, কখনও কম হারে বাড়ে।

উৎপাদনের ব্যয় বলিতে আমরা কি বুঝি ? বিভিন্ন অর্থে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, পরিবর্তনীয় ব্যয় (variable cost), অপরিবর্তনীয় ব্যয় (fixed cost), মৌলিক ব্যয় (prime cost), আনুষঙ্গিক ব্যয় (supplementary cost), গড়পড়তা ব্যয় (average cost) এবং প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost)।

পরিবর্তনীয় ব্যয় ও অপরিবর্তনীয় ব্যয় (**Variable Cost and Fixed Cost**)—উৎপাদনের পরিমাণের সঙ্গে কতকগুলি ব্যয় বাড়ে বা কমে। এইগুলিকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলা হয়। যেমন, বস্ত্রশিল্পে বস্ত্রের উৎপাদন

বাড়াইতে হইলে বেশী পরিমাণ তুলা কিনিতে হইবে, রং কিনিতে হইবে, বেশী সংখ্যক মজুর নিযুক্ত করিতে হইবে। এই রূপে প্রত্যেক জিনিসেরই মোট উৎপাদনব্যয়ের কিছুটা অংশ পরিবর্তনীয়। মোট উৎপাদনব্যয়ের কতকাংশ আবার অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ, উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো হউক বা কমানো হউক, এই ব্যয়গুলি ঠিক একই পরিমাণে থাকে। যেমন, কলকারখানার ঘরবাড়ী, মেশিন, সুপারভাইজার, ম্যানেজার ইত্যাদি একই প্রকার থাকে—সে কারখানা পুরাদমে চলুক অথবা আধাআধি চলুক। ঘরবাড়ীর জন্য ভাড়া অথবা খাজনা, মেশিন বসানোর জন্য যে টাকা ধার করিতে হইয়াছে তাহার সুদ, সুপারভাইজার ম্যানেজার প্রভৃতি পরিচালকদের বেতন—এগুলি প্রায় একরূপই থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশী না বাড়াইলে বা না কমাইলে এগুলির পরিবর্তন ঘটে না। কাজেই অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে আমরা ধরিব জমির খাজনা, বাড়ীভাড়া, ধারের সুদ এবং পরিচালনার খরচ। পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে ধরিব পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য শ্রমিকের পারিশ্রমিক, মেশিন চালানোর জন্য শক্তির (কয়লা অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির) ব্যয়, এবং কাঁচা মালের জন্য ব্যয়।

অবশ্য, মনে রাখা উচিত যে পরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে এই যে পার্থক্য ইহা স্বল্পকালের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। অনেক অপরিবর্তনীয় ব্যয়ই কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্যই অপরিবর্তনীয়। বাস্তবিক পক্ষে, যেগুলিকে আমরা অপরিবর্তনীয় ব্যয় বলিয়াছি সেগুলির অধিকাংশই দীর্ঘকালের হিসাবে পরিবর্তনীয়।

মৌলিক ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয় (Prime Cost and Supplementary Cost)—উৎপাদন-ব্যয়কে অনেক সময়ে মৌলিক ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয় এই দুই ভাগেও ভাগ করা হয়।

মৌলিক ব্যয় (prime cost) বলিলে সকল রকমের পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং কিছু কিছু অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের (যেমন, সুপারভাইজার ম্যানেজার প্রভৃতির বেতন অর্থাৎ পরিচালনার ব্যয়) সমষ্টি বুঝায়। অপরিবর্তনীয় ব্যয়ের অবশিষ্টাংশকে (অর্থাৎ জমির খাজনা, মূলধনের সুদ—এই ধরণের ব্যয়) আনুষঙ্গিক ব্যয় (supplementary cost) বলে।

যদি কোন ব্যবসায়ীর উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কোন রকমে তাহার মৌলিক ব্যয়েরও সমান হয় তাহা হইলেও সে কিছু কালের জন্য তাহার উৎপাদন

চালাইয়া যাইবে। স্বল্পকালের মধ্যে সে ব্যবসা গুটাইবে না। যদি সে সাময়িক ভাবে কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলেও তাহাকে আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করিতেই হইবে। সুতরাং, যদি বিক্রয়-মূল্য সমগ্র উৎপাদন-ব্যয়ের সমান না হয়, তবুও মৌলিক ব্যয়ের সমান হইলে খুব বেশী ক্ষতি হইবে না।

কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে পারে না। দীর্ঘ কাল পরেও যদি বিক্রয়মূল্য সমগ্র ব্যয় হইতে কম থাকে, তাহা হইলে কারখানা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

গড়পড়তা ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় (Average Cost and Marginal Cost)—উৎপাদনের পরিমাণ এক একক বাড়াইলে উৎপাদন ব্যয় যে পরিমাণে বাড়ে তাহাকে প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost) বলে। সমগ্র ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে উৎপাদনের একক পিছু যে খরচ পড়ে তাহা নির্ণয় করা যায়। এই খরচকে গড়পড়তা খরচ (average cost) বলে।

আমরা একটি তালিকা দ্বারা একটি কারখানার বিভিন্ন প্রকার খরচের একটি নমুনা দেখাইতে পারি :—

উৎপাদন (এককের সংখ্যা)	অপরিবর্তনীয় ব্যয়	পরিবর্তনীয় ব্যয়	মোট ব্যয়	গড়পড়তা ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়
১	১০০৲	১৫৲	১১৫৲	১১৫৲	১১৫৲
২	১০০৲	২৭৲	১২৭৲	৬৩·৫৲	১২৲
৩	১০০৲	৩৮৲	১৩৮৲	৪৬৲	১১৲
৪	১০০৲	৪৬৲	১৪৬৲	৩৬·৫৲	৮৲

এই তালিকা হইতেই উৎপাদনের পরিমাণের সহিত ব্যয়ের কি সম্বন্ধ তাহা বোঝা যায়। যখন মাত্র একটি একক উৎপন্ন হয় তখন খরচ হইতেছে ১১৫৲। যখন ৪টি একক উৎপন্ন হয় তখন গড়ে একক পিছু খরচ পড়ে ৩৬·৫৲। প্রান্তিক ব্যয় ২টি একক উৎপাদনের সময়ে ছিল ১২৲, ৩টি একক উৎপাদনের সময়ে ১১৲, ৪টি একক উৎপাদনের সময়ে আরও কমিয়া হইল ৮৲। তবে, উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া চলিলে প্রান্তিক ব্যয় যে বরাবর কমিয়াই চলিবে তাহা সম্ভব নয়।

...ন্নের তালিকাটি দেখা যাক :—

উৎপাদন (এককের সংখ্যা)	মোট ব্যয়	গড়পড়তা ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়
৩০	৩২০৲	১০·৬৲	—
৪০	৪০০৲	১০৲	৮৲
৫০	৫০০৲	১০৲	১০৲
৬০	৬৩০৲	১০·৫৲	১৩৲
৭০	৭৯০৲	১১·৩৲	১৬৲

এই তালিকা হইতে বোঝা যায় যে, এমন একটা সময় আসিতে পারে যখন প্রান্তিক ব্যয় বাড়িতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায়, কোন একটি কারখানায় যখন গড়পড়তা ব্যয় সর্বনিম্ন তখন গড়পড়তা ব্যয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়।

সাধারণ লাভ (Normal Profit) ঃ প্রান্তিক কারখানা (Marginal Firm)—সাধারণ একটা লাভকে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপাদনব্যয়ের অঙ্গীভূত মনে করে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন শিল্পে নিযুক্ত থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহার একটা লাভ থাকা চাই।

যে কোন শিল্পে বহু কারখানা বা প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে। প্রান্তিক কারখানা বা প্রতিষ্ঠান হইল এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠান যাহা শুধু সাধারণ একটা লাভ পাইতেছে। অতিরিক্ত লাভ বলিয়া তাহার কিছু নাই। যাহারা এই সাধারণ লাভটুকুও পায় না সেই সব কারখানা এই শিল্পে বেশীদিন টেঁকে না। পক্ষান্তরে, যে সব কারখানা অতিরিক্ত লাভ পায় তাহারা এই শিল্প ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার কোন সার্থকতা দেখে না।

সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপাদনের পরিমাণ (Optimum Production)—পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক উদ্যোক্তাই সর্বোচ্চ লাভ চায়। যে পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করিলে লাভ সর্বোচ্চ হইবে সেখানে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের (marginal revenue) চেয়ে বেশী নয়। প্রান্তিক আয় বলিলে বুঝায় অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করিলে যে আয় হয় তাহা।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি জিনিসের দাম ঠিক থাকে, কোন এক জন ব্যবসায়ী তাহার নিজের যোগান বাড়াইয়া দামের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। এই কারণে অতিরিক্ত এক একক প্রচলিত দামে বিক্রয় করিতে হইবে। কাজেই, অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহা জিনিসটির প্রচলিত দামের সমান। যখন প্রান্তিক ব্যয় প্রচলিত দামের সমান হয়, তখন লাভ সর্বোচ্চ হয়।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ততক্ষণ উৎপাদন বাড়ানো উচিত যতক্ষণ না প্রান্তিক ব্যয় প্রচলিত দামের সমান হয়। যতক্ষণ প্রান্তিক ব্যয় প্রচলিত দামের চেয়ে কম থাকে ততক্ষণ উৎপাদন বাড়াইয়া যাওয়া লাভজনক। কিন্তু উৎপাদন বাড়াইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রচলিত দামের চেয়ে বেশী হইলে উৎপাদন বাড়ানো সুবিধাজনক নয়, কারণ তখন অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হইবে তাহা অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করিয়া যে আয় হইবে তাহার চেয়ে বেশী হইবে, কাজেই লাভ কম হইবে। যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ার ফলে এমন একটা সময় আসে যখন প্রান্তিক ব্যয় বাড়িতে থাকে—এবং সাধারণত ইহাই ঘটে—সেই সব ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সময়ে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে, প্রান্তিক ব্যয় প্রচলিত দামের সমান হইবে এবং গড়পড়তা ব্যয়ও গড়পড়তা আয়ের সমান হইবে। গড়পড়তা আয় সব সময়েই প্রচলিত দামের সমান। কাজেই, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে :

প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়
প্রান্তিক ব্যয় = জিনিসের দাম
জিনিসের দাম = গড়পড়তা আয় = গড়পড়তা ব্যয়।
কাজেই,
দাম = প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয় = গড়পড়তা আয় = গড়পড়তা ব্যয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক কারখানা :—

উৎপাদনের পরিমাণ	গড়পড়তা ব্যয়	মোট ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়	গড়পড়তা আয় (প্রচলিত দাম)	মোট আয়	প্রান্তিক আয়	অতিরিক্ত লাভ
৫০ একক	১২৲	৬০০৲	—	১০৲	৫০০৲	১০৲	—১০০৲
৬০ একক	১১·৩৲	৬৮০৲	৮৲	১০৲	৬০০৲	১০৲	—৮০৲
৭০ একক	১০·৭৲	৭৫০৲	৭৲	১০৲	৭০০৲	১০৲	—৫০৲
৮০ একক	১০·১৲	৮১০৲	৬৲	১০৲	৮০০৲	১০৲	—১০৲
৯০ একক	১০৲	৯০০৲	৯৲	১০৲	৯০০৲	১০৲	০
১০০ একক	১০৲	১০০০৲	১০৲	১০৲	১০০০৲	১০৲	০
১১০ একক	১০·২৲	১১২৫৲	১২·৫৲	১০৲	১১০০৲	১০৲	—২৫৲
১২০ একক	১০·৬৲	১২৭৫৲	১৫৲	১০৲	১,২০০৲	১০৲	—৭৫৲

উৎপাদনের হার ঃ ব্যয় (Returns : Costs)—যোগানের নিয়ম অনুসারে বলা হয় যে, যখন কোন জিনিসের দাম বাড়ে তখন তাহার যোগানও বাড়ে এবং দাম কমিলে যোগানও কমে। দীর্ঘ কাল পরে যোগানের অবস্থা কি হইবে তাহা নির্ভর করে জিনিসটির উৎপাদনের ব্যয় (costs) অথবা উৎপাদনের পরিমাণের (returns) পরিবর্তনের অনুপাতের উপর।

যখন উৎপাদনের কোন একটি কি একাধিক উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করিয়া এবং অন্য একটি কি একাধিক উপাদান স্থির রাখিয়া উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় তখন সাধারণত অতিরিক্ত উৎপাদনের হার কমিয়া আসে। যে উপাদান বাড়ানো হয় সেই উপাদানের গড়পড়তা উৎপাদন কমিয়া আসে। ইহার অর্থ এই যে, অতিরিক্ত উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া চলে।

জমি একটি উপাদান। জমিতে আরও বেশী শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অতিরিক্ত উৎপাদন সমানুপাতিক হারে বাড়িবে না, বরং তাহার চেয়ে কম হারে বাড়িবে। যে কোন ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের (diminishing returns) অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের (increasing costs) এই সাধারণ নিয়মটি (law) খাটে।

অবশ্য, যদি উৎপাদন প্রণালীর কোন উন্নতি সাধন করা হয়, তাহা হইলে ইহা না হইয়া অতিরিক্ত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে (increasing returns) বাড়িতে পারে অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের (diminishing costs) ব্যবস্থা হইতে পারে।

নিয়মটি (law) একটি তালিকার দ্বারা বোঝানো যাইতে পারে ঃ—

উৎপাদনের হিসাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান ব্যয়
(Diminishing Returns or Increasing Costs)

শ্রমিকের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (স্থির) একক	মূলধনের পরিমাণ (স্থির) একক	উৎপাদনের পরিমাণের একক	শ্রমিক পিছু গড়পড়তা উৎপাদন
১	২	৮	১০	১০
২	২	৮	৩০	১৫
৩	২	৮	৬০	২০
৪	২	৮	১০০	২৫
৫	২	৮	১২০	২৪
৬	২	৮	১৩২	২২
৭	২	৮	১৪০	২০
৮	২	৮	১৪৪	১৮

এই তালিকা হইতে বোঝা যায়, ৫ম শ্রমিক হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিয়মের (law of diminishing returns or increasing costs) ক্রিয়া সুরু হইয়াছে।

ব্যয়ের হিসাবে ক্রমবর্ধমান ব্যয় অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন
(Increasing Costs or Diminishing Returns)

উৎপাদনের পরিমাণের একক	মোট ব্যয় (টাকা)	প্রান্তিক ব্যয় (টাকা)
১০	২২৫	—
৩০	৩৭৫	৭·৫
৬০	৫৫৫	৬
১০০	৭৫৫	৫
১২০	৮৬৫	৫·৫
১৩২	৯৪০	৬·২৫
১৪০	৯৯৬	৭
১৪৬	১০৪৪	৮

দেখা যাইতেছে যে ৫ম ধাপ হইতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের (law of increasing costs or diminishing returns) ক্রিয়া সুরু হইয়াছে।

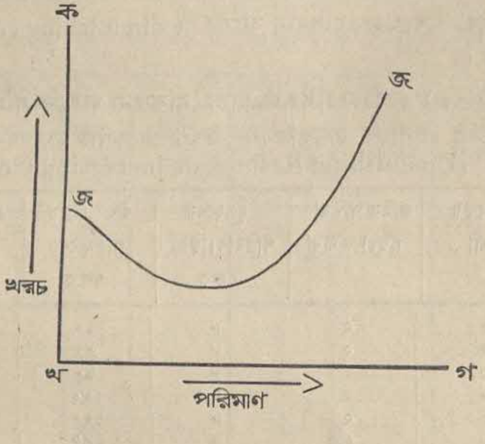

এই চিত্র হইতে বোঝা যায় যে প্রথম দিকে ব্যয় কমিয়া আসিলেও কিছু কাল পরে ক্রমশই তাহা বাড়িয়া যাইতেছে। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিয়মের ক্রিয়া সুরু হইলে দাম বাড়িলেও যোগান খুব বেশী বাড়ে না। তখন যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়।

অনেক সময়ে এরূপ হইতে পারে যে বেশী উৎপাদন হইলেও খরচের হার এক প্রকার (constant costs) আছে। উৎপাদক বাড়াইলে উৎপাদনের পরিমাণও একই হারে বাড়িতেছে, অর্থাৎ উৎপাদনের ব্যয়ও একই হারে বাড়িতেছে। এই রকম সমানুপাতিক উৎপাদনের (constant returns) অর্থাৎ সমানুপাতিক ব্যয়ের (constant costs) ক্ষেত্রে যদি চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে যোগান বাড়ানোর খুব সুবিধা। নূতন নূতন কারখানা চালু হইতে পারে, কারণ তাহাদের উৎপাদনব্যয় একই প্রকার থাকিবে। পুরাতন কারখানাগুলিও মোটামুটি পূর্বের ব্যয়-হার বজায় রাখিয়া বেশী উৎপাদন করিতে পারিবে। কাজেই, সামান্য একটু দাম বাড়িলে যোগান খুব বাড়িয়া যাইবে এবং সামান্য একটু দাম কমিলে যোগান খুব কমিয়া যাইবে। সুতরাং ব্যয়ের হার সমান থাকিলে যোগান স্থিতিস্থাপক হয়।

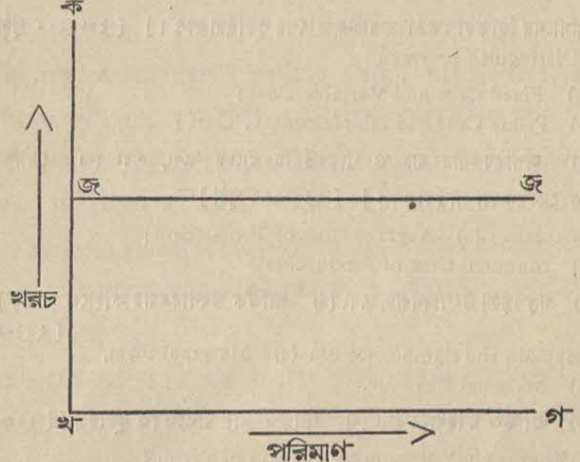

এই চিত্র হইতে বোঝা যায় যে পরিমাণ যাহাই হউক না কেন খরচের হার একপ্রকার আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যোগান স্থিতিস্থাপক হয়।

সব সময়েই যে ব্যয়ের হার বাড়িয়া চলে তাহা নহে। এমন হইতে পারে যে কোন একটি শিল্প এত বেশী সমৃদ্ধিশালী যে আরও বেশী প্রসার হওয়া সত্ত্বেও গড়পড়তা ব্যয় সমানে কমিয়া যাইতেছে এবং এই শিল্পের সকল কারখানাতেই এইরূপে ব্যয় কমিতেছে। এই নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের নিয়ম (law of diminishing costs) অথবা ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম (law of increasing returns) বলা হয়।

বলা বাহুল্য, এরূপ ক্ষেত্রে যোগান অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক হয়। তবে, যেখানে এইরূপে ব্যয়ের হার কমে সেখানেও বরাবর এই অবস্থা চলিতে থাকে না, সেখানেও এক সময়ে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিয়ম কার্যকরী হয়। সুতরাং, সেরূপ ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত যোগানের একটা সীমারেখা টানা হয়। তবে, এ কথা বলা চলে যে যত দিন ব্যয় ক্রমহ্রাসমান থাকে ততদিন দাম কমিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্বাপেক্ষা কম দামের স্তরে যোগান ও চাহিদার মধ্যে একটা সমতা (equilibrium) আসে।

প্রশ্ন

1. Explain and illustrate the relation between price and supply.

[কোন জিনিসের দামের সহিত ইহার যোগানের সম্পর্ক কি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।] [২১৮-২২০ পৃষ্ঠা]

2. Explain the significance of elasticity of supply.

['যোগানের স্থিতিস্থাপকতা' কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।] [২১৮-২২০ পৃষ্ঠা]

3. Distinguish between :

(a) Fixed Cost and Variable Cost ;

(b) Prime Cost and Supplementary Cost ;

[(ক) অপরিবর্তনীয় ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে, এবং (খ) মৌলিক ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ?] [২২০-২২২ পৃষ্ঠা]

4. Explain : (a) Average Cost of Production ;

(b) Marginal Cost of Production.

[(ক) গড়পড়তা উৎপাদনব্যয়, এবং (খ) প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় কাহাকে বলে ?] [২২২-২২৩ পৃষ্ঠা]

5. Explain the significance of : (a) Marginal Firm,

(b) Marginal Revenue.

[(ক) প্রান্তিক কারখানা এবং (খ) প্রান্তিক আয় বলিলে কি বুঝায় ?] [২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা]

6. What is the optimum production of a firm ?

[একটি কারখানার সর্বাপেক্ষা লাভজনক উৎপাদনের পরিমাণ কি ভাবে নির্ণয় করা হয় ?] [২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা]

7. Explain and illustrate the laws of returns.

[উৎপাদনের হার সম্পর্কে যে তিনটি নিয়ম আছে তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।] [২২৫-২২৮ পৃষ্ঠা]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দাম-নির্ধারণ
(Price Determination)

মূল্য ও দাম (Value and Price)—কোন একটি জিনিসের একটি এককের (unit) বিনিময়ে অন্য একটি জিনিসের (টাকা কিংবা অন্য যে কোন জিনিসের) যে সংখ্যা বা পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাকে প্রথমোক্ত জিনিসটির মূল্য (value) বলা হয়।

যখন কোন একটি জিনিসের মূল্য টাকার হিসাবে ধরা হয় তখন সেই মূল্যকে দাম (price) বলা হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা 'মূল্য' শব্দটিকে 'দাম' অর্থেই ধরিয়া লইব। সাধারণত 'মূল্য' এবং 'দাম' কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়।

দাম ও সাধারণ মূল্যস্তর (Price and General Price Level)—দাম (price) বলিলে কোন একটি জিনিসের দাম বুঝায়। সাধারণ মূল্যস্তর (prices or general price level) বলিলে জিনিসপত্রের এবং সেবাকার্যের সবগুলির একটি কাল্পনিকভাবে একীভূত রূপের (ইহাকে আমরা 'দ্রব্যাদি' বলিয়াছি) দামকে বুঝায়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে সাধারণ ভাবে সবগুলি জিনিসপত্র এবং সেবাকার্যের দাম অর্থাৎ সাধারণ মূল্যস্তর প্রধানতঃ অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু, একটি জিনিসের দাম এই ভাবে নির্ধারিত হয় না। যে কোন একটি জিনিসের দাম অন্য ভাবে নির্ধারিত হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা একটি জিনিসের দাম-নির্ধারণের কথা আলোচনা করিব।

দাম-নির্ধারণের প্রধান উপাদান (Factors Governing Price)—কোন একটি জিনিসের দাম প্রধানত ইহার চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, যে দামে একটি জিনিসের চাহিদা এবং যোগানের পরিমাণের মধ্যে একটা সাম্য আসিবে তাহাই ঐ জিনিসটির দাম (price) হিসাবে চালু হইবে।

চাহিদা ও যোগানের সাম্য (Equilibrium of Demand and Supply)—চাহিদা অনুসারে যোগান নিয়ন্ত্রিত হইলেই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা সমতা আসে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন একটি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের সমতা আসে তখন, যখন সেই প্রতিষ্ঠান উৎপাদন আর বাড়াইতে বা কমাইতে চাহে না। উৎপাদনপ্রণালী পরিবর্তন করার দিকেও আর কোন ইচ্ছা থাকে না। এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াইলে মোট লাভ কমিয়া আসে। যখন উৎপাদন সমতায় পৌছায় তখন গড়পড়তা ব্যয় (average cost) সর্বাপেক্ষা কম হয়, কারণ তখন প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost) গড়পড়তা ব্যয়ের সমান হয়।

সমগ্র শিল্পে সমতা আসে তখন, যখন শিল্পটির আয়তন আর বাড়াইবার বা কমাইবার কোন উপায় নাই অথবা ইচ্ছাও নাই। অর্থাৎ নূতন কোন প্রতিষ্ঠান এই শিল্পে প্রবেশ করিবে না এবং কোন প্রতিষ্ঠান এই শিল্প ছাড়িয়া অন্য শিল্প আশ্রয় করিবে না। ইহার অর্থ এই যে, শিল্পটিতে যে সব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনব্যয় সর্বাপেক্ষা বেশী (যে কোন সময়েই উৎপাদনব্যয় কোন প্রতিষ্ঠানের কম, কোন প্রতিষ্ঠানের বেশী হইতে পারে) তাহারাও স্বাভাবিক সাধারণ একটা লাভ (normal profit) পাইতেছে। যদি শিল্পে নিযুক্ত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই সাধারণ লাভ পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শিল্পটিতে আদর্শ সমতা (perfect equilibrium) আসিয়াছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক শক্তি শিল্পটিতে নিযুক্ত সবগুলি প্রতিষ্ঠানকেই এই দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু কার্যত স্থায়ী ভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনব্যয় অধিক, কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনব্যয় কম থাকে। এমন অবস্থায় শিল্পটিতে যে সমতা থাকিবে তাহাকে আদর্শস্থানীয় বলা যায় না, কারণ তখন যে সব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনব্যয় খুব কম তাহারা সাধারণ লাভের চেয়ে বেশী লাভ পাইবে।

যদি কোন জিনিসের দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে যোগান বাড়িবে। শিল্পে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবে এবং নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান বেশী লাভের আশায় এই শিল্পে প্রবেশ করিবে। জিনিসের দাম কমিলে ঠিক ইহার উল্টা ফল ফলিবে।

যদি প্রান্তিক ব্যয় ক্রমশই বাড়িতে থাকে তাহা হইলে যোগান

বাড়ানোর জন্য দাম খুব বেশী বাড়া দরকার। কাজেই দাম বাড়ার সঙ্গে যোগান কিরূপ বাড়িবে সেটা নির্ভর করে প্রান্তিক ব্যয়ের পরিমাণের উপর। যদি প্রান্তিক ব্যয় খুব বেশী বাড়িতে থাকে তাহা হইলে যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবে।

তেমনি আবার, দাম কমিলে যোগান অনুরূপ কমাইতে পারা যাইবে কিনা সেটাও নির্ভর করে শিল্পে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনব্যয়ের হারের উপর। যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে খুব বেশী তারতম্য থাকে, তাহা হইলে যখন যোগান কমানোর দরকার তখন অল্প যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনব্যয় বেশী সেগুলির উৎপাদন কমাইলে উৎপাদন কমিয়া যাইবে—অবশ্য, সমানুপাতে নহে।

যখন দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে যোগান অনুরূপ কমাইতে পারা যায় না, তখন বুঝিতে হইবে যে, সেই দামে যতটা চাহিদা আছে তাহা হইতে বেশী উৎপাদন হইতেছে। কাজেই দাম আরও পড়িয়া যাইবে। ইহাতে শিল্পে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির লাভ কমিয়া যাইবে এবং যাহাদের উৎপাদন ব্যয় বেশী তাহাদের ক্ষতি হইবে, কাজেই তাহারা উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হইবে। এই ভাবে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা আসিবে।

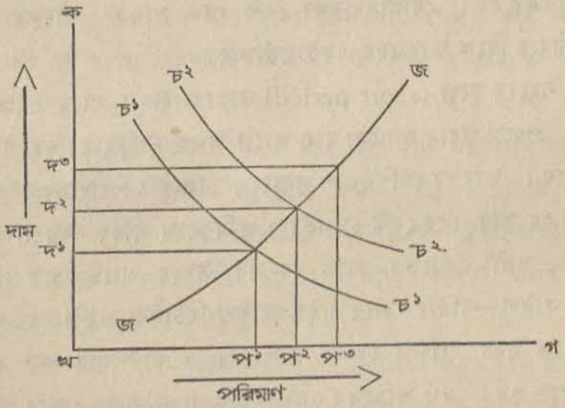

চিত্রটিতে জজ রেখাদ্বারা বিভিন্ন দামে যোগানের পরিমাণ এবং চ¹চ¹ ও চ²চ² রেখাদ্বয় দ্বারা যথাক্রমে চাহিদা বাড়িবার পূর্বে এবং পরে বিভিন্ন দামে চাহিদার পরিমাণ বুঝায়।

এই চিত্র হইতে বোঝা যায়, চাহিদা বাড়ায় জিনিসের দাম বাড়িয়া দ³

হইল। ইহাতে উৎপাদনকারিগণ থপ৩ পরিমাণ জিনিস প্রস্তুত করিবে। কিন্তু যোগান বেশী হওয়ার দরুণ দাম কমিয়া দ২তে নামিবে। এই অবস্থায় চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমতা আসিবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জিনিসের মূল্য বা দাম (Value or Price under Perfect Competition)—মূল্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা সমতা আসে। কোন জিনিসের মূল্য আবার তাহার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। কাজেই চাহিদা, মূল্য ও যোগান—ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে যে কোন প্রতিষ্ঠানে এবং যে কোন শিল্পে সমতা আসে।

চাহিদার ব্যাপারে বলা যায় যে প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) কোন জিনিসের চাহিদা সীমিত করিবে।

যোগানের ব্যাপারে বলা যায় যে গড়পড়তা উৎপাদনব্যয়ই (average cost of production) যোগানের সীমারেখা নির্ধারণ করিবে।

কাজেই, প্রান্তিক উপযোগ এবং গড়পড়তা উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে সমতা আসিলেই শিল্পে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা আসিবে।

কোন জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে স্বভাবতই বেশী দামে সেই জিনিস বিক্রয় হয়। যোগানদারগণ বেশী লাভ পায়। কাজেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার দিকে তাহাদের একটা ঝোঁক হয়।

অল্প সময়ের মধ্যে (short period) তাহারা যতটা পারে যোগান বৃদ্ধি করে। প্রথমে পুরান জমানো মাল আস্তে আস্তে ছাড়িয়া চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। তারপর মেশিনগুলি পুরাদমে চালাইয়া (সাধারণ সময়ে যতটা চালানো হয় তার চেয়ে বেশী চালাইয়া), শ্রমিকদের অধিক সময় (overtime) খাটাইয়া—অর্থাৎ, হাতের কাছে যে সব উপায় আছে তার সব কয়টি ব্যবহার করিয়া—সাময়িকভাবে বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে।

ইহাতে খরচ বাড়িয়া যায়। Overtime খাটানোর জন্য অতিরিক্ত মজুরি দিতে হয়। দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মজুরি বৃদ্ধি পায়। কাজেই খরচ বাড়িবে। সেই জন্য, যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে, অল্প সময়ের মধ্যে (short period) জিনিসের দামও খুব বাড়ে। সব জিনিসই বিক্রি হয় বলিয়া মোট লাভও বেশী হয়।

খরচ বাড়িলেও লাভ থাকে বলিয়া, যে সব প্রতিষ্ঠানে কাজ চলিতেছে

তাহারা কেহই কাজ বন্ধ করে না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে (short period) কোন নূতন প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসা আরম্ভ করে না। যত দিন পর্যন্ত না বেশ কিছু কাল গত হয়—যাহাতে নূতন নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—তত দিন পর্যন্ত কোন নূতন ব্যবসায়ী এই শিল্পে উৎপাদনের ঝুঁকি নেয় না।

দীর্ঘ কাল (long period) ধরিয়া এইরূপে চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে প্রথমে চালু কারখানাগুলি তাহাদের আয়তন বৃদ্ধি করিবে। ইহাতে যন্ত্রপাতি এবং মজুরের উপর হইতে চাপ কমানো হইবে। বেশী লাভের জন্য আরও বেশী সংখ্যক কারখানা তৈয়ারি হইবে। এই শিল্পে ক্ষতির সম্ভাবনা কম, এই জন্য অনেক নীচু দরের কারখানাও চালু থাকিবে। এই দুই কারণে এই বিশেষ শিল্পের খুব প্রসার হইবে এবং কারখানাগুলিও বর্ধিত আয়তনের হইবে।

উৎপাদন তো বৃদ্ধি পাইবে। এখন দাম কিরূপ হইবে সেটা নির্ভর করে খরচ কিরূপ হইবে তাহার উপর।

সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি না হইলে খরচ কমানোর উপায় নাই। কাজেই চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার আগে একটি প্রতিষ্ঠানের একক পিছু উৎপাদন ব্যয় যাহা ছিল দীর্ঘ কালের মধ্যে তাহা কমার চেয়ে বরং বাড়িবার সম্ভাবনাই বেশী। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে বড় মেশিন বসাইয়া কাজ করিতে হইবে। যে সব মেশিনে কাজ হইবে সেই সব মেশিনের চাহিদা বাড়িবে এবং দাম বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং, উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ভবিষ্যতে একক পিছু খরচ খুব সম্ভব কিছু বাড়িবে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানের একমাত্র নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করা যায় তাহা হইলে দীর্ঘ কালের হিসাবে তাহার একক পিছু খরচ পূর্বের চেয়ে কম হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

অন্য কতকগুলি অসুবিধার—যেগুলি সেই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উৎপাদনের অঙ্গীভূত নহে, যেগুলির উদ্ভব সাধারণ ভাবে শিল্প প্রসারের জন্য সেগুলির—কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের ফলে মোটামুটি ভাবে দীর্ঘ কাল পরে সেই জিনিসটির একক পিছু খরচ পূর্বের চেয়ে কম হইবে না, বরং কিছুটা বাড়িবে। শিল্প প্রসারের জন্য নূতন ব্যবসায়ী দরকার এবং দক্ষ ব্যবসায়ীর সংখ্যা অসীম নহে। কাজেই সেই শিল্পে নূতন ব্যবসায়ীর প্রবেশের অর্থ

হইল এই যে, যে হারে লাভ না পাইলে দক্ষ ব্যবসায়ী সেই শিল্পে থাকিবে না সেই হারে লাভ বাড়ানো হইতেছে। কাঁচা মালের দাম বাড়িবে। মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইবে। খরচ বাড়িবে।

সুতরাং দীর্ঘ কাল পরে যে দাম হইবে তাহা অল্পমেয়াদী দামের চেয়ে কম না হইয়া বরং বেশী হইতে পারে।

কিন্তু আবার, শিল্পের প্রসারের ফলে প্রথম দিকে কতকগুলি সুবিধাও পাওয়া যায়। যেমন, অনেক প্রতিষ্ঠান একই শিল্পে নিযুক্ত থাকার ফলে তাহারা অনেক কাঁচা মাল সস্তায় কিনিতে পারে। যেমন, কয়লা শিল্পের প্রসারের ফলে এক জায়গায় যদি বহু খনি খনন করা হয় তাহা হইলে সেগুলির যে কোন একটি হইতে জল নিষ্কাশনের খরচ অনেক কম হইবে। তারপর বিজ্ঞাপন, কারিগরি শিক্ষা, পরিবহন, এ সবেরই কম খরচে ব্যবস্থা করা যায়।

অবশ্য, এ সবের জন্যও যে দীর্ঘ কাল পরেও খরচ ক্রমান্বয়ে কমিতেই থাকিবে তাহা নহে। খরচ কম হইতে পারে একমাত্র যদি উৎপাদন প্রণালীর কোন উন্নতি করিতে পারা যায়। দীর্ঘ কাল ধরিয়া শিল্পের প্রসার হইলে এরূপ সম্ভাবনা আছে। তবে কোন নিশ্চয়তা নাই। এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই যে যখন শিল্পের দ্রুত প্রসার হইতেছে সেই সময়ে উৎপাদন প্রণালীরও দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং মন্দার বাজারে উন্নতি হয় না, অথবা প্রতিযোগিতার বাজারেই উন্নতি হয় এবং একচেটিয়া বাজারে উন্নতি হয় না।

যদি কোন জিনিসের চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে যোগানদারী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমত মাল বেশী জমাইয়া রাখিয়া দাম ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু বেশী দিন এইরূপ করিতে পারিবে না। যখন দেখিবে যে চাহিদা সত্য সত্যই কমিয়া যাইতেছে, তখন তাহারা মাল ছাড়িতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে দাম আরও কমিয়া যাইবে। উৎপাদনকারীরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া কম দামে বিক্রয় করিতে সুরু করিবে।

অল্প সময়ের মধ্যে দাম বেশ কমিয়া যাইবে। তবে, তখনও উৎপাদন খুব বেশী কমিবে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাহাদের জিনিস কম দামে বিক্রয় করিবে। হয়ত একক পিছু যাহা খরচ পড়ে তাহার চেয়েও কম দামে বিক্রয় করিবে। প্রতিষ্ঠানগুলি এমন দাম চাহিবে যাহাতে তাহাদের পরিবর্তনীয় ব্যয়গুলি এবং আংশিক ভাবে অপরিবর্তনীয় ব্যয়ও পোষাইয়া যায়। একেবারে কারবার বন্ধ করার চেয়ে এইটাই তাহারা সুবিধাজনক মনে করে।

প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য ক্রমাগতই দাম কমাইতে থাকিবে। ইহার ফলে লাভের হার কমিয়া আসিবে। নূতন কোন প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসায়ে আসিবে না। বরং কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। সাহসী উদ্যোক্তাগণ (entrepreneurs) অন্য ব্যবসায়ে (যেখানে একটু বেশী এবং নিশ্চিত লাভ পাওয়া যায় সেই ব্যবসায়ে) ছুটিবে এবং লাভ কম হইতেছে দেখিয়া দুর্বল ব্যবসায়িগণ (যাহাদের প্রান্তিক ব্যয় বেশী তাহারা) এই ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে।

তাহা হইলে, বেশ কিছুদিন পরে এই বিশেষ জিনিসের উৎপাদনে খুব বেশী প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত থাকিবে না। যোগান কমিয়া যাইবে। ফলে, জিনিসের দাম মন্দা আসিবার পূর্বে যেরূপ ছিল সম্ভবত তাহার চেয়ে কিছুটা কম হইলেও খুব কম হইবে না।

দাম নির্ধারণে কালের গুরুত্ব (Importance of the Time Element in the Determination of Price)—পূর্ণ প্রতিযোগিতার (perfect competition) ক্ষেত্রে, যে দামে কোন একটি জিনিসের চাহিদার পরিমাণ এবং যোগানের পরিমাণের মধ্যে সমতা উপস্থিত হয় সেই দামই ঐ জিনিসটির প্রচলিত দাম বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহা হইতেই বলা যায় যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন একটি জিনিসের দাম ইহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

কিন্তু, দাম নির্ধারণের ব্যাপারে চাহিদা ও যোগান এই দুইটির কোন্‌টির প্রভাব বেশী? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আমরা কতটা সময়ের কথা বিবেচনা করিতেছি তাহার উপর।

সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, অল্প কালের (short period) কথা বিবেচনা করিলে চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগানের পরিবর্তন যথোপযুক্তভাবে সম্ভব হয় না বলিয়া দাম নির্ধারণের ব্যাপারে যোগানের চেয়ে চাহিদার অর্থাৎ জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগের প্রভাব বেশী হয়, কিন্তু দীর্ঘ কালের (long period) কথা বিবেচনা করিলে পরিবর্তিত যোগানের ফলে পরিবর্তিত উৎপাদনব্যয়ের প্রভাব বেশী হয়।

দামের প্রথম গতিবেগ তৈয়ারি হয় চাহিদার দ্বারা। কোন জিনিসের একটি দাম প্রতিষ্ঠিত আছে। হঠাৎ সেই জিনিসটির প্রান্তিক উপযোগ

বাড়িতে বা কমিতে পারে। প্রান্তিক উপযোগ অর্থাৎ চাহিদার এই পরিবর্তনের ফলে তৎক্ষণাৎ দামের পরিবর্তন হয়।

দামের পরিবর্তন হইলেই যোগানদারগণ যোগানের পরিবর্তন করিতে থাকে। প্রথমে তাহারা মজুত মাল বাজারে ছাড়িয়া অথবা বাজার হইতে মাল গুটাইয়া লইয়া চাহিদার সহিত যোগানের সমতা রক্ষার চেষ্টা করে।

আমরা যদি সময়ের পরিমাণ মাত্র কয়েক ঘণ্টা ধরি, তাহা হইলে অনেক জিনিসের বেলায়ই এই রকম মজুত মাল বাজারে ছাড়া, অথবা বাজার হইতে মাল তুলিয়া নিয়া মজুত করা, সম্ভব হয় না।

স্থতরাং, সময়ের পরিমাণ মাত্র কয়েক ঘণ্টা ধরিলে, অর্থাৎ অত্যন্ত কম সময়ের (very short period) কথা বিবেচনা করিলে, বলিতে হইবে যে পরিবর্তিত দাম চাহিদার দ্বারা খুব বেশী নির্ধারিত হয়, যোগানের পরিবর্তন মোটেই সম্ভব হয় না বলিয়া দামের পরিবর্তনের উপর যোগানের প্রভাব খুবই কম পড়ে।

সময় যদি অত্যন্ত কম না হইয়া কিছু কম (short period) হয়, তাহা হইলে মজুত মাল ছাড়ার অথবা মাল গুটাইয়া লওয়ার অবকাশ পাওয়া যায়।

স্থতরাং, সময় খুব কম না ধরিয়া মোটামুটি ভাবে কম (short period) ধরিলে, দেখা যায় যে দামের পরিবর্তনের উপর চাহিদার প্রভাব বেশী হইলেও যোগানের প্রভাবও নগণ্য নয়।

যোগানদারগণ মজুত মাল ছাড়িবার অথবা মাল গুটাইয়া লইবার পরে উৎপাদনের পরিবর্তন স্থরু করে। কিন্তু উৎপাদনের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। উৎপাদনের পরিবর্তনের কথা ভাবিলে দীর্ঘ কালের (long period) কথা বিবেচনা করিতে হয়।

যোগানদারগণ প্রথমে প্রতিষ্ঠিত (existing) কারখানা ইত্যাদির মাধ্যমেই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে অথবা কমাইতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায়, মৌলিক ব্যয়ের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করিতে হয়। অবশ্য, আনুষঙ্গিক ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু, জিনিসটির মোট উৎপাদনব্যয়ের অনেক পরিবর্তন হয়। দামের পরিবর্তনের উপর উৎপাদনব্যয়ের এই পরিবর্তনের প্রভাব চাহিদার প্রভাবের চেয়ে, কম ত নয়ই, বরং কিছু বেশী হওয়াই সম্ভব।

যোগানদারগণ পরে প্রতিষ্ঠিত কারখানা ইত্যাদিও বাড়াইয়া অথবা

কমাইয়া দামের পরিবর্তন অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ যথাযথভাবে বাড়ায় অথবা কমায়। ইহাতে সময় আরও বেশী (very long period) লাগে। উৎপাদনব্যয়েরও আরও বেশী পরিবর্তন হয়, কারণ ইহাতে আনুষঙ্গিক ব্যয়েরও বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের প্রয়োজন হয় এবং সেই জন্য কোন কোন উৎপাদকেরও পরিবর্তিত পরিমাণের উৎপাদনব্যয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই অবস্থায় কোন জিনিসের দামের পরিবর্তনের উপর ইহার উৎপাদকের কতকাংশের উৎপাদনব্যয়ের পরিবর্তনেরও প্রভাব পড়ে।

সুতরাং, সময় অত্যন্ত দীর্ঘ (very long period) না ধরিয়া, অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে আনুষঙ্গিক উৎপাদনব্যয়ের (supplementary cost of production) পরিবর্তন হইতে পারে সেই রকম দীর্ঘ সময় না ধরিয়া, কিছুটা বেশী সময় ধরিলে, অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র মৌলিক ব্যয় (primary cost of production) বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া জিনিসটির উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো অথবা কমানো যায় সেই রকম দীর্ঘ সময় (long period) ধরিলে, দেখা যায় যে কোন জিনিসের দামের পরিবর্তনের উপর ইহার পরিবর্তিত উৎপাদনব্যয়ের অর্থাৎ ইহার যোগানের প্রভাব বেশ ভালভাবেই পড়ে। এই প্রভাব চাহিদার প্রভাবের চেয়েও একটু বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

সময় অত্যন্ত দীর্ঘ ধরিলে, অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে জিনিসটির আনুষঙ্গিক ব্যয়েরও পরিবর্তন সম্ভব সেই রকম অতি দীর্ঘ সময় (very long period) ধরিলে, কোন জিনিসের দামের পরিবর্তনের উপর ইহার কোন কোন উৎপাদকেরও উৎপাদনব্যয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং, সময় অত্যন্ত দীর্ঘ ধরিলে, বলিতে হয় যে কোন জিনিসের দামের পরিবর্তনের উপর ইহার যোগানের প্রভাব ভীষণভাবে পড়ে। এই অবস্থায়, যোগানের প্রভাব চাহিদার প্রভাবের চেয়ে আরও অনেক বেশী।

অবশ্য, সময় কম অথবা বেশী যাহাই ধরি না কেন, সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোন জিনিসের দাম ইহার চাহিদা এবং যোগান এই উভয় ব্যাপার দিয়াই নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে, কাল যত হ্রস্ব বলিয়া ধরা যায় দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত বেশী, এবং কাল যত দীর্ঘ বলিয়া ধরা যায় দামের উপর যোগানের প্রভাব তত বেশী, অনুভূত হয়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দাম-নির্ধারণের ব্যাপারটি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কালের হ্রস্বতা কি দীর্ঘতার প্রশ্ন ওঠে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার (perfect competition) ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি খুব বেশী আসিয়া যায়। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা (imperfect competition) এবং সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া ব্যবসায়ের (monopoly) আলোচনা করিবার সময় দেখা যাইবে যে সেই সব ক্ষেত্রেও কালের পরিমাণের প্রশ্নটি একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। সুতরাং আমরা নির্বিবাদে বলিতে পারি যে দামনির্ধারণের ব্যাপারে কালের গুরুত্ব খুব বেশী।

বাজার দর ও স্বাভাবিক দর (Market Price and Normal Price)—হ্রস্ব কালে (short period) প্রবর্তিত দামকে, অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে মজুত মাল কমানো কিংবা বাড়ানো সম্ভব হইলেও উৎপাদন বাড়ানো কিংবা কমানো মোটেই সম্ভব হয় না সেই সময়ে প্রবর্তিত দামকে, ধনবিজ্ঞানে বাজার দর (market price) বলা হয়। অনেক সময়ে বাজার দর কথাটি অত্যন্ত হ্রস্ব কালে (very short period) প্রচলিত দরের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে, বাজার দরের উপর যোগানের প্রভাবের চেয়ে চাহিদার প্রভাব বেশী।

সময় অত্যন্ত অল্প ধরিলে, অর্থাৎ বাজার দর কথাটি অত্যন্ত অল্প সময়ে (very short period) প্রচলিত দামের অর্থে প্রয়োগ করিলে, দেখা যায় যে বাজার দর খুব বেশী ভাবে চাহিদা-সংশ্লিষ্ট কারণগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়, কারণ এই সময়ের মধ্যে মজুত মালেরও পরিবর্তন সম্ভব হয় না। তবে, সময় অত্যন্ত অল্প না ধরিয়া মোটামুটি ভাবে অল্প ধরিলে, অর্থাৎ বাজার দর কথাটি মোটামুটি ভাবে অল্প সময়ে প্রচলিত দামের অর্থে প্রয়োগ করিলে, দেখা যায় যে বাজার দর যোগানের তুলনায় চাহিদা-সংশ্লিষ্ট কারণগুলির দ্বারা বেশী ভাবে (খুব বেশী ভাবে নয়) নির্ধারিত হয়।

দীর্ঘ এবং অতিদীর্ঘ কালে (long and very long period) প্রবর্তিত দামকে, অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কারখানা ইত্যাদির মাধ্যমে এবং দরকার হইলে কারখানা ইত্যাদিরও প্রসারণ কিংবা সঙ্কোচন করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো কিংবা কমানো সম্ভব হয় সেই রকম সময়ে প্রবর্তিত দামকে, ধনবিজ্ঞানে স্বাভাবিক দর (normal price) বলা হয়।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, স্বাভাবিক দর চাহিদার চেয়ে যোগান-সংশ্লিষ্ট কারণগুলির দ্বারা বেশী ভাবে নির্ধারিত হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জিনিসের মূল্য বা দাম কি ভাবে নির্ধারিত হয় তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সময়ে আমরা সমগ্র ব্যাপারটি এমন ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছি যে তাহা হইতেই বাজার দর (অল্পকালে প্রবর্তিত দর) কি ভাবে নির্ধারিত হয় এবং স্বাভাবিক দর (দীর্ঘকালে প্রবর্তিত দর) কি ভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বোঝা যায়।

অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জিনিসের মূল্য বা দাম (Value or Price under Imperfect Competition)—যে অবস্থায় প্রতিযোগিতা খুব তীক্ষ্ণ নয় সেই অবস্থাকে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা (imperfect competition) বলে। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে, সেই অভাব বেশী অথবা কম হইতে পারে। প্রতিযোগিতার অভাব সম্পূর্ণভাবে উদ্ভূত হইলে একচেটিয়া কারবারের (monopoly) উদ্ভব হয়। একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইলে, ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা (potentiality) থাকিতে পারে, কিন্তু বিবেচ্য সময়ে প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না।

একচেটিয়া কারবার হইল প্রতিযোগিতার অসম্পূর্ণতার চরম অবস্থা। সুতরাং, অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে ভাবে দাম নির্ধারিত হয় একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রেও কতকাংশে সেই ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। কাজেই অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণের আলোচনা কতকাংশে একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণের আলোচনায় প্রযোজ্য।

প্রথমে আমরা সাধারণ ভাবে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণের আলোচনা করিব। পরে বিশেষ ভাবে একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণের আলোচনা করিব। যেখানে একই শিল্পে রত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হুবহু এক ধরণের জিনিস উৎপন্ন করে না—একটু আলাদা আলাদা জিনিস তৈয়ারি করে—সেখানেও অবস্থা পূর্ণ প্রতিযোগিতার মতই, তবে একটু পার্থক্য আছে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতাটা দামের। কিন্তু অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধরণ আলাদা।

যদি উৎপাদনকারীর ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সে বরং জিনিসটির উৎপাদন

অথবা আবরণ বদলাইবে, তবু দাম বদলাইবে না। যেমন, কোন নক্সা বদলাইয়া অথবা মোড়কের রং বদলাইয়া, যে কোন প্রকারে ক্রেতার মনোরঞ্জন করিয়া, বিভিন্ন উৎপাদনকারীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

বিভিন্ন ধরণের স্থবিধা-অস্থবিধা দিয়াও জিনিসের মধ্যে তারতম্য করা হয়। খুচরা বিক্রয়ের দোকানের কথা ধরা যাক। লোকে বাড়ীর কাছে পাড়ার দোকান হইতে বরং বেশী দাম দিয়া জিনিস্ কিনিবে, কিন্তু তবুও একটু দূরে যাইবার কষ্ট স্বীকার করিবে না, যদিও দূরের দোকানে জিনিসটি হয়ত একটু সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে। তবে, একটু বেশী সময়ের কথা ধরিলে বলিতে হয় যে, এরূপ ব্যবসায়েও প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে। যেমন, কোন একটি বিশেষ জায়গায় যদি কোন দোকান থাকে তাহা হইলে বাহিরের দোকান হইতে লোক আসিয়া সেই জায়গায় বাড়ী বাড়ী গিয়া জিনিসটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই স্থানীয় দোকানটি একটু অস্থবিধাগ্রস্ত হইবে।

বিজ্ঞাপনের দ্বারাও জিনিসের মধ্যে তারতম্য স্থষ্টি করিতে চেষ্টা করা হয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই প্রচার করিতে চেষ্টা করে যে তাহার জিনিসটিই সর্বাপেক্ষা ভাল। এই জন্য ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহারা নানারকম বিজ্ঞাপন দেয়। উদ্দেশ্য হইল জিনিসটির জন্য নিজস্ব একটি বাজার স্থষ্টি করা।

তারপর, উৎপাদনকারিগণ সব সময়েই উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। উৎপাদন প্রণালী উন্নত করিতে পারিলে, খরচ কমানো এবং লাভ বাড়ানো যায়। উৎপাদনকারিগণ সর্বদাই চেষ্টা করে কি উপায়ে খরচ কমানো যায়। যে খরচ কমাইতে পারে তাহার সহিত অন্যেরা সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয় না।

এখন দেখা যাক এইরূপ অবস্থায় কি করিয়া দাম ঠিক হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে জিনিসের দামের উপর বিশেষ একজন বিক্রেতার কোন হাত নাই। বাজারে যে দামে জিনিসটি বিক্রয় হইবে বিশেষ একজন বিক্রেতাকে সেই দামই লইতে হইবে, নচেৎ ব্যবসায় গুটাইতে হইবে। যেখানে প্রতিযোগিতা খুব বেশী সেখানে এক জন যোগানদারের পক্ষে দাম বাড়ানো সম্ভব নয়।

যেখানে প্রতিযোগিতা খুব তীক্ষ্ণ নহে, চাহিদাও খুব স্থিতিস্থাপক নহে, সেখানে যোগানদারের পক্ষে দাম বাড়ানো অসম্ভব নয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিযোগিতার ধরণ এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপরই সব নির্ভর করিতেছে।

সাধারণত, প্রত্যেক উৎপাদনকারীই সর্বোচ্চ মোট লাভ চায়। উৎপাদনকারীকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হয় যে সে কতটা উৎপাদন করিবে বা কি দাম ধার্য করিবে। সে যদি উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি না করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে সাধারণত একক পিছু খরচ বাড়িয়া যাইবে। যদি চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে দাম বাড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে কম বিক্রয় হইবে। কিন্তু, পাছে বিক্রয় কমিয়া যায় সেই জন্য সে দাম বাড়াইতে পারিবে না। এই অবস্থায়, উৎপাদন বাড়াইয়া বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে, একক পিছু লাভ কম হইবে, যদিও মোট লাভ বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এমন অবস্থায়, উৎপাদনকারী এমন পরিমাণে উৎপন্ন করিবে যাহাতে খরচ বাড়িলেও এবং দাম না বাড়াইলেও মোট লাভ সর্বোচ্চ থাকে।

কিন্তু, প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব সময়েই সর্বোচ্চ লাভ করিতে চায় তাহা নহে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভয়ে অথবা দুর্নামের ভয়ে তাহারা মনে করিতে পারে যে, যে সব জিনিসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সে সব জিনিসের দামও একরূপ রাখাই ভাল—ইহাতে হয়ত সর্বোচ্চ লাভ নাও হইতে পারে।

সর্বোচ্চ লাভ আদায়ের আরও একটা বাধা আছে। এক একটা প্রতিষ্ঠান শুধু একটি মাত্র জিনিসই তৈয়ারি করে না, অনেক জিনিস তৈয়ারি করে। এখন, কি ভাবে অপরিবর্তনীয় ব্যয় বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে সেটা ঠিক করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যে পরিবর্তনীয় খরচ পড়ে তাহার উপর অপরিবর্তনীয় খরচের একটা অংশ যোগ করা হয় এবং তাহার উপর লাভের একটা হার যোগ করিয়া জিনিসটির মোট খরচ ধরা হয়। এই অবস্থায় কোন্ জিনিসের জন্য কত অপরিবর্তনীয় খরচ ধরা হইবে তাহা উৎপাদনকারীর নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অভিজ্ঞতা থাকার ফলে উৎপাদনকারী বুঝিতে পারে বাজারে কোন্ দাম চলিবে এবং সেই অনুসারে সে উৎপন্ন বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে অপরিবর্তনীয় ব্যয় বণ্টন করিয়া দেয়। ইহার ফলে কোন কোন জিনিসের বেলায় সর্বোচ্চ লাভ আদায় করা সম্ভব হয় না।

মূল্য নির্ণয় অথবা উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয়ের বেলায় যে কথা খাটে, ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য কি খরচ করিবে অথবা কোন্ ধরণের জিনিস উৎপাদন করিবে তাহার বেলায়ও ঠিক সেই কথাই খাটে। সাধারণ ভাবে, সর্বোচ্চ মোট লাভের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য বাড়তি যে খরচ হইবে বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ভূত বেশী বিক্রয়ের ফলে বাড়তি লাভ তাহার চেয়ে কম না হওয়াই সর্বোচ্চ মোট লাভের পরিচায়ক। কাজেই ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনের খরচ ততক্ষণ বাড়াইয়া চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত শুধু বিজ্ঞাপনের জন্য বাড়তি খরচ শুধু বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ভূত বাড়তি লাভের চেয়ে বেশী না হয়।

ব্যবসায়িগণ সেই ধরণের জিনিসই তৈয়ারি করে যাহাতে মোট লাভ সর্বোচ্চ হয়। এমন কোন জিনিস থাকিতে পারে যাহা প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করে। যেমন, বস্ত্র শিল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জিনিসের মধ্যে পার্থক্য আছে, যদিও বস্ত্র জিনিসটির সমগ্র যোগানের ক্ষেত্রে তাহারা পরস্পর প্রতিযোগী। যদি বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে দাম বাড়িবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জিনিসের দাম বিভিন্ন হারে বাড়িবে। যদি সমাজের উচ্চ স্তরের লোকে যে ধরণের জিনিস ব্যবহার করে সেই ধরণের জিনিসের চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে সেই সব জিনিসের দাম সবচেয়ে বেশী বাড়িবে। আর যদি শ্রমিক শ্রেণীর চাহিদা বাড়ে, তবে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যবহার্য জিনিসের দাম বেশী বাড়িবে। যাহাই হউক, সকল প্রতিষ্ঠানই তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ভাবে উৎপাদন বাড়াইবে। ইহাতে দাম ও খরচ দুইই বাড়িবে। শিল্পটির যে অংশে লাভ বেশী হইতেছে, সেই অংশে অন্যান্য অংশ হইতে লোক চলিয়া আসিবে।

এই অবস্থায়, দীর্ঘ কালের কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে এবং অন্যান্য শিল্পের (যেগুলির সহিত এই শিল্পের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহাদের) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই শিল্প আশ্রয় করিবে। কাজেই, দীর্ঘ কাল পরে এই শিল্পে অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান কাজ করিতে থাকিবে এবং বাজারে একই শিল্পজাত অনেক বিভিন্ন প্রকারের জিনিস পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতে থাকিবে। লাভের হারও একটা সমতায় আসিবে। এই পরিণতির ফলে, যেমন আগেও ছিল তেমনি এখনও,

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইতে থাকিবে, কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বেশী লাভ হইতে থাকিবে এবং কয়েকটি ঠিক খরচ মিটাইতে পারিবে।

একচেটিয়া ব্যবসায় (Monopoly)—একচেটিয়া ব্যবসায়ী একটি জিনিসের একমাত্র যোগানদার। সে একা জিনিসটির যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ অভাবই হইল একচেটিয়া ব্যবসায়ের লক্ষণ।

প্রতিযোগিতার বাজারে যে সব বাধা-নিষেধ আছে সেগুলি একচেটিয়া ব্যবসায়ে থাকে না। সর্বোচ্চ লাভ পাইতে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর বিশেষ বাধা নাই। বেশী লাভ করিতে গেলে তৎক্ষণাৎ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় কিনা, এ আশঙ্কা তাহার নাই। কাজেই দাম নির্ণয়ে তাহার তেমন কোন অসুবিধা নাই। তবে কি ভাবে যে সে দাম নির্ণয় করিবে সেটা বলা কঠিন।

একচেটিয়া ব্যবসায়ে লাভ খুব বেশী হয়। সুতরাং, এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এরূপ ব্যবসায়ে দাম প্রতিযোগিতার বাজারের চেয়ে বেশী এবং উৎপাদন প্রতিযোগিতার বাজারের চেয়ে কম হয়।

কিন্তু, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

জিনিসটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং উৎপাদনের ব্যয় বিচার করিয়া জিনিসটির মূল্য এবং উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক করিতে হয়। কি পরিমাণ উৎপন্ন করিয়া কি দামে বিক্রয় করিলে তাহার সর্বোচ্চ মোট লাভ থাকিবে ইহা দেখিতে হয়।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দাম নির্ণয়ে আরও অন্য কয়েকটি বিষয় বিচার করা দরকার। জাতীয়করণের ভয়, সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভয়, বিবেকের দংশন, ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার ভয় ইত্যাদি কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম খুব বাড়াইতে পারে না।

খুব বেশী লাভ হইতে থাকিলে জনমত জাগ্রত হইবে। তাহাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অথবা সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণের ভয় আছে। তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতার অভাবে ব্যবসায় সুপরিচালিত নাও হইতে পারে। তখন একচেটিয়া ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

নিজের বিবেকে বাধে বলিয়াও একচেটিয়া ব্যবসায়ী খুব বেশী দাম না চাহিতে পারে। অনেক সময়ে তাহার হয়ত মনে হইতে পারে যে এত বেশী দাম চাওয়া নীতিবিরুদ্ধ।

তারপর, ভাবী প্রতিযোগিতার ভয়ও আছে। যদি কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ে খুব লাভ হইতে থাকে তাহা হইলে অন্যান্য ব্যবসায়ী এই ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে। দীর্ঘ কালের কথা বিবেচনা করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ী এইরূপ প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

সুতরাং, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পন্থা হইল সে যে জিনিসটি বিক্রয় করে তাহার দাম যথাসম্ভব কম রাখা।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী কখন কি ভাবিয়া কি দাম ঠিক করিবে তাহা বলা মুস্কিল। প্রতিযোগী নাই, যোগানের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে এবং নানারকম নীতি (policy) অবলম্বন করা যায়। এমন অবস্থায় সে নিজেই ঠিক করিবে কতটা জিনিস উৎপন্ন করিবে এবং কি দামে বিক্রয় করিবে।

একচেটিয়া ব্যবসায় যে সব সময়েই পৃথিবীজোড়া হইবে তাহা নহে। কোন স্থানীয় বাজারেও একচেটিয়া আধিপত্য থাকিতে পারে। স্থানীয় গ্রামবাজারই হউক বা পৃথিবীজোড়া বাজারই হউক সর্বত্র একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রাধান্য এবং নীতি একরূপ। যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাও থাকে তাহা হইলেও নূতন প্রতিযোগী দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। নূতন উৎপাদন-প্রণালীর উদ্ভবে পুরাতন রীতি অচল হইয়া যাইতে পারে এবং একচেটিয়া আধিপত্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সাধারণত দেখা যায় যে যদি প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় এবং প্রান্তিক আয় এই দুই-এর মধ্যে একটা সমতা আসে তাহা হইলেই একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সর্বোচ্চ মোট লাভ হয়।

'প্রান্তিক ব্যয়' কথাটির অর্থ হইল অতিরিক্ত এক একক উৎপন্ন করিতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহা। প্রান্তিক আয়ের অর্থ হইল অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করিলে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাহা।

ধরা যাক যে কোন একটি জিনিসের দশ একক (১০) বিক্রয় করিতে পারা যায় ৪৲ হারে। তাহা হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ১০ একক বিক্রয় করিয়া ৪০৲ পাইবে। সে যদি ১১টি একক বিক্রয় করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে দাম কমাইতে হইবে। ধরা যাক সে দাম কমাইয়া ৩৸৶০ করিল। সেই অতিরিক্ত এককের দামই শুধু কমাইলে চলিবেনা, অন্য ১০টির দামও কমাইতে হইবে। কাজেই এখন সে সর্বশুদ্ধ ৪৩।৶০ পাইল। তাহার অতিরিক্ত আয় অর্থাৎ প্রান্তিক আয় হইল ৩।৶০।

তাহার পক্ষে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে প্রান্তিক ব্যয়ও বাড়িয়া যায় এবং জিনিসেরও দাম কমাইতে হয়।

কাজেই একদিকে প্রান্তিক আয় কমিতে থাকে, অন্য দিকে প্রান্তিক ব্যয় বাড়িতে থাকে। যখন প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় হইতে বেশী হইবে তখন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে আর উৎপাদন বাড়ানো উচিত হইবে না। কিন্তু তাহার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন বাড়াইয়া যাইবে, কারণ সেরূপ করিলেই তাহার মোট লাভ সর্বোচ্চ হইবে।

জিনিসের দাম অবশ্য সকল সময়েই প্রান্তিক আয় হইতে বেশী থাকে, সুতরাং প্রান্তিক ব্যয় হইতেও বেশী থাকে।

উৎপাদনের উপাদানের ব্যবহার মূল্য (Value of the Use of the Factors of Production)—জমি, শ্রম, মূলধন এবং উদ্যোগ এই চারিটি প্রধান উপাদান ব্যবহার করিয়া উৎপাদনকার্য চালানো হয়। এই ব্যবহারের জন্য যে দাম দেওয়া হয় তাহাই উপাদানগুলির আয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

সুতরাং, উৎপাদনের উপাদানগুলির ব্যবহার-মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি বুঝিতে পারিলেই এই উপাদানগুলির আয় নির্ধারণের (determination of factor incomes) পদ্ধতি বোঝা যায়।

এখন প্রশ্ন হইল এই : উৎপাদনের কোন একটি উপাদানের ব্যবহার-মূল্য অর্থাৎ ইহার আয় কি ভাবে নিরূপিত হয়?

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, অন্যান্য জিনিসের মূল্যের বেলায়ও যে রকম, উৎপাদনের একটি উপাদানের ব্যবহারের বেলায়ও সেই রকম ঐ ব্যবহারের চাহিদা এবং যোগানের সমতার দ্বারা ইহার মূল্য নির্ধারিত হয়।

কিন্তু, এই বিবরণ সত্য হইলেও, উৎপাদনের উপাদানগুলির এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে প্রত্যেকটি উপাদানের আয়ের ব্যাপার পৃথক ভাবে আলোচনা করা দরকার। পৃথক ভাবে আলোচনা করিলে, বিস্তারিত ভাবে বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা হইবে এবং চাহিদা ও যোগানের সাম্য সম্পর্কে নানা রকম নির্দেশ পাওয়া যাইবে।

প্রশ্ন

1. Distinguish between Value and Price.
   (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)
   (মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য কি?) [১১, ২২৯ পৃষ্ঠা]

2. Explain the characteristics of (a) perfect competition and (b) imperfect competition.

((ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং (খ) অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।) [২৩৯-২৪১ পৃষ্ঠা]

3. Explain why, under perfect competition, price is fixed at a point where there is equilibrium of demand and supply.

(পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সাম্য উপস্থিত হইলে সেই স্তরে দাম ঠিক হয় কেন বুঝাইয়া দাও।) [২২৯-২৩২ পৃষ্ঠা]

4. Explain how price is determined in a market under perfect competition. (Higher Secondary Examination, 1960)

(পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজারে কি ভাবে দাম নির্ধারিত হয় তাহা বুঝাইয়া দাও।) [২২৯, ২৩২-২৩৫ পৃষ্ঠা]

5. Explain the importance of the time element in the determination of price.

(দাম নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব কিরূপ তাহা বিশ্লেষণ কর।) [২৩৫-২৩৮ পৃষ্ঠা]

6. How is price determined (a) in the short period and (b) in the long period under perfect competition?

(পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে (ক) অল্প সময়ে এবং (খ) দীর্ঘ সময়ে কি ভাবে দাম নিরূপিত হয়?) [২৩২-২৩৮ পৃষ্ঠা]

7. Distinguish between market value and normal value. Show how market value is determined. (Higher Secondary Examination, 1961)

(বাজার দর ও স্বাভাবিক দরের মধ্যে পার্থক্য কি? বাজারদর কি ভাবে নির্ধারিত হয় বুঝাইয়া দাও।) [২৩৮-২৩৯, ২৩২-২৩৬ পৃষ্ঠা]

8. What are market prices? Why is demand more influential than supply in fixing market prices? (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)

(বাজার দর কাহাকে বলে? বাজার-দর নির্ধারণে যোগানের চেয়ে চাহিদার প্রভাব বেশী কেন?) [২৩৮, ২৩৫-২৩৭ পৃষ্ঠা]

9. How is normal price determined under perfect competition?

(পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক দাম কি ভাবে নির্ধারিত হয়?) [২৩৫-২৩৭ পৃষ্ঠা]

10. How is price determined under conditions of imperfect competition?

(অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কিভাবে দাম নিরূপিত হয়?) [২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা]

11. What do you mean by 'monopoly'? How is monopoly price determined?

('একচেটিয়া কারবার' কাহাকে বলে? একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে কি ভাবে দাম নির্ধারিত হয়?) [২৪৩-২৪৫ পৃষ্ঠা]

12. How are incomes of factors of production generally determined?

(উৎপাদনের উপাদানগুলির আয় সাধারণত কি ভাবে নিরূপিত হয়?) [২৪৫ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মজুরি

(Wages)

মজুরির হার (Rates of Wages)—জিনিসের দাম কিরূপে ঠিক হয় আমরা জানিয়াছি। এখন আমরা দেখিব কিরূপে উৎপাদনের উপাদানগুলির ব্যবহারের জন্য মূল্য দেওয়া হয়। প্রথমেই আমরা পারিশ্রমিকের বিষয় আলোচনা করিব।

শ্রমিক তাহার শ্রমের পরিবর্তে পারিশ্রমিক পায়। শ্রমিককে নিযুক্ত করে মালিক এবং এই নিযুক্ত শ্রমিকের শ্রমের ব্যবহার-মূল্যকে আমরা পারিশ্রমিক অথবা মজুরি (wages) বলি। 'মজুরির হার' বলিলে বুঝায় কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন মজুরকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহা।

আর্থিক মজুরি ও বাস্তব মজুরি (Money Wages and Real Wages)—মজুরি আর্থিক মজুরি (money wages) এবং বাস্তব মজুরি (real wages) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। টাকা পয়সা হিসাবে যাহা পাওয়া যায় তাহা আর্থিক মজুরি এবং সেই টাকা পয়সায় যে জিনিসপত্র কিনিতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তব মজুরি বলিয়া পরিগণিত হয়। জিনিসপত্রের দাম তিন গুণ বৃদ্ধি পাইলে আর্থিক মজুরি দ্বিগুণ হইলেও বাস্তব মজুরি কমিয়াছে বলিতে হইবে।

মজুরির নির্ধারণ (Determination of Wages)—মজুরির বেলায়ও চাহিদা ও যোগানের সম্বন্ধ লইয়াই আলোচনা চালাইতে হইবে।

যদি সাধারণ একটা মজুরির হার দেওয়া থাকে (অর্থাৎ প্রচলিত থাকে) তাহা হইলে বিভিন্ন শিল্পের পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য নির্ভর করে সেই বিশেষ শিল্পে শ্রমিকের কাজের চাহিদা এবং যোগানের উপর।

শ্রমের চাহিদা (Demand for Labour)—শ্রমিকের চাহিদার কারণ হইল শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি। ব্যবসায়ী শ্রমিক নিয়োগ করিবে শুধু এই কারণেই যে সে জানে শ্রমিক দিয়া যন্ত্রপাতি চালাইলে জিনিসপত্র বেশী তৈয়ারি হইবে এবং সেগুলি সে বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে।

কাজেই শ্রমিকের চাহিদা ভোগ্যবস্তুর (consumer goods) এবং যন্ত্রপাতির (capital goods) চাহিদা হইতে উদ্ভূত।

একটি শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন না হইলে, শিল্পে নিয়োগের জন্য শ্রমিকের সংখ্যা এবং মজুরির হারের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক থাকে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

অল্প সময়ের মধ্যে—যখন কলকারখানা সহজে বাড়ানো যায় না বা কমানো যায় না তখন—ব্যবসায়িগণ শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া বা কমাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

অল্প কালে কলকারখানার আকার অপরিবর্তিত থাকে এবং নূতন কোন প্রতিষ্ঠান এই শিল্পে প্রবেশ করে না। কাজেই, যদি মজুরির হার বেশী হয় তাহা হইলে কম লোক নিযুক্ত হইবে এবং কম হইলে বেশী লোক নিযুক্ত হইবে। যেখানে কারখানার আয়তন বাড়ানো যায় না সেখানে ব্যবসায়ী নূতন লোক নিযুক্ত করিতে থাকিলে ক্রমাগতই প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) এবং গড়পড়তা উৎপাদন কমিতে থাকে। সেই জন্য ব্যবসায়ী যে মজুরি দিতে পারে বা চাহে সেটাও কমিতে থাকে। এইরূপে কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে জিনিসের চাহিদা এক রকম থাকিলে, যদি মজুরির হার কম থাকে তাহা হইলে বেশী লোক নিযুক্ত হইবে এবং যদি মজুরির হার বেশী থাকে তাহা হইলে কম লোক নিযুক্ত হইবে।

দীর্ঘ কাল পরে সেই শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই।

কোন প্রতিষ্ঠানে হয়ত কলকারখানা বাড়ানো যায়, কাজেই বাড়তি লোক নিযুক্ত করিলেও উৎপাদনের হার কমে না। একটি বিশেষ কারখানা বাড়ানো না হইলেও সমগ্র শিল্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং ইহার ফলে উৎপাদনের হার না কমাইয়াও বেশী লোক নিয়োগ করিতে পারে। উৎপাদনের হার না কমিতে পারে, কারণ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন আরম্ভ করিবে এবং প্রচলিত কারখানাগুলি অধিকতর দক্ষতায় কাজ চালাইয়া যাইবে। মোটের উপর ইহা অসম্ভব নয় যে প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের হার না কমাইয়া বেশী সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে মজুরির হার কমিবার সম্ভাবনা থাকে না।

তবে, কার্যত দেখা যায় যে দীর্ঘ সময় পরেও একমাত্র যদি মজুরির হার কম

থাকে তাহা হইলেই বেশী সংখ্যক কর্মী কোন শিল্পে নিযুক্ত হইতে পারে, কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন শিল্পে বেশীসংখ্যক লোক নিযুক্ত হইলে সাধারণের গড়পড়তা উৎপাদন কমিয়া যায়। যতই শিল্পের প্রসার হইতে থাকে ততই যে সব কর্মী এবং মালিক ইহার ভিতরে ঢুকিতে থাকে তাহারা সাধারণত পূর্বের কর্মী এবং মালিকের চেয়ে কম দক্ষ হয়। শিল্পটিতে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়, কারণ নূতন যাহারা শিল্পটিতে কাজ পায় তাহারা পুরাতন কর্মীদের চেয়ে কম উৎপাদন করিতে পারে। নূতন ব্যবসায়ী যাহারা ব্যবসায়ে প্রবেশ করে তাহারা পূর্বের ব্যবসায়ীদের চেয়ে কম দক্ষতার সহিত লোক নিয়োগ করিতে পারে। শিল্পে সাধারণভাবে উৎপাদনের হার কমিয়া যায়। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে কি ভাবে শ্রমিক পরিচালিত হয় এবং কি ভাবেই বা যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহৃত হয় তাহার উপর।

তাহা হইলে, একথা সাধারণত অনস্বীকার্য যে একমাত্র যদি মজুরির হার কমে তাহা হইলে কোন শিল্পে বেশী লোক নিযুক্ত হইতে পারে। তেমনি যদি মজুরির হার বাড়ে তাহা হইলে সেই শিল্পে কম লোক নিযুক্ত হইবে।

শ্রমের যোগান (Supply of Labour)—শ্রমের যোগানের কথা আলোচনার সময়ে প্রথমেই বলা দরকার যে মজুরির নিশ্চয়ই এমন একটা নিম্নতম মান আছে যাহার নীচে মজুরির হার নামিলে শ্রমিক শ্রম সরবরাহ করিবে না, অর্থাৎ এই নিম্নতম মানের নীচে পারিশ্রমিকের হার নামিলে শ্রমিক পাওয়া যাইবে না।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে লোকের মনে এরূপ একটা ধারণা ছিল যে, বিশেষ বিশেষ শিল্পে এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই পারিশ্রমিকের হার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম ভোগ্য বস্তুর উপরে উঠিবে না।

ইহার কারণ স্বরূপ বলা হইত যে, এই নিম্নতম ভোগ্য বস্তুর বেশী পারিশ্রমিক দিলেই শ্রমিকগণ তাহাদের পরিবার বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে শ্রমিকের সরবরাহ বাড়িয়া যাইবে এবং পারিশ্রমিকের হার কমিয়া আবার নিম্নতম ভোগ্য বস্তুর পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইবে।

অনুন্নত দেশগুলিতে এইরূপ হওয়া সম্ভব। উন্নত দেশে হওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেখানে জীবনযাত্রার মান অনেক বেশী উন্নত এবং লোকে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা বেশী পছন্দ করে। সেখানে মজুরির হার বাড়িলেই যে লোকে

পরিবার বৃদ্ধি করে এমন নয়। সেখানে পারিশ্রমিকের সাধারণ হার (general level) জীবনযাত্রার নিম্নতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশী।

যে কোন একটা বিশেষ শিল্পের বেলায় বলা যায় যে, সেখানে মজুরির নিম্নতম হার নিশ্চয়ই আছে। সেটা এমন হইবে যাহাতে শ্রমিকগণ এই শিল্প ছাড়িয়া অন্য শিল্পে না যায়। এখন, এখানেও প্রশ্ন এই যে অন্য শিল্পে মজুরির নিম্নতম হার কি হইবে? ইহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসারে একটা হার নির্দিষ্ট হয়। তাহার নীচে মজুরির হার নামাইলে শ্রমিক-সংঘগুলি প্রতিবাদ করিবে, ধর্মঘট (strike) হইবে এবং ঐ হারে আর শ্রমিক পাওয়া যাইবে না।

যেখানে পারিশ্রমিকের হার এই নিম্নতম মানের উর্ধ্বে সেখানে শ্রমের সরবরাহ কিরূপ হইবে, বলা শক্ত।

যদি মজুরির হার বাড়ানো হয় তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমের সরবরাহ বাড়িতে পারে, অর্থাৎ বেশী সংখ্যক শ্রমিক সেই কাজে আসিতে পারে অথবা একই সংখ্যক শ্রমিক বেশীক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই কাজের সময় বাড়িয়া যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার শ্রমের সরবরাহ কমিতেও পারে। যেমন, কয়লার খনির কর্মীদের যদি মজুরি বাড়ানো হয়, তাহা হইলে সেখানে শ্রমের সরবরাহ কমিতে পারে, কারণ কর্মীরা ইচ্ছা করিয়া কাজে অনুপস্থিত হইতে পারে—তাহাদের হয়ত বেশী অবসর ভোগ করিতে ইচ্ছা হইবে। এমন হইতে পারে যে, কোন শ্রমিক বেশী রোজগার করিয়া দামী ভোগ্য বস্তু ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু অবসরই যদি না থাকে তাহা হইলে বেশী আয় করিয়াই বা লাভ কি? অন্য শ্রমিকদেরও ঐ কয়লার খনিতে কাজ করিতে আসার অসুবিধা থাকিতে পারে। এই জন্য মজুরি বেশী হইলেই যে শ্রমের সরবরাহ বাড়িবে এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মজুরির হার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে কাজের সময় কমিয়াছে। শ্রমিক সংঘগুলিও কাজের সময় কমাইতে চাহে।

সাধারণত শ্রমিকরা যে সব শিল্পে কম মজুরি সেই সব শিল্প ছাড়িয়া যেখানে বেশী মজুরি সেখানে যায়।

তবে তাহারা যে শুধু টাকার অঙ্কটাই দেখে তাহা নয়। কাজের পরিবেশটাও দেখে। তাই যে সব শিল্পে বিপদের সম্ভাবনা বেশী বা নোংরা

কাজ করিতে হয় সেখানে বেশী বেতন না দিলে লোকে কাজ করিতে চায় না। তেমনি যেখানে আবার অনিশ্চয়তা আছে সেখানে বেশী পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে লোকে নিশ্চয়তা ছাড়িয়া অনিশ্চয়তা বাছিয়া লইবে না।

ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, কোন কাজ চিত্তাকর্ষক হইবে কি না সেটা শুধু টাকার অঙ্কের উপরই নির্ভর করে না, অন্য আরও কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করে।

শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং মজুরি (Demand for and Supply of Labour and Wages)—এখন দেখা যাক শ্রমের চাহিদা বা সরবরাহ কমিলে অথবা বাড়িলে মজুরি কিরূপ হয়।

কোন শিল্পে যদি শ্রমের চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে মজুরির হারও বাড়িবে। শ্রমের চাহিদা বাড়িতে পারে দুই কারণে: (১) শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি (অর্থাৎ উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণ ও উৎকর্ষ) বাড়িয়া গেলে, অথবা (২) উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়িয়া গেলে। শ্রমের চাহিদা বাড়ার অর্থ হইল শিল্পের সমৃদ্ধির বৃদ্ধি। এরূপ হইলে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইবে।

তেমনি যদি শ্রমের সরবরাহ কমে, তাহা হইলে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে।

অপর পক্ষে, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গেলে অথবা শ্রমের সরবরাহ বাড়িয়া গেলে মজুরির হার কমিয়া যাইবে।

মজুরির নিম্নতম ও উধ্বর্তম হার (Lowest and Highest Rates of Wages)—মজুরির হার কিরূপ হইবে তাহা আগে থেকে বলা যায় না। এই পর্যন্ত বলা যায় যে, জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে গেলে যতটুকু লাগে তাহার চেয়ে কম হইবে না এবং শিল্পে শ্রমের উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশী হইবে না।

অতিরিক্ত একজন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া যে অতিরিক্ত উৎপাদন হয় তাহার মূল্যের চেয়ে বেশী মজুরি শ্রমিক পাইবে না। এইটাই হইল প্রান্তিক উৎপাদনের নিয়ম (theory of marginal productivity)। এই অতিরিক্ত শ্রমিক হইল প্রান্তিক শ্রমিক এবং তাহার নিয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন হয় তাহা প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product)। যদি মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশী হয় তাহা

হইলে লাভের হার কমিয়া যাইবে এবং নূতন প্রতিষ্ঠান এই শিল্পে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

তাই মনে হয় মজুরির হার মন্দার সময়ে সর্বনিম্ন স্তরে থাকিবে এবং শিল্পের অবস্থা যখন ভাল তখন সর্বোচ্চ স্তরে থাকিবে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ে মজুরির হার (Monopoly Wage Rates)—একচেটিয়া ব্যবসায়ে শ্রমিক সংঘগুলি মজুরি বাড়াইতে খুবই নিপুণ। প্রতিযোগিতা না থাকায় লাভ খুব বেশী হয়। কাজেই লাভ কমাইয়া মজুরি বাড়ানো যায়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী জনমতের ভয়ে দাম বাড়াইতে পারিবে না। তাই লাভের অঙ্কে হাত দিয়া তাহাকে মজুরি বাড়াইতে হইবে। যদি জিনিসটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ী মজুরি এবং দাম দুই-ই বাড়াইবে।

বিভিন্ন শিল্পে এবং ব্যবসায়ে মজুরির হারের তারতম্য হয় কেন? (Causes of Differences in Wage Rates)—যে কোন মালিকের কাছে মজুরের উপযোগিতা নির্ভর করে প্রধানত দুইটি জিনিসের উপর: (১) মজুর কতটা দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে এবং (২) কি দামে সেই দ্রব্য বিক্রীত হইতে পারে। বিভিন্ন বৃত্তিতে (occupation) পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য হয় কেন তাহার একটি কারণ হইল শ্রমের উৎপাদন-শক্তির তারতম্য। দ্বিতীয় একটি কারণ হইল শ্রমের যোগান। অবশ্য, উৎপাদিকা শক্তিও অনেকাংশে যোগানের উপর নির্ভর করে। সেই জন্য, বলা যায় যে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন রকম মজুরির হারের প্রধান কারণ হইল কাজ করিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক লোকের যোগানের বিভিন্নতা।

বিভিন্ন বৃত্তিতে (occupation) পারিশ্রমিকের তারতম্যের কারণ হইল শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য। দক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিক অদক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশী। ইহার কারণ দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি অদক্ষ শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তির চেয়ে বেশী। যেখানে শ্রম-বিভাগ আছে সেখানে কোন শ্রমিকের পক্ষেই একটি সমগ্র জিনিস তৈয়ারি করা সম্ভব নয়। কাজেই উৎপাদিকা শক্তি বেশী এই কথার অর্থ হইল এই যে সমগ্র জিনিসটির তৈয়ারিতে দক্ষ শ্রমিকের দান অদক্ষ শ্রমিকের দানের চেয়ে ঢের বেশী।

উৎপাদিকা শক্তির এই উৎকর্ষ শ্রমিকের যোগানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ শ্রমিকের মত তত সুলভ নয়। সকলেরই টাকা বা সময় অত অপর্যাপ্ত নয় যাহাতে দক্ষতা বাড়াইতে পারে। কিন্তু যে কেহই যাহাতে দক্ষতা লাগে না এমন কাজ লইতে পারে। এই জন্যই দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ শ্রমিকের মত সুলভ নয়। বাস্তবিক পক্ষে, যদি দক্ষ শ্রমিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত তাহা হইলে শিল্পে তাহাদের নিজস্ব দান এত বেশী হইত না, অর্থাৎ দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি অদক্ষ শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তির চেয়ে খুব বেশী বলিয়া গণ্য করা হইত না। যোগানের এই স্বল্পতার জন্যই আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কেন দক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিক অদক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশী। যাহারা বিশেষ ভাবে দক্ষতা অর্জন করিয়াছে এই রকম কোন কোন শ্রমিক অসম্ভব রকমের বেশী পারিশ্রমিক পায়। ইহার কারণ কতকাংশে উৎপাদনের শক্তি। কিন্তু, তাহা ছাড়া আরও একটা বড় কারণ আছে। সাধারণত, যেখানে শ্রমের যোগান খুব বেশীভাবে সীমাবদ্ধ সেখানে আপনা হইতেই পারিশ্রমিকের হার খুব বাড়িয়া যায়। দক্ষতার জন্য যোগানের স্বল্পতা ছাড়া অন্যান্য কারণে যোগানের স্বল্পতা দেখা দিলেও এরূপ হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যেখানে খুব শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ (trade union) থাকে, কোন একটি বিশেষ শ্রমিক সংঘের সভ্য ছাড়া অন্য কাহাকেও কর্মে নিযুক্ত করা হয় না, সেখানে বাহিরের লোকের কাজ পাওয়া অসম্ভব। এইরূপে কোন একটি ব্যবসায়ে শ্রমিকের যোগান সীমাবদ্ধ রাখিয়া সেই ব্যবসায়ে মজুরির হার খুব বাড়ানো হয়।

কোন একটি বিশেষ শিল্পে শ্রমিকের চাহিদার অনুপাতে যোগান না হইলেই সেই বিশেষ শিল্পে মজুরির হার খুব বাড়িয়া যাইবে। যোগানের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন কাজে পারিশ্রমিকের তারতম্য হয়। চিকিৎসকের পারিশ্রমিক খুব বেশী। চিকিৎসা ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জন করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে এইসবের প্রয়োজন হয় না। তাই আবর্জনা সংগ্রহকারীর যোগান তেমন সীমাবদ্ধ (limited) নয়। সুতরাং ইহাদের পারিশ্রমিকের চেয়ে চিকিৎসকের পারিশ্রমিকের হার অনেক বেশী। অবশ্য, আবর্জনা সংগ্রহ-কারীর কাজ নোংরা বলিয়া এই কাজের জন্যও শ্রমের যোগান কিছুটা সীমাবদ্ধ।

সুতরাং এই কাজের মজুরি অন্য ধরণের অনিপুণ কাজের (যেমন, পত্রবাহকের কাজ) মজুরির চেয়ে বেশী।

বিভিন্ন শিল্পের সমৃদ্ধি অনুসারেও তাহাদের পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য হয়। যে শিল্প যত সমৃদ্ধিশালী সেই শিল্পে মজুরির হার তত বেশী।

যদি কোন এক বিশেষ শিল্পে এক বিশেষ ধরণের দক্ষতা লাগে তাহা হইলে সেই শিল্পে মন্দা আসিলে মজুরির হার কমিয়া যাইবে, কারণ ঐ বিশেষ শিল্পে দক্ষ শ্রমিকগণ অন্য শিল্পে নিয়োগযোগ্য নহে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে নানা কারণে—যেমন, স্থানের দূরত্ব, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, কাজটি নোংরা অথবা বিপজ্জনক অথবা ইহাতে বহাল থাকার নিশ্চয়তা না থাকা ইত্যাদির ফলে বিশেষ বিশেষ কাজে অনিচ্ছা—শ্রমিকগণ বেশী মজুরির সম্ভাবনা থাকিলেও এক কাজ ছাড়িয়া আর এক কাজে যাইতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক হয় না। ফলে, অনেক রকম কাজে শ্রমের যোগানের একটা সীমারেখা টানিতে হয়। সেই সব ক্ষেত্রে মজুরির হার বেশী থাকে।

শ্রমিক সংঘ (Trade Unions)—শ্রমিক সংঘগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল মালিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া মজুরি বাড়ানো এবং কাজের পরিবেশ ভাল করা।

সংঘবদ্ধ হইয়া শ্রমিকেরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে যাহাতে তাহারা মালিকদের সহিত সমান ভাবে আলোচনা চালাইতে পারে। একা কোন শ্রমিকের পক্ষে তাহার মালিকের সহিত আলাপ-আলোচনা করা সম্ভব নয়। সংঘবদ্ধ ভাবে দরাদরি (collective bargaining) করিলে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই আজকাল প্রতিটি শিল্পেই শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হয়।

যে কোন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের এক বা একাধিক সংঘ বা ইউনিয়ন (union) থাকিতে পারে। শ্রমিক সংঘের প্রধান কাজ অবশ্য মালিকের নিকট হইতে বেশী মজুরি ইত্যাদি আদায় করা। কিন্তু সংঘের সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করাও শ্রমিক সংঘের আর একটি কাজ।

প্রত্যেক ইউনিয়নই বাস্তব মজুরি (real wages) বাড়াইতে চেষ্টা করে। এইজন্য ইউনিয়ন মালিকের সহিত আলাপ-আলোচনা চালায় এবং দরকার হইলে ধর্মঘট (strike) করে। কোন্ শিল্পে কিরূপ প্রতিযোগিতা আছে তাহার উপর নির্ভর করে ইউনিয়ন মজুরি বাড়াইতে পারিবে কি না। যদি

কোন শিল্প প্রতিযোগিতামূলক হয় তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে প্রথম দিকে মজুরির হার বাড়ানো যাইতে পারে। কোন মালিক যদি শ্রমিকদের অত্যন্ত কম মজুরি দেয় তাহা হইলে সে মজুরি বাড়াইতে বাধ্য হইবে।

ইহার পরেও যদি মজুরি বাড়ানোর চেষ্টা হয়, তাহা হইলে মজুরের সংখ্যা কমানো হইবে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে লাভ কম হয়। যে সব মজুর সেরূপ দক্ষ নয় তাহাদের ছাড়ানো হইবে। ইহাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি একটি সমস্যার সম্মুখীন হইবে। তাহাদের স্থির করিতে হইবে যে তাহারা বেশী মজুরি চায়, না বেশী লোকের নিয়োগ চায়।

ভারতে শ্রমিক সংঘ (Trade Unions in India)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর ভারতে স্বাধীনতার আন্দোলন গুরুতরভাবে প্রসার লাভ করে। ঐ সময়ে ভারতীয় শ্রমিকগণের মধ্যেও চেতনার সঞ্চার হয়। তাহারাও ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তখন মজুরি খুব কম ছিল, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ভীষণ-ভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল। ইহার ফলেও শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া দাবি পেশ করিতে সচেষ্ট হয়। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতে শ্রমিক সংঘ (trade unions) গড়িয়া ওঠে।

তবে, ভারতীয় শ্রমিকগণ এখনও উন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের মত সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৫৭-৫৮ সালে সংঘবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা (membership of unions submitting returns) মাত্র ২৬,৭২,৮৮৩ জন ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে, কৃষিকার্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের বাদ দিলেও, কেবলমাত্র কারখানা (factories), রোপণশিল্প (plantations), রেলপথ (railways), খনি (mines) এবং বন্দরে (ports) নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যাই ছিল ৬৬ লক্ষেরও কিছু বেশী। সুতরাং, স্পষ্টই বোঝা যায় যে কৃষিকার্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের বাদ দিলেও ভারতীয় শ্রমিকদের যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাহার ৪১ শতাংশও সংঘবদ্ধ হয় নাই।

তাহা ছাড়া, ভারতীয় সংঘগুলি সাধারণত অত্যন্ত শ্লথ ধরণের, মোটেই জোরালো নয়।

ভারতীয় শ্রমিক সংঘগুলি কিছু কিছু কাজ যে করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না মালিকদের সঙ্গে যুঝিয়া ইহারা আগের তুলনায় অবস্থার

উন্নতি সাধন করিয়াছে। স্বাধীনতা আন্দোলনেও শ্রমিক সংঘগুলির যথেষ্ট অবদান আছে।

তবে, ভারতীয় শ্রমিক সংঘগুলির দুর্বলতা (weakness) অনেক রকমের।

জাতি (caste), ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে শতধা বিভক্ত ভারতীয় জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রেই ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহে না। শ্রমিকদের মধ্যেও এই সব কারণে অনৈক্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় শ্রমিকগণ—এমন কি, যাহারা সংঘের সভ্য হইয়াছে তাহারাও—জাতি (caste), ভাষা, ধর্ম, পদমর্যাদা, রাজনৈতিক মত ইত্যাদির পার্থক্যগুলি ভুলিয়া নিজেদের প্রধানত শ্রমিক হিসাবে ভাবিতে নারাজ। ফলে, শ্রমিকগণের বেশীর ভাগ সংঘে যোগ দেয় না এবং যাহারা যোগ দেয় তাহাদের মধ্যেও যথোপযুক্তভাবে নিবিড় ঐক্য গড়িয়া ওঠে না। ইহা সত্যই বিস্ময়কর যে, আমাদের দেশের যে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও একতার এমন অভাব যে রেষারেষি করিয়া ইহারা অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানই রহিয়াছে, একটি দুইটি নয়, চারটি—Indian National Trade Union Congress, All-India Trade Union Congress, Hind Mazdoor Sabha, United Trade Union Congress. সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানই যখন চারটি, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ত অসংখ্যই থাকিবে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে একটি কারখানায়ই হয়ত দুই তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন বিরাজ করিতেছে এবং ইহাদের একটিও কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নহে—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। বলা বাহুল্য, ঐক্যের এইরূপ অভাবের ফলে ভারতের শ্রমিক সংঘগুলি মালিকদের সহিত দরাদরির (bargaining) ব্যাপারে যথেষ্ট জোর দেখাইতে পারে না।

আমাদের শ্রমিক সংঘগুলি অর্থের অভাব হেতুও নিস্তেজ হইয়া থাকে। ভারতীয় শ্রমিকগণ ভীষণভাবে দারিদ্র্যক্লিষ্ট। অনেকে চাঁদা দিতে অক্ষম বলিয়াই সংঘে যোগ দেয় না। যাহারা যোগ দেয় তাহারাও নিয়মিতভাবে চাঁদা দিতে পারে না। অথচ চাঁদার হার এতই কম যে নিয়মিতভাবে সকলের চাঁদা আদায় হইলেও তাহাতে সংঘের দৈনন্দিন কাজ কোন রকমে চলিয়া যাইতে পারে, তার বেশী নয়। অর্থাভাবের অন্তত দুইটি কুফল পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। সংঘগুলি কোন সমাজসেবামূলক কাজের ভার লইয়া সভ্যদের

উপকার করিতে সমর্থ হয় না। তাহা ছাড়া, সংঘগুলি ধর্মঘটের সময়ে সভ্যদিগকে যথোপযুক্তভাবে আর্থিক সাহায্য দান করিতে পারে না। ফলে, ধর্মঘট বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। অর্থের অভাবে শ্রমিকদের সংগ্রাম অত্যল্প কালের মধ্যেই বিফল হইয়া যায়।

ভারতীয় শ্রমিকগণের শিক্ষার মানও যথোপযুক্ত নহে। অনেক সময়ে, শ্রমিকগণের অজ্ঞতার ফলে সংঘের কার্য ব্যাহত হয়।

ভারতীয় মালিকগণ সংঘ গঠন ব্যাপারে অনেক সময় শ্রমিকগণকে নানাভাবে বাধা দান করে। তাহারা জাতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির ধুয়া তুলিয়া ইউনিয়নের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। শ্রমিকগণের শিক্ষার মান তেমন উচ্চ নয় বলিয়া তাহারাও মালিকদের ফাঁদে পা দিয়া সংঘকে অকেজো করিয়া তোলে।

আমাদের শ্রমিক সংঘগুলির পরিচালকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেরা শ্রমিক নয়। বহিরাগত এই সব পরিচালক অবশ্য সংঘ গঠনের ব্যাপারে শ্রমিকদের অনেক উপকার করিয়াছে। ইহারা শ্রমিক আন্দোলন উন্নত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, নিজেরা কেহই ঠিক শ্রমিক নয় বলিয়া ইহারা কোন কোন সময়ে কার্যক্ষেত্রে শ্রমিকদের সমস্যাগুলি কিরূপ তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে সমর্থ হয় না। ফলে, মাঝে মাঝে ভুল নির্দেশও দেওয়া হয়।

প্রশ্ন

1. Distinguish between money wages and real wages. On which of these two does the economic condition of labourers depend ?

(আর্থিক মজুরি এবং বাস্তব মজুরির মধ্যে পার্থক্য কি ? শ্রমিকদের অবস্থা ইহাদের কোন্‌টির উপর নির্ভর করে ?) [২৪৭ পৃষ্ঠা]

2. Analyse the factors on which the demand for and supply of labour depend.

(যে যে বিষয়ের উপর শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান নির্ভর করে তাহা বিশ্লেষণ কর।)

[২৪৭-২৫১ পৃষ্ঠা]

3. Discuss the concept of the minimum level of wages.

(মজুরির নিম্নতম হার সম্বন্ধে আলোচনা কর।) [২৪৯-২৫১ পৃষ্ঠা]

4. Show how wages are determined.

(মজুরি কি ভাবে নির্ধারিত হয় বুঝাইয়া দাও।) [২৪৭-২৫১ পৃষ্ঠা]

5. Explain why wage rates vary in different occupations within a country. (Higher Secondary Examination, 1961)

(একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন হারে মজুরি হয় কেন তাহা বুঝাইয়া দাও।)

[২৫২-২৫৪ পৃষ্ঠা]

6. What is a trade union ? What are the effects of 'trade unions on wages ?

(শ্রমিক সংঘ কাহাকে বলে ? মজুরির উপর শ্রমিক সংঘের কাজের কিরূপ প্রভাব পড়িতে পারে ?) [২৫৪-২৫৫ পৃষ্ঠা]

7. Discuss the functions and utility of trade unions. What are the principal weaknesses of the trade union movement in India ? (Higher Secondary Examination. 1960)

(শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী এবং প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ভারতে শ্রমিক সংঘ গঠনের আন্দোলনে যে সব প্রধান প্রধান দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তাহা বুঝাইয়া দাও।) [২৫৪-২৫৭ পৃষ্ঠা]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মুনাফা
(Profits)

আমরা মজুরির কথা আলোচনা করিয়াছি। এখন একটি বিশেষ ধরণের পারিশ্রমিকের কথা আলোচনা করিব, সেটি হইতেছে 'লাভ'।

ব্যবসায়ীগণ ব্যবসার জন্য যে উদ্যোগ নিয়োগ করে, তাহার জন্য যাহা পায় তাহাকে লাভ অথবা মুনাফা বলে।

উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী যদি নিজেই নিজের মূলধন নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সমগ্র আয়ের একটা অংশ হইবে মূলধনের সুদ। সে যে টাকাটা নিজের ব্যবসায়ে যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য ব্যয় করিয়াছে সেই টাকাটা যদি ব্যাঙ্কে রাখিত, তাহা হইলে তাহার উপর একটা সুদ পাইত। কাজেই টাকাটা নিজের ব্যবসায়ে নিয়োগ করার দরুণ এই সুদটা তাহার প্রাপ্য।

তারপর সে যদি নিজেই উদ্যোগী হইয়া ব্যবসায় না করিত, অন্যত্র বেতনভুক ম্যানেজার হইত, তাহা হইলে একটা পারিশ্রমিক পাইত। কাজেই এই পারিশ্রমিকও তাহার নিজের ব্যবসায় হইতে প্রাপ্য।

সমগ্র আয় হইতে নিজস্ব মূলধনের সুদ এবং তাহার প্রাপ্য ম্যানেজারের পারিশ্রমিক বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই হইল উদ্যোক্তা (entrepreneur) ব্যবসায়ীর মুনাফা অথবা লাভ।

এই মুনাফাই হইল উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক। সে মূলধন ধার করিতে পারিত—তাহার জন্য তাহাকে সুদ দিতে হইত। বেতনভুক ম্যানেজার দিয়া তাহার কাজকর্ম করাইতেও পারিত। কিন্তু উদ্যোগ একমাত্র তাহার নিজের। কাজেই মুনাফার উদ্ভবও তাহার সেই উদ্যোগের ফলে। ইহা তাহার একান্ত নিজস্ব। উদ্যোক্তা ভিন্ন অন্য কেহ মুনাফা অর্জন করিতে পারে না। কোন কোন ধনবিজ্ঞানীর মতে তত্ত্বাবধানের পারিশ্রমিকও (অর্থাৎ ম্যানেজার হিসাবে যাহা প্রাপ্য তাহাও) মুনাফার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা উচিত। তাহাদের মতে উদ্যোগ এবং তত্ত্বাবধান এই উভয় কাজের জন্য যাহা প্রাপ্য তাহাকে স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) বলা উচিত। তবে, আজকাল অধিকাংশ মনীষী মুনাফাকে একমাত্র উদ্যোগেরই প্রাপ্য বলিয়া ধরিয়া লন।

মুনাফার উদ্ভবের কারণ—এই 'উদ্যোগ' বস্তুটি কি? ধনবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের এমন ঝুঁকি বহন করে যে ঝুঁকির জন্য আগে হইতে কোন ব্যবস্থা করা যায় না।

অনেক রকমের অনিশ্চয়তা আছে যেগুলির জন্য আগে হইতে ব্যবস্থা করা যায়। যেমন, ব্যবসায়ী নিজে মারা যাইতে পারে, তাহার কারখানায় চুরি হইতে পারে, তাহার মালপত্র জাহাজডুবি হইতে পারে। এই সকল সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার জন্য আগে হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখা যায়। বীমা করিয়া লোকে মৃত্যু, অগ্নিকাণ্ড, চুরি ইত্যাদি দুর্ঘটনার ফলে যে লোকসান হইতে পারে তাহা পূরণ করিবার জন্য পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা করিয়া রাখে। এই ধরণের অনিশ্চয়তার ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব, কারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি যাঁহারা বীমা কোম্পানীর সহিত জড়িত তাঁহারা মোটামুটিভাবে বলিতে পারেন কি কি কারণে ৪০ বৎসর বয়স্ক লোক ৬৫ বৎসর বয়স হওয়ার আগেই মারা যাইতে পারে, অথবা কি কি কারণে কারখানায় আগুন লাগিতে পারে।

কাজেই ইহাদের পরামর্শে বীমা কোম্পানীগুলি লোকের নিকট হইতে প্রিমিয়াম লইয়া এই সব ঝুঁকির জন্য দায় বহন করে।

এক ধরণের ঝুঁকি আছে যেটা আগে হইতে বোঝা যায় না, তাই কোন প্রকার ব্যবস্থাও করা যায় না। সেটা হইতেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঝুঁকি।

ব্যবসায়ী হয়ত বাজারের অবস্থা ঠিক বুঝিল না। ফলে, তাহার ভয়ানক ক্ষতি হইল। এই ধরণের ঝুঁকি বেশী লইতে হয় তখন যখন বাজারে নূতন জিনিস ছাড়া হয়। জিনিসের উৎপাদনব্যয় কিরূপ হইবে তাহা আগে হইতে কিছুটা অনুমান করা গেলেও চাহিদা কিরূপ হইবে সেটা অনুমান করা সম্ভব নয়। তাই ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা খুব থাকে। কেহই বলিতে পারে না কোন একটি বিশেষ বৎসরে কোন্ কোম্পানীর কিরূপ ক্ষতি হইবে। কাজেই ইহার জন্য কোন বীমা কোম্পানী দায়িত্ব লইবে না।

এইখানেই উদ্যোক্তার বিশেষত্ব। সে এমন ঝুঁকি গ্রহণ করে যে ঝুঁকি অন্য কাহারও উপর চাপানো যায় না। ক্ষতি হইলে একমাত্র তাহারই ক্ষতি হইবে। এই ধরণের ঝুঁকি আছে বলিয়াই উদ্যোক্তার একটা বিশেষ আয় থাকা দরকার। তাহা না হইলে সে ঝুঁকি নিবে না। আমরা এইরূপ আয়কে 'লাভ' অথবা মুনাফা বলি।

আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে ধরিয়া লইয়াছি যে ব্যবসায়ী একাই ব্যবসায় চালায়। আজকাল বেশীর ভাগ ব্যবসায় যৌথ মূলধনে পরিচালিত হয়। শেয়ার-হোল্ডারগণ ব্যবসায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করে। যদি সিদ্ধান্ত ভাল হয় তাহা হইলে তাহারা লাভবান হয়। যদি সিদ্ধান্ত ভুল হয়, তাহা হইলে তাহাদের ক্ষতি হয়। একথা মনে রাখিতে হইবে যে শেয়ার-হোল্ডারগণ সংখ্যায় অনেক এবং নানা জায়গায় ছড়াইয়া থাকে। তাই তাহারা নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া ডিরেক্টরগণের হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে যৌথ মূলধনী প্রথায় স্বত্বাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে। সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণ মূলধনের ঝুঁকি নেয় এবং লভ্যাংশ ভোগ করে। কিন্তু ব্যবসায়গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শেয়ার হোল্ডারগণের মনোনীত প্রতিনিধিগণ অর্থাৎ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ।

উদ্যোক্তার আয়-নির্ধারণ (Determination of Profits)— মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে উদ্যোগের চাহিদা ও যোগানের উপর মুনাফা নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় আধুনিক কালে যে ভাবে উৎপাদনের

কাজ চলে তাহাতে উদ্যোগের চাহিদা প্রবল ভাবে অনুভূত হয়। উদ্যোগের যোগানেরও ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন

1. Explain the nature of the services performed by the entrepreneur in modern business organisation. (Higher Secondary Compartmental Examination, 1960)

(আধুনিক কালে ব্যবসায় সংগঠনে উদ্যোক্তার কাজের প্রকৃতি কিরূপ বুঝাইয়া দাও)

[১৫-১৮, ২৫৮-২৬০ পৃষ্ঠা]

2. Explain the term 'profit'. Why does profit arise ?

('মুনাফা' কথাটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও। মুনাফার উদ্ভব হয় কেন ?)

[২৫৮-২৬১ পৃষ্ঠা]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

খাজনা
(Rent)

খাজনার সংজ্ঞা (Definition of Rent)—জমি ব্যবহার করিবার জন্য ব্যবহারকারী স্বত্বাধিকারীকে যাহা দেয় তাহাকে খাজনা বলে। যে কারণে মজুরকে মজুরি দিতে হয়, উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী মুনাফা ভোগ করে, ঠিক সেই কারণেই উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকেও তাহাদের পারিশ্রমিক (return) দিতে হয়। যেমন, জমি ভোগ-দখলের জন্য জমির স্বত্বাধিকারী খাজনা পায়। যে জমি ভোগ করে সে খাজনা দেয়। যেখানে অফিস, দোকানঘর ইত্যাদি করিবার জন্য জমির অভাব, অথচ চাহিদা খুব বেশী, সেখানে জমির খাজনাও খুব বেশী। তেমনি কোন বিশেষ মেশিনজাত দ্রব্যের চাহিদা যদি যোগানের চেয়ে বেশী হয়, তাহা হইলে যাহার এই মেশিন আছে সে বেশী আয় করিতে সুরু করিবে।

উৎপাদনের উপাদানগুলির আয় নির্ধারণের সাধারণ নিয়ম (Principles of Determining Factor Incomes)—যে সাধারণ নিয়মে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারের মূল্য নির্ধারিত হয় তাহা

হইল এই : সকল উপাদানেরই—শ্রমিক, উদ্যোগ, জমি, মূলধন সকলেরই—ব্যবহারের মূল্য নিরূপিত হইবে তাহার যোগান এবং চাহিদার দ্বারা। বিভিন্ন উপাদানের চাহিদার ধরণ আলাদা। যোগানের ধরণও আলাদা।

শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর করে কতকগুলি ব্যাপারের উপর—যেমন শ্রমিকের সংখ্যা, নৈপুণ্য, আরামের স্পৃহা, অথবা শ্রমিক সংঘের বিধি-নিষেধ ইত্যাদি।

মূলধনের সরবরাহ নির্ভর করে যে সব শিল্প যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করে, তাহাদের উৎপাদনের খরচ কিরূপ তাহার উপর। যে হারে টাকা ধার করা যায় সেই সুদের হারও একটা ধর্তব্য বিষয়। সুদের হার বাড়িলে নিশ্চয়ই যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ারি করিতে একটা বাধা আসে। অপর পক্ষে, খুব অল্প হারের সুদে টাকা ধার করা গেলে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ারি করিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

জমির খাজনার উদ্ভব ও নির্ধারণ (Determination of Rent of Land)—জমির যোগানের একটা বিশেষত্ব আছে। জমির যোগান সীমাবদ্ধ।

শহরাঞ্চলে জমির অভাব এত বেশী যে কেহই বলিতে দ্বিধা করিবে না যে, এই সরবরাহের স্বল্পতার জন্যই শহরে জমির খাজনা এত বেশী। শহরের আশে পাশে যে সব বাগান হইতে শহরে শাকসব্জী আসে, সেগুলি যথেচ্ছ-ভাবে যে কোন জায়গায় তৈয়ারি করা যায় না। যাওয়া-আসা ও মাল-চলাচলের খরচ কমাইবার জন্য যোগানদার এমন এক জায়গা চায় যেখান হইতে মাল শহরে পাঠাইলে তাহার লাভ থাকে। একমাত্র যদি জিনিসপত্রের দাম বাড়ে তাহা হইলে সে শহর হইতে আরও দূরে শাকসব্জীর বাগান করিবে। যদি দাম বাড়ে তাহা হইলে শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলের দুষ্প্রাপ্য জমি যাহারা পাইবে সেই দুষ্প্রাপ্য জমির জন্য তাহাদের বেশী খাজনা দিতে হইবে। তাহাদের জমির অবস্থান ভাল, এই কারণে তাহাদের মাল-চলাচলের খরচ কম। কাজেই উৎপাদন এবং বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়াও তাহাদের হাতে উদ্বৃত্ত আয় যথেষ্ট থাকে। সুতরাং তাহারা উচ্চ হারে খাজনা দিতে পারে। সকলেই ভাল জমি চায়। কাজেই প্রতিযোগিতার ফলে তাহারা ভূমির স্বত্বাধিকারীকে বেশী খাজনা না দিয়া পারিবে না।

পল্লী অঞ্চলেও ভাল চাষের জমি সীমাবদ্ধ। এই জন্য লোকে সবচে

ভাল জমিই আগে চাষ করিবে। একমাত্র যদি কৃষিজ জিনিসের দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলেই নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হইবে—যে জমিতে আগে চাষ করিলে খরচে কুলাইত না।

যতই নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হইতে থাকিবে, ততই ভাল ভাল জমির খাজনা বাড়িতে থাকিবে, কারণ নিকৃষ্ট জমিতে চাষ করার অর্থ প্রান্তিক উৎপাদনের হ্রাস এবং প্রান্তিক উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি। এমন অবস্থায় নিকৃষ্ট জমিগুলি তাহাদের খরচটা মিটাইতে পারিবে মাত্র।

প্রতিযোগিতার বাজারে সকল কৃষক তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য এক দামে বিক্রয় করিবে। কাজেই যাহারা ভাল জমিতে চাষ করে, খরচ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার দরুণ তাহাদের বেশী লাভ হইবে। ভাল জমি পাইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে। ইহার ফলে জমির মালিক জমির উৎকর্ষের জন্য যে অতিরিক্ত আয় তাহার সবটাই পাইবে।

খাজনার উৎপত্তি কি ভাবে হয় সে সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো (Ricardo) যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

খাজনার উদ্ভব হয় জমির উৎকর্ষের জন্য। জমির উৎকর্ষ দুই ভাবে দেখা হয়—একটি হইল জমির উৎপাদিকা শক্তি, অপরটি হইল স্থানমাহাত্ম্য।

ভাল জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। তাই নিকৃষ্ট জমি কাজে লাগাইতে হয়। সেই জন্য ভাল জমি পাইতে গেলে খাজনা দিতে হয়। যে জমি যত ভাল, তার খাজনাও তত বেশী।

জমি ব্যতীত অন্যান্য উৎপাদকের খাজনা (Rent Element in other Factor Incomes)—বিভিন্ন উপাদানের সরবরাহের অবস্থার খুব বেশী তারতম্য হয়।

কিন্তু চাহিদার বেলায় একথা ঠিক খাটে না। সর্বত্রই কোন উপাদানের চাহিদা তাহার উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করে। এই উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে কতটা জিনিস সে তৈয়ারি করিতে পারে—অর্থাৎ সমস্ত উৎ-পাদনের কতটা অংশের জন্য সে দায়ী—এবং কোন্ দামে এই জিনিসটি বিক্রয় করিতে পারা যাইবে তাহার উপর। যেমন, যে কোন মেশিনের চাহিদা বাড়িবে এবং সেই মেশিন হইতে আয়ও বাড়িবে, যদি সেই মেশিনের কোন উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদ্বারা বেশী জিনিস উৎপন্ন করা যায়। তেমনি

কলকারখানা বসাইবার জমির চাহিদা বাড়িবে যদি কারখানায় উৎপন্ন জিনিসের দাম বাড়ে। কৃষিজ জিনিসের দাম বাড়িলে কৃষি-জমির চাহিদা বাড়িবে।

পারিশ্রমিক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে কোন শিল্পে পারিশ্রমিকের একটা নিম্নতম মান আছে। সেটা হইল এমন একটা পারিশ্রমিক যাহাতে শ্রমিক সেই শিল্প ছাড়িয়া অন্য শিল্পে যাইতে চাহিবে না।

ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, কোন শিল্পে পারিশ্রমিকের নিম্নতম হার হইবে অন্য শিল্পের নিম্নতম হারের অন্তত সমান—যাহাতে শ্রমিকরা সেই শিল্পে চলিয়া না যায়।

এই সাধারণ নিয়মটি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন কারখানার ম্যানেজার যদি তাহার বর্তমান কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যায় তবে হয়ত সে মাসে ৫০০৲ বেতন পাইতে পারে। কাজেই তাহার বর্তমান মালিক তাহাকে নিশ্চয়ই অন্তত ৫০০৲ দিবে, কারণ তাহা না হইলে সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। এটা হইল সেই ম্যানেজারের নিয়োগান্তর আয় (transfer earning)।

এই রূপে প্রত্যেকটি উপাদানের একটি নিয়োগান্তর আয় (transfer earning) আছে।

যে জমিতে গম উৎপন্ন হয়, সে জমির জন্য এমন খাজনা দিতে হইবে যাহাতে সে জমিতে আলুর চাষ না হয়।

উদ্যোক্তাগণেরও এমন মুনাফা হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা এক ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায়ে না যায়।

এটা অবশ্য ঠিক যে কোন উপাদানের কোন কোন এককের পাওনা শুধু তাহার নিয়োগান্তর আয় (transfer earning)-এর সমান হইতে পারে।

কিন্তু চাহিদা এবং যোগান অনুসারে কোন কোন এককের পাওনা এমন পরিমাণে ধার্য হইতে পারে যাহা তাহার নিয়োগান্তর আয় (transfer earning) হইতে বেশী। যেমন, যে ম্যানেজার ইস্পাত শিল্পে গেলে মাসে ৫০০৲ বেতন পায় সে হয়ত কোন কাপড়ের কলের ম্যানেজার হিসাবে ১০০০৲ বেতন পাইতেছে। তাহা হইলে ৫০০৲ হইল তাহার নিয়োগান্তর আয়—নিম্নতম পারিশ্রমিক, যাহা না পাইলে সে এই বস্ত্রশিল্পে থাকিত না। আর ৫০০৲ হইল তাহার অতিরিক্ত আয় যেটা সে তাহার একান্ত নিজস্ব দুর্লভ গুণের জন্য পায়।

এই অতিরিক্ত আয়কে—যাহা সমগ্র আয় এবং নিয়োগান্তর আয় (transfer earning)-এর অন্তরফল তাহাকে—ধনবিজ্ঞানে খাজনা (rent) বলা হয়। এই ক্ষেত্রে ইহা দুর্লভ গুণের জন্য অতিরিক্ত আয়। ধনবিজ্ঞানে খাজনা (rent) কথাটি একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইহা হইল, কোন উপাদানের কোন কোন একক কোন সুবিধাজনক ক্ষেত্রে যাহা আয় করে এবং অন্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া যাহা আয় করিতে পারিত, এই দুই-এর অন্তরফল।

খাজনা নির্ধারণের বিস্তারিত আলোচনা (Detailed Discussion on Determination of Rent)—যেখানেই কোন উপাদানের বিভিন্ন এককগুলি ক্ষমতায় এক রূপ নহে সেখানেই এই অতিরিক্ত আয়ের সমস্যা আসিবে। যেমন, সব জমি এক রূপ নহে। কাজেই ভাল জমির খাজনা বেশী। যে জমি উৎপাদনের প্রান্তসীমায়—অর্থাৎ যাহার আয় অন্য উপাদান-গুলির বাবদ ব্যয়ের সমান—সেখানে কোন অতিরিক্ত আয় বা খাজনার উদ্ভব হইতে পারে না।

প্রকৃতির কার্পণ্যের জন্যই খাজনার (rent) উদ্ভব। যদি প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে সব জমিকেই সমান এবং ভাল করিত তাহা হইলে কোন জমিরই অতিরিক্ত আয়ের উপায় থাকিত না। যদি সকল লোকই এক রূপ কর্মকুশল হইত তাহা হইলে প্রতিযোগিতার ফলে সকলের আয় নিয়োগান্তর আয়ের (transfer earning) সমান হইত। অতিরিক্ত কর্মকুশলতার জন্য কোন অতিরিক্ত আয় হইত না।

ভাল জমির খাজনা বেশী, কারণ ভাল জমি খুব বেশী নাই। সেই জন্য একমাত্র ভাল জমি চাষ করিয়া ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির খাদ্যসমস্যা সমাধান করা যায় না। মন্দ জমিও চাষ করিতে হয়। মন্দ জমি ব্যবহারের জন্যও একটা দাম দিতে হয় যাহাতে জমিটি অন্য ভাবে ব্যবহৃত না হয়। ভাল জমির খাজনা অবশ্য খুব বেশী। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে ভাল জমির খাজনা বাড়িতে থাকে।

জমি বা মানুষ, ইহাদের যোগ্যতা বাড়াইবার খুব বেশী উপায় নাই। জমিতে সার দিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো যায়, কিন্তু নিজস্ব কোন গুণ না থাকিলে সার অসার হয়। তেমনি শিক্ষা দিয়া মানুষের যোগ্যতা বাড়ানো যায়, কিন্তু যে মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি বলিয়া তেমন কিছু নাই তাহাকে শিক্ষা দিলেও বিশেষ কিছু লাভ হইবে না।

যন্ত্রপাতির বেলায় একথা খাটে না। সাময়িকভাবে কোন মেশিনের চাহিদা বাড়িয়া গেলে সেই মেশিনের মালিক অতিরিক্ত আয় করিতে পারে। কিন্তু কালক্রমে ঐ ধরণের মেশিন আরও তৈয়ারি হইবে। তখন আর ঐ মেশিনের কোন বিশেষত্ব থাকিবে না যাহার ফলে অতিরিক্ত আয় সম্ভব হইবে। সাময়িক দুর্লভতার জন্য যে অতিরিক্ত আয় তাহাকে আংশিকভাবে খাজনা (quasi-rent) বলে। ইহা খাজনার মতন, কিন্তু ঠিক খাজনা নয়।

প্রশ্ন

1. How is 'rent' defined in Economics ?

(ধনবিজ্ঞানে 'খাজনা' কথাটির কিরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয় ?) [২৬১-২৬৫ পৃষ্ঠা]

2. How is rent determined ?

(খাজনা কি ভাবে নির্ধারিত হয় ?) [২৬২-২৬৫ পৃষ্ঠা]

3. Discuss the Ricardian theory of rent.

(খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর মত আলোচনা কর।) [২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা]

4. Examine the effects of the pressure of population on the rent of land.

(জনবৃদ্ধির চাপের ফলে খাজনা কিরূপ পরিবর্তিত হয় বুঝাইয়া দাও।) [২৬৫ পৃষ্ঠা]

5. Analyse the rent element in the remuneration of the factors of production.

(উৎপাদনের উপাদানগুলির আয়ের মধ্যে কি ভাবে 'খাজনা' নিহিত আছে বুঝাইয়া দাও।) [২৬৩-২৬৬ পৃষ্ঠা]

ষড়বিংশ অধ্যায়

সুদ
(Interest)

সুদ ও অর্থ (Interest and Money)—যে দামে অর্থ বা টাকা ধার করা হয় তাহাকে সুদ বলে। যেমন, যে দামে শ্রম ভাড়া করা হয় তাহাকে মজুরি অথবা পারিশ্রমিক বলে।

সুদ বাৎসরিক এবং শতকরা হিসাবে ধরা হয়। যদি এক বৎসরের জন্য ৫৲ হারে ১০০৲ টাকা ধার করা হয় তাহা হইলে উত্তমর্ণকে এক বৎসর পরে ১০৫৲ দিতে হইবে।

অর্থ বস্তুটি কি তাহা আমরা সকলেই জানি। অর্থের প্রধান কাজ হইল যে ইহা বিনিময়ের মাধ্যম। দ্বিতীয়ত, ইহা ধন সঞ্চয়ের উপায়। কেহ যদি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে চাহে তাহা হইলে অর্থ সঞ্চয় করা ভাল, কারণ অন্য জিনিস সঞ্চয় করিতে গেলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবার ভয় আছে। তৃতীয়ত, হিসাবপত্রের একক হিসাবে অর্থ ব্যবহৃত হয় এবং অর্থের পরিমাণ দিয়াই বর্তমানে জিনিসপত্রের মূল্য নির্ণয় হয়, কেনা-বেচা হয় এবং ভবিষ্যতের দেনা-পাওনা ঠিক করা হয়।

সুদের হার নির্ধারণ (Determination of Rate of Interest)—সুদের হার বলিলে বুঝায়, যে দামে অর্থ ধার দেওয়া হয় অথবা ধার করা হয় তাহা। এখন প্রশ্ন এই : সুদের হার কম হইবে কি বেশী হইবে তাহা কিরূপে নির্ণয় করা হয়? অর্থাৎ সুদ শতকরা ৩৲ হইবে না ৬৲ হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় কি?

অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, সুদ আর্থিক কারণে কম-বেশী হয়।

একদিকে সরকার (Government) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি (monetary policy) এবং অন্য দিকে সাধারণ লোকের নগদ টাকা হাতে রাখিবার ইচ্ছা (liquidity-preference), এই দুই কারণের উপর সুদের হার নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। লোকের টাকা হাতে রাখিবার ইচ্ছার দ্বারা ইহার চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং, সুদের বেলায়ও চাহিদা ও যোগানের কথা ওঠে।

অর্থের চাহিদা (Demand for Money)—সাধারণত টাকার চাহিদা কথাটি ঠিক পূর্বোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণত ব্যাঙ্কারগণ টাকার চাহিদা বলিলে বোঝে টাকা ধার করার ইচ্ছা। কিন্তু 'টাকার চাহিদা'কে এই ভাবে 'ধারের চাহিদা' অর্থে ব্যবহার করিলে একটু অসুবিধা আছে। যেমন, কোন ব্যবসায়ী তাহার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার চাহিতে পারে শুধুমাত্র ব্যাঙ্কে তাহার হিসাবের খাতায় টাকার অঙ্ক বাড়াইবার জন্য। আবার সেই ব্যবসায়ী যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্যও ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহার চাহিদা যন্ত্রপাতির জন্য,

টাকার জন্য নয়। এই কারণেই আজকাল অর্থনীতিবিদগণ টাকার চাহিদা বলিতে টাকা ধরিয়া রাখার চাহিদা বোঝেন।

অর্থনীতিবিদগণের মতে, টাকার চাহিদার কথা চিন্তা করিলে প্রথমেই লোকে টাকা দিয়া প্রধানত কি কি কাজ করে তাহা ভাবিতে হয়। লোকে হয় টাকা হাতে রাখিবে, না হয় বণ্ড (bond), সিকিউরিটি (security) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রচলিত সরকারী অথবা বেসরকারী ঋণপত্র (ইহাতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে) ক্রয় করিবে। আজকাল লোকে যদি তাহাদের আয় হইতে কিছু বাঁচাইতে পারে তাহা হইলে জিনিসপত্র কিনিয়া তাহা মজুত করিয়া রাখে না। তাহারা হয় নগদ টাকা হাতে রাখে, না হয় দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র কেনে।

যখন লোকে টাকা প্রচলিত সুদে না খাটাইয়া নগদ (liquid cash) হাতে রাখিতে চায়, তখন তাহারা যাহাতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র ক্রয় করে তাহার জন্য সুদের হার বাড়াইতে হয়। ইহা হইতে বলা যায় যে, সুদের হার এমন একটা পুরস্কার বিশেষ যাহার জন্য লোকে টাকা হাতে না রাখিয়া ঋণপত্র ক্রয় করে—সে সরকারী ঋণপত্রই হউক অথবা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কিংবা অন্য ধরণের ঋণপত্রই হউক। লোকে নানা কারণে নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়। যাহাতে তাহারা টাকা হাতে না রাখিয়া সরকারী অথবা বেসরকারী ঋণপত্র কেনে সেই জন্য সুদ দিতে হয়।

নগদ টাকা হাতে রাখার উদ্দেশ্য (Motives for Liquidity-Preference)—ব্যক্তিগত ভাবে ধরিয়া-রাখা অর্থের সমষ্টিই হইল জাতির ধরিয়া-রাখা অর্থ। তিনটি উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়।

(১) সাধারণ লোকে দৈনন্দিন খরচপত্রের জন্য টাকা হাতে রাখিতে চায়। তাহারা হয়ত সপ্তাহে একবার, অথবা দুই সপ্তাহে একবার অথবা মাসে একবার বেতন পায়। অথচ, প্রতিদিনই নানাবিধ কাজে টাকা খরচ করিতে হয়। তাই হাতে টাকা থাকা দরকার। ব্যবসায়িগণও হাতে টাকা রাখিতে চায়, কারণ শ্রমিকদিগকে বেতন দিতে হইবে, কাঁচা মালের দাম দিতে হইবে, আরও নানাবিধ খরচ চালাইয়া যাইতে হইবে। এই জন্য তাহারা ব্যাঙ্কে টাকা মজুত রাখে। এইরূপ জমা রাখা আর নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখা একই কথা। যে ব্যবসায়ী অথবা যে লোক যত বেশী বড়লোক ব্যাঙ্কে তাহার

নামে তত বেশী টাকা মজুত থাকে দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য। দৈনন্দিন খরচ (transactions) চালানোর জন্য কে কত টাকা হাতে রাখিবে তাহা নির্ভর করে তাহার আয়ের (income) পরিমাণের উপর।

(২) দ্বিতীয়ত, লোকে দুর্দিনের জন্যও টাকা হাতে রাখিতে চায়। হয়ত বেকার অবস্থায় কি খাইবে, অথবা অসুখ বিসুখ বা বিপদ আপদে কি হইবে, এই আশঙ্কায় লোকে টাকা হাতে রাখে। ব্যবসায়িগণও ব্যবসায়ে মন্দা আসিলেও যাহাতে ব্যবসায় না গুটাইতে হয়, জমানো টাকা হইতে খরচ করিতে পারে, সেই কারণে হাতে টাকা রাখে। সাবধানতার (precaution) বশবর্তী হইয়া লোকে কতটা অর্থ হাতে রাখিবে সেটাও নির্ভর করে লোকের আয়ের (income) উপর। লোকের আয় যত বেশী হইবে ততই বেশী টাকা দুর্দিনের জন্য রাখিবে।

(৩) তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে সুদের হার বাড়িবার সম্ভাবনা আছে এইরূপ অনুমান (speculation) করিয়াও লোকে প্রচলিত সুদের হারে বণ্ড ইত্যাদি না কিনিয়া অথবা না ধরিয়া রাখিয়া নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। তখন তাহারা বণ্ড ইত্যাদি কিনিবে ত না-ই, বরং আগের কেনা বণ্ড ইত্যাদিও কম দামে হইলেও বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখিতে চাহিবে। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল এই ধরিয়া-রাখা নগদ টাকা ভবিষ্যতে খাটাইয়া বেশী সুদ আয় করা।

এইখানেই টাকার চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের খুব বেশী সম্পর্ক। সাধারণ দৈনন্দিন খরচপত্রের জন্য এবং দুর্দিনের জন্য কি পরিমাণ টাকা লোকের হাতে থাকিবে সেটা প্রধানত লোকের আয়ের (income) উপর নির্ভর করে। কাজেই আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিলে, যে টাকা লোকে হাতে রাখিতে চাহিবে তাহা সাধারণত বদলায় না। কেবলমাত্র লোকের অভ্যাসের পরিবর্তন হইলেই সেটার পরিবর্তন হইতে পারে। সুতরাং, মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, সুদের হারের পরিবর্তন হইলে যে টাকার চাহিদার পরিবর্তন হয় তাহা সাধারণত প্রথম দুইটি কারণে ঘটে না। সুদের হারের পরিবর্তন হইলে লোকের টাকার চাহিদার পরিবর্তন হইতে পারে উল্লিখিত তৃতীয় কারণে।

যে কোন সময়ে লোকে কোন একটা সুদের হারকে স্বাভাবিক মনে করে। যেমন, এখন হয়ত আমাদের এখানে ৪%কে লোকে স্বাভাবিক মনে করে।

শতকরা ১৲ বা ২৲ কিংবা ৭৲ বা ১০৲কে লোকে অস্বাভাবিকই মনে করিবে। অবশ্য সুদের স্বাভাবিক হার সম্পর্কে লোকের ধারণা বহুলাংশে সরকারী নীতির দ্বারা নিরূপিত হয়।

যাহারা অনুমানের বশবর্তী হইয়া নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় তাহারা সুদের যে হারকে স্বাভাবিক মনে করে সেই হারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত সুদের হারের বিচার করে। সুতরাং, ইহাদের টাকার চাহিদার অর্থাৎ নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছার সহিত সুদের হারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সাধারণত, সুদের যে হার চলিতেছে তাহা বাড়িলে ইহাদের নগদ টাকা ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা (liquidity-preference) অর্থাৎ টাকার চাহিদা কমিবে, সুদের যে হার চলিতেছে তাহা কমিলে ইহাদের নগদ টাকা ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা (ভবিষ্যতের আশায়) অর্থাৎ টাকার চাহিদা বাড়িবে। তবে, কোন কোন সময়ে এই সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, সুদের হার কিছু বাড়িলে কেহ কেহ আরও বাড়িবে বলিয়া আশা করিয়া ভবিষ্যতে বেশী সুদের বণ্ড ইত্যাদি কিনিবার জন্য নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহিতে পারে।

দেখা গেল যে, দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে প্রধানত দুইটি জিনিসের উপর : (১) লোকের আয়, (২) সুদের হার।

অর্থের যোগান (Supply of Money)—এখন দেখা যাক অর্থের যোগান কিসের উপর নির্ভর করে।

অর্থের যোগান বলিতে বুঝায় দেশের মধ্যে প্রচলিত যে অর্থ (currency) তাহার পরিমাণ এবং ব্যাঙ্কে যে ডিপোজিট (deposit) বা জমা থাকে—যাহা চেক দিয়া তোলা যায় অথবা চেক দিয়া যাহা হইতে ধারকর্জ মিটানো যায়—তাহার পরিমাণ।

আজকাল দেশে টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রায় সর্বত্রই দেশের সরকারের অধীন। সুতরাং, বলিতে গেলে, সরকারই দেশের টাকার যোগান নিয়ন্ত্রিত করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট ছাপায়। তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কেরও ব্যাঙ্কার। সময় বিশেষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশও দিতে পারে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের নিকট বিভিন্ন লোক কর্তৃক গচ্ছিত ডিপোজিটের (deposit) একটা অংশ (ধরা যাক ১০%)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। ব্যাঙ্কগুলি এই জমা-করা টাকাকে নগদ টাকার সমান বলিয়া ধরে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে যে পরিমাণ টাকা ধার দিতে পারে সেটা নির্ভর করে সেই সব ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা কতটা আছে তাহার উপর। এই নগদ টাকা বলিতে বুঝায় তাহাদের হাতে নগদ নোট যাহা আছে এবং দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তাহাদের যে পরিমাণ টাকা গচ্ছিত আছে (অর্থাৎ তাহাদের cash reserves with the Central Bank) তাহার সমষ্টি। সাধারণত নগদ টাকার কয়েকগুণ পর্যন্ত টাকা ধার দেওয়া হয়—ব্যাঙ্কিং ভাষায় deposit create করা হয়। বিলাতী নীতি অনুসারে নগদ টাকার ৮ গুণ হইতে ১০ গুণ পর্যন্ত টাকা ধার দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের নগদ টাকা এবং ইহাতে যাহা ডিপোজিট আছে তাহার মধ্যে একটা অনুপাত রক্ষা করাই হইল ব্যাঙ্কিং নীতির মূলসূত্র। যাহাই হউক, ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট অর্থও অর্থ এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি কি পরিমাণ অর্থ সৃষ্টি করিবে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই অনেকাংশে ঠিক করিয়া দেয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ইহা হইতে বোঝা যায় যে, দেশের সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেশের মধ্যে টাকার যোগান নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

যদি সরকার টাকার যোগান বাড়াইতে চায় তাহা হইলে ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিবে বণ্ড অথবা সিকিউরিটি কেনার জন্য। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বণ্ড কিনিলে বিক্রেতাদিগকে নিজের উপর চেক দিবে। বিক্রেতাগণ সেই চেক জমা দিবে নিজেদের ব্যাঙ্কে। ইহাতে তাহাদের একাউণ্টে ডিপোজিট বাড়িবে। ব্যাঙ্কগুলি সেই চেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পাঠাইবে। তাহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কগুলিরও ডিপোজিট অথবা রিজার্ভ (reserve) বাড়িবে। যখন এইরূপে ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা (কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ নগদ টাকারই সমান) বাড়িবে তখন তাহারা ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিবে বেশী পরিমাণে। যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ডিপোজিটের ১০% নগদ টাকায় রাখে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তাহাদের রিজার্ভ ১০০ টাকা বাড়িলে তাহারা আগে যে পরিমাণ টাকা ধার দিয়া ডিপোজিট তৈয়ারি করিত তাহার চেয়ে ১০০০ টাকা বেশী ধার দিয়া ডিপোজিটের পরিমাণও ১০০০ টাকা বাড়াইতে পারে। অবশ্য, এই রকম ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্কগুলি কার্যত ৩।৪ গুণের

ধার দেয় না। যাহা হউক, ইহার ফলে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

বিপরীত পক্ষে, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বণ্ড বিক্রয় করে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির টাকার পরিমাণ (cash reserves with the Central Bank) কমিয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ীদের কম ধার দিবে। কাজেই দেশে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

সরকার ও সুদের হার—আমরা টাকার চাহিদা এবং যোগান দুই-ই আলোচনা করিয়াছি। এখন দেখা যাক সরকার কি ভাবে এই চাহিদা ও যোগান এবং সুদের হারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

সুদের হার কমাইতে হইলে তিনটি উপায় আছে: (১) টাকার যোগান বাড়ানো, (২) টাকার চাহিদা কমানো, অথবা (৩) দুই উপায়ই অবলম্বন করা। সরকার টাকার চাহিদা কমাইয়া এবং যোগান বাড়াইয়া সুদের কম হার প্রচলিত করিতে পারে। তেমনি, বিপরীত পক্ষে, সরকার টাকার চাহিদা বাড়াইয়া এবং যোগান কমাইয়া সুদের বেশী হার প্রচলিত করিতে পারে। তবে, কার্যক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে টাকার চাহিদার পরিবর্তন ঘটানোর চেয়ে যোগানের পরিবর্তন ঘটানো অনেক বেশী সহজ।

সরকার কর্তৃক টাকার চাহিদা কমানো—টাকার চাহিদা কমানো খুব সহজ নয়, কারণ এটা লোকের মানসিক প্রক্রিয়ার ফল।

একটা উপায় আছে, সেটা হইতেছে ব্যাঙ্ক রেট (bank rate) কমানো।

ব্যাঙ্ক রেট বলিলে বুঝায় দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যে হারে টাকা ধার করে তাহা। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে টাকা ধার করিতে যায় না। কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে টাকা ধার দিবে তাহার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি খুব কম হারে টাকা ধার দেয় তাহা হইলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিও খুব কম হারে ব্যবসায়ীদিগকে টাকা ধার দিতে পারে, এবং সরকারী নীতির প্রভাবে লোকের মনে একটা ধারণা হইতে পারে যে ভবিষ্যতে সুদের হার আরও কমিবে অর্থাৎ তাহাদের আনুমানিক স্বাভাবিক হার হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং সেই আনুমানিক স্বাভাবিক হারের তুলনায় যে হ্রাসপ্রাপ্ত হারের প্রচলন হইয়াছে তাহাও বেশী মনে হইবে। সুতরাং

তাহাদের টাকার চাহিদা কমিবে। তাহারা টাকা হাতে না রাখিয়া বণ্ড ইত্যাদি কিনিবে।

সরকার কর্তৃক টাকার যোগান বাড়ানো—ব্যাঙ্ক রেট কমাইয়া টাকার চাহিদা কমানোর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত টাকার যোগানও বাড়ানো হয়। যখন সুদের হার কমানো হয় তখন সাধারণত সরকারের তরফ হইতে সিকিউরিটি ক্রয় করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি কিনিলে দেশে টাকার যোগান বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে সুদের হার আরও কমিয়া যায়।

সরকার কর্তৃক টাকার চাহিদা বাড়ানো—ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইলে লোকের মনে একটা ধারণা আসে যে শীঘ্রই সুদের হার আরও বাড়িবে। ইহাতে টাকার চাহিদা বাড়িবে, অর্থাৎ প্রচলিত সুদের হারে যতটা টাকা লোকের হাতে থাকা উচিত তাহার চেয়ে বেশী টাকা লোকে হাতে রাখিতে চাহিবে। ভবিষ্যতে সুদের হার আরও বাড়িবে বলিয়া অনুমান করা হয়। তখন আরও বেশী সুদে খাটাইতে পারা যাইবে এই আশায় লোকে টাকা হাতে রাখিতে চাহিবে। টাকার চাহিদা বাড়িবার ফলে সুদের হার আরও বাড়িবে। এই ভাবে ব্যাঙ্ক রেট বাড়িলে সুদের হার বাড়ে।

সরকার কর্তৃক টাকার যোগান কমানো—ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইয়া টাকার চাহিদা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত টাকার যোগানও কমানো হয়। সরকারের তরফ হইতে সিকিউরিটি বিক্রয় করা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ কমিয়া যাইবে। ইহার ফলে তাহারা তাহাদের ধার দেওয়ার নীতি পরিবর্তন করিবে। তাহারাও বেশী সুদে টাকা ধার দিবে। কাজেই সুদের হার বাড়িয়া যাইবে।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিয়াছি কি ভাবে সরকার সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিয়া সুদের হার কমাইতে অথবা বাড়াইতে পারে। অনেক সময়ে আপনা হইতে টাকার চাহিদা কমিতে বা বাড়িতে পারে। কিন্তু আজকাল জগতে সর্বত্রই সরকারই প্রধানত সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করে।

সুদের হারের বিভিন্নতা (Differences in Rates of Interest)—এতক্ষণ যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে ইহা মনে হইতে পারে যে সুদের হার একটি মাত্রই হয়। কিন্তু তাহা নহে। সুদের হার নানারকম হইতে পারে।

ঋণের মেয়াদ অনুসারে সুদের হারের তারতম্য হয়। অল্প-মেয়াদী ঋণের সুদ কম, দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের সুদ বেশী।

তারপর, ঋণ দানের ঝুঁকি অনুসারেও সুদের হারের তারতম্য হয়। সরকারের কাছে টাকা ধার দিলে সময়মত সুদ এবং আসল পাওয়া যায়। এই কারণে লোকে সরকারকে কম সুদে টাকা ধার দিতে রাজী হয়।

প্রশ্ন

1. On what factors do the demand for and supply of money depend ?

(অর্থের চাহিদা ও যোগান কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?) [২৬৭-২৭৩ পৃষ্ঠা]

2. What are the main motives that lead to liquidity-preference in respect of money ?

(লোকে কি কি উদ্দেশ্যে নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় ?) [২৬৮-২৭০ পৃষ্ঠা]

3. What is interest ? Explain how interest is determined. (Higher Secondary Examination, 1961)

(সুদ বলিলে কি বুঝায় ? সুদের হার কি ভাবে নির্ধারিত হয় বুঝাইয়া দাও ।)
[২৬৬-২৭৪ পৃষ্ঠা]

4. Why is interest paid ?

(সুদ দেওয়া হয় কেন ?) [২৬৮-২৭০পৃষ্ঠা]

5. How can the Government control the supply of money ? Can it influence demand for money ?

(দেশের সরকার কি কি ভাবে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বুঝাইয়া দাও। সরকার কি অর্থের চাহিদাকে প্রভাবিত করিতে পারে ?) [২৭০-২৭৩

6. Describe the different types of loans. Why do interest rates vary according to the types of loans ?

(কি কি প্রকারের ঋণ আছে বর্ণনা কর। ঋণের প্রকার-ভেদে সুদের হার বিভিন্ন রকমের হয় কেন ?) [২৭৩-২৭৪পৃষ্ঠা]

W. B. HIGHER SECONDARY EXAMINATION QUESTIONS

ECONOMICS
1960

1. Explain how price is determined in a market under perfect competition.
2. Discuss the functions and utility of trade unions. What are the principal weaknesses of the trade union movement in India ?
3. What is meant by 'co-operation' ? Describe the different types of co-operative societies which prevail in India.
4. What is capital ? What measures would you adopt to increase the accumulation of capital in India ?
5. Give a brief account of the aims and objectives of India's Five Year-Plans.
6. What is inflation ? How does inflation affect businessmen and wage-earners ?
7. Comment on the advantages and limitations of production by joint-stock companies.
8. Discuss the functions of a Central Bank.
9. What are the principal features of an under-developed economy ? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions.
10. Indicate the importance of the village and small-scale industries in our economy. What measures would you suggest so that they may develop side by side with our large-scale industries ?
11. Define a tax. Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes.

1960 : COMPARTMENTAL

1. Distinguish between (a) wealth and capital, (b) value and price, and (c) money wages and real wages.
2. What are the causes leading to the localisation of industries in particular areas ? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions.
3. Explain the nature of the services performed by the entrepreneur in modern business organisation.

4. What are market prices? Why is demand more influential than supply in fixing market prices?
5. Estimate the place of small-scale and cottage industries in the economy of India. How would you propose to plan the future development of such industries?
6. What are the functions of Banking? Carefully explain their importance in modern business.
7. Distinguish between a direct and an indirect tax. Give examples of both from the Indian tax system.
8. What are the main causes which influence the accumulation of capital in a country? How far are those causes present in India today?
9. What are the chief defects of Indian industrial labour and what, in your opinion, are the remedies for them?
10. How will a period of rising prices affect the following groups in the population:

    (a) Farmers; (b) Wage-earners; and (c) Teachers?

1961

1. Distinguish between market value and normal value. Show how market value is determined.
2. What is money? Describe the functions of money.
3. Describe the part which co-operation can play in the development of Indian agriculture.
4. Discuss the problem of India's population and food supply.
5. Explain why wage rates vary in different occupations within a country.
6. Discuss the advantages and disadvantages of foreign trade.
7. Explain how interest is determined.
8. What is a bank? What are its services to society for which you consider it useful?
9. What is meant by 'economic development'? State the principal requirements for the development of an underdeveloped country like India.
10. What is a tax? How should the burden of taxes be distributed among the people?

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌরবিজ্ঞান

নবম শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

W. B. Secondary Board Syllabus

IN CIVICS—FOR CLASS IX

1. The evolution of human society. The Family. The patriarchal and matriarchal families. The Indian joint family.
2. The State : its origin and characteristics.
3. The Government. Forms of Government. Democracy and Dictatorship. Merits and defects of Democracy. Unitary and Federal Government. Parliamentary and Presidential Government.
4. Organs of Government. Separation of Powers. Departments of Government.
5. Functions of Government.
6. Individual and Society. Socialism.
7. The Nation. Right of Self-determination. United Nations.

প্রথম অধ্যায়

পরিবার ও সমাজ

(Family and Society)

পৌরবিজ্ঞান কাহাকে বলে? (What is Civics?)—যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান নাগরিক (Citizen) হিসাবে মানুষের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকে পৌরবিজ্ঞান (Civics) বলে। সুতরাং নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের পর্যালোচনা পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। ইংরাজী Civics শব্দটি ল্যাটিন Civis শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। Civis শব্দের অর্থ নাগরিক বা নগর-রাষ্ট্রের (City State : ল্যাটিনে Civitas) অধিবাসী। নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক মানুষের নানাবিধ অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। এই সকল অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

সমাজ (Society)—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে সমাজ বলা যায়। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিরা নানা কারণে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকে। মানুষ অপর মানুষের সাহচর্য ও সহায়তা ব্যতীত বাস করিতে চাহে না। এই অর্থে মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বাহিরে মানুষ অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে পারে; বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষ দেখা যায়। কিন্তু মানুষকে প্রকৃত মানুষের মত বাঁচিতে হইলে তাহাকে অবশ্যই সমাজে বাস করিতে হয়। যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইলে মানুষ উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে এবং নিজের গুণাবলীর সম্যক বিকাশ করিতে সমর্থ হয় তাহা সমাজের বাহিরে পাওয়া যায় না। নানা বিষয়ে অপরের সহযোগিতা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। সহযোগিতা পাইতে হইলে অপর মানুষের সঙ্গে—অর্থাৎ সমাজের মধ্যে—বাস করিতে হয়। এই সকল কারণে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) বলিয়াছেন যে স্বভাবতই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই দেখে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই মানুষের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে।

সমাজের বিবর্তন (Evolution of Society)—সাধারণত প্রত্যেক মানুষের জীবন নানাভাবে সমাজ-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সমাজ-জীবন স্থিতিশীল নয়, গতিশীল—অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা

কারণে সমাজ-জীবনে বহু পরিবর্তন ঘটে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে মানব-সমাজের গঠন ও প্রকৃতি যেরূপ ছিল এখন আর সেরূপ নাই। এমন কি, পঞ্চাশ বা একশত বৎসরের মধ্যেও সমাজ-জীবনে প্রভূত পরিবর্তন ঘটিতে পারে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না, কারণ সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে।

কত কাল পূর্বে—ইতিহাসের কোন প্রাচীন যুগে—সমাজ-জীবনের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু **পরিবার** (Family) গঠন হইতেই সুসংবদ্ধ সমাজ-জীবনের বিবর্তন (evolution) আরম্ভ হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অর্থাৎ পরিবার সমাজ-জীবনের প্রাচীনতম রূপ।

মানুষের জীবন রক্ষার জন্য পরিবার গঠন অপরিহার্য। শৈশবে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহযত্ন না পাইলে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মানুষের পক্ষে দীর্ঘকাল এইরূপ স্নেহযত্ন লাভের প্রয়োজন আছে, কিন্তু পশু-পক্ষীর শাবক অল্পদিনের মধ্যেই স্বাবলম্বী হইয়া পিতা-মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। তাই পশু-পক্ষীর জগতে মানুষের মত সুসংবদ্ধ সমাজ গঠনের প্রয়োজন থাকে না।

শৈশব অতিক্রান্ত হইলেই যে মানুষের পক্ষে পরিবারের সহায়তা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে তাহা নহে। জীবন সংগ্রামের প্রতি পর্যায়ে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া মানুষের সঙ্গপ্রিয়তার জন্য পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সাহচর্য সকলেরই কাম্য। কেহই নিঃসঙ্গ-ভাবে জীবন কাটাইতে চাহে না। আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্যে নিঃসঙ্গতার দুঃখ দূর হয়।

পরিবার গঠন সমাজ গঠনের প্রথম স্তর মাত্র। একটি পরিবারে যখন জন-সংখ্যা বাড়িয়া যায় তখন উহা কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইয়া যায়। যেমন, মনে কর 'ক' নামক ব্যক্তির সাত পুত্র। যতদিন 'ক' জীবিত থাকিবে, ততদিন এই সাত পুত্র এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি একই পরিবারভুক্ত থাকিবে, কিন্তু 'ক'-এর মৃত্যুর পর তাহারা সাতটি পরিবারে বিভক্ত হইয়া যাইবে। অবশ্য তখনও এই সাতটি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে। পৌরবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে তাহারা এক **গোষ্ঠী** (Clan) গঠন করিবে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়। প্রাচীন কালে প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন গোষ্ঠীপতি থাকিত। সমগ্র গোষ্ঠীর সমবেত স্বার্থ

ও নিরাপত্তা রক্ষা গোষ্ঠীপতির প্রধান কর্তব্য ছিল। গোষ্ঠীপতির নেতৃত্ব সম্মিলিত পরিবারগুলিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রাখিত। সমাজ-জীবনের বিবর্তনে ইহাই দ্বিতীয় স্তর।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যেমন পরিবার গোষ্ঠীতে প্রসারিত হয় তেমন কালক্রমে গোষ্ঠী, কুল বা উপজাতিতে (Tribe) প্রসারিত হয়। যেমন কয়েকটি পরিবার মিলিয়া একটি গোষ্ঠী গঠিত হয় তেমন কয়েকটি গোষ্ঠী মিলিয়া একটি **কুল** বা **উপজাতি** (Tribe) গঠিত হয়। এক উপজাতির অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তি একই পূর্বপুরুষের বংশধর (অন্ততঃ তাহারা এইরূপই মনে করে) ; তাই তাহারা সাধারণভাবে একই রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষার জন্য উপজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠী আভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষা করে। উপজাতি গঠন সমাজ-জীবনের বিবর্তনে তৃতীয় স্তর।

অতঃপর বিভিন্ন উপজাতির সম্মিলনে জাতিগত একাত্মতাবোধের উৎপত্তি হইল এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য **রাষ্ট্রের** (State) উদ্ভব হইল—সমাজ-জীবনের বিবর্তনে চতুর্থ স্তর আসিল। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পড়িবে।

প্রাচীন কালে কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সীমা প্রথমে একটিমাত্র নগরে সীমাবদ্ধ ছিল। এইরূপ রাষ্ট্রকে নগর-রাষ্ট্র (City State) বলা হইত। প্রাচীন গ্রীসে এথেন্স ও স্পার্টা এবং প্রাচীন ইটালীতে রোম ইহার উদাহরণ। কালক্রমে একটি বা একাধিক দেশ লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইতে লাগিল। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে সমাজ-জীবনে বহু পরিবর্তন ঘটিল।

বর্তমানে পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সুসংবদ্ধ মানব-সমাজ স্থাপনের আদর্শ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতেছে। যদি এই আদর্শ সফল হয় তবে আমরা সমাজ-জীবনের বিবর্তনে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে উপনীত হইব।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal and Matriarchal Families)—উপরে পরিবার গঠনের কথা বলা হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি কে? বর্তমান যুগের সামাজিক ব্যবস্থায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পিতা পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। পিতা সমুদয় পারিবারিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব করেন। পরিবারের সকল সভ্য তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে

আবদ্ধ থাকে। পিতার দিক হইতে হিসাব করিয়া বংশক্রম, উত্তরাধিকার প্রভৃতি নির্ণীত হয়। সুতরাং পিতাই পরিবারের কেন্দ্র। স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) নামক আইনজ্ঞ মনীষীর মতে আদিম কাল হইতে মানব-সমাজে পিতৃপ্রধান বা পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বর্তমান আছে এবং এইরূপ পরিবার প্রসারিত হইয়া কালক্রমে গোষ্ঠী, উপজাতি ও রাষ্ট্র উদ্ভূত হইয়াছে। এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ। বর্তমান কালে পরিবারে পিতার প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন কাল সম্বন্ধে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত।

মরগ্যান (Morgan) প্রভৃতি মনীষীর মত মেইনের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন, পুরুষের দিক হইতে বিচার করিয়া বংশ নির্ণয় করার পদ্ধতি প্রাচীন কালে খুব কম ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল ; বরঞ্চ স্ত্রীলোকের দিক হইতে বিচার করিয়া বংশ নির্ণয় করার পদ্ধতিই সুপ্রচলিত ছিল। অর্থাৎ আদিম যুগে পরিবার মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক ছিল, পিতৃপ্রধান বা পিতৃতান্ত্রিক ছিল না। যে সমাজে প্রত্যেকটি স্ত্রীলোক এক সময়ে একটি মাত্র স্বামী গ্রহণ করে সেই সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠিত হইতে পারে ; কিন্তু যে সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয় নাই অথবা যে সমাজে স্ত্রীলোক একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করিতে পারে সেই সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পরিবর্তে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের উৎপত্তিই স্বাভাবিক। প্রাচীন কালে পুরুষের বহুবিবাহ (polygamy) অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বহুপতিগ্রহণ (polyandry) প্রথা বেশী প্রচলিত ছিল। সুতরাং তখন পরিবার প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক ছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণের বিবরণ আছে। প্রাচীন মিশরে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে মালাবার অঞ্চলে এখনও এই ব্যবস্থা আংশিক-ভাবে প্রচলিত আছে।

ভারতীয় যৌথ পরিবার (Indian Joint Family)—পাশ্চাত্ত্য দেশে পরিবারের আয়তন ছোট। সাধারণত স্বামী, স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানদের লইয়া একটি পরিবার গঠিত হয় ; বৃদ্ধ মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও সাবালক সন্তানেরা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সভ্য রূপে গণ্য হয় না—তাহারা পৃথকভাবে নিজ নিজ পরিবার গঠন করে। কিন্তু ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে—পরিবারের আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এখানে পিতামাতা, সাবালক পুত্রগণ ও তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি এবং কন্যা, ভগিনী ও মাতৃস্থানীয়া আত্মীয়ারা একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত

থাকে। অনেক সময় অপেক্ষাকৃত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-আত্মীয়াগণও পরিবারের সভ্য রূপে গণ্য হয়। এইরূপ বৃহৎ পরিবারকে যৌথ পরিবার বলা হয়। সাধারণত যৌথ পরিবারের উপার্জনশীল সকল ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ একত্র করিয়া সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এইরূপ পরিবারকে একান্নবর্তী পরিবারও বলা হয়। যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের সভ্যগণের অর্থনৈতিক দায়িত্ব কেবলমাত্র নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকে না; ভ্রাতা-ভগিনী-ভ্রাতুষ্পুত্র-ভাগিনেয় প্রভৃতি পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতিও তাহাদের অর্থনৈতিক কর্তব্য প্রসারিত হয়।

যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের অনেক আর্থিক সুবিধা আছে। উপার্জন নির্বিশেষে পরিবারের সকল সভ্যই অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমান সুবিধা পায়; আপদে বিপদে প্রত্যেকেই পরিবারস্থ সকলের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারে। এক ভাই বেকার বা অসুস্থ হইলে তাহার স্ত্রী-পুত্রের অন্নাভাব হয় না। কাহারও অকালে মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী-পুত্র পথের ভিখারী হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে বেকার, বিকলাঙ্গ, বার্ধক্যজনিত উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিরা সরকারী সাহায্য পায়; সুতরাং তাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আত্মীয়স্বজনের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। আমাদের দেশে এইরূপ ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নাই। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এই অভাব খানিকটা পূরণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া যৌথ পরিবারে এক সঙ্গে বহু লোক বাস করায় নানাদিকে ব্যয় সংকোচ করা সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহা যৌথ পরিবার প্রথার একটি বিশেষ সুবিধা।

যৌথ পরিবারের একটি নৈতিক দিক আছে। একজনের উপার্জিত অর্থ কেবলমাত্র তাহার স্ত্রী-পুত্র ভোগ করিবে, কোন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাহার কোন কর্তব্য নাই—এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে স্বার্থপর করিয়া ফেলে। যৌথ পরিবারে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনে মানুষের মন অনেকটা উদার হয়। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়া মানুষ বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন শিক্ষা করে।

কিন্তু যৌথ পরিবার প্রথা নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করে। যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় দায়িত্বহীন, অলস ও উদ্যমহীন হইয়া পড়ে। উপার্জন না করিলে উপবাস করিতে হইবে—এইরূপ ভয় না থাকায় অনেকে উপার্জনের চেষ্টা করে না; ফলে একজন উপার্জনশীল ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কয়েকজন আলস্যে কাল কাটায়। ইহাতে সাধারণভাবে জীবনের মান

(standard of living) নামিয়া যায়। নৈতিক দিক হইতেও এই ব্যবস্থা অনিষ্টকর। যাহার শারীরিক সামর্থ্য আছে তাহার পক্ষে নিজে শ্রম না করিয়া অপরের শ্রমলব্ধ অন্নে জীবনধারণ করা অন্যায়। নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের ভার অপরের উপরে ফেলিয়া দেওয়া অসঙ্গত। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে যৌথ পরিবার প্রথা হানিকর। পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের ফলে পরিবারস্থ ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে নিজ নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে কাজ করিতে পারে না।

কিছুকাল যাবৎ নানাকারণে যৌথ পরিবার প্রথা ভাঙিয়া পড়িতেছে; সম্ভবত অল্পদিনের মধ্যেই ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিবার ক্রমশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে, দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সামাজিক কর্তব্যবোধ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। তাহা ছাড়া জীবনসংগ্রাম ক্রমশ তীব্র হওয়ায় অনেকের পক্ষেই নিজের স্ত্রী-পুত্র ছাড়া অপরের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া কঠিন হইয়াছে। চাকুরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় একান্নবর্তী পরিবার রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। হিন্দু সংহিতা (Hindu Code) আইনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থা যৌথ পরিবার প্রথার প্রতিকূল। প্রধানত আর্থিক অবস্থার চাপে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যটুকু আজ বিলুপ্তির মুখে।

প্রশ্ন

1. Give a brief account of the evolution of human society. (মানুষের সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।) [৩—৫ পৃষ্ঠা]

2. What do you mean by the terms "Patriarchal Family" and "Matriarchal Family"? ("পিতৃতান্ত্রিক সমাজ" এবং "মাতৃতান্ত্রিক সমাজ"—এই কথাগুলির অর্থ কি?) [৫—৬ পৃষ্ঠা]

3. What are the merits and defects of the Joint Family system? Account for its gradual disintegration. (যৌথ পরিবার প্রথার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? ইহা ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কেন? [৬—৮ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র (State)

রাষ্ট্র কাহাকে বলে? (What is the State?)—প্রথম অধ্যায়ে রাষ্ট্র (State) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? রাষ্ট্র গঠনের জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন?

পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রাচীন কালে গ্রাসে ও ইটালীতে একটি নগর লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হইত। বর্তমান যুগে একটি দেশ বা একটি বিরাট ভূখণ্ড লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারত একটি রাষ্ট্র। পাকিস্তান একটি রাষ্ট্র। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে একটি দেশ (অর্থাৎ ভারতবর্ষ) দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। দেশটি ভাগ হওয়া সত্ত্বেও দুই রাষ্ট্রেই বিরাট ভূখণ্ড রহিয়াছে। এই ভূখণ্ডদ্বয় সুস্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক রাষ্ট্রই সুস্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। ইউরোপের রঙীন মানচিত্রের দিকে তাকাইলে তোমরা দেখিতে পাইবে যে ঐ মহাদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রঙে চিত্রিত হইয়াছে। এক-একটি রঙ এক-একটি রাষ্ট্র বুঝাইতেছে। লাল রঙ দ্বারা ব্রিটেনকে নির্দেশ করা হইতেছে। হয়তো সবুজ রঙ দ্বারা ফ্রান্স, নীল রঙ দ্বারা ইটালী বুঝাইতেছে। প্রত্যেকটি রঙের দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে। সুস্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রগঠনে একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। এইরূপ ভূখণ্ড না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না, কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিকার ও কার্যকলাপ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে। এই ভূখণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। বর্তমান যুগে রাশিয়ার ন্যায় বৃহৎ এবং বেলজিয়মের ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আছে। কিন্তু আয়তন যাহাই হউক, সীমারেখা সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

কেবল ভূখণ্ড থাকিলেই তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। রাষ্ট্র গঠনের জন্য মানুষ চাই। যে ভূখণ্ডে মানুষের স্থায়ী বাস নাই তাহাকে রাষ্ট্র বলা চলে না। হিমালয় পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গসমূহে জনসমষ্টি স্থায়ী ভাবে বাস করিতে পারে না। তাই সেখানে রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব। মেরু অঞ্চলে মানুষের স্থায়ী বসবাস সম্ভব নহে। তাই সেখানে রাষ্ট্র স্থাপন করা চলে না। জনশূন্য মরুভূমিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় না। যখন এক বিশাল জনসমষ্টি এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ী ভাবে বাস করে তখনই রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। এইজন্যই যাযাবরেরা রাষ্ট্র গঠন করিতে

পারে না। তাহারা এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল বাস করে না। এইরূপ ভ্রাম্যমাণ জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। ভারতে মানুষ স্থায়ী ভাবে বাস করে। তাই ভারত একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হইবে সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় সিংহলের জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। তবে বর্তমান যুগের রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন হওয়া চাই যাহাতে ধনবলে ও সামরিক বলে রাষ্ট্র অন্তত খানিকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে।

একটি বিশাল জনসমষ্টির পক্ষে স্থায়ী ভাবে এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করিতে হইলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাসন-ব্যবস্থা থাকা চাই। সেই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে 'সরকার' (Government)। যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে সেখানে চুরি ডাকাতি, মারামারি-কাটাকাটি হইবে। তখন সরকার না থাকিলে দুষ্টের দমন করিবে কে? এক ভূখণ্ডের লোক লুণ্ঠনের লোভে অন্য ভূখণ্ড আক্রমণ করিতে পারে। তখন সরকার না থাকিলে আক্রান্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিবে কে? কেবল দুষ্টের দমন ও বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধই সরকারের কাজ নয়। লক্ষ লক্ষ লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করা চাই। সরকার না থাকিলে তাহা করিবে কে? প্রকৃতপক্ষে সরকার না থাকিলে কোন বিশাল জনসমষ্টির পক্ষে সম্মিলিত ভাবে এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ী ভাবে বাস করা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি সরকারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সরকার না থাকিলে রাষ্ট্র গঠন চলে না।

যে কোন রকমের সরকার থাকিলেই চলিবে না, সরকারের স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার অধিকার থাকা চাই। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষে সরকার ছিল। কিন্তু সেই সরকার স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পারিত না, ইংলণ্ডের সরকারের হুকুম অনুসারে তাহাকে চলিতে হইত। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে কোন সরকার দেশের উন্নতি করিতে পারে না। এখন আমাদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে আর ইংলণ্ডের (বা অপর কোন দেশের) সরকারের হুকুম তামিল করিতে হয় না। ভারতের স্বাধীন সরকার দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই করিতে পারে। এই অধিকারকে বলা হয় 'সার্বভৌমিকতা' (Sovereignty)। রাষ্ট্র সার্বভৌম হইবে, অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ইহার সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার থাকিবে, ইহাকে অপর কোন রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্র গঠনের জন্য চারিটি প্রধান উপাদান প্রয়োজন ঃ ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার, সার্বভৌমিকতা। ইহার মধ্যে যে-কোন একটি না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। ভারতে এই চারিটি উপাদান আছে। তাই ভারত একটি রাষ্ট্র।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্রসংক্রান্ত প্রচলিত ধারণার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে সকল রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য তাহারা জাতিপুঞ্জের সনদ (Charter) অনুসারে অনেক বিষয়ে স্ব স্ব সার্বভৌম অধিকার ত্যাগ করিয়াছে। যেমন, যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের অন্তর্গত, কিন্তু জাতিপুঞ্জের সভ্য কোন রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছানুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে না, সনদের সর্ত দ্বারা যুদ্ধঘোষণার অধিকার সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্ম আইনগত বিচারে জাতিপুঞ্জের সভ্য রাষ্ট্রগুলিকে যথার্থ সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা যায় না।

অনেকের মতে, বর্তমান যুগে জাতিপুঞ্জের সভ্য না হইলে কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ রাষ্ট্র মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে না। চীন (Communist China) জাতিপুঞ্জের সভ্য নহে।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে বলা যায়ঃ রাষ্ট্র এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে, যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন (অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত) এবং যাহাদের এমন একটি সুসংবদ্ধ সরকার বা শাসন-প্রতিষ্ঠান আছে যাহার নির্দেশ রাষ্ট্রবাসিগণ স্বভাবত পালন করে।*

এই সংজ্ঞা প্রয়োগ করিলে পশ্চিম বঙ্গ একটি রাষ্ট্ররূপে গণ্য হইতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গ একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড, এক বৃহৎ জনসমষ্টি এখানে বাস করে, এখানে একটি সুসংবদ্ধ সরকার আছে যাহার নির্দেশ এখানকার অধিবাসীরা স্বভাবত পালন করে। অতএব রাষ্ট্রগঠনের তিনটি উপাদান এখানে বর্তমান। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার কোন কোন বিষয়ে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং বৈদেশিক নীতি, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ, মুদ্রানীতি প্রভৃতি ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কোনই কর্তৃত্ব নাই। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের সার্বভৌমিকতা নাই। ইহা ভারত

---

* "The State... ...is a community of persons, more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so—of external control and possessing an organised Government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."

রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত একটি রাজ্য (State), স্বতন্ত্র রাষ্ট্র রূপে ইহার অস্তিত্ব নাই। যে রাজ্যের সার্বভৌমিকতা নাই তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায় না।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘ (State and other associations)—মনুষ্য-সমাজে নানাবিধ সঙ্ঘ আছে, যেমন—ধর্মসঙ্ঘ (যথা, রামকৃষ্ণ মিশন), শ্রমিক সঙ্ঘ (যথা, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস), রাজনৈতিক সঙ্ঘ (যথা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস), শিক্ষকসঙ্ঘ (যথা, নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতি), স্বায়ত্তশাসন সঙ্ঘ (যথা, কলিকাতা কর্পোরেশন) ইত্যাদি। যখন কোন জনসমষ্টি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং নির্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হয় তখন একটি সঙ্ঘ গঠিত হয়। রাষ্ট্র মনুষ্য-সমাজে বৃহত্তম সঙ্ঘ। জনসংখ্যা এবং উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্য—এই দুই দিক হইতে বিচার করিলে অন্যান্য সঙ্ঘের তুলনায় রাষ্ট্রের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য স্পষ্টভাবে দেখা যাইবে।

রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সঙ্ঘের মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য আছে। প্রথমত, প্রত্যেক রাষ্ট্রের কার্য এবং কর্তৃত্ব একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ, এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কোন কাজ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন সঙ্ঘ একটি দেশের সীমার বাহিরে কাজ করিতে পারে। যেমন, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হইয়াছে, নানাদেশের লোক ইহার সভ্য হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কিন্তু কোন কোন সঙ্ঘের সহিত নাগরিকতার সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেক মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক, রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধহীন মানুষের অস্তিত্ব (Statelessness) অসম্ভব না হইলেও বিরল। কিন্তু কোন মানুষের পক্ষে কোন ধর্মসঙ্ঘ বা শ্রমিক সঙ্ঘের সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক নহে। আবার একজন মানুষ কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে (দ্বৈতনাগরিকতা বা Double Nationality বিরল), কিন্তু যে কোন মানুষ একাধিক ধর্মসঙ্ঘ ও শ্রমিক সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র স্থায়ী এবং সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, কিন্তু অন্যান্য সঙ্ঘ অস্থায়ী (যে কোন সময়ে তাহাদের বিলোপ ঘটিতে পারে) এবং তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সঙ্ঘ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং মনুষ্যগঠিত সর্বপ্রকার সঙ্ঘের মধ্যে রাষ্ট্রের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of the State)—রাষ্ট্র কাহাকে বলে তাহা দেখা গেল। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিরূপে হইল, উহা কিরূপে বর্তমান অবস্থায়

পরিণত হইল, রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। অবশ্য যে সকল মনীষী এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) **ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ (Theory of Divine Origin)**—এই মতবাদ অনুসারে স্বয়ং ঈশ্বর রাষ্ট্রের স্রষ্টিকর্তা ও পরিচালক। পূর্বকালে মনে করা হইত যে রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তিনি রাজ্যশাসন করেন। সুতরাং রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, অথবা তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করা—এমন কি, তাঁহার কার্যের সমালোচনা করা কেবলমাত্র অপরাধ (crime) নহে—পাপ (sin) বলিয়া গণ্য করা হইত। রাজার ইচ্ছা ও কার্যের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের নির্দেশ প্রকাশিত হয়। অতএব রাজাকে অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরকে অমান্য করা; রাজদ্রোহের অর্থ ধর্মদ্রোহ। রাজা কোন কার্যের জন্য প্রজার নিকট দায়ী নহেন, তাঁহার দায়িত্ব কেবলমাত্র ঈশ্বরের নিকটে।

বাইবেল, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে এই মতবাদের উল্লেখ ও সমর্থন পাওয়া যায়। ইউরোপে দীর্ঘকাল এই মতবাদ সুপ্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে নূতন ধারণা ইউরোপে প্রসার লাভ করে। ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ঈশ্বরের স্থান সম্বন্ধে পূর্বপ্রচলিত ধারণা পরিত্যক্ত হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয় যে রাজা প্রজার প্রতিনিধি এবং প্রজার মত অনুসারে তাঁহাকে রাজ্যশাসন করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ সম্পূর্ণ অচল।

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচীন কালে এই মতবাদ রাষ্ট্রনৈতিক জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। রাজার কর্তৃত্বকে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত করার ফলে সেকালের মানুষ সহজে রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সহজ হইয়াছে, রাষ্ট্রের গঠন পাকা হইয়াছে। রাজা ঈশ্বরের নামের আড়ালে আশ্রয় না লইলে সেকালে রাষ্ট্রের কাঠামো তৈয়ারি করা কঠিন হইত।

কর্তব্যপরায়ণ রাজা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করিয়া প্রজাদের মঙ্গল সাধনের দায়িত্ব লইতেন, রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইত। শাসকের পক্ষে নৈতিক দায়িত্ববোধ প্রজার মঙ্গলের কারণ হইত। কিন্তু কোন কোন

ক্ষেত্রে রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেন, কারণ তিনি মনে করিতেন যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বলে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তখন দুর্ভাগ্য প্রজাগণ কুশাসনে পীড়িত হইত। এইরূপে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ পরোক্ষভাবে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা ও কুশাসন সমর্থন করিত।

(২) **বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force)**—যাঁহারা ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদে বিশ্বাসী নহেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। মানুষের ইতিহাস চিরদিনই সংঘর্ষের ইতিহাস; "জোর যার মুলুক তার" ইহাই মানব সমাজের চিরন্তন নীতি। এই নীতি অনুসারে যাহার জোর আছে সে অপরকে বশীভূত করিয়া নিজের কর্তৃত্ব মানিতে বাধ্য করে। এইভাবে দুর্বলের উপর সবলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন কালে কোন দুঃসাহসী গোষ্ঠীপতি বা দলপতি বাহুবলে এবং নিজ গোষ্ঠী বা দলের সাহায্যে অন্যান্য গোষ্ঠীকে বা দলকে পরাজিত করিয়া রাজ্যস্থাপন করিত। সুতরাং দৈহিক বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি। আবার বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়; আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ বলপ্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব হয় না। এমন কি, দৈনন্দিন শাসনকার্যেও পুলিশ প্রভৃতির মাধ্যমে বলপ্রয়োগের আবশ্যক হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্ভব ও অস্তিত্ব—উভয়ই বলপ্রয়োগের উপর নির্ভর করে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ অনেকটা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ রাষ্ট্রগঠনে ও রাষ্ট্রশাসনে ঈশ্বরের স্থান মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু বলপ্রয়োগ মতবাদ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রগঠন ও সংরক্ষণ করিতে যে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র শারীরিক বলের সাহায্যে রাষ্ট্র গঠিত ও সংরক্ষিত হইতে পারে না। নৈতিক বলই রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি। যে রাষ্ট্রে প্রজারা কেবলমাত্র পুলিশ বা সৈন্যসামন্তের ভয়ে রাজার কর্তৃত্ব মানিয়া লয় তাহা বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। যে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা জনগণের অনুমোদন লাভ করে তাহাই স্থায়ী হয়। শাসক যখন কোন প্রজার প্রতি বলপ্রয়োগ করেন তখন তাহা প্রজাসাধারণের সম্মতি অনুসারে রচিত আইনের ভিত্তিতে করা উচিত, অর্থাৎ দোষীর শাস্তিবিধান সম্বন্ধে সমাজের পরোক্ষ অনুমোদন থাকা আবশ্যক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বলপ্রয়োগ মতবাদ আংশিক ভাবে সত্য।

বলপ্রয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রের গঠন ও সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। কিন্তু কেবলমাত্র শারীরিক বলপ্রয়োগ দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন করা যায় না, নৈতিক বলের সহায়তা প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া জাতীয় ভাব, ধর্মীয় ভাব, ভৌগোলিক ঐক্য, সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজন প্রভৃতি নানাবিধ উপাদান রাষ্ট্রগঠনে ও সংরক্ষণে সহায়তা করে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইলে সমাজে পশুবল ও স্বেচ্ছাচার প্রবল হইবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হইবে। "জোর যার মুলুক তার" এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া কোন সুস্থ, সভ্য সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে না। সভ্য রাষ্ট্রে দুর্বলকেও তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হয়, ন্যায় ও নীতি অনুসারে তাহার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। বলপ্রয়োগের সহিত ন্যায় ও নীতির সামঞ্জস্য রক্ষা প্রয়োজন। এই সামঞ্জস্য কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে নহে, আন্তর্জাতিক সমাজের ক্ষেত্রেও আবশ্যক।

(৩) **সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory)**—এই মতবাদ অনুসারে রাজা ও প্রজার মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও দর্শনে এই মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা পরিণতি লাভ করে আধুনিক যুগে। ইংরেজ দার্শনিক **হব্‌স্** (Hobbes) ও **লক্** (Locke) সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং ফরাসী দার্শনিক **রুশো** (Rousseau) অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মতবাদকে দার্শনিক রূপ প্রদান করেন। তাঁহারা কল্পনা করিয়াছেন যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে পৃথিবীতে "প্রাকৃতিক অবস্থা" (State of Nature) বর্তমান ছিল। তখন কোন আইন-কানুন প্রচলিত ছিল না; মানুষ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইত।

কিন্তু এই "প্রাকৃতিক অবস্থায়" মানুষের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে উপরোক্ত তিনজন দার্শনিক একমত নহেন। হব্‌সের মতে তখন মানুষের জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং অনিশ্চিত"। এই দুঃখময় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের জন্য মানুষ পরস্পরের সহিত চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিল। চুক্তির ফলে সমুদয় ক্ষমতা বিনা শর্তে রাষ্ট্রের শাসক রাজার হাতে চলিয়া গেল, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার অধিকার প্রজাদের রহিল না। রাজা চুক্তির বহির্ভূত রহিলেন, চুক্তির শর্ত পালনের জন্য তাঁহার কোন বাধ্যবাধকতা রহিল না। এই ভাবে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের (Absolute Monarchy) উৎপত্তি হইল।

লকের মতে "প্রাকৃতিক অবস্থায়" শান্তি, সাম্য ও স্বাধীনতা বিরাজ করিত।

মানুষের দুঃখ ছিল না, কিন্তু নিরাপত্তার অভাব ছিল—কারণ রাষ্ট্র না থাকায় শাসক ছিল না, একজনের অধিকার জোর করিয়া অপরে কাড়িয়া লইলে তাহার প্রতিকার পাওয়া যাইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ সামাজিক চুক্তি (Social Contract) দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপন করিল। রাষ্ট্র স্থাপনের পর আর একটি চুক্তি দ্বারা শাসনভার রাজাকে দেওয়া হইল। কিন্তু এই চুক্তি দ্বারা রাজাকে সীমাবদ্ধ অধিকার মাত্র দেওয়া হইয়াছিল; রাজা চুক্তি ভঙ্গ করিলে প্রজা তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে পারিত। চুক্তি সম্বন্ধে হব্‌সের মতের সঙ্গে লকের মতের পার্থক্য এইখানে। হব্‌সের একপক্ষীয় চুক্তি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ভিত্তি, লকের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি। লকের মতে সমাজে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের স্থান নাই, রাজা জনমতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া রাজ্যশাসন করিবেন এবং তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকিবে।

রুশো "প্রাকৃতিক অবস্থাকে" মর্ত্যের স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষ তখন পূর্ণ সাম্য, পূর্ণ শান্তি ও অপার আনন্দ ভোগ করিত। ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেই স্বাধীন ও আনন্দময় সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকারের ফলে সামাজিক সাম্য বিনষ্ট হইয়া মানুষের মধ্যে প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এই সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করিল। এই চুক্তিতে রাজার কোন স্থান নাই; জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা (General Will) রাষ্ট্রে চরম কর্তৃত্ব পরিচালনা করিবে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা সামাজিক সাম্য বিনষ্ট হইবে না। সরকার সাধারণ ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং রুশোর কল্পিত রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক।

হব্‌স্, লক্ ও রুশোর মধ্যে নানাবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও মূল একটি বিষয়ে তাঁহারা একমত; তিনজনই বলিয়াছেন যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু আদিম কালে কোন সময়ে মানুষ সামাজিক চুক্তি করিয়াছিল, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। অর্থাৎ চুক্তির কথাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এইরূপ কাল্পনিক মতবাদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে "প্রাকৃতিক অবস্থায়" মানুষ বহু অধিকার ভোগ করিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে অধিকার রক্ষার জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থা নাই তাহার অস্তিত্ব সম্ভব নয়, অর্থাৎ রাষ্ট্র না থাকিলে নাগরিকের অধিকার থাকে না। তৃতীয়ত, আদিম বন্য পরিবেশে মানুষ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিয়া চুক্তিবদ্ধ

হইল, ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন। রাজনৈতিক চেতনা এবং চুক্তি সম্পাদন সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন। এই সকল কারণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ আধুনিক মনীষিগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কাল্পনিক হইলেও গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই মতবাদের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। এই মতবাদের আঘাতে ইউরোপে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ বিলুপ্ত হইয়াছিল। লক্ ও রুশো বুঝাইলেন যে রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নহে, মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। রাজা ঈশ্বরের কাল্পনিক প্রতিনিধি রূপে স্বেচ্ছাচার করিতে পারেন না, প্রজার মঙ্গলের জন্য প্রজার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে রাজ্যশাসন করিতে হয়। রাষ্ট্রগঠনে ও রাষ্ট্রশাসনে প্রজার সম্মতি প্রয়োজন—ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান শিক্ষা। এই শিক্ষা ইউরোপে গণতন্ত্র স্থাপনের সহায়ক হইয়াছিল।

(৪) **পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories)**—এই দুইটি মতবাদের মর্ম এই যে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক পরিবার গঠনের ভিত্তি হইলেও উহা রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি নহে, রক্তসম্পর্কবিহীন বহু পরিবারের সম্মিলনে রাষ্ট্র গঠিত হয়। সুতরাং এই দুইটি মতবাদকে ঐতিহাসিক সত্য রূপে গ্রহণ করা যায় না।

যাঁহারা এই দুইটি মতবাদের মূলতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ পিতৃতন্ত্রবাদী ও মাতৃতন্ত্রবাদী। এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) **ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory)**—উপরে চারিটি মতবাদের আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলামঃ(১) রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নয়। (২) রাষ্ট্র পাশবিক বলের দ্বারা গঠিত নয়। (৩) সামাজিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। (৪) পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ক্রমশ প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের গঠন হয় নাই। তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল কিরূপে?

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঐতিহাসিক কারণে বা সমাজের বিবর্তনের ফলে গঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্র গঠন করেন নাই, মানুষও হঠাৎ একদিন একস্থানে সমবেত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করে নাই। মানুষের প্রয়োজনলিদ্ধির তাগিদে আদিম যুগের বিশৃঙ্খল, অপরিণত সমাজ

অবস্থার চাপে ক্রমশ সুসংবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। এই পরিণতি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের ইচ্ছায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে নাই, কয়েকটি বিশেষ উপাদানের সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে।

প্রথম উপাদান রক্তের সম্বন্ধ রূপ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়তা বোধ। এই আত্মীয়তা বোধকে কেন্দ্র করিয়া পরিবার, গোষ্ঠী ও উপজাতি গঠিত হইত। পরিবারই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ; পরিবারের মধ্যেই সর্বপ্রথম আদেশ দানের এবং আদেশ পালনের রীতি প্রবর্তিত হয়। পরিবারের সকল সভ্যই কর্তার আদেশ মানিয়া চলে। গোষ্ঠী এবং উপজাতি গঠিত হইলে ঠিক এইভাবে গোষ্ঠীপতি এবং দলপতির আদেশ পালিত হয়। পরে সংখ্যাবৃদ্ধি বশত উপজাতি জাতিতে প্রসারিত হয়। তখন রক্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করা কঠিন হয়, আত্মীয়তা বোধ শিথিল হইয়া পড়ে। ক্রমে সমাজে রাজনৈতিক বন্ধনের প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্রের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হয়।

দ্বিতীয় উপাদান ধর্ম। প্রাচীন কালে ধর্ম সমাজকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিত। যখন রক্তের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল তখনও ধর্ম সমাজকে ভাঙ্গনের পথে যাইতে দিল না। প্রাচীন সমাজে যৌথ ধর্মাচরণের প্রথা ছিল, পূর্বপুরুষ-পূজার রীতি ছিল। ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রবীণদের ও পুরোহিতদের শাসন-ক্ষমতা স্বীকার করা হইত। ইহাই ধর্মের সহিত রাষ্ট্রগঠনের যোগসূত্র।

তৃতীয় উপাদান যুদ্ধ। বর্তমান যুগের ন্যায় আদিম যুগেও আত্মরক্ষার জন্য সমাজ বা মনুষ্যসমষ্টিকে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইত। যুদ্ধে যে নেতৃত্ব করিত সমাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার কর্তৃত্ব স্থাপিত হইত। এইরূপে যুদ্ধ-নেতা রাজপদ অধিকার করিল, যুদ্ধের প্রয়োজনে রাষ্ট্র গঠিত হইল।

চতুর্থ উপাদান ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি। ইহা রক্ষার জন্য নূতন নূতন আইন রচনার প্রয়োজন হইল। ক্রমশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উৎপত্তি ও প্রসারের ফলে সামাজিক ব্যবস্থার জটিলতা বাড়িল, নানাবিধ সংঘর্ষ দেখা দিল। এই সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য শক্তিশালী সরকার (Government) গঠন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল। সরকার গঠিত হইলে রাষ্ট্রের গঠন সম্পূর্ণ হইল।

পঞ্চম উপাদান রাজনৈতিক চেতনা (Political Consciousness)। এই চেতনার উদ্ভব না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। রাষ্ট্র গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কতকগুলি আদর্শ বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করা। যেমন, প্রত্যেক মানুষকে তাহার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

যে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা এইরূপ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে তাহার ভিত্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রাষ্ট্র গঠনের প্রথম যুগে নাগরিকগণ এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল না। রাজার প্রতি অন্ধ আনুগত্য তখন রাষ্ট্রের প্রধান বন্ধন ছিল। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে যখন মানুষের রাজনৈতিক চেতনা জন্মিল তখন সে রাষ্ট্রকে আপন করিয়া লইল, রাষ্ট্রের মাধ্যমে জীবনের বৃহত্তম উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতে শিখিল। তখনই রাষ্ট্রের রূপ পূর্ণতা লাভ করিল।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদের সত্যতা বর্তমান যুগের মনীষিগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the State)—উপরে যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে না, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করে। তাই ইহাকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদও বলা যায়। এই মতবাদ অনুসারে শাসক শাসিতের নিকট হইতে শাসনাধিকার লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি শাসিতের উপর নির্ভরশীল থাকিবেন।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে **জৈব মতবাদ** (Organic Theory)* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদের সমর্থকগন জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রকে উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের সহিত তুলনা করা হয়, আর ব্যক্তিকে তুলনা করা হয় দেহের কোষের সহিত। কোষের সহিত জীব-দেহের যে সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সেই সম্বন্ধ। জীবদেহের মত রাষ্ট্রেরও সৃষ্টি, বৃদ্ধি এবং ক্ষয় আছে। জীবদেহের মত রাষ্ট্রেরও মস্তিষ্ক, স্নায়ু, হৃদয়, পেশী প্রভৃতি আছে। উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের জীবনীশক্তি, পরিবহন বিভাগ রাষ্ট্রের স্নায়ুমণ্ডলী, ইত্যাদি। এইভাবে উপমার সাহায্যে হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spenser) প্রভৃতি জৈব মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রকে জীবদেহের অনুরূপ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই মতবাদে কাল্পনিক সাদৃশ্যের উপর অনাবশ্যক জোর দেওয়া হয়, যুক্তির সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। জীবদেহের কোষগুলির ইচ্ছাশক্তি বা

* অনেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জৈব মতবাদের উল্লেখ করেন; কিন্তু এই মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন কারন নির্দেশ করে না, ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করে।

স্বাধীনভাবে কার্য করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু মানুষের তাহা আছে। সুতরাং মানুষের সহিত তাহাদের তুলনা অর্থহীন। কিন্তু একটি বিষয়ে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য। ইহা ইঙ্গিত করিতেছে যে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আর সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া এই মতবাদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের (Individualism) গতি রুদ্ধ করিয়াছিল।

প্রশ্ন

W hat are ·· ·hief elements ? (রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান কি . ক ?) [৯-১১ পৃষ্ঠা]

Explain the characteristics of the State and distinguish it from other associations. (রাষ্ট্রের লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা কর এবং অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্ঘ হইতে রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্দেশ কর।) [Higher Secondary Examination, 1961] [৯-১২ পৃষ্ঠা]

3. Define 'State'. Is West Bengal a State according to your definition ? Explain your answer. (রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। তোমার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র ? তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর।) [H. S. E., 1960] [৯-১১ পৃষ্ঠা]

4. Discuss briefly the main theories on the origin of the State. (রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধান মতবাদগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।) [১২-১৯ পৃষ্ঠা]

5. Explain and criticise the social contract theory about the origin of the State. (রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা এবং সমালোচনা কর।) [H. S. E., Compartmental, 1960] [১৫-১৭ পৃষ্ঠা]

6. What light do the Social Contract Theory and the Organic Theory throw on the character of the State ? (রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও জৈব মতবাদ কি বলে ? [১৭, ১৯-২০ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

সরকার (Government)

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)—রাষ্ট্রের চারিটি উপাদানের মধ্যে একটিকে বলা হইয়াছে সরকার। সাধারণ কথাবার্তায় অনেক সময় রাষ্ট্র ও সরকার একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আইনের দিক হইতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সরকার রাষ্ট্রের চারিটি উপাদানের মধ্যে একটি মাত্র। সুতরাং সরকার ও রাষ্ট্র এক হইতে পারে না।

রাষ্ট্রের সংগঠন হয় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সকল স্থায়ী অধিবাসী (অর্থাৎ নাগরিক) লইয়া, আর সরকারের সংগঠন হয় মাত্র অল্প কয়েকজন লোক লইয়া। সুতরাং রাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটি, কিন্তু ভারত সরকার গঠিত হইয়াছে কয়েকজন মন্ত্রী লইয়া এবং ভারতের পার্লামেণ্টে সভ্যের সংখ্যা কয়েকশত মাত্র। রাষ্ট্র শাসনের ভার যাঁহাদের উপরে তাঁহাদিগকে সম্মিলিতভাবে সরকার বলা হয়। রাষ্ট্রকে যদি জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয় তবে সরকারকে মস্তিষ্ক বলা যায়। মস্তিষ্ক যেমন দেহকে পরিচালনা করে সরকারও তেমনই রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে। আবার মস্তিষ্ক যেমন দেহের অংশ, সরকারও তেমনই রাষ্ট্রের অংশ। মস্তিষ্ক ও দেহ যেমন এক নয়, সরকার এবং রাষ্ট্রও তেমন এক নয়।

রাষ্ট্র চিরস্থায়ী, অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী তো বটেই; কিন্তু সরকার সাধারণত অল্পকাল স্থায়ী। ব্রিটেনে কিছুকাল পূর্বে শ্রমিক দলের মন্ত্রিসভা ছিল, এখন সেখানে রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিসভা রহিয়াছে। সরকারের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে ব্রিটেন অপরিবর্তিত আছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়া দেশে স্বৈরাচারী সম্রাটের (Czar) শাসন প্রচলিত ছিল। পরে সেখানে সাম্যবাদী দলের (Communist Party) শাসন প্রবর্তিত হয়। সরকারের এই অসাধারণ পরিবর্তন রাষ্ট্রকে পরিবর্তিত করে নাই। সরকার ও রাষ্ট্র এক হইলে একটির পরিবর্তনের ফলে অন্যটিরও পরিবর্তন ঘটিত।

সকল রাষ্ট্রেরই প্রকৃতি এক; সকল রাষ্ট্রই (ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার, সার্বভৌমিকতা, এই) চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত। কিন্তু সকল সরকারের প্রকৃতি এক নহে। দেশভেদে ও কালভেদে সরকারের রূপ বিভিন্ন হইতে পারে। কোন সরকার স্বেচ্ছাচারী, কোন সরকার গণতান্ত্রিক। কোন সরকারে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য, কোন সরকার বহুজনের সমষ্টি।

রাষ্ট্র একটি মনঃকল্পিত ধারণা (mental concept)। ইহার নিজস্ব ইচ্ছা বা কর্মশক্তি নাই। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নীতি প্রকাশিত হয় এবং কর্মপদ্ধতি রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং নাগরিকের কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়—সরকারের বিরুদ্ধে। তাই সরকার পরিবর্তনশীল, রাষ্ট্র স্থিতিশীল।

সরকারের বিভিন্ন রূপ (Forms of Government)—যে রাষ্ট্রে প্রকৃত শাসক মাত্র একজন (অর্থাৎ যেখানে শাসন-ক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত এবং যেখানে সরকার বলিতে মাত্র এক ব্যক্তিকে বুঝায়) সেখানে রাজতন্ত্র

(Monarchy) বা স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny) বা একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) প্রচলিত বলা যায়।

পূর্বে আমাদের দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সাধারণত রাজা উত্তরাধিকার-সূত্রে শাসন-ক্ষমতা লাভ করিতেন। রাজার ইচ্ছা অনুসারেই তখন শাসনকার্য পরিচালিত হইত। রাজার ইচ্ছার বিরোধিতা করার অধিকার কাহারও ছিল না। মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরা সকল বিষয়েই রাজার হুকুম তামিল করিতেন। প্রজারা রাজাকে অভাব-অভিযোগ জানাইতে পারিত, কিন্তু শাসনকার্যে ও আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণের অধিকার তাহাদের ছিল না। রাজা যদি অশোক বা আকবরের মত প্রজাহিতৈষী সুশাসক হইতেন তবে দেশের লোক সুখে থাকিত। রাজা যদি দুর্বল বা অত্যাচারী হইতেন তবে তাহাদের দুঃখকষ্টের সীমা থাকিত না। ইউরোপের নানা দেশে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র" ("I am the State"—অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতা আমার হস্তে রহিয়াছে)।

এইরূপ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এখন পৃথিবীর কোন দেশে প্রচলিত নাই। মাত্র কয়েকটি দেশে এখন রাজা আছেন। তাঁহারা প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মত অনুসারে মন্ত্রীদের মারফৎ দেশ শাসন করেন, নিজেদের ইচ্ছামত কোন কাজ করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের কথা বলা যাইতে পারে। সেখানে রাণী এলিজাবেথের নামে পার্লামেণ্টের মত অনুসারে মন্ত্রীরা রাজ্যশাসন করেন। এইরূপ রাজতন্ত্রকে বলা যায় সঙ্কুচিত রাজতন্ত্র (Limited Monarchy) বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)। নামে রাজতন্ত্র হইলেও কার্যত রাজা বা রাণী শাসক নহেন, তাঁহারা গণতন্ত্রের প্রতিভূ।

কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসক মাত্র একজন, অথচ তিনি নামে রাজা নহেন। প্রাচীন গ্রীসে এইরূপ শাসককে বলা হইত Tyrant অর্থাৎ বে-আইনী শাসক। বে-আইনী শাসক যে সকল ক্ষেত্রেই অত্যাচারী ছিলেন তাহা নহে। বর্তমান যুগে এইরূপ একক শাসককে বলা হয় Dictator অর্থাৎ (স্বেচ্ছাচারী) নায়ক। সাধারণত স্বেচ্ছাচারী নায়ক কোন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্ররূপে ঐ দলের সাহায্যে শাসন-ক্ষমতা অধিকার ও রক্ষা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত নাৎসী (Nazi) দল কর্তৃক সমর্থিত হিট্‌লার জার্মানীর (স্বেচ্ছাচারী) নায়ক ছিলেন। ফ্যাসিস্ত (Fascist) দলের সহায়তায় মুসোলিনী ইটালীর সর্বময় শাসক হইয়াছিলেন, যদিও ইটালীতে নামে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। স্পেনের বর্তমান শাসক

জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে এই শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছেন। একনায়কতন্ত্রে জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার নষ্ট হয়।

যে রাষ্ট্রে শাসন-ক্ষমতা অল্প কয়েকজন ব্যক্তির হস্তগত সেখানে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) বা গোষ্ঠীতন্ত্র (Oligarchy) প্রচলিত বলা যায়। সাধারণত অভিজাততন্ত্র বলিতে জ্ঞানী ও গুনীদের শাসন এবং গোষ্ঠীতন্ত্র বলিতে স্বার্থপর দল-বিশেষের শাসন বুঝা যায়। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের স্পার্টা প্রভৃতি কোন কোন নগর-রাষ্ট্রে এবং পরে ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস নগর-রাষ্ট্রে অল্প কয়েকজন ব্যক্তির শাসন প্রচলিত ছিল। এখন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে অভিজাততন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রচলিত নাই।

যে রাষ্ট্রে শাসন-ক্ষমতা জনসাধারণের (অর্থাৎ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের) হস্তগত সেখানে গণতন্ত্র (Democracy) প্রচলিত বলা যায়। "গণ" শব্দের অর্থ জনসাধারণ। সুতরাং গণ তন্ত্র বলিতে বুঝিতে হইবে জনসাধারণ কর্তৃক পরিচলিত শাসন-ব্যবস্থা। এখন পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র প্রচলিত। আমাদের ভারতও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

যখন একজন মানুষ লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি মানুষকে শাসন করে তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—কেন এত মানুষ একজন মানুষের শাসন মানিবে? প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও স্বার্থ রহিয়াছে। একজন মানুষ কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছা পূরণ করিবে কিরূপে? প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। কোটি কোটি মানুষের ব্যক্তিত্ব একজন মানুষের ইচ্ছার কাছে নত হইবে কেন?

অভিজাততন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। কেন কোটি কোটি মানুষ পাঁচ, সাত বা দশ জন মানুষের শাসন মানিবে? পাঁচ, সাত বা দশ জন মানুষ কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছা ও স্বার্থ পূরণ করিবে কিরূপে? কোটি কোটি মানুষের ব্যক্তিত্ব পাঁচ, সাত বা দশ জন মানুষের ইচ্ছার কাছে নত হইবে কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে রাজতন্ত্র (বা স্বৈরাচারতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র) এবং অভিজাততন্ত্র (বা গোষ্ঠীতন্ত্র) আদর্শ শাসন-পদ্ধতি নয়। যে পদ্ধতিতে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহাই আদর্শ হওয়া উচিত। একমাত্র গণতন্ত্রেই তাহা সম্ভব। তাই গণতন্ত্র বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ শাসন-পদ্ধতি রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

গণতন্ত্র (Democracy)—গণতন্ত্রকে বলা হইয়াছে জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন (Government of the people, by the people, and for the people)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক আব্রাহাম লিঙ্কনের (Abraham Lincoln) এই উক্তিটির মর্ম বুঝিতে পারিলেই গণতন্ত্রের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইবে।

গণতন্ত্র হইতেছে জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন—একজনের শাসন নয়, অল্প কয়েকজনের শাসন নয়, সমগ্র জনসমষ্টির শাসন। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা ও স্বার্থ শাসনযন্ত্রে প্রতিফলিত হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এখানে স্বীকৃত হইতে পারে। মানুষকে শাসক ও শাসিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিবার চেষ্টা গণতন্ত্রে নাই। প্রত্যেক মানুষই শাসক, আবার প্রত্যেক মানুষই শাসিত—ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা। প্রত্যেক মানুষই শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকারী, কাহাকেও সম্পূর্ণভাবে পরের শাসন মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায় না—এই মৌলিক ধারণার উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত (অবশ্য মানুষ বলিতে এখানে নাগরিক বুঝিতে হইবে, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বিদেশীর শাসন-কার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার নাই)।

গণতন্ত্র হইতেছে জনগণের জন্য শাসন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনের উদ্দেশ্য সমগ্র জনসমষ্টির মঙ্গল সাধন, কেবলমাত্র এক শ্রেণীর লোকের মঙ্গল সাধন নহে। রাজতন্ত্রে (বা স্বৈরাচারতন্ত্রে বা একনায়কতন্ত্রে) এবং অভিজাততন্ত্রে (বা গোষ্ঠীতন্ত্রে) অনেক সময় শাসনযন্ত্র এমনভাবে পরিচালিত হয় যে ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থসিদ্ধি ঘটে, অথচ বেশীর ভাগ লোকের অনিষ্ট হয়। যাঁহারা শাসক তাঁহারা প্রথমেই নিজেদের এবং নিজেদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থরক্ষা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু গণতন্ত্রে সমগ্র জনসমষ্টিই শাসক। সুতরাং গণতন্ত্রে সমগ্র জনসমষ্টির স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইবে, ইহাতে অল্প কয়েকজনের স্বার্থে বহু লোকের ক্ষতি করা হইবে না। জনগণের শাসনে জনগণের কল্যাণ হইবে।

পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy)—উপরে বলা হইয়াছে, গণতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষই (অর্থাৎ নাগরিকই) শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকারী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ভারতে ৩৬ কোটি লোক আছে। যাহাদের ভোট দিবার অধিকার আছে তাহাদের সংখ্যা ১৮ কোটির বেশী। এত মানুষ কিভাবে দেশের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে?

পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে রাষ্ট্রের আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র

ছিল, তাই নাগরিকের সংখ্যাও ছিল খুব কম। তখন প্রত্যেক নাগরিকই প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। এই শাসন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) নামে পরিচিত, কারণ নাগরিকেরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে যোগদান করিতে পারিত। এথেন্স নগরে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলি আকারে বৃহৎ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে কোটি কোটি লোকের বাস। সকলের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ প্রত্যেক নাগরিককে এই অধিকার না দিলে সেই শাসন-পদ্ধতিকে গণতন্ত্র বলা চলে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য গণতন্ত্রের একটি নূতন রূপ প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার নাম পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy)। পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ নিজের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে) শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। আবার যে-কোন নাগরিক ইচ্ছা করিলে এবং জনমতের সমর্থন পাইলে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে যোগদান করিতে পারে। সুতরাং পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষের শাসনকার্যে যোগদান করিবার এবং শাসনতন্ত্র প্রভাবিত করিবার অধিকার ও সুযোগ থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ভারতে যাহাদের ভোট দিবার অধিকার আছে তাহাদের সংখ্যা ১৮ কোটির বেশী। ইহারাই শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকারী। ভোটের অধিকার দ্বারাই শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার সূচিত হয়। সুতরাং ভোটই ঐ অধিকারের সুস্পষ্ট প্রতীক বা চিহ্ন। যাহার শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার নাই তাহার ভোট নাই। যেমন, বিদেশীদের ভোট নাই; যে ব্যক্তি নাবালক বা উন্মাদ বা দেউলিয়া তাহার ভোট নাই; ইত্যাদি।

যাহাদের ভোট আছে তাহারা ভোট দ্বারা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা আইনসভার সভ্য হন এবং তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারেই দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। যে মন্ত্রীরা শাসনকার্য নির্বাহ করেন তাঁহারা সাধারণত আইনসভার সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা সকল বিষয়েই আইনসভার কর্তৃত্বাধীন থাকেন। আইনসভার অধিকাংশ সভ্য ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদিগকে পদচ্যুত করিয়া নূতন মন্ত্রী নিয়োগের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। যে সকল আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালিত হয় তাহা আইনসভার সভ্যেরাই অনুমোদন করেন। তাঁহাদের মত অনুসারেই মন্ত্রীরা কর স্থাপন করেন। সুতরাং দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয় আইনসভার সভ্যদের ইচ্ছা অনুসারে।

আইনসভার সভ্যেরা ভোটদাতাদের প্রতিনিধি, সুতরাং সাধারণত ভোটদাতাদের ইচ্ছা অনুসারেই তাঁহারা কাজ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভোটদাতাদের ইচ্ছা অনুসারেই শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয়। আইনসভার কোন সভ্য ভোটদাতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলে ভোটদাতারা পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহাকে আর ভোট না দিতে পারে। এই ভয়ে সাধারণত আইনসভার কোন সভ্য ভোটদাতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আইনসভার সভ্যেরা মন্ত্রীদিগকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আর ভোটদাতারা (অর্থাৎ জনসাধারণ) আইনসভার সভ্যদিগকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ভোটদাতারা অর্থাৎ জনসাধারণই পরোক্ষ ভাবে দেশ শাসন করে। মন্ত্রীদের এবং আইনসভার সভ্যদের নীতিতে ও কার্যে জনসাধারণের ইচ্ছা ও স্বার্থ প্রতিফলিত হয়।

ইহা ছাড়া পরোক্ষ গণতন্ত্রেও যে-কোন নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে যোগদান করা সম্ভব। যে-কোন নাগরিক ভোটদাতাদের সমর্থন পাইলে আইনসভার সভ্য হইতে পারেন। যে-কোন নাগরিক আইনসভার সভ্য হইয়া আইনসভার অন্যান্য সভ্যের সমর্থন পাইলে মন্ত্রী হইতে পারেন। যে-কোন নাগরিক রাষ্ট্রপতি (President) বা সহ-রাষ্ট্রপতি (Vice-President) নির্বাচিত হইতে পারেন। যে-কোন নাগরিক রাজ্যপাল (Governor) নিযুক্ত হইতে পারেন। দেশবাসীর আস্থা-ভাজন হইলে এবং যোগ্যতা থাকিলে যে-কোন নাগরিক যে-কোন পদ অধিকার করিতে পারেন। কোন পদই ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের জন্য সংরক্ষিত নহে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার।

অনেক সময় আইনসভার সভ্যেরা একই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তখন বেশীর ভাগ সভ্যের মত অনুসারে কাজ হয়। আইনসভার বেশীর ভাগ সভ্য দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের প্রতিনিধি। সুতরাং কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে পরোক্ষভাবে দেশের বেশীর ভাগ লোকের মত অনুসারে কাজ হয়। পরোক্ষ গণতন্ত্র অর্থে কার্যত জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শাসন বুঝিতে হইবে।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)—গণতন্ত্রে জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে, একনায়কতন্ত্রে ইহা বিনষ্ট হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, একনায়কতন্ত্রের অর্থ এক ব্যক্তির শাসন। সেই ব্যক্তিই রাষ্ট্রের কর্তা, সকল বিষয়ে চরম ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত। কোন একটি বিশেষ

রাজনৈতিক দলের নেতা ও মুখপাত্ররূপে ব্যক্তিবিশেষ শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নানাবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে রাশিয়া, ইটালী, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি দেশে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট (Communist) দলের নেতা লেনিন ও স্ট্যালিন, ইটালীতে ফ্যাসিস্ত (Fascist) দলের নেতা মুসোলিনী, জার্মানীতে নাৎসী (Nazi) দলের নেতা হিটলার একনায়কতন্ত্র প্রবর্তন করেন।

একনায়কতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্রের খানিকটা আভাস আছে, কারণ যে রাজনৈতিক দলের সাহায্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার প্রতি দেশবাসীর অন্তত আংশিক সমর্থন থাকে। অবশ্য অনেক সময় কৌশলে বা ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা এই সমর্থন আদায় করা হয়। সাধারণত বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ বা কুশাসনের ফলে জনসাধারণের দুর্দশা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে।

"এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নায়ক" (One Nation, one State, one Leader")—এই নীতি একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি। রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি ও অধিকার কেন্দ্রীভূত করিয়া রাষ্ট্রনায়কের হস্তে সমর্পিত হয়। সেই নায়কের বিরোধিতা করার অর্থ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা। রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্নরূপে কল্পিত হয় এবং তদনুসারে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাধিষ্ঠিত দলের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয়; নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রক্ষা করিয়াও ক্ষমতাধিষ্ঠিত দলের বিরোধিতা করিতে পারে।

একনায়কতন্ত্রের সমর্থকগণ সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রে (Totalitarian State) বিশ্বাস করে। নাগরিকগণের জীবনের সমস্ত ব্যাপার রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয় না। নাগরিকের ইচ্ছার সহিত রাষ্ট্রের নির্দেশের অসামঞ্জস্য ঘটিলে নাগরিক নির্বিচারে ও বিনা প্রতিবাদে রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিতে বাধ্য থাকেন। সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে নাগরিকের জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিকে বলি দিতে সরকার কখনও কুণ্ঠিত হয় না। এইখানেই একনায়কতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য। গণতন্ত্র ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করে, প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ পায় সেইভাবে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে, নাগরিককে যন্ত্রের পর্যায়ে নামাইয়া রাষ্ট্রের দাসত্বে নিযুক্ত রাখে না।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে পরস্পরবিরোধী মতের যথাসম্ভব সমন্বয় সাধন করিয়া শাসনকার্য পরিচালিত হয়, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে বিরোধী দল ও বিরোধী মত সবলে

দমন করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় দল শাসন-ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একটিমাত্র দল থাকে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার স্থান থাকে না। হিটলারের আমলে জার্মানীতে একমাত্র নাৎসী দল ছিল, বর্তমানে রাশিয়ায় একমাত্র কমিউনিস্ট দল আছে। গণতন্ত্রকে "আলোচনা দ্বারা শাসনকার্য" ("government by discussion") বলা হইয়াছে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আলোচনার স্থান নাই, বিভিন্ন দলের পরস্পর-বিরোধী কর্মনীতি নাই; এক দলের এবং এক নায়কের নির্দেশ নির্বিচারে সকলকেই পালন করিতে হইবে। এখানে যুক্তির স্থান নাই, ভোটের অর্থ নাই; বলপ্রয়োগে কার্য সম্পাদন ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই সকল মৌলিক ত্রুটি সত্ত্বেও একনায়কতন্ত্রের কিছু কিছু গুণ আছে। শক্তিশালী নেতার দ্বারা পরিচালিত একনায়কতন্ত্র জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করিতে পারে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহু সমস্যার আশু সমাধান করিতে পারে। গণতন্ত্র ধীরে ধীরে কাজ করে, একনায়কতন্ত্র তড়িৎগতিতে চলে। হিটলার কয়েক বৎসরের মধ্যে জার্মানীর বহু জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। মুসোলিনীর শাসনে ইটালী শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। জার্মানীতে ও ইটালীতে গণতন্ত্র যাহা করিতে পারে নাই একনায়কতন্ত্র তাহা করিয়াছিল। শক্তি ও সমৃদ্ধির মাপকাঠিতে বিচার করিলে স্ট্যালিনের নায়কত্বে রাশিয়ার একনায়কতন্ত্র অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy)—উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে গণতন্ত্রের কয়েকটি প্রধান গুণ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমান জগতের পরোক্ষ গণতন্ত্রে শাসকগণ জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত এবং জনসাধারণের নিকট নিজ নিজ কার্যের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য। সুতরাং শাসকগণ সর্বদা সতর্কভাবে জনমত অনুযায়ী কাজ করেন। গণতন্ত্রে জনকল্যাণই শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য, শাসকগণ জনসেবাক্ষেত্রে জনসাধারণের ভৃত্য মাত্র। অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় জনকল্যাণ সাধনের এরূপ সুযোগ ও বন্দোবস্ত থাকে না।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক সমাজ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; এখানে মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং জাতিতে জাতিতে কোন ভেদ স্বীকার করা হয় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির বা কোন শ্রেণীর সম্পত্তি নয়; এখানে প্রত্যেকেরই শাসন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার আছে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদানের ও শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং অধিকার থাকে। এই অধিকার পরিচালনার ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার ব্যাপক প্রসার হয়। এখানে প্রত্যেক নাগরিক আত্মশাসনের শিক্ষা লাভ করে, ফলে সমগ্র সমাজ আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া গণতন্ত্রে মানুষের দেশপ্রীতি গভীর হয়, দেশের কাজকে সকলে নিজের কাজ বলি মনে করিতে শিখে।

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আকস্মিক বিপ্লবের ভয় থাকে না বলিলেই চলে। সেখানে শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণের কর্তৃত্বাধীন, সেখানে সকলেরই সমান অধিকার, সেখানে বলপ্রয়োগ দ্বারা এক সরকারের পরিবর্তে অন্য সরকার স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। একনায়কতন্ত্রে বিপ্লবের সম্ভাবনা অনেক বেশী।

এই সকল কারণে বর্তমান যুগে গণতন্ত্র পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে আমাদের দেশে ইংরেজ-শাসন বিলুপ্ত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

গণতন্ত্রের ত্রুটি (Defects of Democracy)—গণতন্ত্রের যতই গুণ থাকুক না কেন, ইহার কিছু কিছু ত্রুটিও আছে। কোন কোন প্রাচীন লেখকের মতে গণতন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসন, সুতরাং ইহা দেশে শান্তিরক্ষা করিতে ও সভ্যতার উন্নতি করিতে পারে না। বর্তমান যুগে উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ সাধারণভাবে টিকিতে পারে না, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাও সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা এখনও সত্য যে গণতন্ত্রে গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। ভোটের হিসাবে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও মূর্খ চাষীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যেক দেশেই অপেক্ষাকৃত মূর্খ ও দুর্বলচিত্ত লোকের সংখ্যা জ্ঞানী ও দৃঢ়চিত্ত লোকের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে রাজ্যশাসনের ফলে অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। "গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ ও সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য লোকের শাসন-ব্যবস্থা, কারণ ঐ শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় সর্বাধিক।" ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় অনেক সময় দূরদর্শিতা ও কর্মকুশলতার অভাব দেখা যায়। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যাগুলি এত জটিল যে সকল ক্ষেত্রে "সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ ও সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য লোকের শাসন-ব্যবস্থা" উহাদের সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে না।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে ইহা অমিতব্যয় এবং অপচয়ের পক্ষে অনুকূল। জনসাধারণের অর্থ যাহাতে সাবধানে ও সঙ্গত কারণে ব্যয় করা হয় সেদিকে নির্বাচিত শাসকদের তেমন দৃষ্টি থাকে না, বরঞ্চ জনসেবার অজুহাতে ব্যয়বাহুল্য করিয়া তাঁহারা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা করেন। অজ্ঞ জনসাধারণ এইরূপ ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। তাহা ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় হয়। অনেকে ইহাকে অপব্যয় রূপে গণ্য করেন।

গণতন্ত্র বহু লোকের সম্মিলিত শাসন, সুতরাং এখানে শাসনযন্ত্র ধীর গতিতে চলে। কোন আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে গণতন্ত্র তাড়াতাড়ি কার্যকরী ব্যবস্থা চালু করিতে পারে না, নানারকম মত ও দলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিপদ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এই অসুবিধা নাই। সেখানে কর্তৃত্বভার একজনের উপর ন্যস্ত, তিনি প্রয়োজনমত যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তনশীল, ভোটদাতাগণের এবং আইনসভার মত পরিবর্তনের ফলে অল্পকাল পর পর সরকার পরিবর্তন হয়। ফ্রান্সে মন্ত্রিসভাগুলি গড়ে এক বৎসরও স্থায়ী হয় না। এইরূপ পরিবর্তনশীল সরকারের পক্ষে দীর্ঘ-মেয়াদী জনহিতকর নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন সরকার কর্তৃক অল্প সময়ের ব্যবধানে নীতি পরিবর্তনের ফলে জনহিতকর কার্যের বিঘ্ন ঘটে।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সাম্য থাকে—প্রত্যেক নাগরিকের এক ভোট, প্রত্যেক নাগরিকই শাসনকার্যে অংশগ্রহণের অধিকারী। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে রাজনৈতিক সাম্য অনেকটা অর্থহীন হইয়া পড়ে। যে চাষী জীবিকা অর্জনের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সময় ও সুযোগ পাইবে কোথায়? তাহার রাজনৈতিক অধিকার আইনে স্বীকৃত হইলেও কার্যক্ষেত্রে অবাস্তব হইয়া যায়। এজন্য আজকাল সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যথাসম্ভব অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইতেছে।

গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতির সহায়ক নহে। পূর্বে রাজগণ এবং অভিজাত সম্প্রদায় শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহাদের আর্থিক সাহায্যে জীবনধারণের দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত থাকিয়া গুণীরা নিশ্চিন্তে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইরূপ ব্যবস্থা সাধারণত থাকে না। কারণ যে জনসাধারণ গণতন্ত্রকে পরিচালনা করে তাহাদের নিকট শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের

তেমন কোন মূল্য নাই। ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিভার বিকাশ রুদ্ধ হয়, সভ্যতার উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হয়। একথা মোটামুটি সত্য হইলেও মনে রাখিতে হইবে প্রাচীন গ্রীসে গণতান্ত্রিক এথেন্সে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির যথেষ্ট সমাদর ছিল। বর্তমান কালেও কোন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (যেমন, ভারতবর্ষ) শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান (Conditions of success of democracy)—গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির সাফল্য প্রধানত জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও দায়িত্ববোধের উপর নির্ভর করে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য তিনটি প্রধান উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত, জনসাধারণ দেশের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের জন্য ইচ্ছুক এবং ঐ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হইবে। বাহির হইতে গণতন্ত্র চাপাইয়া দিলে চলিবে না, জনসাধারণের ইচ্ছা ও রাজনৈতিক সামর্থ্যের সহিত ইহার যোগ থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিবে, নতুবা গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহ প্রবল হইয়া গণতন্ত্র বিনষ্ট করিতে পারে। তৃতীয়ত, জনসাধারণ সর্বদা রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। অধিকারবোধের সঙ্গে দায়িত্ববোধের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা চাই। এই সকল উপাদান যে দেশে নাই সেখানে গণতন্ত্রের সাফল্য সুদূরপরাহত। এই সকল উপাদানের অভাবে ইটালী, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary Government)—যে রাষ্ট্রে সমস্ত শাসন-ক্ষমতা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী একটিমাত্র কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকে তাহাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State) বলে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। ইংরেজ শাসনকালে ভারতবর্ষেও এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থায় সমগ্র দেশে একটিমাত্র সরকার (Government) থাকে, উহাই শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই সরকার ইচ্ছা করিলে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে কয়েকটি অংশে বিভাগ করিতে পারে এবং প্রত্যেকটি অংশের কার্য পরিচালনার জন্য পৃথক সরকার স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু এই স্থানীয় সরকারগুলির (Local Government) গঠন ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সরকারগুলির ক্ষমতা কেন্দ্রের অনুগ্রহে প্রাপ্ত, কেন্দ্র হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের কোন ক্ষমতা নাই। কেন্দ্র ইচ্ছা

করিলে ইহাদের যে কোন ক্ষমতা যে কোন সময়ে কাড়িয়া লইতে পারে। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আইনের ভিত্তিতে ক্ষমতার বিভাগ নাই, সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুন এই যে একই আইন ও শাসননীতি সমগ্র দেশে প্রচলিত থাকে, ফলে দেশের ঐক্য সুদৃঢ় হয়। শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সরল ও অল্পব্যয়সাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না। তাহা ছাড়া দেশে জরুরী অবস্থার (emergency) উদ্ভব হইলে সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে, স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের মতামতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না।

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় লোকের স্বায়ত্ত শাসনের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয় না, স্থানীয় সরকার থাকিলেও তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে জনসাধারণের সহিত সরকারের যোগ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। ইহাতে গণতন্ত্রের মূল নীতি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। বৃহৎ দেশে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবন পূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ পায় না। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার সকল সময় যথাযোগ্য মনোযোগ দিতে পারে না। ইহাতে শাসনকার্যে ত্রুটি ঘটে, দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal Government)—যে রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে যুক্তরাষ্ট্র (Federal State) বলে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র (Centre) এবং অংশ (Unit)—উভয়ই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট ও পৃথক ক্ষমতা ভোগ করে। অংশগুলিকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হয় সেগুলি তাহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র; কেন্দ্র কখনও সেগুলিকে কাড়িয়া লইতে বা সঙ্কুচিত করিতে পারে না। কেন্দ্রের ক্ষমতা যেমন শাসনতন্ত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ, অংশগুলির ক্ষমতাও তেমনই শাসনতন্ত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই ব্যবস্থায় দেশে পাশাপাশি দুইটি সরকার থাকে, ইহারা প্রত্যেকেই শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করে; উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ থাকিলেও কেহ কাহারও অধীন হয় না। এখানেই এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ভারতবর্ষ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া,

সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে বর্তমানে প্রচলিত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের অংশ-সমূহকে রাজ্য (State) বা প্রদেশ (Province) বলে। পশ্চিমবঙ্গ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। নিউ ইয়র্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। কানাডার অংশগুলিকে প্রদেশ বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে ইহা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বার্থ স্বীকার করে এবং তাহাদের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়। যে দেশ আকারে বৃহৎ, অথবা যে দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বাস, সেই দেশের পক্ষে এই শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক স্বার্থ সুরক্ষিত হয়, রাজ্য সরকার আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার বন্দোবস্ত করে। ইহা জাতীয় ঐক্যের উপর জোর দেয়, কিন্তু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যকে অস্বীকার করে না।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের সহিত সরকারের—বিশেষত রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। ফলে গণতন্ত্রের মূলনীতি, অর্থাৎ জনসাধারণের সহিত সরকারের সংযোগ, প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয়। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় শাসনকার্যের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া মৌলিক জাতীয় স্বার্থরক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারে। স্থানীয় স্বার্থরক্ষার জন্য রাজ্যসরকার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে। ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিভাগের ফলে জাতীয় ও স্থানীয় স্বার্থ—উভয়ই সুরক্ষিত হয়।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি আছে। প্রথমত, শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত হওয়ার ফলে জাতীয় শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, কিন্তু স্থানীয় সরকারগুলির পরিপূর্ণ সহযোগিতা না পাইলে এই দায়িত্ব পালন করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পাট রপ্তানি সম্বন্ধে ব্রিটেনের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল, কিন্তু যে রাজ্যে পাট উৎপন্ন হয় সেই রাজ্যের সরকার এই চুক্তির সর্ত অনুমোদন না করিয়া নানাভাবে পাট রপ্তানিতে বাধা দিতে লাগিল। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে চুক্তির সর্ত পালন কঠিন হইয়া পড়িবে। দেশে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে অথবা দেশ যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িলে এই ত্রুটি মারাত্মক হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে স্ব স্ব

অধিকার সম্বন্ধে বিরোধ—এমন কি, সংঘর্ষ—হইতে পারে। সংবিধান উভয়ের অধিকারের সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দেয় বটে, কিন্তু সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও মতভেদ হইতে পারে। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court বা Supreme Court) যে ব্যাখ্যা করে তাহা কেন্দ্র ও রাষ্ট্র মানিয়া লইতে বাধ্য ; কিন্তু স্বার্থের সংঘাত প্রবল হইলে আইনের পরিবর্তে বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণও অসম্ভব নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের রাজ্যগুলির মধ্যে গৃহযুদ্ধ (Civil War) হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল ও ব্যয়বহুল। দেশে দুই শ্রেণীর আইন প্রচলিত থাকে—কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও রাজ্য সরকারের আইন। পাশাপাশি অবস্থিত দুই রাজ্যের সরকার একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী আইন প্রচলন করিতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের সহিত কোন রাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের বিরোধ ঘটিতে পারে। ইহাতে নাগরিকদের পক্ষে নানাবিধ জটিলতা দেখা দেয়। এইসকল জটিলতার সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Court বা Supreme Court) স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া দুই শ্রেণীর আইন-সভা (কেন্দ্রের ও রাজ্যের) ও সরকারী কর্মচারী পোষণের জন্য নাগরিকদের করভার বৃদ্ধি পায়।

পার্লামেণ্টীয় সরকার (Parliamentary Government)—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের (Government) দুইটি প্রধান রূপ থাকিতে পারে—পার্লামেণ্টীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার।

যেখানে শাসনকার্য আইন-সভার প্রতি দায়িত্বশীল (responsible to the Legislature) মন্ত্রি-পরিষদ (Cabinet) দ্বারা পরিচালিত হয় সেখানে পার্লামেণ্টীয় সরকার বর্তমান আছে বলা যায়। এখানে রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি (President) স্বয়ং শাসনকার্য পরিচালনা করেন না, মন্ত্রিগণই দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা। আইন-সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে রাজা বা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিগণকে মনোনীত করেন। তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর (Prime Minister) নেতৃত্বাধীনে মন্ত্রি-পরিষদ (Cabinet) গঠন করেন। মন্ত্রি-পরিষদ শাসনকার্য সম্বন্ধীয় নীতি নির্ধারণ করে। সেই নীতি অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রী শাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করেন। প্রত্যেকটি কার্য এবং নীতির জন্য মন্ত্রিগণ যুক্তভাবে (collectively) আইন-সভার নিকট দায়ী (responsible) থাকেন। যতদিন আইন-সভা তাঁহাদের কার্যাবলী ও নীতি অনুমোদন করে ততদিন তাঁহারা

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন ; কিন্তু আইন-সভা তাঁহাদের কোন কার্য বা নীতি অনুমোদন না করিলে তাঁহারা পদত্যাগ করেন। তখন রাজা বা রাষ্ট্রপতি আইন-সভার বিশ্বাসভাজন অপর মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই শাসন-ব্যবস্থায় আইন-সভা বা পার্লামেন্টের প্রাধান্য, কারণ যে মন্ত্রীরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারা পার্লামেন্টের মত অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য থাকেন। ইহাই পার্লামেণ্টীয় সরকারের বিশেষত্ব। ইহাকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা যায়, কারণ মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। আবার ইহাকে মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারও (Cabinet Government) বলা যায়, কারণ ইহাতে মন্ত্রিগণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা থাকে ; মন্ত্রিগণ যে রাজনৈতিক দলভুক্ত, পার্লামেন্টে সেই রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা (majority) থাকায় পার্লামেণ্ট পরোক্ষভাবে মন্ত্রিগণের নেতৃত্বাধীন থাকে। ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টীয় সরকার বর্তমান।

পার্লামেণ্টীয় সরকারে শাসন-ব্যবস্থা ও আইন-বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে (কারণ আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃগণ মন্ত্রীর পদ অধিকার এবং শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন); সুতরাং শাসনকার্য সুপরিচালিত হয়, আইন-সভা এবং শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সম্ভাবনা খুব কম থাকে। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিগণ সকল বিষয়ে আইন-সভার নিকট দায়ী থাকায় শাসন বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। আইন-সভা মন্ত্রীদের কর্ম ও নীতির সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে অনাস্থা প্রস্তাব (no-confidence motion) দ্বারা অত্যাচারী বা অকর্মণ্য মন্ত্রি-পরিষদকে পদচ্যুত করিতে পারে। এইরূপে আইন-সভার মাধ্যমে জনমত শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু পার্লামেণ্টীয় সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি আছে। প্রথমত, ইহাতে সমগ্র দেশের স্বার্থের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থ প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। আইন-সভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতৃগণই মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। মন্ত্রী রূপে যে ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তগত হয় তাহা দেশের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োগ না করিয়া দলের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহারা ব্যবহার করিতে পারেন। এইভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করিলেও তাঁহাদের পদচ্যুতির ভয় থাকে না, কারণ আইন-সভায় তাঁহাদের দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ—সেখানে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদিত হইবার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, পার্লামেণ্টীয় সরকার যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় দেশ-শাসনের বিশেষ উপযোগী নয়। একটিমাত্র রাজনৈতিক

দল হইতে নির্বাচিত মন্ত্রিগণ দেশের সকল শ্রেণীর লোকের আস্থাভাজন না-ও হইতে পারেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশবাসীর অকুণ্ঠ আস্থা ও সহযোগিতা না পাইলে মন্ত্রীরা যুদ্ধ পরিচালনায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। আবার মন্ত্রি-পরিষদে ২০।২৫ জন মন্ত্রী থাকেন। আলাপ-আলোচনার দ্বারা সকলের (বা অধিকাংশের) সম্মতি লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। শান্তির সময়ে ইহা সম্ভব হইলেও যুদ্ধের সময়ে ইহাতে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে।

এই সকল কারণে যুদ্ধকালে পার্লামেণ্টীয় সরকারের সাধারণত দুইটি পরিবর্তন ঘটে। প্রথমত, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার সাময়িকভাবে ত্যাগ করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃগণকে লইয়া সম্মিলিত মন্ত্রি-পরিষদ (Coalition Cabinet) গঠিত হয়। এইরূপ মন্ত্রি-পরিষদ দেশের সকল শ্রেণীর লোকের আস্থাভাজন হয়। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য-সংখ্যা কমাইয়া ৪।৫ জন মন্ত্রী দ্বারা যুদ্ধ-মন্ত্রি-পরিষদ (War Cabinet) গঠন করা হয়। এই ক্ষুদ্র পরিষদ আলাপ-আলোচনায় বেশী সময় নষ্ট না করিয়া তাড়াতাড়ি যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডে এই দুইটি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। ফলে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টীয় সরকার যুদ্ধ পরিচালনায় যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছিল।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Preisdntial Govern ment)—শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিলে তাহাকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বলা যায়। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি আছেন, কিন্তু এখানে শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব মন্ত্রি-পরিষদের হাতে। সুতরাং আমাদের সরকারকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বলা যায় না, ইহা পার্লামেণ্টীয় সরকার। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে। তিনি আইন-সভার নিকট দায়ী নহেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট দায়ী,আইন-সভার নিকট দায়ী নহেন (এখানেইপার্লামেণ্টীয় সরকারের সহিত রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান পার্থক্য)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বর্তমান।

রাষ্ট্রপতি স্বয়ং আইন-সভার নিকট দায়ী নহেন, তাঁহার মন্ত্রিগণও আইন-সভার নিকট দায়ী নহেন। তবে কি তিনি দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী শাসক? গণতন্ত্রে দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারী শাসকের স্থান নাই। রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্টকালের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সুতরাং তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি। তাঁহাকে দেশের সংবিধান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়।

কর স্থাপন, বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি আইন-সভার অনুমোদন ছাড়া কিছু করিতে পারেন না। তাঁহার কোন কার্য সংবিধান-বিরোধী হইলে সুপ্রীম কোর্ট তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। তিনি সংবিধান-বহির্ভূত বা দুর্নীতিমূলক কোন কাজ করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়। সুতরাং রাষ্ট্রপতির শাসন গণতন্ত্রের বিরোধী নহে।

এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি এই যে শাসন বিভাগ (Executive) ও আইন বিভাগের (Legislature) মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বন্দোবস্ত থাকে না, কারণ মন্ত্রিগণ আইন-সভার নিকট দায়ী নহেন—এমন কি, তাঁহারা আইন-সভার সভ্যও হইতে পারেন না। ফলে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি আইন-সভা ও দেশবাসীর মতের বিরুদ্ধে কার্য করিলেও তাঁহার পূর্বনির্দিষ্ট শাসনকাল শেষ না হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা কঠিন। পার্লামেন্টীয় সরকারকে অতি সহজে পদচ্যুত করা যায়।

এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির শাসন আমেরিকায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি কর্মনিষ্ঠ, দূরদর্শী ও জনপ্রিয় হইলে এই শাসন-ব্যবস্থা পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে। দেশে কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে অথবা দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার পার্লামেন্টীয় সরকার অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করিতে পারে।

প্রশ্ন

1. Define Government. What are the different forms of Government ? (সরকার কাহাকে বলে ? সরকারের বিভিন্ন রূপ কি কি ?) [২০—২৩ পৃষ্ঠা]

2. Explain what you mean by Democracy. What are its merits and defects ? (গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা কর। গণতন্ত্রের গুণ ও ত্রুটি কি কি ?) [H. S. E., 1960] [২৪, ২৮—৩১ পৃষ্ঠা]

3. Distinguish between Direct and Indirect Democracy. What are the defects of a democratic form of Government ? (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। গণতান্ত্রিক সরকারের ত্রুটি কি কি ?) [H. S. E., 1961] [২৪—২৬, ২৯—৩১ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between Unitary and Federal forms of Government. (এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।) [H. S. E., 1960] [৩১—৩৩ পৃষ্ঠা]

5. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of Government. Is the Government of India Presidential or Parliamentary? (পার্লামেন্টীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ভারতবর্ষের সরকার কি পার্লামেন্টীয়, না রাষ্ট্রপতি-শাসিত ?) [H. S. E., Compartmental, 1960] [৩৪—৩৭ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

(Organs of Government and Separation of Powers)

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Organs of Government)—সরকার যে সকল কাজ করে সেগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) আইন প্রণয়ন (Legislation), (২) শাসনকার্য পরিচালনা (Administration) এবং (৩) বিচার (Justice)। এই তিন রকম কাজ করিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ আছে—(১) ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature), (২) শাসন বিভাগ (Executive) এবং (৩) বিচার বিভাগ (Judiciary)। সাধারণভাবে বলা যায়, ব্যবস্থা বিভাগের কাজ আইন প্রণয়ন করা; শাসন বিভাগের কার্য প্রচলিত আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা; বিচার বিভাগের কার্য আইন ভঙ্গ করিলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Theory of Separation of Powers)—সরকারের তিনটি বিভিন্ন বিভাগের উপর সাধারণভাবে তিন রকম বিভিন্ন কাজের ভার দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় এই সীমারেখা না মানিয়া এক বিভাগ অপর বিভাগের কাজ খানিকটা করে। যেমন, ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের নায়ক রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যের শাসন বিভাগের নায়ক রাজ্যপাল কতকগুলি সর্তাধীনে আইন-সভার মতামত না লইয়া স্ব স্ব মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এখানে শাসন বিভাগ নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যবস্থা বিভাগের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ইংলণ্ডে লর্ড সভা (House of Lords) আইন-সভার (Parliament) অংশ, কিন্তু ইহা আবার দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়। এখানে ব্যবস্থা বিভাগ নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া বিচার

বিভাগের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশে দূত (Ambassador) নিয়োগ রাষ্ট্রপতির অধিকার, কিন্তু ইহা আইন-সভার উচ্চ কক্ষের (Senate) অনুমোদনসাপেক্ষ। এখানে আইন বিভাগ নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া শাসন বিভাগের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রেই সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে এক বিভাগ অপর বিভাগের স্বাভাবিক অধিকারে অংশগ্রহণ করে।

অনেকে মনে করেন, এক বিভাগের পক্ষে অপর বিভাগের কর্মক্ষেত্রে এইভাবে প্রবেশ করা অনুচিত। তাঁহাদের মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট নীতি রূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহার নাম ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (Aristotle) রচনায় এই নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী লেখক মন্টেস্কু (Montesquieu) এই নীতির বিশদ আলোচনা করিয়া ইহাকে একটি বিশিষ্ট রূপ প্রদান করেন। এই নীতি অনুসারে কোন বিভাগ কখনও নিজের নির্দিষ্ট গণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবে না, নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে প্রত্যেক বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও চরম ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমর্থকগণ বলেন, বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না থাকিলে নাগরিকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র না থাকিলে শাসকগণ উভয় বিভাগে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। ব্যবস্থা বিভাগ ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র না থাকিলে একই ব্যক্তি ব্যবস্থা বিভাগের ক্ষমতা দ্বারা অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া বিচার বিভাগের ক্ষমতা দ্বারা ঐ আইন অনুসারে বিনা প্রমাণে লোককে শাস্তি দিতে পারে। বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র না থাকিলে শাসকের অবিচার ও অত্যাচার হইতে নাগরিককে কেহ রক্ষা করিতে পারে না, কারণ শাসকই সেখানে বিচারক। আর তিনটি বিভাগের ক্ষমতা যদি এক ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত করা হয় তবে তাহার স্বেচ্ছাচারের পথে আর কোন বাধা থাকিবে না।

প্রাচীনকালে স্বেচ্ছাচারী রাজগণ তিনটি বিভাগেই চরম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূর্ণ স্বীকৃতি অপরিহার্য। প্রত্যেক বিভাগের কাজ স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইলে একটি বিভাগ অপর বিভাগের অন্যায় ও অবিচার প্রতিরোধ করিবে, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তিনটি বিভাগই সংযত থাকিবে। ফলে

ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, শাসন-ব্যবস্থা ন্যায় এবং সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে এই সকল যুক্তি সাধারণভাবে সত্য বটে, কিন্তু এই নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করিলে শাসনকার্য পরিচালনায় নানারকম অসুবিধা ঘটে। শাসন বিভাগকে ক্ষেত্র বিশেষে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা না দিলে চলে না। মনে কর, দেশ অকস্মাৎ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে; দেশরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থার জন্য ২।১ দিনের মধ্যে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন। তখন কি আইন-সভার অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব? দেশের মঙ্গলের জন্য তখন শাসন বিভাগকেই জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। আবার বিচার বিভাগ অনেক সময় ব্যবস্থা বিভাগ কর্তৃক রচিত আইনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে নূতন আইনের সৃষ্টি করে—অর্থাৎ বিচারকগণের মত পরবর্তীকালে অন্য বিচারকগণ মানিয়া লন এবং এইভাবে ইহা আইনের (case law) মর্যাদা লাভ করে। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আইনের পরিবর্তন আবশ্যক হইলে অনেক সময় বিচারকগণ আইন-সভার নির্দেশের অপেক্ষা না রাখিয়া যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত করেন। ইহাতে মোটের উপর সমাজের মঙ্গল হয়।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের রাষ্ট্র-সংগঠন এত জটিল যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পূর্ণভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব এবং অবাঞ্ছনীয়। শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, তাহাদিগকে পৃথক করা চলে না—পৃথক করিতে গেলে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। তিনটি বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে সুশাসন সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রের সংহতি এবং কার্যক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তিনটি বিভাগকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গণ্য করিলে চলিবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে স্বেচ্ছাচারী রাজার শাসনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মণ্টেস্ক্যু শাসনযন্ত্রের বিভাগগুলিকে পৃথক রাখিয়া শাসকের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ না করিয়াও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। ইংলণ্ডে এই নীতির প্রয়োগ নাই, সেখানে শাসনযন্ত্রের তিনটি বিভাগ—বিশেষত ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ—পরস্পরের সহিত সংযুক্ত; অথচ ইংলণ্ডে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত রহিয়াছে।

শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ পার্লামেণ্টীয় শাসন-

ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ, এখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ নীতিগতভাবে সম্ভব হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহাতে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান শাসন বিভাগকে ব্যবস্থা বিভাগ হইতে পৃথক রাখিয়াছে বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সংবিধানের বহির্ভূত (extra-constitutional) নানা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই দুইটি বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হইতেছে।

কেবলমাত্র বিচার বিভাগকে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আংশিক প্রয়োগ আবশ্যক। বিচারকগণ যাহাতে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য। বিচারকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলে সুবিচার পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সংবিধান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল, সে যুগের অবস্থার সহিত বর্তমান যুগের অবস্থার কোন সাদৃশ্য নাই। ফলে সংবিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থা বাস্তব অবস্থার চাপে অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে, কার্যক্ষেত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ নানাদিকে সঙ্কুচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশে এই নীতি কখনও গৃহীত হয় নাই; স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও ইহার স্থান নাই। বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতির উপযোগিতা কেবলমাত্র বিচার বিভাগে সীমাবদ্ধ।

ব্যবস্থা বিভাগের কার্য (Functions of Legislature)—পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্যবস্থা বিভাগের (অর্থাৎ আইন-সভার) কার্য আইন প্রণয়ন করা। নূতন আইন প্রণয়ন করা এবং পুরাতন আইন সংশোধন ও বাতিল করা আইন-সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ইহার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আইন-সভা রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব করে; ইহার অনুমোদন ব্যতীত কর স্থাপন বা সরকারী কার্যে অর্থব্যয় করা যায় না। প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ (Budget) আইন-সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করিতে হয়। আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আইন-সভা সমগ্র শাসন-

ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করে। দ্বিতীয়ত, যে সকল দেশে পার্লামেণ্টীয় সরকার বর্তমান সেখানে মন্ত্রি-পরিষদ আইন-সভার নিকট দায়ী থাকে; আইন-সভা যে কোন সময়ে মন্ত্রি-পরিষদের কোন কার্য বা নীতি সম্বন্ধে বিরূপ মত প্রকাশ করিয়া উহার পদচ্যুতি ঘটাইতে পারে। এখানে শাসন বিভাগ সাধারণভাবে ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্বাধীন। অবশ্য যে দেশে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বর্তমান সেখানে আইন-সভার এই অধিকার নাই। তৃতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে আইন-সভা রাষ্ট্রের উচ্চপদাধিকারীদিগকে নির্বাচন বা নিয়োগ করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট এবং রাজ্যের আইন-সভাগুলির নিম্নপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দূত (Ambassador) নিয়োগ সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। সুইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ায় বিচারপতিগণ আইন-সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। চতুর্থত, কোন কোন ক্ষেত্রে আইন-সভা বিচারকার্য করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের উচ্চ কক্ষ (House of Lords) সেই দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়। ভারতের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ (impeachment) উপস্থিত হইলে পার্লামেণ্ট তাহার বিচার করিবে। ইহা ছাড়া সংবিধানের মৌলিক সংশোধন বা পরিবর্তন (Amendment of Constitution) করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন-সভার উপর ন্যস্ত থাকে।

আইন-সভার গঠন (Organisation of Legislature)—পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই আইন-সভার দুইটি অংশ আছে—উচ্চ পরিষদ (Upper Chamber) বা দ্বিতীয় পরিষদ (Second Chamber) এবং নিম্ন পরিষদ (Lower Chamber) বা প্রথম পরিষদ। এই ব্যবস্থাকে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা (Bicameralism) বলা হয়। ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টে, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে দুইটি পরিষদ বা কক্ষ (House) আছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে আইন-সভার একটিমাত্র পরিষদ বা কক্ষ থাকে। যেমন, ভারতবর্ষের কোন কোন রাজ্যে আইন-সভার দুইটি কক্ষ, আবার কোন কোন রাজ্যে মাত্র একটি কক্ষ আছে। মাত্র একটি কক্ষ থাকিলে সেই ব্যবস্থাকে এক-পরিষদ ব্যবস্থা (Unicameralism) বলে।

সাধারণত উচ্চতর পরিষদের ক্ষমতা কম থাকে, নিম্ন পরিষদের ক্ষমতা বেশী থাকে। ইহার কারণ এই যে নিম্ন পরিষদ সকল ক্ষেত্রেই জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত হয়, কিন্তু উচ্চতর পরিষদের সভ্যগণ সাধারণত

উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা মনোনয়ন বা পরোক্ষ নির্বাচন দ্বারা আসন লাভ করেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মতামতের মূল্য স্বভাবতই বেশী হইয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদের (Senate) যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে।

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা এবং এক-পরিষদ ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক-পরিষদ ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটিমাত্র পরিষদের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়, সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা বা ভুল-ত্রুটি সংশোধনের উপায় থাকে না। কিন্তু দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় নিম্ন পরিষদের সিদ্ধান্ত উচ্চ পরিষদে আলোচিত ও সংশোধিত হইতে পারে। দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পক্ষে ইহাই প্রধান যুক্তি। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একথা বলা যায় যে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত নিম্ন পরিষদের সিদ্ধান্তই প্রবল হওয়া উচিত, অপেক্ষাকৃত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত উচ্চ পরিষদের হস্তে চরম ক্ষমতা থাকা অসঙ্গত।

যে দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত সেখানে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। এখানে নিম্ন পরিষদে থাকেন সমগ্র দেশের জনসমষ্টির প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিগণ, আর উচ্চ পরিষদে থাকেন আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার ভারপ্রাপ্ত পরোক্ষ প্রতিনিধিগণ। এইরূপে দেশের সামগ্রিক ঐক্য এবং আঞ্চলিক পার্থক্য পাশাপাশি ভাবে আইন-সভায় প্রতিফলিত হয়।

শাসন বিভাগের কার্য (Functions of Executive)—শাসন বিভাগের প্রধান কার্য প্রচলিত আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা। কিন্তু অনেক রাষ্ট্র ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি উপেক্ষা করিয়া শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন ও বিচারকার্য সংক্রান্ত কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করে। যে সকল দেশে পার্লামেন্টীয় সরকার বর্তমান সেখানে শাসন বিভাগ আইন-সভার মাধ্যমে আইন প্রণয়নে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, শাসন বিভাগ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে, বিচারপতি নিয়োগ ও বিচারালয়ের নির্দেশ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, আইন-সভার মাধ্যমে আইন প্রণয়নে প্রধান অংশ গ্রহণ করে, পররাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ (foreign relations) পরিচালনা করে, দেশরক্ষা বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা করে এবং যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করে।

শাসন বিভাগের গঠন (Organisation of Executive)—রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রধান কর্মকর্তা থাকেন রাষ্ট্রপতি।

তাঁহার নির্দেশ অনুসারে এবং তাঁহার নিকট দায়ী থাকিয়া মন্ত্রিগণ ও রাষ্ট্রভৃত্যগণ (civil servants) শাসনকার্য নির্বাহ করেন। পার্লামেণ্টীয় সরকারে রাজা বা রাষ্ট্রপতি নামে শাসন বিভাগের অধ্যক্ষ থাকেন বটে, কিন্তু শাসন-ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রি-পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে।

শাসন বিভাগের মধ্যে নানাপ্রকার দপ্তর (Department) থাকে। যেমন,—স্বরাষ্ট্র (Home), পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার (Foreign Affairs), দেশরক্ষা (Defence), অর্থ (Finance), শিক্ষা (Education), যানবাহন (Communications), শিল্প (Industries), বাণিজ্য (Commerce), কৃষি (Agriculture), ইত্যাদি। সাধারণত এক একটি বিভাগ মন্ত্রি-পরিষদের এক এক জন সভ্যের কর্তৃত্বাধীন থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে একজন মন্ত্রীর উপর একাধিক বিভাগের ভার দেওয়া হয়। আবার মন্ত্রীর কার্যে সহায়তা করিবার জন্য সহকারী মন্ত্রী থাকিতে পারেন। মন্ত্রিগণ উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রভৃত্যগণের সাহায্যে স্ব স্ব দপ্তরের কার্যভার পরিচালনা করেন। মন্ত্রি-পরিষদের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, রাষ্ট্রভৃত্যগণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; তাঁহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন।

বিচার বিভাগের কার্য (Functions of Judiciary)—বিচার বিভাগের কার্য আইন-সভা কর্তৃক রচিত এবং অন্যান্য সূত্র হইতে লব্ধ আইনের যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করা। এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির, অথবা এক ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের বিরোধ উপস্থিত হইলে বিচারপতিগণ আইন অনুসারে কাহার কি অধিকার তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং দোষীকে শাস্তি দিবেন। আইনের গুণাগুণ বিচার তাঁহাদের কার্য নহে; আইন ভালই হউক আর মন্দই হউক, বিচারকগণ তাহার যথাযথ প্রয়োগ করিবেন। তাঁহারা সর্বদা নিরপেক্ষ থাকিবেন, কখনও কোন কারণে কোন ব্যক্তিকে বা রাষ্ট্রকে আইন-বহির্ভূত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন না।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারকগণ আইন-সভা বা শাসন বিভাগের অনুরোধে আইন সংক্রান্ত কোন জটিল বিষয়ে তাহাদিগকে পরামর্শ দিতে পারেন (Advisory Jurisdiction)।

যে দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত সেখানে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের (Supreme Court) একটি প্রধান কার্য সংবিধানের ব্যাখ্যা করা। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বিভাগ সংক্রান্ত কোন আইনগত

বিরোধ উপস্থিত হইলে এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষকেই মানিয়া লইতে হয়।

প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা বিচারকগণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বটে, কিন্তু তাঁহারা পরোক্ষভাবে নূতন আইনের সৃষ্টি করিতে পারেন। আইনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহারা যে মত প্রকাশ করেন তাহা পরবর্তীকালে অন্য বিচারকগণ মানিয়া লন এবং এইভাবে ইহা আইনের মর্যাদা লাভ করে। ইহাকে নজীর আইন (case law) বলে।

বিচার বিভাগের গঠন (Organisation of Judiciary)—প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ ক্রমোচ্চভাবে—পিরামিডের মত—সংগঠিত হয়। সকলের উপরে যে বিচারালয় থাকে তাহা বিভিন্ন নামে (Supreme Court, High Court, House of Lords) অভিহিত হইতে পারে। বিচারকগণ সাধারণত শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহারা যাহাতে শাসন বিভাগের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন সেজন্য নানারকম ব্যবস্থা করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে ও সোভিয়েত রাশিয়ায় বিচারকগণ আইন-সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

প্রশ্ন

1. What are the different organs of Government? What are their functions? (সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যাবলী কি কি?) [৩৮,৪১—৪২,৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা]

2. Explain the theory of separation of powers. Is it possible and desirable to adopt it fully? (ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। এই নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় কি?) [৩৮—৪১ পৃষ্ঠা]

3. Why is it considered desirable to separate the powers of the legislative, executive and judicial organs of a Government? (সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যাবলীর স্বতন্ত্রীকরণ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হয় কেন?) [H. S. E., 1960] [৩৮—৪১ পৃষ্ঠা]

4. Explain the limits to the theory of Separation of Powers. Give examples. (ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সীমা নির্দেশ কর। উদাহরণ দাও।) [H. S. E., 1961] [৩৮—৪১ পৃষ্ঠা]

5. Write short notes on: (*a*) the Legislature, (*b*) the Executive, (*c*) the Judiciary. (ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।) [৪১—৪৫ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের কার্যাবলী

(Functions of Government)

রাষ্ট্রের বা সরকারের কর্তব্য (Functions of the State or Government)—রাষ্ট্রকে কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে বা কাজ করিতে হয়। কিন্তু ভূখণ্ড-জনসমষ্টি-সরকার-সার্বভৌমিকতার সংমিশ্রণে গঠিত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্মশক্তি নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্য পালন করে সরকার। সরকার কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তির সমষ্টি; সুতরাং ইহার পক্ষে কাজ করা সম্ভব। সরকার যাহা করে তাহাই রাষ্ট্র করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। যেমন, আমরা বলি, "জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়াছিল।" প্রকৃতপক্ষে জাপান নামক রাষ্ট্রে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল সেই সরকার ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়াছিল। রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে ঐ কর্তব্য সম্পাদন করে সরকার।

রাষ্ট্র কি কি কাজ করিবে? রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত?

রাষ্ট্রের করণীয় কার্যগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি কার্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই করিতে হয়, না করিলে রাষ্ট্রের নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। এইগুলিকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কর্তব্য বলা যায়। আর কতকগুলি কার্য করা বা না করা রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও শক্তির উপর নির্ভর করে। এইগুলিকে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক বা গৌণ কর্তব্য বলা যায়।

রাষ্ট্রের বা সরকারের মুখ্য কর্তব্য (Essential functions of the State or Government)—রাষ্ট্রের (অর্থাৎ সরকারের) প্রাথমিক কর্তব্য নাগরিকদিগের ধন, প্রাণ ও সম্মান রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যই মানুষ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সুতরাং নাগরিকদিগের নিরাপত্তা যাহাতে কোন প্রকারে বিপন্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হইবে।

দুই প্রকারে নাগরিকদিগের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে—চোর-ডাকাতের উপদ্রবে এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার অভাবে, আর বৈদেশিক আক্রমণে। চোর-ডাকাতের উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে পুলিশ ও বিচারক নিয়োগ করিতে, আইন প্রণয়ন করিতে এবং

কারাগার স্থাপন করিতে হয়। যে সকল কার্য দ্বারা নাগরিকদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে তাহা নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণয়ন করা হয়। কেবল যে চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া এবং এই সকল অন্যায় কার্যের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া আইন রচিত হয় তাহা নহে। জনবহুল নগরের রাজপথে ইচ্ছামত মোটরগাড়ী চালাইলে লোকের প্রাণহানি বা অঙ্গহানি ঘটিতে পারে। এই জন্য মোটর চালাইবার নিয়ম সম্বন্ধেও আইন রচনার প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, কেহ যাহাতে আইন ভঙ্গ করিয়া নাগরিকদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে সেদিকে পুলিশ দৃষ্টি রাখে। কেহ যদি পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া বে-আইনী কাজ করে তবে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয়। সেখানে বিচারে তাহার দোষ প্রমাণিত হইলে তাহাকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা হয়। গুরুতর অপরাধের জন্য কারাদণ্ড—এমন কি, প্রাণদণ্ড—হইতে পারে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে সকলকে সতর্ক করা—যেন আর কেহ ঐরূপ অপরাধ করিয়া শাস্তিভাজন না হয়। এইরূপে রাষ্ট্র সর্বদা নাগরিকদিগের নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা হইতে নাগরিককে মুক্ত রাখিবার জন্য রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহার পররাষ্ট্রনীতি মৈত্রী ও সহযোগিতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু সকল সময় সকল রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রকে সৈন্য পোষণ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে হয়। যুদ্ধ ঘটিবে কিনা, ঘটিলে কখন ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং কর্তব্যপরায়ণ রাষ্ট্রকে সর্বদাই আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। যতদিন পৃথিবীতে শান্তি ও মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা—এই দুইটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কর্তব্য। যে রাষ্ট্র এই দুইটি কর্তব্যে অবহেলা করে তাহাকে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নষ্ট হইলে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন বৈদেশিক আক্রমণে তাহার স্বাধীনতা—এমন কি, অস্তিত্ব পর্যন্ত—বিপন্ন হইতে পারে। এইরূপ কর্তব্যচ্যুত রাষ্ট্রের নাগরিকদিগকে নানাপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে হয়। শান্তি ও

শৃঙ্খলা সুরক্ষিত না হইলে তাহারা নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ কাজ করিতে পারে না। ফলে সমাজের বাঁধন খসিয়া পড়ে, সভ্যতার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু কেবলমাত্র সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেই রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সুসম্পাদিত হয় না। পারিবারিক জীবন যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে—স্বামী-স্ত্রী এবং পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থা যাহাতে যুগোপযোগী হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে যাহাতে অনাবশ্যক বা হানিকর ব্যবস্থা প্রচলিত না হয় তাহাও রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে। মোটের উপর নাগরিকগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যাহাতে অচল না হয় তাহার সুবন্দোবস্ত রাষ্ট্রকে করিতে হইবে, নতুবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

রাষ্ট্রের বা সরকারের গৌণ কর্তব্য (Non-essential or optional functions of the State or Government)—যে রাষ্ট্র কেবলমাত্র অপরিহার্য বা মুখ্য কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে, অন্য কোন কর্তব্য স্বীকার করে না—অর্থাৎ যাহার কর্মপ্রচেষ্টা কেবলমাত্র নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় এবং প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনায় সীমাবদ্ধ—তাহাকে 'পুলিশ-রাষ্ট্র' (Police State) বলা যায়। পুলিশ যেমন শান্তিরক্ষা ছাড়া অন্য কাজে মন দেয় না, পুলিশ-রাষ্ট্রও তেমনই প্রধানত শান্তিরক্ষার উপর নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। কিন্তু কেবলমাত্র শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই নাগরিকগণের মঙ্গলসাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। রাষ্ট্র যদি অন্যান্য কতকগুলি কর্তব্য স্বীকার করে তবে তাহাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। যে রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া সকল বিষয়ে নাগরিকদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে তাহাকে বলা হয় 'কল্যাণ রাষ্ট্র' (Welfare State), কারণ সর্বক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণসাধন ইহার লক্ষ্য।

যে রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে বা হইতে চায় তাহাকে কতকগুলি গৌণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের জীবন যাহাতে সহজ, সুন্দর ও সুখময় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দারিদ্র্যের জন্য কেহ যেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যলাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত না থাকে তাহা দেখিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে নিজের প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে শিক্ষালাভের ও জীবনযাপনের সুযোগ পায় তাহার জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কেহ যাহাতে খাদ্যের বা বাসস্থানের অভাবে মারা না যায়, প্রত্যেক রোগীর যাহাতে সুচিকিৎসা হয়, তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে। প্রত্যেক কর্মপ্রার্থীকে কাজ সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা সরকারী ব্যয়ে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা বার্ধক্য, রোগ বা পঙ্গুতার জন্য জীবিকা অর্জন করিতে পারে না, রাষ্ট্র তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে। মোটের উপর প্রত্যেক নাগরিককে সৎ, সুস্থ ও আনন্দময় জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া কল্যাণ-রাষ্ট্রের কর্তব্য।

কল্যাণ-রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নাগরিকদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে হইবে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে সমাজের প্রবল অংশের লোভ নিয়ন্ত্রিত করা এবং দুর্বল অংশকে জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করা। কল-কারখানার অর্থশালী মালিকেরা অনেক সময় শ্রমিকদিগকে উপযুক্ত বেতন দিতে চাহেন না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য করেন। মালিক প্রবল, শ্রমিক দুর্বল। তখন রাষ্ট্র শ্রমিকের পক্ষ লইয়া মালিককে বেতন বাড়াইতে এবং পরিশ্রম কমাইতে বাধ্য করিবে। রাষ্ট্র ইহা না করিলে দুর্বল শ্রমিকের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে না। আবার কোন শক্তিশালী ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায় যাহাতে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণকে লুণ্ঠন বা অন্যভাবে জনসাধারণের অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হইবে। ব্যবসায়ীরা অনেক সময় অতিরিক্ত মুনাফার লোভে জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দেয়। তখন রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যবসায়ীদিগকে উচিত মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য করা। কিছুদিন পূর্বে বড় বড় শহরে রেশন প্রথা চালু ছিল, নির্দিষ্ট দামে কয়েকটি নির্দিষ্ট দোকানে চাউল বিক্রয় হইত। রাষ্ট্র এই বন্দোবস্ত না করিলে লোভী ব্যবসায়ীরা চাউলের দাম বাড়াইয়া দিত, তখন বহু লোক চড়া দামে চাউল কিনিতে না পারিয়া অনাহারে মরিত। রাষ্ট্র লোভী ব্যবসায়ীদিগকে সংযত রাখিলে বাঙ্গালা দেশে ১৩৫০ সালে যে ভয়াবহ মন্বন্তর ঘটিয়াছিল তাহা ঘটিতে পারিত না। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, সমগ্র সমাজের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে সমাজ-বিরোধী কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজের অধীনে আনিতে হয়।

আজকাল সকল রাষ্ট্রই কয়েকটি প্রধান শিল্প ব্যবসায়ীদের হাতে না রাখিয়া নিজে পরিচালনা করে। ভারতে যে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আছে রাষ্ট্রই তাহার মালিক এবং তাহার পরিচালনা করে ভারত সরকার। সমগ্র জাতির স্বার্থে কোন কোন জিনিস উৎপাদনের জন্য ভারত সরকার কারখানা (যেমন, বিহারের অন্তর্গত সিন্ধ্রীতে সার উৎপাদনের কারখানা) স্থাপন ও

পরিচালনা করিতেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহু মোটর বাস কিনিয়া কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে চালাইতেছে। ঐ সরকার ঐ বাসগুলির মালিক। বাস হইতে লাভ-লোকসান যাহা হয় তাহাও ঐ সরকারের। কেবল যে আমাদের দেশেই এই ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বড় বড় শিল্প রাষ্ট্রের হাতে আনা হইয়াছে ও হইতেছে। জন-সাধারণের স্বার্থেই ইহা করা প্রয়োজন। ভারতের রেলপথ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর আয় হয়। পূর্বে কয়েকটি বিলাতী কোম্পানী ভারতের রেলপথের মালিক ছিল। রেলপথ হইতে যে আয় হইত তাহা ঐ সকল কোম্পানীর অংশীদারগণ ব্রিটেনে বসিয়া ভোগ করিত। ভারতের জনসাধারণ তাহাতে কোন প্রকারে উপকৃত হইত না। এখন রেলপথের আয় যায় ভারত সরকারের তহবিলে। ঐ টাকাটা নানাপ্রকারে ভারতের মঙ্গলের জন্যই ব্যয় করা হয়। সুতরাং সরকার রেলপথের মালিক হওয়ায় জনসাধারণ উপকৃত হইতেছে।

অনেকে বলেন, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইলে নাগরিকের স্বাধীনতা কমিয়া যায়। রাষ্ট্র চাউলের দাম নির্দেশ করিয়া দিলে ব্যবসায়ী নিজের ইচ্ছামত দামে চাউল বিক্রয় করিতে পারে না। ইহাতে তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। পশ্চিমবঙ্গে যদি শুধু সরকারী মোটর বাস চলে তবে এখন যাহারা বে-সরকারী বাস চালাইয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে তাহাদের রোজগার বন্ধ হইবে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বেশী লোকের মঙ্গলের জন্য অল্প কয়েকজন লোকের স্বাধীনতা কমাইয়া দিয়াছে। চাউল-বিক্রেতার চেয়ে চাউল-ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং যে ব্যবস্থায় ক্রেতার সুবিধা হয় তাহাই সমাজের পক্ষে ভাল। সরকারী বাস হইতে যে আয় হইবে তাহা সরকারী তহবিলে যাইবে। সুতরাং পরোক্ষভাবে তাহা জনসাধারণের কাজে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু এখন যে কয়েকজন লোক বাসের মালিক হইয়া প্রচুর লাভ করিতেছেন, তাঁহারা ঐ আয়ের অংশমাত্রও জনসাধারণের কাজে ব্যয় করেন না। সুতরাং জনসাধারণের দিক হইতে দেখিতে গেলে শুধু সরকারী বাস চালাইবার ব্যবস্থাই ভাল। রাষ্ট্র সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক মঙ্গল ("greatest good of the greatest number") সাধনের চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টার ফলে অল্পসংখ্যক লোকের স্বার্থ বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলেও রাষ্ট্র নিজের মহান্ লক্ষ্য ত্যাগ করিতে পারে না।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কল্যাণ-রাষ্ট্রের কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। যে সকল আইন বা সামাজিক রীতি-নীতি মানুষের উন্নতির পথে বাধা

স্বরূপ সেগুলি সংশোধন বা বিলোপ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। হিন্দুদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিয়া কন্যাকে ও স্ত্রীকে উত্তরাধিকার দেওয়া হইয়াছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে—শিক্ষা, শাসন, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে—নারী যাহাতে পুরুষের সমান অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বর্তমান যুগে ইহা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে যে পুলিশ-রাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কেবলমাত্র কল্যাণ-রাষ্ট্রই মানুষের কাম্য সুন্দর জীবনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। এইজন্য পৃথিবীর নানা দেশে কল্যাণ-রাষ্ট্র স্থাপনের প্রয়াস চলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের মুখ্য কর্তব্য এবং গৌণ কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য এখন আর নাই বলিলেই চলে।

ভারতের সংবিধানে কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। সংবিধানের একটি অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) লিপিবদ্ধ আছে। যেমন: (১) প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষালাভের অধিকার এবং বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে ও পীড়িত অবস্থায় সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার থাকিবে। (২) শ্রমিকদিগকে উপযুক্ত বেতন ও সময়মত বিশ্রাম দিতে হইবে। (৩) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যাহাতে সম্পত্তির বা আয়ের অত্যধিক পার্থক্য না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যেন জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত হয়। এই সকল নীতি অনুসারে ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য-সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করিলে ভারত একটি প্রকৃত কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

ব্যক্তি ও সমাজ (The Individual and Society)—রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধের কথা স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যতই প্রসারিত হইবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ততই কমিয়া যাইবে; রাষ্ট্রের চাপে ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হইবে। কোন কোন মনীষীর মতে রাষ্ট্রই সামাজিক গঠনের চরম বিকাশ, রাষ্ট্রের বাহিরে ব্যক্তির কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে প্রয়োজন মত ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যতদূর সম্ভব প্রসারিত করা উচিত। ইহাতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিকশিত না হইলেও বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদী (Socialist) দার্শনিকগণের এই মত। আবার কেহ কেহ মনে করেন, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে না পারিলে সমাজের মঙ্গল হয় না, স্নুতরাং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত রাখিয়া ব্যক্তিকে আত্মবিকাশের স্নুযোগ দেওয়া উচিত। ইহার নাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)—অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant), ইংরেজ ধনবিজ্ঞানী রিকার্ডো (Ricardo) এবং ইংরেজ দার্শনিক মিল (Mill), স্পেন্সার (Spencer) প্রভৃতি মনীষিগণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করেন। তাঁহারা মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাষ্ট্র মানব-কল্যাণের উৎস নহে, ইহা মানব-জীবনের অভিশাপ। তথাপি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অপরিহার্য, কারণ সমাজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে এবং প্রয়োজন হইলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। অন্য কোন ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র 'পুলিশ-রাষ্ট্র' হইবে এবং নিরাপত্তা রক্ষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করিবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে কল্যাণ-রাষ্ট্রের স্থান নাই, কারণ ইহার সমর্থকগণ রাষ্ট্রকে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য না করিয়া মানুষের আত্মবিকাশের পথে বাধা বলিয়া মনে করেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষ নিজের মঙ্গল চিন্তা করে এবং যাহাতে কল্যাণ হয় সেভাবে কাজ করে। রাষ্ট্র যদি তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাহাকে নিজের ইচ্ছামত আত্মকল্যাণকর কার্য করিতে স্নুযোগ দেয় তবেই তাহার কল্যাণ হইবে। এইরূপে ব্যক্তির কল্যাণ হইলে সমষ্টিরও—অর্থাৎ সমগ্র সমাজের কল্যাণ হইবে। স্নুতরাং ব্যক্তির বা সমাজের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষভাবে কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা কমিয়া যাইবে, সে পরমুখাপেক্ষী হইবে—ফলে তাহার কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ক্ষুণ্ণ হইবে। ইহাতে কেবল ব্যক্তির নহে—সমগ্র সমাজের ক্ষতি হইবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি অবাধ প্রতিযোগিতা (perfect competition)। রাষ্ট্র উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে (production and distribution) মোটেই হস্তক্ষেপ করিবে না, যাহারা উৎপাদন ও বণ্টন করে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। এই নীতিকে *Laissez faire* বলা হয়। এই

নীতি প্রয়োগ করিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা হইবে; তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যের উৎকর্ষ বাড়িবে এবং দাম কমিবে। প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্য ব্যক্তির উন্নতি এবং অযোগ্য ব্যক্তির অপসারণ ঘটিবে। ইহাতে সমগ্র সমাজ লাভবান হইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে এই সকল যুক্তি ত্রুটিহীন নহে। ব্যক্তির ও সমাজের পক্ষে রাষ্ট্রের সহায়তার কোন প্রয়োজন নাই—এই মৌলিক যুক্তি ইতিহাসের শিক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয় না। প্রত্যেক মানুষ নিজের মঙ্গল চিন্তা করে এবং আত্মকল্যাণ-কর কার্যে প্রবৃত্ত হয়—এই বিশ্বাস আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী। যে মদ্যপ স্ত্রীপুত্রকে অনাহারে রাখিয়া মদ্য ক্রয় করে তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেই সে নিজের এবং সমাজের কল্যাণ করিবে, একথা কে বলিতে পারে? যে লোভী ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার আশায় জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া চাউল মজুত করে তাহাকে বাধা দেওয়া কি সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক নয়? জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সমাজের কল্যাণকর কার্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রই সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে। রাষ্ট্রের কার্যাবলী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে মানুষের দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধি পাইত, সভ্যতার উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইত। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পরিবেশে রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে প্রায় সর্বত্রই মানুষ সমাজতন্ত্রবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে সমাজের সর্বাপেক্ষা বেশী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, ইহাই বর্তমান যুগের মানুষের ধারণা। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করাই এখন প্রধান রাজনৈতিক আদর্শ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কার্যত ঐতিহাসিক স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)—সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণা এই যে রাষ্ট্র একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গল এবং সামাজিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের প্রসার এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক। রাষ্ট্র 'পুলিশ-রাষ্ট্র' হইবে না, কল্যাণ-রাষ্ট্র হইবে—ইহাই সমাজতন্ত্রবাদের মুখ্য আদর্শ। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, সুতরাং নানাবিধ কল্যাণকর কর্মের দ্বারা রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত সমাজতন্ত্রবাদের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণসাধন উভয়

মতবাদের মৌলিক লক্ষ্য বটে, কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে।

এই দুইটি মতবাদের পার্থক্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সঙ্কুচিত করিয়া এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার (perfect competition) ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে অসাম্যের ভিত্তিতে গঠন করে ; জনসাধারণকে শোষণ করিয়া এক শ্রেণীর লোক অর্থ ও মর্যাদা আত্মসাৎ করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইরূপ শোষণ ও নিপীড়নের স্থান নাই। সেখানে সমাজ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাষ্ট্র নিজ ক্ষমতাবলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করে। উগ্র সমাজতন্ত্রবাদীরা সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়করণের (Nationalisation) পক্ষপাতী। জমি, মূলধন, উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন হইবে। রাষ্ট্র কেবল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবে না, যে সম্পদ উৎপাদিত হইবে তাহা ন্যায়সঙ্গতভাবে নাগরিকগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। এইভাবে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের বৈষম্য দূর হইবে। তাহা হইলে ধনী ও দরিদ্র নামে দুইটি শ্রেণী থাকে না, রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের জীবনধারণ ও সুখভোগের যথোচিত ব্যবস্থা করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে অসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় ; অবিচার, শোষণ ও সংঘর্ষ চলিতে থাকে। এই দিক হইতে সমাজতন্ত্রবাদ অনেক বেশী উন্নত ও বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র বিত্তহীন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে অবশ্যই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ হইবে। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। উৎপাদনক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মুনাফা সঞ্চয়ের পরিবর্তে সমাজের প্রয়োজন মিটানো উৎপাদনের লক্ষ্য রূপে গৃহীত হয়। ইহাতে অনেক অপচয় বন্ধ হয়, সমাজের প্রয়োজনের সহিত উৎপাদনের সংযোগ স্থাপিত হয়। তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আয়ের বৈষম্য দূর করিয়া এবং জনকল্যাণ-কর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ দেয়।

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করিতে হইলে রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান হইতে হয়। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র না থাকিলে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার জাতীয়করণ সম্ভব হয় না। আবার সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের পক্ষেও এক বিরাট জনসমষ্টির জীবনের সকল দিক সুষ্ঠুরূপে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতা অপরিমিত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ কুফলও

আছে। সম্পত্তি জাতীয়করণের ফলে মানুষের ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ফলে উৎপাদন কমিতে থাকে, দেশের ক্ষতি হয়। খনির মালিক প্রাণপণে খনির উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, কারণ সে জানে যে বেশী লাভ হইলে তাহার ব্যক্তিগত আয় বাড়িবে। কিন্তু খনি জাতীয় সম্পত্তি হইলে খনির কর্মকর্তা নির্দিষ্ট বেতন পাইবে, সুতরাং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া খনির উন্নতি করিবার তাহার তেমন আগ্রহ থাকিবে না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত হইলে অযোগ্যতা, কর্মবিমুখতা প্রভৃতি দোষ বৃদ্ধি পায়। সম্পত্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংযোগ অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক।

আর্থিক লাভ-লোকসানের কথা বাদ দিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সমাজতন্ত্রবাদ অনেকাংশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী। মানুষ জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র কর্তৃক (অর্থাৎ সরকার বা শাসকগণ কর্তৃক) নিয়ন্ত্রিত হইবে, কাহারও স্বাধীনভাবে কিছু করিবার অধিকার থাকিবে না। সরকারী আইন-কানুনের চাপে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিচারবুদ্ধি লুপ্তপ্রায় হইবে। নৈতিক দিক হইতে এই ব্যবস্থা আপত্তিজনক। রাষ্ট্র (অর্থাৎ সরকার বা শাসকগণ) অভ্রান্ত নহে ; সুতরাং রাষ্ট্র যখন যাহা ভাল মনে করিবে তখন তাহাই সকল মানুষকে অবশ্য মানিতে হইবে, এইরূপ বাধ্যতামূলক নীতি দেশের অমঙ্গল সাধন করিতে পারে। জীবনের বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা সৈনিকোচিত শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র যে সমাজ গঠন করে তাহা সকল দিক হইতে বাঞ্ছনীয় নহে।

সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Different forms of Socialism)— সমাজতন্ত্রবাদের মৌলিক উদ্দেশ্য এক হইলেও কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে সেই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই মতভেদকে ভিত্তি করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

সমষ্টি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (Collectivism) উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ সমর্থন করে, কিন্তু বিনিময় ও ভোগ-ব্যবস্থা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের আওতার বাহিরে রাখিতে চায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সমন্বয়।

রাষ্ট্রবিলোপকারী সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

উক্ত দুইটি মতবাদের সম্মিলিত রূপ সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) নামে পরিচিত। এই মতের সমর্থকগণ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ

চাহেন না। রাষ্ট্র শিল্পের মালিক হইবে, কিন্তু শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শিল্পের পরিচালনা করিবে। রাষ্ট্র সমগ্র জনসমষ্টির মঙ্গলের জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার সঙ্ঘগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করিবে।

সমাজতন্ত্রবাদের যে রূপ বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত ও প্রচলিত তাহার নাম **মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদ** (Marxian Socialism)। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জার্মান দার্শনিক **কার্ল মার্ক্স্** (Karl Marx) এই মতবাদ প্রচার করেন। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (economic interpretation of history) ইহার ভিত্তি। মার্ক্স্ সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণী-বৈষম্যের উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন, এই শ্রেণী-বৈষম্যের প্রতিবাদে যুগে যুগে শ্রেণী-সংগ্রাম (class struggle) ঘটে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ফলেই মানব-সমাজের ইতিহাস নূতন রূপ গ্রহণ করে। বর্তমান যুগের ধনতান্ত্রিক (capitalistic) সমাজ-ব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি (capitalist) শ্রমিকগণকে বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত সম্পদ ভোগ করে। ইহার ফলে শ্রমিক ও মালিক, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের পরিণতি হইবে শ্রমিকের জয়ে। তখন ধনতন্ত্রের পতন ঘটিবে, সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে, শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান ঘটিয়া শ্রেণীহীন সমাজ (classless society) প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই শ্রেণীহীন সমাজে উৎপাদনে অথবা ভোগে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সাধ্যানুযায়ী শ্রম করিবে এবং তাহার অভাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবে। তখন রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না, রাষ্ট্রবিহীন সমাজ (Stateless society) প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার নানাদিক হইতে সমালোচনা হইয়াছে। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের শেষ অধ্যায় **সাম্যবাদ** (Communism) ; বর্তমান জগতে ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর লেনিনের (Lenin) নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ায় পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে উৎপাদনের সমুদয় উপাদান রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হইল। মার্ক্সের মতবাদের এই পরিবর্তিত রূপ এখন সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রচলিত। চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা কিছু কিছু পরিবর্তন সহ গৃহীত হইয়াছে।

প্রশ্ন

1. Write a brief essay on the functions of Government. (সরকারের কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।)

2. What is Socialism? Distinguish between Socialism and Individualism. (সমাজতন্ত্রবাদ কি? সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।)

(৫২-৫৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the merits and demerits of Socialism. (সমাজতন্ত্রবাদের গুণ ও দোষ আলোচনা কর।) (৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা)

4. State and explain the Socialist theory about the functions of Government. (সমাজতন্ত্রবাদ অনুযায়ী সরকারের কার্যাবলী বর্ণনা কর।) [H. S. E., Compartmental, 1960] (৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

জাতি (Nation)—'জাতি' শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় (caste—যেমন, ব্রাহ্মণ জাতি) পৌরবিজ্ঞানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। পৌরবিজ্ঞানে ইহা ইংরাজী Nation শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইংরাজ জাতি, ফরাসী জাতি।

পৌরবিজ্ঞানের মতে জাতি গঠনের উপাদান কি কি?

সাধারণত এক জাতির লোক একই ভূখণ্ডবাসী। ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ইংরাজ জাতি, ফ্রান্সের অধিবাসীরা ফরাসী জাতি। কিন্তু এক ভূখণ্ডবাসী সকল লোক যে সকল ক্ষেত্রে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা নহে; এক রাষ্ট্রে একাধিক জাতির বাস থাকিতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে জার্মান, শ্লাভ, ইটালীয়ান প্রভৃতি নানা জাতির বাস ছিল। আবার দীর্ঘকাল বিভিন্ন দেশে বাস করিয়াও ইহুদীরা জাতীয়তাবোধ রক্ষা করিয়াছে।

সাধারণত এক জাতির লোক একই ভাষায় কথা বলে। ইংরাজ জাতির ভাষা ইংরাজী, ফরাসী জাতির ভাষা ফরাসী। কিন্তু এক জাতির লোক যে সকল ক্ষেত্রে একই ভাষায় কথা বলিবে তাহা নহে। বেলজিয়মে দুইটি ভাষা, সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি ভাষা ব্যবহৃত হয়—যদিও ইহার প্রত্যেকটিতে মাত্র একটি জাতির বাস। সোভিয়েত রাশিয়ার বহুভাষাভাষী বিভিন্ন জনসমষ্টির জাতীয় ঐক্য বোধ ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছে।

অনেক সময় এক জাতির লোক একই ধর্মাবলম্বী হয়। কিন্তু ধর্ম জাতি গঠনের অপরিহার্য উপাদান নহে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বী অধিবাসীরা সম্মিলিত হইয়া এক জাতি গঠন করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্মসম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে এক জাতি গঠন করিয়াছে।

পূর্বে কুলগত ঐক্য (racial unity) জাতিগঠনের একটি প্রধান উপাদান রূপে গণ্য হইত। ইহুদীদের ক্ষেত্রে এই মতের সার্থকতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে কুলের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। জার্মান ও ইংরেজ—উভয় জাতিই টিউটন (Teuton) কুলোদ্ভব, কিন্তু তাহারা কখনও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই।

যে জনসমষ্টির মধ্যে চিন্তায়, ঐতিহ্যে, আচার-ব্যবহারে ঐক্য আছে তাহাকে অনেক সময় জাতি বলা যায়। পৃথিবীর—বিশেষত ইউরোপের—নানা দেশের লোক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বাস করিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে ; পূর্বে তাহাদের মধ্যে ভাষায়, চিন্তায়, ঐতিহ্যে, আচার-ব্যবহারে যে পার্থক্য ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে জাতি গঠনের প্রধান উপাদান রাজনৈতিক চেতনা (political consciousness)। জাতীয়তাবোধ প্রধানত একটি মানসিক ভাব মাত্র। যে জনসমষ্টি মনে করে যে তাহারা একটি জাতি তাহাকেই পৌরবিজ্ঞান জাতি রূপে স্বীকার করে। এইরূপ মনে-করার পশ্চাতে নানাবিধ কারণ থাকিতে পারে—যেমন, একই ভূখণ্ডে বাস, একই ভাষা ব্যবহার, একই ধর্মে বিশ্বাস, আচার-ব্যবহারে ঐক্য ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কারণ (বা ইহার মধ্যে কয়েকটি) থাকুক বা না থাকুক, যে জনসমষ্টি নিজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়াছে তাহাকে আমরা জাতি বলিয়া স্বীকার করিব।

অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণে এই জাতীয়তাবোধের বা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উদ্ভব হয়। যে জনসমষ্টি দীর্ঘকাল একসঙ্গে পরাধীনতার দুঃখ ভোগ করে তাহা একই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে। এজন্য কোন কোন মনীষী বলিয়াছেন যে জাতীয়তার ধারণা সম্পূর্ণ ভাবগত, ইহার কোন বাস্তব ভিত্তি না-ও থাকিতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব ভিত্তির সহিত ভাবের ভিত্তির সংযোগে জাতীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি বিচ্ছিন্ন জনসমাজ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একটি জাতিতে পরিণত হয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self-determination)—ইংরাজ মনীষী মিল (John Stuart Mill) বলিয়াছেন, "জাতির সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সহিত সমানুপাতিক হওয়া উচিত।" অর্থাৎ—(১) এক রাষ্ট্রে একাধিক জাতি বাস করিবে না; এবং (২) এক জাতি বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাষ্ট্রে বাস করিবে না। "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" ("One nation, one State")—পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র এই নীতি অনুসারে গঠিত হইলে কোন রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকিবে না, প্রত্যেক জাতি নিজের রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাইবে।

অনেক মনীষী ও রাজনৈতিক নেতা প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের অধিকার স্বীকার করেন। এই অধিকারকে বলা হয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই অধিকার পাইলে প্রত্যেক জাতি নিজের ঐতিহ্য ও আদর্শ অনুসারে নিজের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন (Wilson) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি সরকারী ভাবে স্বীকার করেন এবং তাঁহার প্রভাবে এই নীতির ভিত্তিতে ইউরোপের কোন কোন অংশে নূতন ভাবে রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু নানাবিধ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই ব্যবস্থা আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই।

সাধারণভাবে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির মূল্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি ঐক্যবদ্ধ ভাবে এক একটি রাষ্ট্রে বাস করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা কখনও সম্ভব হইবে না। আর সম্ভব হইলেও এইরূপ ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রে সুফল প্রদান করিবে না। ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া যাইবে, পৃথিবীতে শান্তির পরিবর্তে নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে ও সমবেত প্রচেষ্টায় যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহাতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়। তাই অনেকে মনে করেন, "এক জাতি এক রাষ্ট্র" নীতির অনুসরণ না করিয়া এক রাষ্ট্রে একাধিক জাতির মিলিয়া মিশিয়া বাস করাই ভাল।

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ—অতি প্রাচীন কালেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুতার ও শত্রুতার সম্বন্ধ ছিল। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেলুকস মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই শত্রুতার সম্বন্ধ শেষে বন্ধুতায়

পরিণত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আসিয়াছিলেন সেলুকসের দূত মেগাস্থিনিস। অশোক পশ্চিম এশিয়া, গ্রাস ও মিশরের কয়েকজন গ্রীক রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কোথায় গ্রীস, আর কোথায় ভারতবর্ষ! আলেকজাণ্ডার গ্রীস হইতে সৈন্য আনিয়াছিলেন ভারতবর্ষে যুদ্ধ করিতে, আর অশোক গ্রীসে ও মিশরে লোক পাঠাইয়াছিলেন মৈত্রী ও শান্তির বাণী প্রচার করিতে!

আজকাল নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদান অত্যন্ত সহজ হইয়াছে। আগে ইংলণ্ড হইতে সমুদ্রপথে ভারতে আসিতে কয়েক মাস লাগিত; এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লণ্ডন হইতে বিমানে কলিকাতায় পৌছান যায়। কলিকাতায় বসিয়া টেলিফোনে লণ্ডনের লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়। এই বিরাট পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। দূরত্বের পরিবর্তে আসিয়াছে নৈকট্য। কিন্তু হিংসা ও শত্রুতার পরিবর্তে প্রীতি ও মৈত্রী আসিয়াছে কি?

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে দুইটি ভয়াবহ মহাসমর সংঘটিত হইয়াছে। দুইটিরই উৎপত্তি হইয়াছিল ইউরোপে; পরে নানাকারণে ইউরোপের বাহিরে উহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে দেখা গেল যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িয়াছে, এক অঞ্চলে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অন্যান্য অঞ্চল শান্তিতে থাকিতে পারে না। তখন বিভিন্ন জাতি যাহাতে মারামারি-কাটাকাটি না করিয়া বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা দ্বারা শান্তিপূর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করিতে পারে সেজন্য চেষ্টা সুরু হইল।

জাতিসঙ্ঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (League of Nations and United Nations)—প্রথম মহাসমরের পরে পৃথিবীতে শান্তি এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) নামক একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। নানা কারণে দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জাতিসঙ্ঘ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত না হইয়া বরঞ্চ জাতিতে জাতিতে হিংসা ও বিদ্বেষ বাড়িয়া গেল। ইহার ভয়াবহ ফল দ্বিতীয় মহাসমর।

দ্বিতীয় মহাসমরের মারাত্মক ধ্বংসলীলা আবার মানুষের মনে শান্তিকামনা প্রবল করিয়া তুলিল। জাতিসঙ্ঘ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী আর একটি

বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। ফলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' (United Nations) নামক নূতন বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই কার্যে অগ্রণী হইয়াছিল তিনটি রাষ্ট্র—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং সোভিয়েত রাশিয়া।

একটি সনদে (Charter) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, গঠন-পদ্ধতি ও কার্য-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। উহা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো নগরে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর তারিখে সনদটি কার্যকর হয়। ঐ তারিখটিকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মদিন বলিয়া গণ্য করা হয়। এই নবজাত বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান যদি পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভিন্ন জাতিকে অচ্ছেদ্য মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে তবে ঐ দিনটি মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এখনও পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ইহার সভ্য নহে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাম্যবাদী চীন এখনও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে আছে। যে সকল রাষ্ট্র জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পরে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে সনদে স্বাক্ষর করিয়াছিল তাহারাই এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের মৌলিক সভ্য (Original Member)। ভারতবর্ষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মৌলিক সভ্যদের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল রাষ্ট্র মৌলিক সভ্য নহে তাহারাও সভ্য হইতে পারে; তবে তাহাদিগকে শান্তিপ্রিয় হইতে হইবে এবং সনদে উল্লিখিত কর্তব্যসমূহ পালনে ইচ্ছুক এবং সমর্থ হইতে হইবে। যে রাষ্ট্র বিশ্বমৈত্রী স্থাপনে বিশ্বাসী নহে তাহাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে রাখাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য-সংখ্যা ১০১।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য (Purposes of United Notions)—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যগুলি ইহার সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইবে এবং অন্যায় আক্রমণ ও শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দূর করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। সহজ কথায় বলিতে গেলে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা এবং অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত রাষ্ট্রকে দমন করা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, কোন আন্তর্জাতিক কলহ বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা

উপস্থিত হইলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে সেই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যুদ্ধ দ্বারা কোন কলহের মীমাংসার চেষ্টা করা হইবে না—এই নীতি মানিয়া লইতে হইবে। তৃতীয়ত, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজের রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে—ইহারই নাম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। আর প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার থাকিবে, অর্থাৎ বড় বা শক্তিশালী জাতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিবে না। এই দুইটি মূল নীতি মানিয়া লইলেই ছোট-বড় সকল জাতির মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হইতে পারে। যতদিন শক্তিশালী জাতির মনে দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছা থাকিবে, যতদিন দুর্বল জাতির মনে স্বাধীনতা হারাইবার আশঙ্কা থাকিবে, ততদিন জাতিতে জাতিতে মারামারি-কাটাকাটি বন্ধ হইতে পারে না। চতুর্থত, কেবলমাত্র যুদ্ধ নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সকলের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা পৃথিবীর আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে।* অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর প্রচেষ্টায় সমুদয় রাষ্ট্র নিয়োজিত থাকিবে। যুদ্ধ নিবারণ, মৈত্রী স্থাপন ও কল্যাণ

---

* U. N. Charter, Article 1 :

"The Purposes of the United Nations are :

1. To maintain international peace and security, and to that end : to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace ;

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace ;

3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion ; and

4. To be a centre for harmonising the action of nations in the attainment of those common ends.

সাধন—এই তিনটি মহান্ উদ্দেশ্য সকল জাতিকে অনুপ্রাণিত করিবে। তাহাদের সম্মিলিত কর্মের কেন্দ্র হইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূলনীতি (Basic Principles of United Nations)—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যপদ্ধতি কয়েকটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, ইহার প্রত্যেক সভ্যের মর্যাদা ও অধিকার সমান। সবল ও দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। যে মর্যাদা ও অধিকার সবলকে দেওয়া হয় তাহা হইতে দুর্বলকে বঞ্চিত করা হইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি কোন সভ্যের সহিত অপর কোন রাষ্ট্রের বিরোধ উপস্থিত হয় তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, যদি কোন সভ্য অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তবে অন্যান্য সভ্যগণকে সেই ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য বা অর্থ চায় তবে তাহা দিতে হইবে এবং কোন প্রকারে শাস্তিভাজন সভ্যকে সাহায্য করা চলিবে না। চতুর্থত, যে সকল রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য নহে তাহাদিগকেও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য উহার নীতি ও নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। সাধারণত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি ও নিয়ম উহার সভ্যগণের প্রতিই প্রযোজ্য। কিন্তু উহার সভ্য নহে এমন কোন রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের উদ্যোগ করে তবে তাহার প্রতিও ঐগুলি প্রয়োগ করা হইবে। পঞ্চমত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম, তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে তাহার নিজের কর্তৃত্বাধীন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ (General Assembly of United Nations)—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য পরিচালনার ভার প্রধানত দুইটি পরিষদের উপর ন্যস্ত। প্রথমটির নাম সাধারণ পরিষদ (General Assembly), দ্বিতীয়টির নাম নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত সকল রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদের সভ্য। প্রত্যেক রাষ্ট্র এই পরিষদে পাঁচ জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভোট মাত্র একটি। প্রতি বৎসর সাধারণত এই পরিষদের মাত্র একটি অধিবেশন বসে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত অধিবেশন ডাকিবার ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ পরিষদ মুখ্যতঃ একটি আলোচনা-সভা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লিখিত সকল বিষয় সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা হইতে পারে। ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে ইহা যে কোন সভ্যকে নির্দেশ দিতে এবং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ পরিষদের নির্দেশ ও সুপারিশ বাধ্যতামূলক নহে, অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদ উহা মানিতে বাধ্য নহে। রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করাই সাধারণ পরিষদের প্রধান কাজ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের উপর ইহার অনেকখানি কর্তৃত্ব আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council of United Nations)—নিরাপত্তা পরিষদই প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্যগণের মধ্যে মাত্র ১১টি রাষ্ট্র এই পরিষদের সভ্য। ইহার মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সভ্য—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া ও জাতীয়তাবাদী চীন।* বাকী ছয়টি অস্থায়ী সভ্য দুই বৎসরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ভারত একবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিল। নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সভ্য মাত্র একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। এই পরিষদের কাজ অনবরত চলে। পাঁচটি স্থায়ী সভ্য একমত না হইলে কোন গুরুতর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কার্য। ইহা সাধারণ পরিষদের ন্যায় আলোচনা-সভা মাত্র নহে ; ইহার যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা তাহা অনেকাংশে নিরাপত্তা পরিষদের নীতি ও কার্যদক্ষতার উপর নির্ভর করিবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council of United Nations)—পৃথিবী হইতে যুদ্ধের বিভীষিকা

---

* সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন চীনে কুওমিন্টাঙ্ দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং ঐ সরকারই তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের আসন অধিকার করিয়াছিল। পরে কমিউনিস্ট দল কুওমিন্টাঙ্ সরকারকে বিতাড়িত করিয়া চীনে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কুওমিন্টাঙ্ সরকারই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের আসন অধিকার করিয়া আছে, ঐ আসনে কমিউনিস্ট সরকারের অধিকার এখনও স্বীকৃত হয় নাই।

দূর করিতে হইলে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলেই চলে না। অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৮টি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সভ্য। বিভিন্ন জাতির অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে এই পরিষদ আলোচনা করিতে পারে। ঐ সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য এবং মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ("human rights and fundamental freedoms") রক্ষার জন্য এই পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্যগণের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই সকল সুপারিশ গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে কোন বিষয়ের আলোচনা হইলে তাহা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরূপে পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর পথ প্রশস্ত হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদ (Trusteeship Council of United Nations)—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিকে অছি পরিষদের (Trusteeship Council) কর্তৃত্বাধীনে রাখা হইয়াছে। এই সকল জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন অছি পরিষদের প্রধান লক্ষ্য। আর একটি লক্ষ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। পূর্বে অনুন্নত জাতিসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তারের লোভে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কলহে লিপ্ত হইত। অছি পরিষদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঐভাবে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কয়েকজন সভ্য দ্বারা অছি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ সাধারণ পরিষদের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অধীন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)—আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) একটি স্থায়ী আদালত এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান অঙ্গ। সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ এই বিচারালয়ের বিচারকদিগকে নির্বাচন করে। বিচারকেরা খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ব্যক্তি হইবেন এবং সাধারণত আন্তর্জাতিক আইন (Inter-

national Law) সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিবে। আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন, কোন সন্ধির সর্তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ, আন্তর্জাতিক আইন বা রীতি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ—সাধারণত এই সকল বিষয় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের জন্য দাখিল করা হয়। কোন রাষ্ট্রের কোন নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে এখানে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে না। কেবলমাত্র কোন রাষ্ট্রই এখানে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরখানা (Secretariat of United Nations)— সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনের জন্য আমেরিকার অন্তর্গত নিউ ইয়র্ক শহরে একটি বিরাট দপ্তরখানা (Secretariat) আছে। একজন প্রধান কর্মসচিব (Secretary-General) ইহার পরিচালক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্যগণের প্রদত্ত অর্থে এই দপ্তরখানার ব্যয় নির্বাহ হয়। ভারতকে এজন্য প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ দিতে হয়।

ভারত শান্তিকামী দেশ। ভারতের সংবিধানে বলা হইয়াছে : রাষ্ট্র (অর্থাৎ ভারত) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্বন্ধ রক্ষা করিবে, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধিসমূহের সর্ত পালনে উৎসাহ দিবে এবং মধ্যস্থতা দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা সমর্থন করিবে। আমাদের রাষ্ট্রের এই সকল উদ্দেশ্যের সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যসমূহের পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সুতরাং ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য কামনা করা এবং সর্বপ্রকারে ইহার সহিত সহযোগিতা করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন

1. Describe the constitution of the United Nations. (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠন বর্ণনা কর।) (৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা)

2. Describe the purposes and functions of the United Nations. (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বর্ণনা কর)। (৬১-৬৩ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌরবিজ্ঞান

দশম শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

W. B. Secondary Education Board
Syllabus in Civics for Class X

8. The Citizen ; how citizenship is acquired and lost ; qualities of a good citizen ; hindrances to good citizenship.

9. The citizen's rights. The Right to Vote : its importance and implications.

10. The citizen's duties—to the family, to the community, to the State.

11. Rights and Duties.

12. Law and Liberty.

13. Public Services.

14. Public Opinion. Organs of Public Opinion.

15. Political parties.

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকতা

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রগঠনের জন্য চারিটি প্রধান উপাদান প্রয়োজন : ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার, সার্বভৌমিকতা। এই জনসমষ্টিকে সাধারণভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—নাগরিক ও বিদেশী।

নাগরিক (Citizen)—সাধারণভাবে বলিতে গেলে নাগরিক অর্থে নগরের অধিবাসী বুঝায়। যেমন, কলিকাতার অধিবাসীকে বলা হয় কলিকাতার নাগরিক (Citizen of Calcutta)। পৌরবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। প্রাচীন গ্রীসে অনেকক্ষেত্রে একটিমাত্র নগর লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হইত। ইহাকে বলা হইত নগর-রাষ্ট্র (City State)। যেমন, এথেন্স ছিল প্রাচীন গ্রীসের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নগর-রাষ্ট্র। এইরূপ নগর-রাষ্ট্রের যে সকল অধিবাসী উহার সহিত প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিত (অর্থাৎ যাহারা সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনায় অংশ গ্রহণের অধিকারী ছিল) তাহাদিগকে নাগরিক বলা হইত। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিধি প্রসারিত হইয়াছে, একটি নগর লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় না। তথাপি রাষ্ট্রের সহিত আনুগত্য ও অধিকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়।

বিদেশী (Alien) অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতি তাহার স্থায়ী আনুগত্য ; সে কোন কার্য উপলক্ষে এই রাষ্ট্রে অস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে মাত্র। সুতরাং এই রাষ্ট্রে তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার (যেমন, ভোট দেওয়ার অধিকার, আইন সভার সভ্য হওয়ার অধিকার, ইত্যাদি) নাই, শুধু সামাজিক অধিকার (যেমন, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার অধিকার) আছে। এই রাষ্ট্রের প্রতি তাহার কর্তব্যও সীমাবদ্ধ ; যেমন, এই রাষ্ট্রের আইন অনুসারে তাহাকে কর দিতে হইবে, কিন্তু এই রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীতে যোগদান তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক হইতে পারে না।

নাগরিক (Citizen) এই রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, সর্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করে এবং সর্ববিধ কর্তব্য পালন করিতে

আইনত বাধ্য থাকে। তাহার অধিকার ও দায়িত্ব, উভয়ই বিদেশী অপেক্ষা বেশী।

নাগরিকতা লাভের উপায় (How citizenship is acquired)—নাগরিকগণকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—জন্মসূত্রে নাগরিক (Natural-born Citizen) এবং গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিক (Naturalized Citizen)।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভের দুইটি মূল নীতি আছে :—(১) শিশুর পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক শিশুও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে ; শিশু অপর কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। যেমন, ইংলণ্ডের একজন নাগরিকের পুত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিলেও সে ইংলণ্ডের নাগরিক হইবে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইবে না। (২) শিশুর পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক হউক না কেন, যে রাষ্ট্রে শিশু জন্মগ্রহণ করিবে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে। যেমন, ইংলণ্ডের একজন নাগরিকের পুত্র জাপানে জন্মগ্রহণ করিলে সে জাপানের নাগরিক হইবে, ইংলণ্ডের নাগরিক হইবে না। সমুদ্রগামী জাহাজ যে রাষ্ট্রের পতাকা বহন করে সেই রাষ্ট্রের অংশরূপে গণ্য হয়। ইংলণ্ডের একজন নাগরিকের পুত্র সমুদ্রবক্ষে ভাসমান, জাপানের পতাকাবাহী জাহাজে জন্মগ্রহণ করিলে সে জাপানের নাগরিক হইবে। এই দুইটি নীতিকে যথাক্রমে জন্ম নীতি (Jus Sanguinis) ও জন্মস্থান নীতি (Jus Soli বা Jus Loci) বলা হয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জন্ম নীতিই সমর্থনযোগ্য। সন্তানের পক্ষে পিতার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই স্বাভাবিক, ঘটনাচক্রে যে দেশে তাহার জন্ম হয় তাহার সাহত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ আকস্মিক। প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশেই জন্ম নীতি অনুসারে নাগরিকতা নির্ধারিত হইত। আধুনিক কালে কোন কোন দেশে জন্ম নীতি এবং কোন কোন দেশে জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করা হয়, আবার কোন কোন দেশ উভয় নীতিই অনুসরণ করে। ফলে অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষের নাগরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ বা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। যেমন, ইংলণ্ডের একজন নাগরিকের পুত্র ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিল ; জন্ম নীতি অনুসারে সে ইংলণ্ডের নাগরিক, জন্মস্থান নীতি অনুসারে সে ফ্রান্সের নাগরিক। ইহাকে দ্বি-জাতি সমস্যা (Double Nationality) বলা যায়। আবার এমন অবস্থাও কল্পনা করা যায় যখন নবজাত শিশু কোন রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে গণ্য হইতে পারে না। তাহাকে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি

(Stateless Person) বলা যায়। দ্বি-জাতি সমস্যা এবং রাষ্ট্রহীনতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু গোলযোগের সৃষ্টি করে।

অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা লাভ করিতে হইলে সেই রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট কতকগুলি সর্ত পূরণ করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন সর্ত প্রচলিত আছে। রাষ্ট্রের অধীনে কয়েক বৎসর বসবাস করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি প্রধান সর্ত। যেমন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন বিদেশীকে অন্তত পাঁচ বৎসর বসবাসের পূর্বে নাগরিকতালাভের সুযোগ দেয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সর্তের ব্যতিক্রম হয়। যেমন, ইংলণ্ডরাজের অধীনে পৃথিবীর যে কোন দেশে অন্তত পাঁচ বৎসর কার্য করিলে ইংলণ্ডে পাঁচ বৎসর বসবাস না করিয়াও বিদেশীর পক্ষে ইংলণ্ডের নাগরিকতা লাভ করা সম্ভব। আবার নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর ঐ দেশে বসবাস করিলেই বিদেশীর পক্ষে নাগরিকতা লাভের অধিকার জন্মে না; সে বাকী জীবন ঐ দেশে স্থায়ী ভাবে বাস করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে হয়। রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের সহিত বিবাহ, রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে বা সরকারী চাকুরীতে যোগদান, রাষ্ট্রের অধীনে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে বিদেশী অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে। আইন অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করিয়া বিদেশীকে নাগরিকতা লাভের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে হয়। সেই আবেদন সরকার কর্তৃক গ্রাহ্য হইলে তাহার নাগরিকতা লাভ হয়।

সাধারণত জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদিত নাগরিক—উভয়েই রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ সম্বন্ধে সমপর্যায়ভুক্ত থাকে, অর্থাৎ রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে তারতম্য করে না। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদ অনুমোদিত নাগরিক কখনও পাইতে পারে না।

নাগরিকতার বিলোপ (How citizenship is lost)—কোন নাগরিক বিভিন্ন কারণে নাগরিকতা হারাইতে পারে। কেহ স্বেচ্ছায় অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিলে (অর্থাৎ অনুমোদন সূত্রে অপর রাষ্ট্রের নাগরিক হইলে) নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারাইবে, কারণ কেহ একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিতে পারে না। পররাষ্ট্রের নাগরিকের সহিত বিবাহিতা স্ত্রীলোককে নিজের পূর্ব নাগরিকতা হারাইতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে নাগরিকতার পরিবর্তন হয়, একেবারে বিলোপ হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকতার সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে এমন বিধান

আছে যে কোন নাগরিক পররাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিলে, অথবা পররাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি বা পুরস্কার গ্রহণ করিলে, নাগরিকতা হইতে বিচ্যুত হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সৈন্যদল হইতে যে পলায়ন করে তাহার নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে নাগরিকতা হইতে বিচ্যুত ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন (Stateless) হইয়া পড়ে। অবশ্য সে অন্য কোন দেশের আইন অনুযায়ী সেখানকার নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে।

সুনাগরিকতা (Qualities of a good citizen)—নাগরিকদের লইয়াই রাষ্ট্র; নাগরিকদের চরিত্রবল, কর্তৃব্যনিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের উপর রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিককে সুনাগরিক হইতে হইবে।

কোন নাগরিকের কি কি গুণ থাকিলে তাহাকে সুনাগরিক বলা যায়? প্রথমত, সুনাগরিক বিবেক দ্বারা পরিচালিত ও আত্মসংযমী হইবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে। সুতরাং সুনাগরিকের জীবন ও কার্যপদ্ধতি নৈতিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। উদার দৃষ্টিভঙ্গি না থাকিলে এবং স্বার্থপর হইলে কেহ সুনাগরিক হইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সুনাগরিক বুদ্ধিমান ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সে সমাধানের উপায় নির্ধারণ করিবে এবং ঐ সকল উপায় কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিবে। রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনের জন্য তাহাকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাস্কি (Laski) বলিয়াছেন, সুনাগরিক নিজের বিচারবুদ্ধি জনসেবায় প্রয়োগ করিবে (Citizenship "is the contribution of one's instructed judgement to public good.")

সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক (Hindrances to Good Citizenship)—সুনাগরিক হওয়া সহজ নহে, সুনাগরিকতার পথে কয়েকটি প্রতিবন্ধক আছে। একটি প্রধান প্রতিবন্ধক নির্লিপ্ততা (Indolence)। রাষ্ট্রের শুভাশুভ সম্বন্ধে যে নাগরিক নির্লিপ্ত মনোভাব পোষণ করে, রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের জন্য যে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়, তাহাকে সুনাগরিক বলা যায় না। যদি কেহ মনে করে যে সে রাষ্ট্রের কোটি কোটি নাগরিকের মধ্যে একজন মাত্র, তাহার প্রত্যক্ষ সহায়তা এবং উৎসাহ

ছাড়াও রাষ্ট্রের কার্য সুসম্পন্ন হইবে, তবে তাহাকে নির্লিপ্ত নাগরিক বলা যায়। যে রাষ্ট্রে নির্লিপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বেশী তাহার উন্নতি হয় না। প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রের কার্যে সহায়তা করা এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল চিন্তা করা সকলের অবশ্য কর্তব্য। নির্লিপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বেশী হইলে রাষ্ট্র বিপন্ন হইতে পারে অথবা গণতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সুনাগরিকতার পথে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private self-interest)। যে নাগরিক রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে তাহাকে সুনাগরিক বলা যায় না। যেমন, রাষ্ট্রের প্রাপ্য কর ফাঁকি দিয়া যে নজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে চায় সে প্রকৃত-পক্ষে রাষ্ট্রের শত্রু। সুনাগরিক কখনও রাষ্ট্রের অনিষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে না, বরং নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রকে শক্তি-শালী করিবার চেষ্টা করিবে।

সুনাগরিকতার পথে আর একটি প্রতিবন্ধক দলীয় মনোভাব (Party spirit)। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে। অনেক নাগরিক কোন না কোন দলের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে; আবার অনেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন দলে যোগ দিয়াও দলবিশেষের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে এবং নির্বাচনে সেই দলকে সাহায্য করে। সাধারণভাবে এই রীতির বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, বরঞ্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সেবা করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দলীয় মনোভাব প্রবল হইয়া পড়ে, দলকে রাষ্ট্র অপেক্ষা বড় মনে করা হয়, এবং দলের শক্তিবৃদ্ধি বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কার্য করা হয়। যে নাগরিক দলীয় স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রের অনিষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হয় না তাহাকে সুনাগরিক বলা যায় না।

সুনাগরিকতার পথে এই সকল প্রতিবন্ধক দূর করিতে হইলে প্রধানত দুইটি উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রথমত, শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন দ্বারা নাগরিকগণকে রাষ্ট্র-পরিচালনা এবং জনসেবা সম্বন্ধে পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাপ্রসার প্রভৃতি কার্য দ্বারা নাগরিকগণের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। তাহাদের মনে কর্তব্য বোধ জাগ্রত করিতে পারিলে তাহারা সুনাগরিক হইবে।

প্রশ্ন

1. Explain how citizenship is acquired and lost. (নাগরিকতা লাভের উপায় এবং নাগরিকতা বিলোপের ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর।) (৭০-৭২ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between Natural-born citizens and Naturalized citizens. (জন্মসূত্রে লব্ধ নাগরিকতা এবং অনুমোদনসূত্রে লব্ধ নাগরিকতা, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।) (৭০-৭১ পৃষ্ঠা)

3. Define a citizen. What are the qualities of a good citizen ? (নাগরিকের সংখ্যা নির্দেশ কর। সুনাগরিকের গুণ কি কি?) [H. S. E., 1961]
(৬৯-৭০, ৭২ পৃষ্ঠা)

4. What are the hindrances to good citizenship ? (সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক কি কি ?) (৭২-৭৩ পৃষ্ঠা)

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

অধিকার কাহাকে বলে ? (What are Rights ?)—রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ফলে নাগরিক কতকগুলি অধিকার ভোগ করে এবং কতকগুলি কর্তব্য পালন করে। এই সকল অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতাকে অধিকার (Right) বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা কেবলমাত্র পাশবিক শক্তি দ্বারা লাভ করা যায় ; যেমন, কোন শক্তিশালী ব্যক্তি অসহায় দুর্বল ব্যক্তিকে প্রহার করিতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞান এইরূপ ক্ষমতাকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করে না ; ইহা বে-আইনী এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যবস্থা সাময়িকভাবে আইনসঙ্গত হইতে পারে। যেমন, একশত বৎসর পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং ক্রীতদাসের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার প্রভুরা আইনসঙ্গত ভাবে ভোগ করিতেন। কিন্তু এইরূপ অধিকারও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞান কর্তৃক স্বীকৃত হয় না, কারণ ইহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে।

যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইলে মানুষ সমাজের সভ্য রূপে অপরের অনিষ্ট

না করিয়া নিজের উন্নতি করিতে পারে তাহাদিগকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞান অনুযায়ী অধিকার বলা যায়। সমাজের সহিত অধিকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে অধিকারের উৎপত্তি, সমগ্রভাবে সমাজের মঙ্গলসাধন অধিকার স্বীকারের উদ্দেশ্য। সমাজের বাহিরে অধিকারের অস্তিত্ব নাই, যে মানুষ নির্জন অরণ্যে একাকী বাস করে সে কোন অধিকার ভোগ করিতে পারে না। মানুষ যাহাতে সমাজ-জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞান মানুষের অধিকার স্বীকার করে। মানুষের সামাজিক জীবনে যে সকল ক্ষমতা না থাকিলে মানুষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না তাহাদিগকে অধিকার বলা যায়।

রাষ্ট্রই বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম সামাজিক সংগঠন। এই সংগঠনের সভ্য হিসাবে—অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে—মানুষ অধিকার ভোগ করে। এই অধিকার এমন হওয়া চাই, এবং ইহা এমনভাবে ভোগ করা চাই, যেন কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের নয়—সমগ্র সমাজের মঙ্গল হয়। সুতরাং অধিকার বলিতে আমরা বুঝিব সমাজ (বা রাষ্ট্র) কর্তৃক স্বীকৃত এমন কতকগুলি সুযোগ যাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা মানুষ নিজের এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

কর্তব্য কাহাকে বলে? (What are Duties?)—অধিকারের সহিত কর্তব্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য ; অধিকার ভোগ করিতে হইলেই কর্তব্য পালন করিতে হয়। কর্তব্য অর্থে কোন কিছু করার বা না করার দায়িত্ব বুঝিতে হইবে। যেমন, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করা এবং রাষ্ট্রের আইন অমান্য না করা। এগুলি আইনসঙ্গত কর্তব্য। যে এগুলি পালন না করে তাহাকে রাষ্ট্রবিরোধী বলা যায়। ইহা ছাড়া কতকগুলি নৈতিক কর্তব্য আছে, যাহা পালন না করিলে সমাজের অমঙ্গল [illegible]য়, দরিদ্রকে সাহায্য করা উচিত, ভিক্ষুককে দুর্বাক্য বলা উচিত নয়। আইনসঙ্গত কর্তব্য পালন না করিলে আইন অনুসারে শাস্তি হইতে পারে। নৈতিক কর্তব্য পালন না করিলে রাষ্ট্র শাস্তি দেয় না, কিন্তু সমাজ ধিক্কার দেয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার (Different Classes of Rights)—কর্তব্যের ন্যায় অধিকারকেও দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—নৈতিক অধিকার (Moral Rights) এবং আইনসঙ্গত অধিকার (Legal Rights)। যে সকল অধিকার মানুষের ন্যায়বোধ এবং শুভবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে নৈতিক অধিকার বলা যায়। কোন নাগরিক এইসকল অধিকার ভোগ করিতে না পারিলে সে

রাষ্ট্রের কাছে প্রতিকার আশা করিতে পারে না। যেমন, সকলেরই অপরের নিকট হইতে ভদ্র ব্যবহার পাইবার অধিকার আছে ; কিন্তু রাম শ্যামের সহিত ভদ্র ব্যবহার না করিলে শ্যাম আইনের সাহায্যে রামকে ভদ্র ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারে না। কিন্তু রাজপথে চলিবার আইনসঙ্গত অধিকার শ্যামের আছে, সেই অধিকার ভোগে রামের নিকট হইতে বাধা পাইলে শ্যাম রামকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিতে পারে। তবে কেবলমাত্র আইনসঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পারিলেই নাগরিকের জীবন সুষ্ঠু ও সুখকর হয় না, নৈতিক অধিকার ভোগের যথেষ্ট সুযোগও প্রয়োজন। অতএব সুপরিচালিত সমাজে নাগরিকের নৈতিক অধিকারগুলিও স্বীকৃত এবং রক্ষিত হয়।

আইনসঙ্গত অধিকারগুলিকে আবার দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— সামাজিক বা পৌর অধিকার (Civil Rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)। যে সকল অধিকার না পাইলে মানুষ সভ্যভাবে জীবন যাপন করিতে পারে না তাহাদিগকে সামাজিক অধিকার বলা যায়। যেমন,—জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার প্রভৃতি সভ্য জীবন যাপনের পক্ষে অপরিহার্য। যে দেশে এই সকল অধিকার স্বীকৃত ও রক্ষিত না হয় সেই দেশে সভ্য মানুষ বাস করিতে পারে না। আবার যে সকল অধিকার মানুষকে রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় তাহাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার বলা যায় ; যেমন, ভোট দেওয়ার অধিকার, আইনসভার সভ্যপদ ও মন্ত্রিত্বলাভের অধিকার, ইত্যাদি। এই সকল অধিকার নাগরিকতার পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ এগুলি না পাইলে মানুষের রাজনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক বা পৌর অধিকার (Different Kinds of Civil Rights)—বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে সামাজিক (বা পৌর) অধিকারের তারতম্য ঘটে। তথাপি কতকগুলি সামাজিক (বা পৌর) অধিকার সকল দেশ ও কাল সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য।

(১) **জীবনরক্ষার অধিকার**—মানুষের জীবন নিরাপদ না হইলে, তাহার জীবন-ধারণের অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে, সে অন্য কোন অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পায় না। সুতরাং মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্য রাষ্ট্রকে সৈন্যদল ও পুলিশ রাখিতে হয়। যে অপরের প্রাণ হরণ করে বা করিবার চেষ্টা করে তাহাকে

শাস্তি দিবার জন্য রাষ্ট্রকে বিচারালয় ও কারাগার রাখিতে হয়। আবার প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জীবন রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার আইনসঙ্গত উপায়ে চেষ্টা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের প্রাণ নষ্ট করিবার অধিকার কাহারও নাই। আত্মহত্যার চেষ্টা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ।

(২) **ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার**—মানুষের পক্ষে কেবল পশুপক্ষীর মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ও সুযোগ পাইলেই চলে না, সহজ ও স্বাধীন জীবন তাহার কাম্য। তাহার গতিবিধির উপর অযথা নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না, বিনা কারণে বা অন্যায়ভাবে তাহাকে আটক রাখা যাইবে না—তবেই সে বাঁচিবার মত বাঁচিতে পারিবে। যে নাগরিকের গতিবিধির পূর্ণ স্বাধীনতা নাই তাহার অবস্থা কারাগারে আবদ্ধ বন্দী বা ক্রীতদাসের মত হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে। তবে যুদ্ধের সময়ে, অথবা কোন আভ্যন্তরীণ কারণে রাষ্ট্রের বিপদ ঘটিলে এই অধিকার সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইলে নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা হয়।

(৩) **মত প্রকাশের অধিকার**—প্রত্যেক মানুষের নানা বিষয়ে নিজস্ব মত থাকিতে পারে। ঐ মত সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর না হইলে উহা প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার আছে। যেমন, যদি কাহারও এইরূপ মত থাকে যে, ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা না দিয়া খুন করা উচিত তবে তাহা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। তাহাকে এই মত প্রকাশের স্বাধানতা দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। সুতরাং এইরূপ অধিকার তাহাকে দেওয়া সঙ্গত হইবে না। কিন্তু যদি কাহারও এইরূপ অভিমত থাকে যে দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সরকারী খরচে ভরণ-পোষণ করা উচিত তবে তাহা প্রকাশের স্বাধীনতা তাহাকে দেওয়া উচিত, কারণ এইরূপ ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। যে মত সমাজের স্থিতি ও উন্নতির বিরোধী নহে তাহা প্রকাশের এবং প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষেরই থাকা উচিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়।

বাক্য দ্বারা এবং লেখা দ্বারা মত প্রকাশ করা যায়। কোন নাগরিক কোন বিষয়ে অপর নাগরিকদিগকে তাহার নিজের মত জানাইতে চাহিলে সে কথাবার্তায় বা বক্তৃতার মারফৎ উহা জানাইতে পারে, অথবা বই বা সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়াও জানাইতে পারে। মত প্রকাশের এই দুই প্রকার পদ্ধতি সম্বন্ধেই নাগরিকের অধিকার স্বীকার করা উচিত।

অন্যান্য অধিকারের ন্যায় মত প্রকাশের অধিকারও সর্বদা অবাধে ব্যবহার করা যায় না। রাষ্ট্রের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য সময় সময় উহা খর্ব করিতে হয়। যে কথা বা বক্তৃতা বা রচনা দ্বারা কোন ব্যক্তির মানহানি হয়, অথবা রাষ্ট্রের সুনাম বা নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা আপত্তিজনক। মত প্রকাশের অধিকার আপত্তিজনক ভাবে ব্যবহৃত হইলে রাষ্ট্র তাহা খর্ব করিতে পারে।

(৪) **সম্পত্তির অধিকার**—প্রত্যেক মানুষের আইনসঙ্গত উপায়ে সম্পত্তি অর্জনের এবং উহা ভোগ করিবার অধিকার আছে। অনেকে মনে করেন, এই অধিকার স্বীকার না করিলে মানুষের কর্মস্পৃহা কমিয়া যায়, সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। 'ক' যদি জানে যে সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না, তাহার সঞ্চিত ধনে রাষ্ট্রের বা অপর কোন ব্যক্তির অধিকার জন্মিবে, তবে সে বেশী পরিশ্রম করিবে কেন? এই জন্য রাষ্ট্র নাগরিকের সম্পত্তিতে তাহার ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করে, সেই সম্পত্তি চোর-ডাকাতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করে এবং কেহ অপরের সম্পত্তি হরণ করিলে তাহাকে শাস্তি দেয়।

কিন্তু বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে এই পুরাতন ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হইতেছে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য, অথবা সমাজের বা জাতির কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য, নাগরিকের সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার খর্ব করা যাইতে পারে। অনেক সময় সমাজের বৃহত্তর অংশের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র ব্যক্তি-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষের সম্পত্তি কাড়িয়া লয়। যেমন, বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের মঙ্গলের জন্য জমিদারদের সম্পত্তি সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়া কাড়িয়া নেওয়া হইতেছে। কাশ্মীরে ক্ষতিপূরণ না দিয়াই জমিদারী কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহাতে জমিদারদের সম্পত্তির অধিকার নষ্ট হইতেছে, কিন্তু সমগ্র রাষ্ট্রের ও সমাজের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে ইহা করা হইতেছে।

(৫) **পরিবার গঠনের অধিকার**—কতকগুলি পরিবার লইয়া সমাজ গঠিত হয়। পরিবার গঠন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পরিবারের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য। রাষ্ট্রের আশ্রয়ে ও আইনের রক্ষণাধীনে পরিবার গঠনের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। পরিবার সমাজ-বন্ধনের একটি মূল গ্রন্থি। রাষ্ট্র পরিবার রক্ষার দায়িত্ব না লইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।

(৬) **সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার**—মানুষ সামাজিক জীব। সে অন্য মানুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। বিচ্ছিন্নভাবে একক জীবন যাপন

করিতে কাহারও ভাল লাগে না। এই জন্যই বহু মানুষ সম্মিলিত হইয়া নানাপ্রকার সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে। সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার না পাইলে মানুষ কেবল যে আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকে তাহা নহে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগও তাহার হয় না। অনেক মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে একে অন্যের সহযোগিতায় আত্মোন্নতির সুযোগ পায়, তাহার ফলে পরোক্ষভাবে সমগ্র সমাজ ও জাতি উপকৃত হয়। এইজন্যই রাষ্ট্র নাগরিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার স্বীকার করে।

কিন্তু কোন নাগরিক যদি সেই অধিকার রাষ্ট্র বা সমাজ বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তবে তাহা সঙ্কুচিত করা বা কাড়িয়া লওয়া হয়। যেমন, কয়েকজন মানুষ যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা কাহাকেও খুন করিবার জন্য, সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবে রাষ্ট্র তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিবে।

(৭) **চুক্তির অধিকার**—আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেকাংশে চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কল-কারখানায় যখন শ্রমিক নিযুক্ত হয় তখন তাহাদের বেতন ও কার্যের সর্তাদি সম্বন্ধে মালিকের সহিত চুক্তি হয়। একজন ব্যবসায়ী যখন অন্য একজন ব্যবসায়ীর নিকট মাল বিক্রয় করিতে চায় তখন উহার মূল্য, হস্তান্তরের সময় ইত্যাদি বিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি হয়। উভয় পক্ষ সাধারণত চুক্তি অনুসারে কাজ করে বলিয়াই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না। এইজন্যই নাগরিকের চুক্তির অধিকার থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এই অধিকার যদি সমাজ-বিরোধী বা রাষ্ট্র-বিরোধী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তবে রাষ্ট্র ইহা সঙ্কুচিত করিতে বা কাড়িয়া লইতে পারে। যেমন, কয়েকজন লোক যদি সরকারের প্রাপ্য কর ফাঁকি দিবার জন্য পরস্পরের সহিত চুক্তি করে তবে তাহা বে-আইনী হইবে।

(৮) **ধর্মবিশ্বাসের অধিকার**—প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস থাকিতে পারে। যদি ঐ ধর্মবিশ্বাস সমাজের বা রাষ্ট্রের বিরোধী না হয় তবে উহা রাষ্ট্র কর্তৃক রক্ষিত হইবে। মনে কর, একজন নাগরিকের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে নরবলি দেওয়া পুণ্য অর্জনের উপায়। তাহাকে ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে দিলে সমাজের ক্ষতি হইবে। তাই রাষ্ট্র ঐ নাগরিককে তাহার

বিশ্বাস পোষণের অধিকার না দিয়া বরঞ্চ তাহাকে শাস্তি দিবে। আবার মনে কর, একজন নাগরিকের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহার যুদ্ধ করা কর্তব্য। ঐ বিশ্বাস পোষণের জন্য সে রাষ্ট্রের কাছে শাস্তিভাজন হইবে। কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাস সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরোধী নয়, তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার করে এবং কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে শাস্তি দেয়। রাষ্ট্রের আশ্রয়ে প্রত্যেক নাগরিক নীতিসঙ্গত ও আইনসঙ্গত ধর্মবিশ্বাস অনুসারে ধর্মকার্য সম্পাদন করিতে পারে।

(৯) **সাংস্কৃতিক অধিকার**—প্রত্যেক নাগরিকের নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার আছে। ভারতের সংবিধান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগরিকগণের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার স্বীকার করিয়াছে। ভারতের কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উপর কোন ভাষা বা সংস্কৃতি জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে পারে না।

বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক অধিকার (Different Kinds of Political Rights)—যে সকল রাজনৈতিক অধিকার না পাইলে নাগরিকেরা সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর জীবনে এবং শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি প্রধান।

(১) **বসবাস করিবার অধিকার**—সাধারণত প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের যে কোন অংশে বসবাস করিতে অধিকারী। কেবলমাত্র সামরিক কারণে অথবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই অধিকার সঙ্কুচিত করা বা কাড়িয়া লওয়া যায়। যেমন, যুদ্ধের সময় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে লোকের বসবাস বা চলাচল করিবার অধিকার সঙ্কুচিত করা বা কাড়িয়া লওয়া যায়।

রাষ্ট্রে বসবাস করিবার অধিকার বিদেশীদের নাই। তাহাদের বসবাস রাষ্ট্রের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে।

(২) **নির্বাচনের অধিকার**—এই অধিকার দুই প্রকার:—নির্বাচন করিবার (অর্থাৎ ভোট দিবার) অধিকার এবং নিজে নির্বাচিত হইবার (অর্থাৎ অপরের ভোট পাইবার) অধিকার। এই দুই প্রকার অধিকার না পাইলে কেহ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

ভোট দিবার অধিকার নাগরিকগণের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোট দিবার অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভোটদাতা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটদাতাদের প্রতিনিধিরা শাসনকার্য নির্বাহ করে এবং আইনপ্রণয়ন করে। তাহাদের কার্যে ভোটদাতারা অসন্তুষ্ট হইলে তাহারা ক্ষমতাচ্যুত হয়। সুতরাং ভোটদাতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্র-পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভোটদানপ্রথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি।

বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সার্বজনীন ভোটাধিকার (universal franchise) স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (adult franchise)। ভোট দিবার এবং ভোট পাইবার অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের আইনে কিছু কিছু বাধানিষেধ আছে।

বিদেশীদের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার নাই। সুতরাং তাহাদের আইন সভায় নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার নাই।

(৩) **আবেদন করিবার অধিকার**—প্রত্যেক নাগরিকের শাসন-কর্তৃপক্ষ এবং আইনসভার নিকট অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আবেদন করিবার অধিকার আছে। এইরূপ আবেদনের উদ্দেশ্য অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপযুক্ত প্রতিকার লাভের ব্যবস্থা করা। অবশ্য আবেদন পাইলেই কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর প্রার্থনা অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য নহেন।

(৪) **সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকার**—প্রত্যেক নাগরিকের সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকার আছে। অবশ্য যোগ্যতা না থাকিলে কেহই কোন চাকুরি দাবি করিতে পারে না।

বিদেশীদের যোগ্যতা থাকিলেও সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকার তাহাদের নাই। কিন্তু রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করিলে বিদেশীকে চাকুরি দিতে পারে। এইরূপ নিয়োগ বিদেশীদের পক্ষে অনুগ্রহ লাভ মাত্র—অধিকার নয়।

(৫) **বিদেশে বাসকালে সাহায্য লাভের অধিকার**—প্রত্যেক নাগরিক বিদেশে থাকা কালে কোনরূপ অন্যায় বা অবিচারের বিরুদ্ধে ঐ দেশের সরকারের সাহায্য না পাইলে নিজ রাষ্ট্রের নিকট সাহায্য দাবি করিতে পারে। তুমি যদি আমেরিকায় বাসকালে আমেরিকার কোন নাগরিক বা আমেরিকার সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হও এবং আমেরিকার সরকার তোমাকে ন্যায় বিচার লাভের উপযুক্ত সুযোগ না দেয়, তবে ভারত সরকার তোমার স্বার্থরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। অনেক সময় নাগরিকের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য—এমন কি, সংঘর্ষ—দেখা দেয়।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য (Citizen's duties to the State)—নাগরিকগণের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, তেমনি তাহাদের কতকগুলি কর্তব্যও আছে। অধিকার ভোগ করিতে হইলেই কর্তব্য পালন করিতে হয়।

(১) **আনুগত্য**—রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা নাগরিকগণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, কারণ রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের স্থায়ী সম্বন্ধ। বিদেশীরা রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নহে, কারণ রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অস্থায়ী। রাষ্ট্রকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং সকল ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকিতে প্রত্যেক নাগরিক বাধ্য। বৈদেশিক আক্রমণে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে নাগরিক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া দেশের জন্য যুদ্ধ করিবে। দেশে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে নাগরিক শান্তিস্থাপনে সরকারী কর্মচারিগণের সহিত সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করিবে। সাধারণ সময়ে শাসনকার্য যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে সেজন্য নাগরিক সচেষ্ট থাকিবে। সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের সহযোগিতা করা যথার্থ আনুগত্যের চিহ্ন। নাগরিকগণের আনুগত্য না পাইলে রাষ্ট্রের উন্নতি হয় না—এমন কি, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।

(২) **আইন মান্য করিয়া চলা**—দেশে শান্তিরক্ষার জন্য এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং যে সকল নাগরিক দেশের ও সমাজের মঙ্গল চায়, তাহাদের পক্ষে আইন মান্য করিয়া চলা অবশ্য কর্তব্য। যে স্বভাবতই আইন অমান্য করে, সে কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক নহে।

নিজে আইন মান্য করিয়া চলাই যথেষ্ট নয়; অপরে যাহাতে আইন মান্য করিয়া চলে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও নাগরিকের কর্তব্য। অধিকাংশ নাগরিক যদি আইন মান্য করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন না থাকে তবে রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে না। নাগরিকগণ সমগ্রভাবে যাহাতে আইন মান্য করে সেজন্য প্রত্যেক নাগরিককে সতর্ক থাকিতে হইবে।

(৩) **কর প্রদান**—টাকা না থাকিলে রাষ্ট্রের কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সমাজের উন্নতিমূলক নানাবিধ কার্য (যেমন, শিক্ষাবিস্তার) করা—সকল ক্ষেত্রেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকদের প্রদত্ত অর্থই রাষ্ট্রের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। অতএব প্রত্যেক নাগরিকের উচিত তাহার উপর ধার্য সমুদয় কর নিয়মিত ভাবে

প্রদান করিয়া রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনায় সহযোগিতা করা। যে নাগরিক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রের প্রাপ্য কর ফাঁকি দেয়, সে রাষ্ট্রের ও সমাজের ঘোর অনিষ্ট করে।

(৪) **অন্যান্য কর্তব্য**—এই তিনটি প্রধান কর্তব্য ছাড়া নাগরিক-দিগকে রাষ্ট্রের প্রতি আরও নানাপ্রকার কর্তব্য পালন করিতে হয়।

ভোট দেওয়া নাগরিকের অধিকার, আবার এক হিসাবে ইহা তাহার কর্তব্য। যে নাগরিক আলস্যবশত বা অন্য কোন কারণে এই অধিকার ব্যবহার করে না (অর্থাৎ নির্বাচন কালে ভোট দেয় না) সে কার্যত রাষ্ট্র-পরিচালনায় অসহযোগিতা করে। আবার, যে নাগরিক ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে বা অন্য কারণে অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেয় সে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের অনিষ্ট করে। সুতরাং ভোটের সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র যদি কোন নাগরিককে কোন কার্যের ভার দেয়, তাহার পক্ষে নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াও ঐ ভার লওয়া উচিত। যেমন, রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন নাগরিকের পক্ষে যদি কোন বিশেষ কর্মগ্রহণ আবশ্যক বিবেচিত হয়, তবে ঐ নাগরিকের ঐ কর্ম গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের সেবা করা কর্তব্য। মনে কর, যে চিকিৎসকের মাসিক উপার্জন ১০,০০০৲ টাকা তাঁহাকে ১,৫০০৲ টাকা বেতনে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইল। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহার ঐ পদ গ্রহণ করা উচিত। যে নাগরিক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য বা অন্য কারণে রাষ্ট্রের সেবা করিতে চায়, সে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনে বিমুখ হইয়া দেশের ও সমাজের ক্ষতি করে। নাগরিকগণের সেবা ও সহযোগিতা না পাইলে রাষ্ট্র শক্তিমান হইতে পারে না।

পরিবার ও সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য (Citizen's duties to the family and to the community)—পরিবারের সভ্য হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকের পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি নানাবিধ কর্তব্য পালন করিতে হয়। যেমন, পিতার কর্তব্য সন্তানকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করা, আবার পুত্রের কর্তব্য পিতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার ভরণপোষণ ও সেবা করা। ইহা ছাড়া সমাজের সভ্য হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকের নানাবিধ কর্তব্য আছে। যথাসাধ্য সমাজের সেবা করা, প্রতিবেশীদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করা, জনহিতকর কার্যে সহায়তা করা প্রভৃতি নাগরিকদের সামাজিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties)—অধিকার ও কর্তব্য

কাহাকে বলে তাহা উপরে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; একটিকে বাদ দিয়া অপরটির অস্তিত্ব থাকে না। একের যাহা অধিকার অপরের তাহা কর্তব্য। রামের বাঁচিবার অধিকার আছে। শ্যামের কর্তব্য এই অধিকার স্বীকার করা—অর্থাৎ রামের জীবননাশের চেষ্টা না করা। যদুর রাজপথে চলিবার অধিকার আছে। সুতরাং সে যখন রাজপথে গাড়ী চালাইবে তখন মধুর কর্তব্য তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেওয়া। শ্যাম কর্তব্য পালন না করিলে রামের অধিকার বিপন্ন হয়, মধু কর্তব্য পালন না করিলে যদুর অধিকার ভোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। শ্যাম ও মধু স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিলে রাম ও যদুও তাহাদের কর্তব্য পালন করিবে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। যে নিজের কর্তব্য পালন করে না সে অধিকার ভোগের দাবি করিতে পারে না, তাহার কার্যের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কর্তব্যবিহীন অধিকার নাই, অধিকার-বিহীন কর্তব্য নাই। প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিলে প্রত্যেকেই সহজে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিতে পারে। ফলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে, কর্তব্য ও অধিকার পাশাপাশি চলিয়া সকলের মঙ্গল সাধন করে।

প্রশ্ন

1. What is meant by rights and duties of citizens? (নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়?) (৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between different classes of rights. (বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।) (৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা)

3. Enumerate the civil rights of citizens. (নাগরিকদের সামাজিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর।) (৭৬-৮০ পৃষ্ঠা)

4. What are the political rights of citizens? (নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার কি কি?) (৮০-৮১পৃষ্ঠা)

5. Write a short essay on the duties of citizens. (নাগরিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ রচনা কর।) (৮২-৮২ পৃষ্ঠা)

6. "Rights and duties go together." Explain. ("অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত সংযুক্ত"—ব্যাখ্যা কর।) [H. S. E., 1961] (৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty)

আইন কাহাকে বলে ? (What is Law ?)—ছোট-বড় কোন সংগঠনই কতকগুলি নিয়ম ব্যতীত চলিতে পারে না। রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল সংগঠন। সুতরাং কতকগুলি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত না হইলে রাষ্ট্র নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। সাধারণভাবে এই নিয়মগুলিকে আইন বলা যায়। আত্মরক্ষার জন্য, শাসনকার্য সুপরিচালনার জন্য এবং নাগরিকগণের মঙ্গল সাধনের জন্য রাষ্ট্র যে সকল নিয়ম বা বিধি প্রবর্তন করে তাহার নাম আইন।

ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অস্টিন (Austin) বলিয়াছেন, আইন হইল সার্বভৌম শক্তির অনুশাসন (Law is the command of the Sovereign)। রাষ্ট্রই সার্বভৌম শক্তি। এই শক্তির যে আদেশ—যাহা পালন না করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হয়—তাহাই আইন। রাষ্ট্রের নিয়ম (অর্থাৎ আইন) বাধ্যতামূলক ; রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে প্রত্যেককে ইহা পালন করিতে হয় এবং যে পালন না করে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হয়। শাস্তি দানের জন্য রাষ্ট্র শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে। শ্রমিকসঙ্ঘ, ক্রীড়াসঙ্ঘ প্রভৃতি অন্যান্য সংগঠনেরও নানাবিধ নিয়ম থাকে এবং সভ্যদিগকে সেগুলি পালন করিতে হয়। যে সভ্য নিয়ম পালন না করে তাহাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার করা যায়, কিন্তু কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড দেওয়া যায় না। সুতরাং ঐ সকল নিয়মের সহিত রাষ্ট্র প্রবর্তিত আইনের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। যে অর্থে রাষ্ট্রের আইন বাধ্যতামূলক ঠিক সেই অর্থে অন্যান্য সংগঠনের নিয়ম পালন বাধ্যতামূলক নহে।

আইন বাধ্যতামূলক হইলেও ইহা মানুষের বাহ্যিক আচরণ মাত্র নিয়ন্ত্রিত করে ; যাহা মানুষের মনে থাকে, কার্যে আত্মপ্রকাশ করে না, তাহা লইয়া আইনের কারবার নহে।

সমাজে প্রচলিত আচার-ব্যবহারই আইনের প্রকৃত ভিত্তি। যে সকল আচার-ব্যবহার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় তাহাই আইন। এই কারণে বিভিন্ন দেশে একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন আইন প্রচলিত থাকে।

আইনের উৎস (Sources of Law)—প্রাচীন কালে সমাজে প্রচলিত সাধারণ আচার-ব্যবহার (Customs) আইন রূপে স্বীকৃত হইত। সাধারণত

জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল আচার-ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছিল। বর্তমান কালেও আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে প্রচলিত আচার-ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং আচার-ব্যবহার আইনের একটি প্রধান উৎস।

প্রাচীন কালে আইনের একটা প্রধান উৎস ছিল ধর্ম। ঈশ্বরের প্রতিনিধি-রূপে পুরোহিত এবং রাজা আইন প্রণয়ন এবং পরিচালনা করেন, প্রাচীন মানুষের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মনীতি কর্তৃক অনুমোদিত বিধানগুলি আইনরূপে গণ্য করা হইত। বর্তমান কালে রাষ্ট্রে ও সমাজে ধর্মের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং ধর্মকে আর আইনের অন্যতম প্রধান উৎস রূপে গণ্য করা যায় না।

বর্তমান কালে গণতান্ত্রিক দেশে আইন সভার ইচ্ছাই আইনের সর্বপ্রধান উৎস। দেশের জনসাধারণ যাহা চায় আইন সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনে তাহাই প্রকাশিত হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, জনমতই আইনের প্রধান উৎস। আইন সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন বর্তমান সমাজে অন্য শ্রেণীর আইনকে প্রায় বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছে।

বিচারকগণ বিচারকার্য উপলক্ষে আইনের ব্যাখ্যা করেন। অনেক সময় ব্যাখ্যা সূত্রে তাঁহারা যে মত প্রকাশ করেন তাহা কার্যত নূতন আইন সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালের বিচারকগণ সেই মত অনুসারে মামলার বিচার করিয়া উহাকে আইনের মর্যাদা দান করেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের বিবেকের নির্দেশ অনুসারে ন্যায়ধর্মের (Equity) প্রয়োগ করেন। এইরূপ ন্যায়ধর্মের প্রয়োগ পরবর্তী কালে আইনের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং বিচারক-গণের মত ও ব্যাখ্যা (judicial precedents) আইনের অন্যতম উৎস।

আইন এবং শাসনতন্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেক সময় গ্রন্থাদিতে আইন সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার আলোচনা করেন। এই প্রকার আলোচনা উপলক্ষে তাঁহারা যে সকল মতামত প্রকাশ করেন তাহা বিচারকগণ গ্রহণ করিলে কার্যত নূতন আইনের উৎপত্তি হয়। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মতামত, টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি আইনের উৎস রূপে গণ্য হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে আইনের বিভিন্ন উৎস থাকিলেও বর্তমান যুগে আইন সভার ইচ্ছাই প্রবল, কারণ ইহা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন সকল ক্ষেত্রেই বলবৎ হইবে, ইহার সহিত বিরোধ ঘটিলে অন্য যে কোন প্রকার আইন বাতিল হইয়া যাইবে।

আইন ও নীতি (Law and Morality)—আইন ও নীতি, উভয়ই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং আইন ও নীতির মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক সময় নীতি ক্রমে ক্রমে আইনে পরিবর্তিত হয়। যেমন, ভারতে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নীতিবিরোধী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, জনমত ইহার বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়াছিল। পরে ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা আইনবিরোধী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। যাহা নীতিবিরোধী ছিল তাহা আইনবিরোধী হইয়াছে। যতদিন অস্পৃশ্যতা কেবলমাত্র নীতিবিরোধী ছিল ততদিন অস্পৃশ্যতা বর্জন না করিলে কাহারও দণ্ড হইত না, কিন্তু অস্পৃশ্যতা আইনবিরোধী হওয়ার ফলে এখন কেহ অস্পৃশ্যতা বর্জন না করিলে তাহাকে আইন অনুসারে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এখানে আইন ও নীতির মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নীতি লঙ্ঘন করিলে রাষ্ট্র অপরাধীকে শাস্তি দেয় না, কিন্তু আইন লঙ্ঘন করিলে অপরাধীকে রাষ্ট্রের নির্দেশে শাস্তি পাইতে হয়।

আইন ও নীতির মধ্যে আর একটি প্রধান পার্থক্য এই যে আইন কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখে, কিন্তু নীতি মানুষের বাহ্যিক আচরণের সহিত তাহার মানসিক চিন্তারও বিচার করে। রাম মনে মনে শ্যামকে খুন করিবার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু কার্যত তাহাকে খুন করিবার চেষ্টা করে না। এখানে রাম আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী নহে, কিন্তু নৈতিক বিচারে অপরাধী। সুতরাং নীতির পরিধি বিস্তৃত, আইনের পরিধি সংকীর্ণ। মিথ্যা কথা বলা নীতির দিক হইতে অপরাধ, কিন্তু যে মিথ্যা অপরের অনিষ্ট করে না তাহা আইনের দিক হইতে শাস্তিযোগ্য নহে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যাহা নীতির দিক হইতে আপত্তিজনক নহে তাহা আইনের দিক হইতে শাস্তিযোগ্য। যেমন, রাজপথের ডান দিক দিয়া মোটর গাড়ী চালান নৈতিক অপরাধ নয়, কিন্তু ইহা আইনবিরোধী এবং শাস্তিযোগ্য।

আইন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট, কিন্তু নীতি অনেক ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট বা অনিশ্চিত। কোন কাজ আইনসঙ্গত বা আইনবিরোধী কিনা তাহা স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ বর্তমান যুগে লিপিবদ্ধ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ আইন লইয়াই আমাদের কারবার। কিন্তু কোন কাজ নীতিসঙ্গত বা নীতিবিরোধী কিনা তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। কোন ব্যক্তিবিশেষের মতে যাহা নীতিসঙ্গত অপরের মতে তাহা নীতিবিরোধী হইতে পারে। ব্যক্তিগত রুচি, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর নীতিসংক্রান্ত

মতামত নির্ভর করে। অনেকটা এই কারণেই শুধু মাত্র নীতিগত অপরাধের জন্ম রাষ্ট্র শাস্তি দেয় না ; যে ব্যক্তি সমাজে সাধারণ ভাবে প্রচলিত নীতি লঙ্ঘন করে সে সামাজিক নিন্দাভাজন হয়, ইহাই তাহার শাস্তি। আইন ও নীতির মধ্যে এই সকল পার্থক্য স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে আইন যত বেশী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ততই ভাল। নীতির সহিত সম্পর্কহীন আইন মানুষের মনে তেমন-ভাবে সাড়া দেয় না। পক্ষান্তরে যে আইনের সহিত নীতির সামঞ্জস্য থাকে তাহা মানুষ সাধারণভাবে পালন করিতে বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়। মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিয়া তাহাকে সুনাগরিকে পরিণত করিতে হইলে আইনের সহিত নীতির পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা (Liberty)—উপরে বলা হইয়াছে যে আইন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং আইন মানুষের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিয়া তাহার স্বাধীনতা খর্ব করে।

স্বাধীনতা বলিতে আমরা কি বুঝি ? সাধারণ ভাবে মনে হয়, স্বাধীনতা অর্থ নিয়ন্ত্রণহীনতা, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করা সম্বন্ধে কোন রকম বাধানিষেধের অভাব। কিন্তু এইরূপ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা সমাজ-শৃঙ্খলার বিরোধী ও জনসাধারণের পক্ষে অহিতকর। প্রত্যেক মানুষ যদি সকল সময় নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে তবে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার হইবে। সুতরাং এইরূপ স্বাধীনতা পৌরবিজ্ঞান স্বীকার করিতে পারে না।

পৌরবিজ্ঞানের মতে স্বাধীনতার অর্থ কতকগুলি মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণের অভাব। যেমন, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। যেখানে আইন দ্বারা এই অধিকার খর্ব বা বিলোপ করা না হয় সেখানে বাক্-স্বাধীনতা (Freedom of speech) আছে বলা যায়। যে সকল অধিকার না পাইলে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে না সেই সকল অধিকারের সমষ্টিগত নাম স্বাধীনতা। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কতকগুলি বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের বিলোপ মানুষের আত্মবিকাশ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে রাষ্ট্রে এই সকল বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নাই সেখানে নাগরিকের স্বাধীনতা আছে বলা যায়।

স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য আছে। যেখানে কোন বিষয়েই নিয়ন্ত্রণ নাই সেখানে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল। বর্তমান কালে এইরূপ অনিয়ন্ত্রিত সমাজের অস্তিত্ব নাই। যেখানে কোন কোন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আছে, আবার কোন

কোন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ নাই, সেখানে স্বাধীনতা বিরাজমান। নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি এমনভাবে স্থির করিতে হইবে যেন ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হইতে পারে।

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটিলেই তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় না। স্বাধীনতার একটি প্রত্যক্ষ দিক আছে। স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি অধিকার ভোগের সুযোগ, আত্মবিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষ তাহার পূর্ণ সত্তা বিকাশের সুযোগ পায় না সেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা নাই।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Forms of Liberty)—ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ আছে।

১। **প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক স্বাধীনতা (Natural Liberty)**—রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে প্রাকৃতিক অবস্থায় (State of Nature) মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করিত বলিয়া অনুমান করা হয় তাহার নাম প্রাকৃতিক স্বাধীনতা। প্রকৃতপক্ষে তখন স্বাধীনতা ছিল না—ছিল প্রবলের স্বেচ্ছাচারিতা। যে স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিক সমভাবে ভোগ করিতে না পারে তাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায় না।

২। **সামাজিক বা পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty)**—সামাজিক (বা পৌর) অধিকার (Civil Rights) সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সামাজিক (বা পৌর) অধিকারগুলি ভোগ করার যে স্বাধীনতা তাহাই সামাজিক স্বাধীনতা।

৩। **রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty)**—রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করার যে স্বাধীনতা তাহাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

৪। **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)**—আর্থিক দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বচ্ছন্দভাবে জীবন যাপনের অধিকারই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। যে মানুষ সর্বদা অন্নচিন্তায় বিব্রত তাহার নিকট সামাজিক (বা পৌর) স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। বর্তমান কালে প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহ নাগরিকগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন।

৫। **জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)**—জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ বৈদেশিক শাসনের পরিবর্তে দেশীয় শাসন স্থাপন। ইংরেজ আমলে ভারতীয়দের

জাতীয় স্বাধীনতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বাধীনতা অন্যান্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি, কারণ পরাধীন রাষ্ট্রে নাগরিকগণের সামাজিক (বা পৌর), রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

আইন এবং স্বাধীনতা (Law and Liberty)—পূর্বে বলা হইয়াছে যে আইন মানুষের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিয়া তাহার স্বাধীনতা খর্ব করে। যেমন, রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্-স্বাধীনতা (Freedom of speech) এবং গমনাগমনের স্বাধীনতা (Freedom of movement) সঙ্কুচিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই আইন দ্বারা স্বাধীনতাকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। স্বাধীনতা কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার নহে, রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে এই অধিকার সমভাবে ভোগ করিতে পারে সেজন্য আইন দ্বারা ইহার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন (Law is the condition of Liberty)। আইন প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের স্বাধীনতার রক্ষক। যে সমাজে আইন নাই সেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা নাই, স্বেচ্ছাচারিতা আছে। সুতরাং আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আইন এবং স্বাধীনতাকে পরস্পর-বিরোধী মনে করা ভুল। কোন কোন ক্ষেত্রে আইন স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রে আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্তির স্বার্থ এবং সমাজের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। যে স্বাধীনতা সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়—স্বেচ্ছাচারিতা।

রাষ্ট্রের কাঠামোর বাহিরে স্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্ভব নয়, কারণ রাষ্ট্রই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি (যাহা আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়) স্বাধীনতার রক্ষক; ঐ শক্তি স্বীকার না করিলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের স্বাধীনতা রক্ষা করে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ নিবারণ করে। আবার আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা করে। যেমন, ভারতের সংবিধান নাগরিককে কতকগুলি মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) দিয়াছে। কোন ব্যক্তি বা সংগঠন বা সরকার কোন মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে আইন নাগরিকের পক্ষ সমর্থন করে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র সাধারণভাবে আইনের মাধ্যমে এমন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে

যেখানে সাধারণ নাগরিক সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ লাভ করে। আইন বাদ দিয়া স্বাধীনতার কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্ন

1. Define law. What are the sources of law? (আইন কাহাকে বলে? আইনের উৎস কি কি?) (৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the relation between law and morality. (আইন ও নীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা কর)। (৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)

3. What is liberty? What are the different forms of liberty? (স্বাধীনতা কাহাকে বলে? স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ কি কি?) (৮৮-৯০ পৃষ্ঠা)

4. What is meant by liberty? How is it related to law? (স্বাধীনতা কাহাকে বলে? আইনের সহিত স্বাধীনতার কি সম্বন্ধ?) [H. S. E., 1960] (৮৮-৮৯, ৯০-৯১ পৃষ্ঠা)।

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্র কৃত্যক (Public Services)

রাষ্ট্র কৃত্যক (Public Services)—গণতান্ত্রিক দেশে আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রিগণ শাসন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করেন এবং সাধারণভাবে শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে এবং কর্তৃত্বাধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারিগণ বিভিন্ন স্তরে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই সকল কর্মচারী সমবেতভাবে রাষ্ট্র কৃত্যক (Public Services) গঠন করেন। মন্ত্রিগণ অস্থায়ী—যতদিন তাঁহারা আইন সভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন তাঁহাদের কার্যকাল। রাষ্ট্র কৃত্যকের সভ্যগণ স্থায়ী, অর্থাৎ অবসর গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তাঁহারা স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সুষ্ঠু শাসন এবং দেশের উন্নতি অনেকাংশে তাঁহাদের কর্মদক্ষতা ও কর্তব্য-পরায়ণতার উপর নির্ভর করে।

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির অধীনে বহু উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ রাষ্ট্র-ভৃত্যদের লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র কৃত্যক (Public Services) গঠিত। রাষ্ট্র কৃত্যক

দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—জনপালন কৃত্যক (Civil Services) ও দেশরক্ষা কৃত্যক (Defence Services)।

জনপালন কৃত্যক (Civil Services)—বর্তমানে কেন্দ্রীয় জনপালন কৃত্যকের মধ্যে ভারতীয় শাসন-পরিচালন কৃত্যক (Indian Administrative Service) এবং ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যক (Indian Police Service) প্রধান। এই দুই কৃত্যকের সভ্যগণ ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং কোন কোন বিষয়ে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণত রাজ্য সরকারগুলির অধীনে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত থাকেন।

প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকারের অধীনে কতকগুলি কেন্দ্রীয় কৃত্যক (Central Services) আছে—যেমন, ভারতীয় হিসাব-পরীক্ষা কৃত্যক (Indian Audits and Accounts Service),ভারতীয় শুল্ক কৃত্যক (Indian Customs Service), ইত্যাদি। এই সকল কৃত্যকের সভ্যগণ প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিভিন্ন পদে নিযুক্ত থাকেন, রাজ্য সরকারগুলির সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যকের (Indian Foreign Service) সভ্যগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে (Embassies) বিভিন্ন কূটনৈতিক (diplomatic) পদে নিযুক্ত থাকেন।

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন কৃত্যকের সভ্যগণ ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন, তাঁহাদের বেতনের হার ও চাকুরির সর্তাদি ভারত সরকারই নিয়ন্ত্রণ করে।

বিভিন্ন রাজ্যে শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ পদগুলিতে ভারতীয় শাসন-পরিচালন কৃত্যক এবং ভারতীয় আরক্ষা কৃত্যকের সভ্যগণ নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের অধীনে থাকেন বিভিন্ন রাজ্য কৃত্যকের (State Services) সভ্যগণ। এই সম্পর্কে রাজ্য শাসন কৃত্যক (State Civil Service), রাজ্য আরক্ষা কৃত্যক (State Police Service) ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল কৃত্যকের সভ্যগণ রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীন থাকেন।

দেশরক্ষা কৃত্যক (Defence Services)—দেশরক্ষা কৃত্যকসমূহে (স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে) লোক নিয়োগ করে ভারত সরকার এবং ভারত সরকারের অধীনে তাহাদিগকে কাজ করিতে হয়।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (Public Service Commission)—ভারত

সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির অধীনে বহু উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রভৃত্য বা সরকারী কর্মচারী আছেন। এই সকল উচ্চ পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত লোক মনোনয়ন করে 'রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ' নামক সংস্থা। যে সকল কর্মচারী ভারত সরকারের অধীন তাঁহাদিগকে মনোনয়ন করে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ' (Union Public Service Commission)। যে সকল কর্মচারী রাজ্য সরকারের অধীন তাঁহাদিগকে মনোনয়ন করে 'রাজ্য রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ' (State Public Service Commission)। এই জন্য সাধারণত প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি পরিষদ থাকে। একাধিক রাজ্যের জন্য একটি যুক্ত পরিষদও থাকিতে পারে।

প্রত্যেক পরিষদে একজন সভাপতি এবং কয়েকজন সভ্য থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ও সভ্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাজ্য পরিষদের সভাপতি ও সভ্যগণকে নিয়োগ করেন ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল। একাধিক রাজ্যের জন্য যুক্ত পরিষদ থাকিলে তাহার সভাপতি ও সভ্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

প্রত্যেক পরিষদের সভাপতি ও সভ্য ছয় বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ও সভ্যগণ ৬৫ বৎসর বয়স হইলে আর কাজে বহাল থাকিতে পারেন না, এবং রাজ্য পরিষদের সভাপতি ও সভ্যগণ ৬০ বৎসর বয়স হইলে আর কাজে বহাল থাকিতে পারেন না। যদি কোন পরিষদের সভাপতি বা কোন সভ্য কোন অপরাধে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন তবে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

পরিষদগুলি কেবল যে নূতন কর্মচারী মনোনয়ন করে তাহা নহে। পুরাতন কর্মচারীদের পদোন্নতি ও (কোন অপরাধের জন্য) শাস্তিবিধান প্রভৃতি বিষয়ও তাহারা বিবেচনা করে। সাধারণত লিখিত বা মৌখিক বা উভয় প্রকার পরীক্ষা দ্বারা প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করা হয়। রাষ্ট্রভৃত্যগণের নিয়োগ, পদোন্নতি, শাস্তি প্রভৃতি যাহাতে রাজনৈতিক বা দলগত স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেজন্য পরিষদগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিষদের সভাপতি ও সভ্যগণ নিরপেক্ষ ভাবে কার্য করিবেন।

পরিষদের সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে যায়। সরকার তাহা গ্রহণ করিতে পারে, পরিত্যাগ করিতেও পারে। সুতরাং রাষ্ট্রভৃত্যগণের নিয়োগ, পদোন্নতি, শাস্তি প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে সরকার সকল ক্ষেত্রে না হউক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ করে।

প্রত্যেক বৎসর যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ নিজের কার্য সম্বন্ধে একটি বিবরণী (report) রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিবে এবং তিনি তাহা পার্লামেন্টে উপস্থিত করাইবেন। এইরূপে, প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক রাজ্য পরিষদ নিজের কার্য সম্বন্ধে একটি বিবরণী রাজ্যপালের নিকট দাখিল করিবে এবং তিনি তাহা রাজ্যের আইন সভায় উপস্থিত করাইবেন। সরকার যদি কোন ক্ষেত্রে অন্যায় ভাবে পরিষদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া থাকে তবে পার্লামেন্ট (বা রাজ্যের আইন সভা) তাহার সমালোচনা করিতে পারিবে।

প্রশ্ন

1. Write a brief essay on the Civil Services. (জনপালন কৃত্যকসমূহ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।) (৯১-৯২ পৃষ্ঠা)

2. Describe the composition and functions of Public Service Commissions. (রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ সমূহের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর।) (৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)।

একাদশ অধ্যায়

জনমত (Public Opinion)

জনমতের সংজ্ঞা (What is Public Opinion ?)—গণতান্ত্রিক দেশের লোকেরা সাধারণত সরকারী কার্যকলাপের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানারকম তর্কবিতর্ক চালায়। যেমন, আমাদের দেশে যে সরকার বহু বিদেশী জিনিসপত্রের আমদানী কমাইয়া দিয়াছে ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা চলিতেছে, আবার অনেকে ইহার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই কার্য অনুমোদন করিতেছে।

সরকার যাহা করিয়াছে সেই সকল বিষয় ছাড়াও ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ ব্যাপারে সরকারের কি কি করা উচিত তাহা লইয়াও জনগণ নানা রকম আলোচনা চালায়। যেমন, ভারত সরকারের চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদির জন্য ইংরেজী ভাষাই চালু রাখা উচিত না হিন্দী ভাষার প্রবর্তন করা উচিত, এই বিষয় লইয়া আজকাল আমাদের দেশে বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করা হইতেছে।

মোটের উপর দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে স্বাধীনভাবে নিজ

নিজ মত প্রকাশ করে। তাহাদের মতামত লক্ষ্য করিলে তাহারা কি চায় তাহার আভাস মেলে। এই মতামতকে জনমত (Public Opinion) বলে।

কিন্তু জনগণের সকলেই যে ঠিক একমত হইয়া একই দাবি উত্থাপন করে এরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটে। সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে। সুতরাং, জনমত অর্থাৎ জনগণের দাবি বলিলে কোন্ মতটিকে বুঝিব ? এই প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলেন, প্রতিপত্তিশালী লোকদের মতই জনমত, অন্যের মত জনমত নহে। কিন্তু, তাহা হইলে ত সরকারের মতই জনমত বলিয়া গণ্য হইবে, অন্য কোন মতকে জনমত আখ্যা দেওয়া যাইবে না, কারণ রাজা বা রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিগণই ত সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী লোক। এইরূপ সংজ্ঞা নিতান্তই হাস্যকর।

কেহ কেহ বলেন, কোন একটি বিষয়ে—যেমন, হিন্দী বনাম ইংরেজী—বিভিন্ন মতামতের মধ্যে যে মতটি প্রাধান্য লাভ করে, সেইটিই জনমত। কিন্তু কোন্ মতটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার বিচার করিবে কে? যে বিচার করিবে সে তাহার নিজের পছন্দ অনুযায়ী মতকেই প্রধান বলিয়া মনে করিবে। তাহা হইলে জনমত আর ব্যক্তিগত মতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। সুতরাং জনমতের এরূপ সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নহে।

এই সব কথা বিবেচনা করিয়া অনেকে বলেন, অধিকাংশ লোকের মতকে জনমত আখ্যা দেওয়া উচিত। কিন্তু কোন মতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সংখ্যা নির্ণয়ের উপায় কি ? একমাত্র বাধ্যতামূলক গণভোট ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। বাধ্যতামূলক গণভোটের সাহায্যেও কেবলমাত্র দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতের মধ্যে কোন্‌টি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত তাহাই বুঝা যায়, মধ্যপন্থী নানা রকম মতের কোন আভাস পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, এইভাবে জনমত নির্ধারণ করিতে হইলে হাজার হাজার বিষয় সম্পর্কে হাজার হাজার বার বাধ্যতামূলক গণভোটের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইরূপ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে জনমত আখ্যা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হইলেও কার্যক্ষেত্রে জনমত নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

আবার অনেকে বলেন, সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া জনমত বিচার করা ন্যায়সঙ্গত নয়। তাঁহারা বলেন, সংখ্যাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। যাহারা ঐ মতটি পোষণ করে তাহারা হুজুগে পড়িয়া কিছু বলিয়া ফেলিয়াছে, না ভালমন্দ সব কিছু বিবেচনা করিয়া একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহা দেখিতে

হইবে। ইহা ছাড়া, আরও একটি কথা আছে। ঐরূপ মত পোষণ করিয়া তাহারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থ সংখ্যালঘুদের স্বার্থ একেবারে পদদলিত করিতেছে কি না তাহাও দেখিতে হইবে। অবশ্য, এইরূপ কথার অবতারণা করিলে জনমতের সংজ্ঞা আরও জটিল হইয়া পড়ে। কারণ, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে, হুজুগের প্রকোপ পড়িয়াছে কিনা এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ অন্যায়ভাবে নষ্ট হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবে কে? যে মীমাংসা করিবে তাহার মতই তাহা হইলে জনমত বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং জনমতের এরূপ সংজ্ঞা দিলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত মত আর জনমত এক হইয়া দাঁড়ায়।

জনমতের সংজ্ঞা নির্ণয় করা বাস্তবিকই দুঃসাধ্য। তবে, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কোন একটি বিষয় সম্পর্কে যে সব মত প্রকাশ করা হয় সেই সব মতের যেটি অধিকাংশ আলোচনাকারীর মত বলিয়া মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে তাহাকে জনমতের সূচক হিসাবে ধরা যায়।

জনমত গঠনের উপায় (How public opinion is formed)— সাধারণত নাগরিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে এক একটি মত পোষণ করে। কিন্তু তাহাদের এই মতগুলি গড়িয়া ওঠে কি ভাবে? তাহারা নানারকম ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া এবং পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করে। তাহাদের ব্যক্তিগত মতগুলি এই জ্ঞানের সাহায্যে কতকাংশে গড়িয়া ওঠে। নাগরিকগণ আবার তাহাদের ব্যক্তিগত মতামতগুলি লইয়া পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে। এইরূপ আলাপ-আলোচনার ফলে অনেক সময়ে ব্যক্তিগত মতের অদলবদল হয়। যাহা জানা ছিল না এমন অনেক তথ্যের সন্ধান মেলে, বিরুদ্ধ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত মতটি এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যে তাহা আর ব্যক্তিগত মত থাকে না, বহু লোকের মত হইয়া দাঁড়ায়, জনমতের পর্যায়ে উপস্থিত হয়।

তাহা হইলে দেখা যায় যে জনমত একটি বিশেষ পদ্ধতিতে গড়িয়া ওঠে। সেই পদ্ধতিটি হইল নাগরিকগণের মধ্যে ভাববিনিময়। যে সব ক্ষেত্রে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধরণের যুক্তিতর্কের অবকাশ মেলে, অজানা অনেক তথ্য জানা যায়, সেই সব ক্ষেত্রের মাধ্যমে জনমত গড়িয়া ওঠে। বাড়ীতে, ক্লাবে, স্কুলে, হাটে, মাঠে, ঘাটে—বিভিন্ন স্থানে আমরা পরিচিত অপরিচিত বহু লোকের সঙ্গে দৈনন্দিন সমস্যা লইয়া আলোচনা করি। তাহা ছাড়া সাধারণ সভায় গিয়া বক্তাদের নিকট হইতে, রাজনৈতিক দলে যোগদান করিয়া

দলের সভ্যদের নিকট হইতে, আইন সভার বক্তৃতা শুনিয়া কিংবা পড়িয়া সদস্যদের নিকট হইতে, সংবাদপত্র পাঠ করিয়া সম্পাদকদের নিকট হইতে এবং যাহাদের বক্তৃতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাহাদের নিকট হইতে আমরা আধুনিক সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। পুস্তক-পুস্তিকার মারফৎও অনেক কিছু জানা যায়। রেডিও এবং সিনেমার মাধ্যমেও অনেক জিনিস জানা যায়। এই রকম জানাশুনা এবং আলাপ-আলোচনার ফলে এমন একটি মত গড়িয়া ওঠে যাহা আর কাহারও ব্যক্তিগত মত থাকে না, জনমত আখ্যা লাভ করে।

জনমতের বাহন (Organs of Public Opinion)—বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশিত হয়।

দেশে কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে অনেক সময় জনসাধারণ সভায় সম্মিলিত হইয়া ঐ বিষয়ে আলোচনা করে। এইরূপ সাধারণ সভায় অনেক সময়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই রকম প্রস্তাব ঐ সভায় যোগদানকারী লোকদের সুচিন্তিত মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ সভার মাধ্যমে জনমত কতকাংশে প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি ইত্যাদির সিদ্ধান্তগুলিও জনমতের অঙ্গীভূত। এই সকল সিদ্ধান্ত বহু লোকের আলোচনার ভিত্তিতে গঠিত হয়। সুতরাং ক্লাব, সমিতি ইত্যাদিও জনমত প্রকাশে সাহায্য করে।

অনেকে সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট চিঠি লেখে এবং এই সব চিঠিপত্র সংবাদপত্রে ছাপা হয়। ইহা হইতে বিভিন্ন লোকের মতের আভাস পাওয়া যায়। ইহাও জনমতের অংশ বটে। অনেক সময়ে সম্পাদকগণও বিভিন্ন মতের সার সংগ্রহ করিয়া এমন একটি মত প্রকাশ করেন যাহা জনমতের সমকক্ষ। সুতরাং সংবাদপত্রও কতকাংশে জনমতের বাহক। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মত জনমত রূপে গ্রাহ্য নহে। দলীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক অনেক সময় প্রকৃত জনমতের বিরুদ্ধে দলীয় মত সমর্থন করেন।

রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তাবগুলি জনমতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গণতান্ত্রিক দেশে বহু লোক কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য। সুতরাং এই দলগুলির সিদ্ধান্তগুলি বহু লোকের মত প্রকাশ করে। এই জন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারকার্য জনমত প্রকাশের প্রধান উপায়।

আইন সভার সদস্যগণও জনমত প্রকাশ করেন। গণতান্ত্রিক দেশে আইন

সভার সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ এলাকার এবং সমগ্র দেশের লোকদের মত প্রকাশ করিয়া জনপ্রিয় থাকিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য, তাঁহারা আইন সভায় যে সব কথা বলেন তাহাতে জনমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়।

বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য জনমত গঠনে ও প্রকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। অনেক দেশে নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বেতারে নিজ নিজ দলের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি প্রচার করেন।

জনমতের প্রয়োজনীয়তা—গণতান্ত্রিক সরকার জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী চলিতে চাহে। কিন্তু জনগণের ইচ্ছা যে ঠিক কি তাহা ভালভাবে বুঝিতে না পারিলে সরকার তাহাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিবে কিরূপে? জনমত সুস্পষ্টভাবে ও বিপুল পরিমাণে প্রকাশিত না হইলে সরকারের পক্ষে গণতন্ত্রসম্মতভাবে কাজ চালানো সম্ভব হয় না। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে জনমত সরকারের কাজের সুবিধা করিয়া দেয়।

আবার নাগরিকগণের নিজেদের স্বার্থেও জনমত প্রবলভাবে প্রকাশিত হওয়া দরকার। মন্ত্রিগণ এবং আইন সভার সদস্যগণ যদি বুঝিতে পারেন যে জনসাধারণ তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহারা যাহা খুসী করিয়া চলিলেও জনপ্রিয় থাকিবেন, তাহা হইলে তাহারা খুসীমতই কাজ করিবেন। জনসাধারণ সুসংবদ্ধভাবে মত প্রকাশ করিয়া সরকারের উপর চাপ না দিলে গণতান্ত্রিক সরকারও ক্রমে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনা দূর করিতে হইলে সরকারী কার্যকলাপের দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখিয়া নাগরিকগণকে মত প্রকাশ করিতে হয়। নাগরিকগণ যদি সরকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকিয়া জনমতের সৃষ্টি ও প্রকাশ না করে তাহা হইলে সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিসর্জন দিতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে জাগ্রত জনমতের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মোটের উপর বলা যায় যে নাগরিকগণ যদি দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন না থাকিয়া সক্রিয়ভাবে জনমত গঠন করে এবং তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে তাহা হইলে সরকার ঠিক কাজের নির্দেশ পায় এবং স্বেচ্ছাচারের দিকে যায় না। এই জন্য, গণতন্ত্র সচল রাখিতে হইলে জনমতের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন

1. What is meant by public opinion? How is public opinion formed in a country? (জনমত অর্থ কি? কিরূপে জনমত গঠিত হয়?) [H. S. E., Compartmental, 1960] (৯৪-৯৭ পৃষ্ঠা)

2. What are the chief organs of public opinion? (জনমত প্রকাশের প্রধান বাহন কি কি?) (৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল (Political Parties)

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা (What is a political party?)—যে সব দেশে গণতন্ত্র প্রচলিত হইয়াছে সে সব দেশে পরস্পর বিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দলেরও উদ্ভব হইয়াছে। সরকার কি ভাবে কাজ করিলে দেশের সব চেয়ে বেশী উপকার হয় এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার লোকের বিভিন্ন প্রকার মত আছে। কিছুসংখ্যক লোক হয়ত মনে করে যে অধিক পরিমাণে কর (tax) বসাইয়া দেশবাসীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া সেই টাকা দিয়া বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা উচিত। আবার কিছুসংখ্যক লোক হয়ত মনে করে যে করের পরিমাণ কোনক্রমেই বাড়ানো উচিত নয়, বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির বন্দোবস্ত বরং না করিলেও চলে। কিছুসংখ্যক লোক হয়ত মনে করে যে যত রকমের ব্যবসায়-বাণিজ্য আছে সবই সরকারের করায়ত্ত হইলে দেশের সম্পদ বাড়িতে থাকে এবং জনগণেরও কল্যাণ হয়। আবার কিছুসংখ্যক লোক হয়ত মনে করে যে কোন রকম ব্যবসায়-বাণিজ্যেই সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, শিল্পপতিগণকে অবাধ সুযোগ ও সুবিধা দান করিলেই দেশের সম্পদ বাড়ে এবং জনগণের কল্যাণ হয়। আবার কিছুসংখ্যক লোক হয়ত মনে করে যে নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যবসায় সরকারের হাতে রাখিয়া বাকিগুলি শিল্পপতিদের হাতে ছাড়িয়া দিলে দেশের সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার হয়।

এই রকম এক এক শ্রেণীর লোকের এক এক রকম মত। তবে একটি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মিল আছে। ইহারা সকলেই সমগ্র দেশের কল্যাণ চাহে। ইহারা অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব নহে। ইহারা বাস্তবিকই

বিশ্বাস করে যে ইহাদের মত অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশবাসী সকলেরই উপকার হইবে এবং ইহাদের নিজেদের উপকারও অন্যদের সঙ্গে মিল রাখিয়া হইবে। তবে কি করিলে যে দেশের উপকার হয় এই বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে। এক শ্রেণীর লোক যে পথের কথা বলে, আর এক শ্রেণীর লোক হয়ত তাহার পরিবর্তে অন্য একটি পথ পছন্দ করে।

অবশ্য, এক শ্রেণীর মধ্যেও যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি মত অন্য প্রত্যেকের প্রত্যেকটি মতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায় তাহা নহে। মিল থাকে কতকগুলি মূল বিষয়ে। এই মিলও আবার সম্পূর্ণভাবে মিল নহে, মোটামুটি মিল। যাহাদের প্রধান প্রধান মতের মধ্যে এই রকম একটা মোটামুটি মিল থাকে তাহারা একত্র হইয়া রাজনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা দেশের উপকার করিতে চেষ্টা করে। তাহারা সরকারী কর্তৃত্ব লাভ করিয়া নিজেদের মতানুযায়ী কাজ করে। যাহাদের মূল মতামত বহুলাংশে মিলিয়া যায় তাহারা যখন দল গঠন করিয়া সমষ্টিগতভাবে রাজনৈতিক কার্যের দ্বারা দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করে তখন তাহাদের দলকে রাজনৈতিক দল (political party) বলা হয়। যেমন, আমাদের দেশে কংগ্রেস দল, কমিউনিস্ট দল, প্রজা-সোসালিস্ট দল ইত্যাদি।

যদি কিছুসংখ্যক লোক দেশের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী কর্তৃত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদের সঙ্ঘকে রাজনৈতিক দল (party) না বলিয়া রাজনৈতিক চক্র (faction) বলা হয়। রাজনৈতিক চক্রের লোকেরাও অবশ্য জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষাবলম্বী করিবার জন্য একটি মতের উল্লেখ করে। কিন্তু আসলে ইহারা কোন মতেরই ধার ধারে না। কেবল মাত্র নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্যই ইহারা মতের অবতারণা করে। প্রকৃতপক্ষে, ইহারা জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। জনসাধারণ যদি ইহাদের কথায় ভুলিয়া ইহাদিগকে সরকারী আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তাহা হইলে ইহারা মত ও পথের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করে।

রাজনৈতিক দল ও চক্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দল দেশের সমষ্টিগত উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয়, চক্র কেবলমাত্র ইহার সভ্যগণের ব্যক্তিগত উন্নতির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of political parties)— যে কোন রাজনৈতিক দল ইহার মত অনুসারে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিয়া

একটি কার্যতালিকা (programme) প্রণয়ন করে। আইন সভায় গিয়া কিংবা মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া দলের লোকেরা কি কি কাজ করিতে চেষ্টা করিবে দলের কার্যতালিকায় তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়।

② দল বিভিন্ন স্থানে কার্যালয় স্থাপন করিয়া স্থানীয় লোকদের মধ্যে প্রচারকার্য (propaganda) চালায়, অন্যান্য দলের মত ও কর্মসূচীর চেয়ে যে এই দলের মত ও কর্মসূচী দেশের পক্ষে বেশী মঙ্গলকর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া, দলের সভ্যেরা স্থানীয় লোকদের সুযোগ-সুবিধার দিকেও দৃষ্টি দেয়। এই ভাবে দল বহু লোককে ইহার সভ্যতালিকাভুক্ত করিয়া লয়। শুধু সভ্য-সংখ্যাই বাড়ানো হয় না, দলটির প্রতি সব লোকেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা হয়।

যথাসময়ে দলগুলি নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। ③ এক একটি দল বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থী মনোনীত করে। তারপর সেই সব প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারকার্য চালায়। দলীয় প্রার্থী যাহাতে নির্বাচনে জয় লাভ করিতে পারে সেই জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

নির্বাচনের ফলে বিভিন্ন দলের প্রার্থিগণ আইন সভায় যায়। আইন সভায় যদি একটি দলের সভ্য-সংখ্যা অন্য সব দলের সভ্য-সংখ্যার সমষ্টির চেয়ে বেশী হয়, অর্থাৎ দলটি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা (majority) লাভ করে, তাহা হইলে এই দলের নীতি ও কর্মসূচী অনুসারে আইন তৈয়ারি হয়। দেশে যদি দায়িত্বশীল মন্ত্রি-পরিষদের পদ্ধতি (Cabinet System) প্রচলিত থাকে তাহা হইলে আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লোকেরাই মন্ত্রী হয় এবং দলের নীতি ও কার্যতালিকা অনুসারে দৈনন্দিন শাসনকার্য চালায়। দেশটি রাষ্ট্রপতিশাসিত (Presidential) হইলেও আইন প্রণয়ন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছানুযায়ীই হইবে, এমন কি রাষ্ট্রপতি যদি সেই দলের লোক হন তাহা হইলে দৈনন্দিন শাসনকার্যও দলের ইচ্ছানুযায়ী হইবে। একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে অন্য দলটি বা দলগুলি প্রথমোক্ত দলের কার্যে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করে। যদি দলগুলির মধ্যে কোনটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয় তাহা হইলে যে দলের সভ্য-সংখ্যা সব চেয়ে বেশী সেই দলের প্রভাবও সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। মোটের উপর, রাজনৈতিক দলের একটি প্রধান কাজ হইল নির্বাচনে জয় লাভ করিয়া সরকারী কার্যে যথাসম্ভব কর্তৃত্ব স্থাপন করা অথবা বিরোধিতা করা।

দলপ্রথার সুফল (Merits of party system)—গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায়

নির্বাচিত সদস্যগণের বেশীর ভাগ যে মত প্রকাশ করে সেই মত অনুসারে আইন তৈয়ারি হয়। যদি দল না থাকে তাহা হইলে সদস্যগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে থাকে। এই রকম অসংখ্য মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বিধান করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত তাহা করিতে পারিলেও প্রত্যেকের বক্তব্য প্রকাশে এবং পরস্পরবিরোধী তর্কবিতর্কে অযথা এত সময় নষ্ট হয় যে আইন তৈয়ারি করা প্রায় হইয়া ওঠে না। কোন বিশেষ একটি ঘটনা উপলক্ষে আইন তৈয়ারি করিতে গেলে হয়ত দেখা যায় যে সে ঘটনাটির পরিসমাপ্তি হইয়াছে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত আইন তৈয়ারি হওয়া ত দূরের কথা, তর্কবিতর্কই শেষ হয় নাই। দলপ্রথা প্রবর্তিত থাকিলে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় না। দলের নীতি ও কর্মতালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা থাকে। সেই অনুসারে আইনের খসড়া তৈয়ারি হয়। দলের সব সভ্যই একমত, সুতরাং দলের মাত্র দুই এক জন সভ্য বক্তব্য পেশ করে। বিপক্ষ দলেরও সকলেই একমত। সুতরাং সেই দলেরও মাত্র দুই এক জন লোক বিরুদ্ধ বক্তব্য পেশ করে। ফলে, অযথা সময় নষ্ট হয় না, সুসংবদ্ধ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই ভাবে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক দেশে দলপ্রথা থাকিলে আইন প্রণয়ন সহজ হয়, দলপ্রথা না থাকিলে আইন প্রণয়ন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

দেশটি যদি মন্ত্রিপরিষদশাসিত হয় তাহা হইলে দৈনন্দিন শাসন ব্যাপারেও একই অবস্থার উদ্ভব হয়। দল না থাকিলে আইন সভার প্রত্যেক সদস্যই মন্ত্রী হইতে চেষ্টা করিবে। অনেক চেষ্টার পরে কয়েক জন মিলিয়া একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিতে সক্ষম হইলেও ইহা স্বল্পস্থায়ী হইবে। দলের বাঁধন নাই বলিয়া সদস্যগণ যখন তখন খেয়ালখুশিমত অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিবে। অন্তত কিছু দিনের জন্য পদে বহাল না থাকিলে মন্ত্রিগণের পক্ষে, কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা ত দূরের কথা, সাধারণভাবে কাজ করাও সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক মন্ত্রীকেই সর্বদা সদস্যদের প্রত্যেকের অনুমোদন লাভ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে হয় বলিয়া কেহই আসল কর্তব্য সম্পাদন করিবার সময় পায় না। সুতরাং দলপ্রথা না থাকিলে অনেক সময়ে শাসনবিভাগের কার্যও অচল হইয়া পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেশে যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত থাকে তাহা হইলে আইন প্রণয়ন করিবার জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দৈনন্দিন শাসনকার্য চালাইবার জন্য দলপ্রথা অপরিহার্য হইয়া ওঠে। দলপ্রথা থাকিলে সুষ্ঠুভাবে আইন প্রণয়ন করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দলপ্রথা না থাকিলে

শাসন বিভাগের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলে না, দলপ্রথা থাকিলে কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

দলপ্রথা থাকিলে নির্বাচনের সময়ে ভোটদাতাদেরও সুবিধা হয়। দলের নীতি এবং কার্যতালিকা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা থাকে এবং ভোটদাতাদেরও ইহা জানা থাকে। তাহা ছাড়া, নির্বাচনপ্রার্থী যদি কোন দলভুক্ত হয় তাহা হইলে নির্বাচিত হইয়া সরকারী কর্তৃত্ব লাভ করিয়া—না হয় কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করিয়া—যেভাবেই হউক সে সরকারী কার্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে এইরূপ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দলনিরপেক্ষ প্রার্থীর কর্মনীতি অনেকটা অনিশ্চিত এবং নির্বাচিত হইলেও সে একক ভাবে সরকারী কার্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। দলপ্রথা না থাকিলে প্রত্যেক এলাকায় প্রার্থীর সংখ্যাও খুব বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং দলপ্রথা থাকিলে ভোটারগণ বেশ নিশ্চয়তার মধ্যে ভোট দিতে পারে, দলপ্রথা না থাকিলে তাহারা বহু রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে দ্বিধাজড়িত হইয়া পড়ে।

দলপ্রথা আছে বলিলে কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, দল একটির বেশী আছে। দল যদি কেবলমাত্র একটিই থাকে তাহা হইলে আইন প্রণয়ন এবং শাসনকার্য বেশ দ্রুতগতিতেই চলে, কিন্তু সেই দলের স্বৈরাচার রোধ করিবার কোন ব্যবস্থা থাকে না। এরকম অবস্থায় নির্বাচনের বন্দোবস্ত থাকিলেও গণতন্ত্রের লক্ষণ বেশ পরিস্ফুট হয় না। একের বেশী দল থাকিলে একটি দল সরকারী কার্যে কর্তৃত্ব করে, অন্য দল তীব্রভাবে সরকারী দলের কার্যকলাপের সমালোচনা করে—ইহার বিরোধিতা করিয়া ইহাকে ব্যতিব্যস্ত করে। এই রকম অবস্থায় সরকারী দল আগামী নির্বাচনের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত সংযতভাবে কাজ করে, জনমত সর্বদা নিজের পক্ষে রাখিবার চেষ্টা করে। দলপ্রথা না থাকিলে বিরোধী দল বলিয়া কিছু থাকে না, সরকারও সমালোচনা না থাকায় নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে তেমন সংযমের প্রয়োজন বোধ করে না।

দলপ্রথার ফলে জনসাধারণের আর একটি উপকার হয়। দলগুলির প্রচারকার্যের ফলে দেশের লোকদের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় এবং রাজনীতি সম্বন্ধে তাহাদের শিক্ষাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন দল সরকারী কার্যের সমর্থন করিয়া কিংবা প্রতিবাদ করিয়া জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য চালায়। ইহার ফলে জনসাধারণের ঔদাসীন্য দূরীভূত হয়, তাহারা দেশের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া ওঠে। তাহা ছাড়া, পরস্পরবিরোধী দলগুলির নিকট হইতে জাতীয় এবং

আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ শুনিতে পাইয়া অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকেরাও সুশিক্ষিত হইয়া ওঠে।

দলপ্রথার কুফল (Defects of party system)—দলপ্রথার অবশ্য কিছু কিছু ত্রুটিও আছে। কোন কোন সময়ে দল (party) চক্রে (faction) পরিণত হইয়া যায়। তখন দেশের স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া দলগুলি কেবল দলাদলিই চালায় এবং নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার কার্যে ব্যাপৃত হয়। এই অবস্থায় জাতীয়তার আদর্শ বিসর্জন দেওয়া হয়, সঙ্কীর্ণ শ্রেণীগত মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তবে, এই ত্রুটি ঠিক দলপ্রথার অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি নয়। দলপ্রথা না থাকিলেও এই দুরবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, বরং সেই সম্ভাবনাই বেশী। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দলীয় শাসন সকল সময়ে জনসাধারণের স্বার্থকে দলের স্বার্থের উপরে স্থান দিতে পারে না। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত দলের স্বার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হইয়া পড়ে।

দলপ্রথার ফলে দলের সভ্যদের স্বাধীন মনোভাব কতকাংশে সঙ্কুচিত করিতে হয়। একজন নাগরিক একটি দলের নীতি মোটামুটিভাবে গ্রহণ করে বলিয়া হয়ত সেই দলের সভ্য হিসাবে আইন সভায় গেল। তখন তাহাকে প্রত্যেকটি বিষয়েই দলের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে। বিশেষ কোন একটি বিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত মত অন্য রূপে হইলেও দলের মতের সঙ্গেই সায় দিতে হইবে। এইরূপে দলীয় শাসন স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু, দলপ্রথা না থাকিলে অজস্র ব্যক্তিগত মতের প্রকোপে শাসনযন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে। রাজনীতিক্ষেত্রে সংগঠনের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনেকাংশে বিসর্জন দিতে হয়।

দলপ্রথা থাকার ফলে দল-নিরপেক্ষ লোকদের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সরকারী কার্যে প্রভাব বিস্তার করা প্রায় অসম্ভব হইয়া ওঠে। অথচ এমন অনেক জ্ঞানীগুণী লোক আছেন যাঁহারা দলে যোগদান করিয়া ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না, কিন্তু দেশের উন্নতির জন্য সরকারী ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে চাহেন। অনেকে মনে করে, দলপ্রথার ফলে দেশবাসী এই ধরণের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞানীগুণী লোকদের সেবা হইতে বঞ্চিত হয়। এই রকম ত্রুটির উল্লেখ খুব বিচারসহ নহে। সমাজে চলিতে হইলে প্রয়োজন অনুসারে সকলকেই—জ্ঞানীগুণী মহাপুরুষদিগকেও—অন্যের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। যেহেতু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দলপ্রথা অপরিহার্য সেইজন্য দেশসেবাকাঙ্ক্ষী লোকদের পক্ষেও কোন না কোন দলে যোগ দান করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহাতে বিবেকের

স্বাধীনতা কতকাংশে সঙ্কুচিত হয় সত্য, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে এই মূল্য দান করিতে হয়।

দলপ্রথার যত ত্রুটির কথাই বলা হউক না কেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইহা অপরিহার্য বলিয়া ইহার স্থায়িত্ব বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নানা উপায়ে ইহার ত্রুটিগুলি অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। সংবিধান যদি অনমনীয় (rigid) হয় (অর্থাৎ সহজে পরিবর্তনযোগ্য না হয়), স্থায়ী কর্মচারিগণ (permanent civil servants) যদি দলমত নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করেন, ভোটদাতাগণ যদি সতর্ক ভাবে অধিকার রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং সমাজের নৈতিক মান যদি উচ্চ থাকে তবে দলীয় শাসনের কুফল দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। ব্রিটেনের গণতন্ত্রকে এই বিষয়ে আদর্শস্থানীয় বলা যাইতে পারে।

প্রশ্ন

1. What is meant by the term 'political party'? (রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা কি?) (৯৯-১০০ পৃষ্ঠা)

2. What are the merits and defects of the party system? (দলপ্রথার সুফল ও কুফল কি কি?) (১০১-১০৫ পৃষ্ঠা)

3. Define a party. What are the merits and demerits of a party system of government? (রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা কি? দলগত শাসন-ব্যবস্থার গুণ ও ত্রুটি কি কি?) (৯৯-১০০, ১০১-১০৫ পৃষ্ঠা) [H. S. E., Compartmental, 1960]

W. B. Secondary Education Board
Syllabus for class XI

16. A brief outline of the Constitution of India with special reference to—

The Preamble.

Fundamental Rights ; Directive Principles. The Indian Citizen. Franchise.

The Federation of India. The Distribution of Powers.

The President—how he is elected. Powers of the President.

The Union Parliament. Control of the Executive by the Legislature.

The States. The Governor. The State Legislature. Relation between the Centre and the States. Heads of the Revenues and Expenditures for Union and State Governments.

The Judiciary. The Supreme Court.

The Indian Political Parties.

17. Local Government.

18. Civic Problems. Village Improvement. Community Development Projects. Towns and Cities. Food. Housing. Sanitation. Health.

19. Defence of India. The Army, The Navy and the Air Force. Voluntary Defence Organisations. The National Cadet Corps.

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌরবিজ্ঞান

একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য অংশ

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ভারতের সংবিধান ঃ প্রস্তাবনা
(Constitution of India : Preamble)

ভারতের সংবিধান—ভারত রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ভারতের সংবিধান (Constitution of India) নামক মৌলিক দলিলে। এই দলিলে বাইশটি খণ্ড (Part) এবং ৩৯৫টি ধারা (Article) আছে। ইহা ছাড়া আছে নয়টি তপশীল (Schedule)। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত বড় লিখিত সংবিধান নাই। দেশের শাসনকার্য, কর স্থাপন ও আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এই দলিলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সংবিধান ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে প্রবর্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ তারিখ হইতে ইহার ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসনকার্য চলিতেছে।

ভারতের স্বাধীনতা—স্বাধীন ভারতের সংবিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে এই দেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস সংক্ষেপে স্মরণ করা প্রয়োজন। কংগ্রেস বহু বৎসর পূর্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার তাহা মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয় নাই। দ্বিতীয় মহাসমরে (Second World War) জাপান কর্তৃক মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইলে প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়। তখন ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত আপোষের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য এদেশে আসিয়া ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। উহার নাম মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan)। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের নূতন সংবিধান রচনার জন্য ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হয়। এই গণপরিষদ প্রায় তিন বৎসর (ডিসেম্বর, ১৯৪৬- নভেম্বর, ১৯৪৯) নানাপ্রকার আলাপ আলোচনার পর বর্তমান সংবিধান প্রস্তুত করিয়াছিল। ইতিমধ্যে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা (Mountbatten Plan) অনুযায়ী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। উভয় রাষ্ট্রই সাময়িকভাবে (ব্রিটিশ) (British) রাষ্ট্রসঙ্ঘের (Commonwealth

of Nations) অন্তর্ভুক্ত স্বশাসিত রাষ্ট্র (Dominion) হইল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act) পাশ করিয়া ভারত ও পাকিস্তানের Dominion মর্যাদা লাভের ব্যবস্থা করে। প্রকৃত পক্ষে ঐ আইন দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত নূতন সংবিধান অনুসারে ইংলণ্ডরাজের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করিয়া প্রজাতন্ত্র (Republic) হইয়াছে। তবে (ব্রিটিশ) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্যপদ ভারত এখনও ত্যাগ করে নাই।

সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble)—ভারতের সংবিধানের একটি সূচনা বা প্রস্তাবনা (Preamble) আছে। অন্যান্য কোন কোন দেশের সংবিধানেও (যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের) অনুরূপ প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য সংবিধানের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ভারতের জনগণ কর্তৃক এই সংবিধান বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) প্রতিষ্ঠা করা ইহার উদ্দেশ্য।*

প্রকৃতপক্ষে ভারতের জনগণ (People of India) কর্তৃক এই সংবিধান বিধিবদ্ধ হয় নাই, কারণ যে গণপরিষদ কর্তৃক ইহা বিধিবদ্ধ হয় সেখানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সমগ্র ভারতের জনসমষ্টির প্রতিনিধি ছিল না। দেশীয় রাজগণ কর্তৃক শাসিত রাজ্যগুলির জনগণের প্রতিনিধিদের গণপরিষদে প্রবেশাধিকার ছিল না। ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির জনগণও প্রত্যক্ষভাবে গণপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে নাই; প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সভ্যগণ গণপরিষদের সভ্যগণকে নির্বাচন করেন। তথাপি বলা যায় যে গণপরিষদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ সংবিধান সমগ্র ভারতের জনগণের পরোক্ষ সমর্থন লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল।

---

* "*We, the people of India,* having solemnly resolved to constitute India into a *Sovereign Democratic Republic* and to secure to all its citizens :

Justice, social, economic and political ;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship ;

Equality of status and of opportunity ; and to promote among them all *Fraternity* assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation ;

In our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do *hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.*"

প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ভারত একটি **সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** ("**Sovereign Democratic Republic**")। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি প্রধান উপাদান। ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র; ভারত সরকার সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, কোন বিষয়েই ইহাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার বা নির্দেশ পালন করিতে হয় না। ভারত (ব্রিটিশ) রাষ্ট্রসঙ্ঘের (British) (Commonwealth of Nations) সভ্য বটে, কিন্তু ব্রিটেনের সহিত এই দেশের আনুগত্যসূচক সম্বন্ধ নাই। ব্রিটেনের রাণীকে ভারত "রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান" (Head of the Commonwealth) রূপে স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহার প্রতি ভারতের আনুগত্য (allegiance) নাই এবং ভারতের শাসন সম্বন্ধে তাঁহার বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন অধিকার নাই। সুতরাং (ব্রিটিশ) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত ভারতের যোগ ভারতের সার্বভৌমিকতার পক্ষে হানিকর নহে। ভারত স্বেচ্ছায় এই যোগসূত্র রক্ষা করিতেছে এবং স্বেচ্ছায় যে কোন মুহূর্তে ইহা ছিন্ন করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত। এখানে প্রায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোট দিবার অধিকার আছে। নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করেন। গণতন্ত্রের প্রয়োগ কেবলমাত্র রাজনীতি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে, সামাজিক ব্যবস্থায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সংবিধানের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবিধ প্রচেষ্টা চলিতেছে।

তৃতীয়ত, ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে রাজা নাই। রাষ্ট্রের যিনি নায়ক (রাষ্ট্রপতি—President) তিনি নাগরিকদের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত।

প্রস্তাবনায় সংবিধানের মূলনীতিগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নীতিগুলি এই :—

(১) প্রত্যেক নাগরিক সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার (Justice) পাইবে।

(২) প্রত্যেক নাগরিক চিন্তা, বাচন, প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস ও ভগবদুপাসনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা (Freedom) পাইবে।

(৩) প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ লাভ সম্বন্ধে সমান অধিকার (Equality) থাকিবে।

(৪) ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য অটুট রাখিয়া সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব Fraternity) রক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

সংবিধানের মূল অংশে বিভিন্ন ধারায় (Articles) এই সকল মূলনীতি কার্যকর করিবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রসঙ্গে 'মৌলিক অধিকার' (Fundamental Rights) এবং 'রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতি' (Directive Principles of State policy) সংক্রান্ত দুইটি অধ্যায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে।

প্রশ্ন

1. Give the substance and explain the significance of the Preamble. (সংবিধানের প্রস্তাবনার মর্ম ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।) (১১০-১১২ পৃষ্ঠা।)

2. "India is a Sovereign Democratic Republic". Explain what it means. ('ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'—ইহার অর্থ ব্যাখ্যা কর।) [H. S. E., 1960]। (১১০-১১২ পৃষ্ঠা)

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি

(Fundamental Rights and Directive Principles)

মৌলিক অধিকার কাহাকে বলে ? (What is meant by 'Fundamental Rights' ?)—গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকগণ নানাপ্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। ইহার মধ্যে কতকগুলি অধিকার 'মৌলিক' (অর্থাৎ সেই সকল অধিকার না পাইলে কোন নাগরিক পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করে না) এবং কতকগুলি অধিকার রাষ্ট্রের নীতি ও শক্তির উপর নির্ভর করে। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এই সকল অধিকার যথার্থ গণতান্ত্রিক নাগরিকতার পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু বেকার ভাতার দাবি মৌলিক অধিকাররূপে গণ্য করা যায় না, কারণ এই ভাতা প্রদান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে এবং ইহার ব্যবস্থা না থাকিলেও গণতান্ত্রিক নাগরিকতা অসম্পূর্ণ থাকে না।

ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights in Indian Constitution)—ভারতের সংবিধানে প্রধানত ভারতীয় নাগরিকগণের জন্য কতকগুলি মৌলিক অধিকার নির্দেশ করা হইয়াছে এবং অধিকারগুলি যাহাতে আইনের দ্বারা সুরক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এবং অন্যান্য কয়েকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

মৌলিক অধিকারগুলি প্রধানত কেবলমাত্র নাগরিকেরাই ভোগ করিতে পারে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন, সাম্যের অধিকার সম্বন্ধে) বিদেশীরাও মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত নয়।

মৌলিক অধিকারগুলি সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(১) সাম্যের অধিকার (Right to Equality)—আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, ধনী-দরিদ্র উচ্চ-নীচ ভেদ নাই। সকলেই সমানভাবে আইনের আশ্রয় পাইবে। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, জন্মস্থানের পার্থক্য প্রভৃতি কারণে কোন নাগরিকের বিশেষ কোন সুবিধা বা অসুবিধা হইবে না। সরকারী চাকুরি প্রাপ্তি সম্বন্ধে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ দিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হইবে। সামরিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র অন্য কোন উপাধি প্রদান করিয়া কোন নাগরিককে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিবে না।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)—নিম্নলিখিত অধিকারগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত :—বাক্যের ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা ; শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হইবার স্বাধীনতা ; সমিতি ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা ; ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত যে কোন স্থানে গমনাগমন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার স্বাধীনতা ; সম্পত্তি ভোগ, দখল ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা ; যে কোন বৃত্তির অনুশীলন অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার স্বাধীনতা।

এই সকল মৌলিক অধিকারের পরিধি অনেকখানি প্রসারিত হইলেও এগুলি চরম (absolute) বা সর্তবিহীন নয়। নানাভাবে ইহাদিগকে সর্তাধীন করা হইয়াছে। যেমন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে বাক্যের ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সঙ্কুচিত করা যায় ; কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকদিগকে বিনাবিচারে আটক (Preventive Detention) রাখা যায় ; শান্তি ও শালীনতা রক্ষার জন্য ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা যায় ; ইত্যাদি। রাষ্ট্রের এবং সমাজের মঙ্গল

ক্ষুণ্ণ না করিয়া নাগরিককে যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) —যেমন, দাস-ব্যবসায় বেআইনী হইবে, কাহাকেও বেগার খাটিতে বাধ্য করা যাইবে না, চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে কারখানায় অথবা কোন বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে। অবশ্য এখানেও ধর্ম, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি কারণে কোন তারতম্য করা যাইবে না।

(৪) ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) —প্রত্যেকের বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মকার্যানুষ্ঠান এবং ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা থাকিবে। কোন বিশেষ ধর্মসংক্রান্ত কার্যের জন্য কেহ কর দিতে বাধ্য থাকিবে না। কোন বিদ্যালয়ে ধর্মোপদেশ এবং ধর্মোপাসনার জন্য কাহারও উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হইবে না। জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সকল শ্রেণীর হিন্দুর নিকট উন্মুক্ত থাকিবে (অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কারণে কোন হিন্দু মন্দির প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইবে না)। শান্তিরক্ষা, শালীনতা রক্ষা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র এই সকল অধিকার সঙ্কুচিত করিতে পারিবে।

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights)—ভাষা, লিপি এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। এই সকল সম্প্রদায় নিজ নিজ ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে। ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষা সংক্রান্ত কোন কারণে কাহাকেও সরকারী বিদ্যালয়ে অথবা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(৬) সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার (Right to Property)—আইনের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তির সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া যাইবে না। রাষ্ট্র কেবলমাত্র জনসাধারণের উপকারার্থ এবং আইনসঙ্গতভাবে কাহারও সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবে, তবে অধিকৃত সম্পত্তির মালিককে সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে (যেমন, সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারীর মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করিয়াছে)। জনস্বার্থে প্রয়োজন হইলে সরকার আইনের সাহায্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দখল বা পরিচালনার অধিকার গ্রহণ করিতে পারে।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitu-

tional Remedies)—কোন সরকার, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের কার্যের ফলে মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে সেগুলি রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিক বা বিদেশী প্রধান ধর্মাধিকরণে (Supreme Court) আবেদন করিতে পারিবে। প্রধান ধর্মাধিকরণ নানাপ্রকার নির্দেশ (directions or orders or writs) প্রদান করিয়া মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। হাইকোর্টগুলিরও এইরূপ নির্দেশদানের অধিকার আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংবিধান কেবলমাত্র মৌলিক অধিকার প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বাস্তব ক্ষেত্রে সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে বিচারালয়ের মাধ্যমে তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছে।

দেশে জরুরী অবস্থা (Emergency) উপস্থিত হইলে রাষ্ট্রপতি বিচারালয়-সমূহের এই অধিকার রহিত করিতে পারিবেন (অর্থাৎ তখন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলেও কেহ বিচারালয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবে না)। অন্যান্য সময়ে মৌলিক অধিকারগুলি আইনত প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিসমূহ (Directive Principles of State Policy)—সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক নাগরিক সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার (Justice) পাইবে। কেবলমাত্র মৌলিক অধিকার প্রদান করিয়া এই উচ্চ আদর্শ সফল করা যায় না। এইজন্য সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র শাসনকার্য ও আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধে কয়েকটি জনকল্যাণমূলক আদর্শ অনুসরণ করিবে। এই সকল আদর্শ সংবিধানের একটি অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক্ষেত্রে ভারতের সংবিধান আয়র্লণ্ডের সংবিধানের অনুসরণ করিয়াছে।

মৌলিক অধিকারসমূহের ন্যায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি আইনত বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য নহে, অর্থাৎ সরকার এই সকল নীতি লঙ্ঘন করিলে বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া তাহার প্রতিকার পাওয়া যাইবে না। এখানেই মৌলিক অধিকারের সহিত নির্দেশমূলক নীতির পার্থক্য। কিন্তু আইনত বাধ্যতামূলক না হইলেও রাজনৈতিক কারণে সরকার এই সকল নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকে বলিলে ভুল হইবে না। সংবিধানে বলা হইয়াছে, "দেশ শাসনের পক্ষে নির্দেশমূলক নীতিগুলি ভিত্তিস্বরূপ এবং আইনপ্রণয়নের সময় এগুলিকে প্রয়োগ করাই হইবে রাষ্ট্রের কর্তব্য।" এই নীতিগুলি অনুসরণ করিলে

ভারত কল্যাণ-রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত হইবে। সুতরাং ভারতের নাগরিকের পক্ষে এই নীতিগুলির গুরুত্ব কম নয়।

নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই :—

(১) স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকল নাগরিক যাহাতে জীবিকা অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার এমনভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সমগ্রভাবে জনসাধারণের মঙ্গল হয়।

(৩) সমাজে যাহাতে সম্পত্তি ও আয় মোটামুটি সমভাবে বণ্টিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) আর্থিক অভাবের জন্য কেহ যেন বয়স বা শক্তির অনুপযোগী শ্রমসাধ্য কার্য গ্রহণ করিতে বাধ্য না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষালাভের এবং কর্মলাভের অধিকার থাকিবে। বেকার অবস্থা, পীড়া, বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে জীবিকা অর্জনে অসমর্থ ব্যক্তি-দিগকে সরকারী সাহায্য দিতে হইবে।

(৭) শ্রমিকদিগকে জীবন ধারণের উপযুক্ত মজুরি দিতে হইবে এবং তাহাদের বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) সমবায় সমিতিগুলিকে উৎসাহ দিতে হইবে। সমবায়ের ভিত্তিতে কুটির শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে।

(৯) উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠন করিতে হইবে।

(১০) ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১১) অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের (বিশেষত তপশীলভুক্ত জাতিগুলির) শিক্ষার জন্য এবং তাহাদের আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) রাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করিতে হইবে।

(১৩) ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন স্থান ও ইমারতগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৪) জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিতে এবং স্বাস্থ্য-হানিকর মদ্যপান নিবারণ করিতে হইবে।

(১৫) দেশের সর্বত্র একই দেওয়ানী আইন (uniform civil code) প্রচলন করিতে হইবে।

(১৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধি প্রতিপালন করিতে হইবে এবং সালিশী দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করিতে হইবে।

অর্থাভাবে এবং অন্যান্য কারণে বিগত কয়েক বৎসর এই সকল নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই, তবে রাষ্ট্রের পরিচালকগণ এই সকল নীতি মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহাদের দ্বারা নির্দেশিত পথে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করিতেছেন।

ভারতের নাগরিক (The Indian Citizen)—ভারতের নাগরিকগণকে আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়াই মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতির প্রধান লক্ষ্য। নাগরিক কাহাকে বলে এবং নাগরিকতা লাভের উপায় কি তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছে। ভারতের নাগরিক কে তাহা সংবিধানে এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ একটি আইনে নির্দেশ করা হইয়াছে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী সংবিধান প্রবর্তিত (commencement of the Constitution) হয়। ঐ তারিখে কাহাকে ভারতের নাগরিকরূপে গণ্য করা হইবে—এই প্রশ্নের উত্তর সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে। ভারতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের নিম্নলিখিত যোগ্যতা আছে তাহারাই ভারতের নাগরিকরূপে গণ্য হইবে :—যে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে এবং (১) বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, (২) অথবা যাহার পিতামাতার মধ্যে একজন বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, (৩) অথবা যে সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অন্যূন পাঁচ বৎসর কাল বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে বসবাস করিয়াছে।

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে ভারতে আগত ব্যক্তিরা কয়েকটি সর্ত পূরণ করিলে ভারতের নাগরিকতা লাভ করিতে পারে : যদি এইরূপ ব্যক্তি অথবা তাহার পিতামাতার মধ্যে একজন অথবা তাহার পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং যদি এইরূপ ব্যক্তি ভারত বিভাগের পরে নির্দিষ্ট কাল ভারতে বাস করিয়া থাকে তবে সে যথারীতি দরখাস্ত করিলে ভারতের নাগরিকতা লাভের যোগ্য হইবে। বিদেশবাসী ভারতীয়গণও কয়েকটি সর্ত পূরণ করিলে ভারতের নাগরিকরূপে গণ্য হইতে পারে :

যদি এইরূপ ব্যক্তি অথবা তাহার পিতামাতার মধ্যে একজন অথবা তাহার পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং যদি এইরূপ ব্যক্তি যেখানে বাস করে সেই দেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নিকট নিজের নাম তালিকাভুক্ত (registered) করায় তবে সে ভারতের নাগরিকতা লাভের যোগ্য হইবে।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিকতা লোপের এবং নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা আছে।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট যে নাগরিকতা আইন (Citizenship Act) বিধিবদ্ধ করিয়াছে তদনুসারে পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতের নাগরিক হওয়া যায়ঃ (১) জন্ম—সংবিধান প্রবর্তনের দিন অথবা তাহার পর যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে ভারতীয় নাগরিক (বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের সন্তান বাদে)। (২) বংশ—সংবিধান প্রবর্তনের দিন অথবা তাহার পর কোন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান বিদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও সে ভারতীয় নাগরিক হইবে। (৩) স্বীকৃতি (Registration)—ভারতে বসবাসকারী ভারতীয় বংশজাত (of Indian origin) ব্যক্তিগণ, ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক বিবাহিতা বিদেশী মহিলা প্রভৃতি ভারতীয় নাগরিকতা লাভের জন্য নিজ নিজ নাম তালিকাভুক্ত করাইতে পারে। (৪) অনুমোদন (Naturalization)—কতকগুলি সর্ত পূরণ করিলে বিদেশীরা অনুমোদিত (Naturalized) নাগরিকরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। (৫) বিদেশী রাজ্যখণ্ডের ভারতরাষ্ট্রভুক্তি (Incorporation of territory)—কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কাহারা ভারতের নাগরিকরূপে গণ্য হইবে তাহা ভারত সরকার স্থির করিবে।

সাধারণভাবে বলা যায়, ভারত রাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক (Natural-born Citizen) এবং গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিক (Naturalized Citizen)—উভয় শ্রেণীর নাগরিকই আছে।

নাগরিকতা আইনে (ব্রিটিশ) রাষ্ট্রসঙ্ঘ নাগরিকতা (Commonwealth citizenship) স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশে ভারতীয় নাগরিক যে সুবিধা পাইবে, সেই দেশের নাগরিক ভারতে অনুরূপ সুবিধা পাইবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতা (Dual citizenship) আছে—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের (State) নাগরিক এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের

(Federal) নাগরিক। ফলে একই দেশের অধিবাসী হইয়াও কোন ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের বাহিরে অপর রাষ্ট্রে কোন কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতে নাগরিকদের মধ্যে এইরূপ আইনগত বিভেদ নাই। এখানে প্রত্যেকেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, রাষ্ট্রের নাগরিকতা (State citizenship) নাই। ভারতের প্রত্যেক নাগরিক ভারতের অন্তর্গত প্রত্যেক রাজ্যে (State) সমান অধিকার দাবি করিতে পারে।

ভোটদানের অধিকার (Franchise)—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে। কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণের—অর্থাৎ ভোট দিবার—অধিকার দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীর থাকে না। বিদেশীরা ভোট দিতে পারে না, কেবলমাত্র নাগরিকেরাই ভোট দিবার অধিকারী। আবার সকল নাগরিক ভোট দিতে পারে না। ভারতের সংবিধান অনুসারে যাহার বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে কেবলমাত্র সেই নাগরিকই ভোট দিবার অধিকারী। কিন্তু একুশ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকই ভোট দিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে যাহারা উন্মাদ বা দেউলিয়া নয় এবং কোন কোন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হয় নাই, কেবলমাত্র তাহারাই ভোট দিবার অধিকারী। ভারতের প্রায় ৪৪ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ৫০ জন (অর্থাৎ প্রায় ২২ কোটি) ভোট দিবার অধিকারী।

প্রশ্ন

1. State at least four of the Fundamental Rights of an Indian citizen. How are these Fundamental Rights protected in the Constitution? (ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্ততঃ চারিটির উল্লেখ কর। এই সকল অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?) (H.S.E., 1961) (১১৩-১১৫ পৃষ্ঠা)

2. What are the Fundamental Rights of the Indian Citizen under the Constitution of India? (ভারতের সংবিধান অনুসারে ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি কি কি?) [H. S. E., 1960] (১১৩-১১৫ পৃষ্ঠা)

3. What are the Directive Principles of State Policy as stated in the Indian Constitution? What is their significance (ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নির্দেশমূলক নীতিগুলি কি কি? তাহাদের গুরুত্ব কি?) [H. S. E., Compartmental, 1960] (১১৫-১১৭ পৃষ্ঠা)

4. Write a brief note on the law of citizenship in India. (ভারতের নাগরিকতা আইন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ।) (১১৭-১১৯ পৃষ্ঠা)

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান ঃ যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের গঠন (Federation of India)—কয়েকটি রাজ্যের বা প্রদেশের সম্মিলনে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠিত হইলে এবং শাসন-ক্ষমতা রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী বিভক্ত হইলে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্র (Federation) বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (United States of America) ৫০টি রাজ্যের সম্মিলনে গঠিত হইয়াছে। ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র, ১৬টি রাজ্য (States) ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত রাজ্যখণ্ডের (Union Territories) সম্মিলনে ইহা গঠিত হইয়াছে।

ভারতের অঙ্গীভূত রাজ্যগুলিকে ইংরেজীতে State বলা হইয়াছে। তাই সংবিধানে ভারতকে "Union of States" বলা হইয়াছে। এই ভাবটি বুঝাইবার জন্য ভারত সম্বন্ধে Union of India বা Indian Union নামও প্রয়োগ করা হয়।

যে সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যখণ্ডের সম্মিলনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে সেগুলিকে বর্তমান সংবিধানে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) **রাজ্য (States)**—বর্তমানে ভারতে ১৬টি রাজ্য আছে : (১) অন্ধ্রপ্রদেশ, (২) আসাম, (৩) বিহার, (৪) গুজরাট, (৫) কেরল, (৬) মধ্যপ্রদেশ, (৭) মাদ্রাজ, (৮) মহারাষ্ট্র, (৯) মহীশূর, (১০) উড়িষ্যা, (১১) পঞ্জাব, (১২) রাজস্থান, (১৩) উত্তরপ্রদেশ, (১৪) পশ্চিমবঙ্গ, (১৫) জম্মু ও কাশ্মীর, (১৬) নাগাভূমি (Nagaland)। জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনকর্তার উপাধি 'সদর-ই-রিয়াসত'; অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রত্যেকটি একজন রাজ্যপালের (Governor) শাসনাধীন।

(২) **কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড nion Territories)**—বর্তমানে ভারতে ছয়টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড আছে : (১) দিল্লী, (২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) ত্রিপুরা, (৪) মণিপুর, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৬) ল্যাকাডিভ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ। ইহার প্রত্যেকটি একজন 'চীফ কমিশনার' (Chief Commissioner) অথবা উপ-রাজ্যপাল (লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণর, Lieutenant-Governor) আখ্যাধারী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীর শাসনাধীন।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে **রাজ্য পুনর্গঠন আইন (States**

Reorganisation Act) অনুসারে উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। উক্ত আইন প্রবর্তনের পর দুইটি প্রধান পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বোম্বাই রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র নামে দুইটি রাজ্য গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি আসামের কয়েকটি পার্বত্য অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নাগাভূমি রাজ্য গঠিত হইয়াছে :—

যে সকল রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডের সম্মিলনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে সেগুলি সংবিধান প্রবর্তন কালে (১৯৫০) চারিটি ভাগে বিভক্ত ছিল।

(১) **'ক' শ্রেণীর রাজ্য (Part A States) :** এই শ্রেণীতে দশটি রাজ্য ছিল—অন্ধ্র, আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ। ইহার প্রত্যেকটিই একজন রাজ্যপালের (Governor) শাসনাধীন ছিল।

(২) **'খ' শ্রেণীর রাজ্য (Part B States) :** এই শ্রেণীতে আটটি রাজ্য ছিল—হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব পঞ্জাব রাজ্য সম্মিলন, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। ইহার প্রত্যেকটিই একজন রাজপ্রমুখের (Rajpramukh) শাসনাধীন ছিল। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজপ্রমুখের উপাধি ছিল 'সদর-ই-রিয়াসত'। ইংরেজ আমলে যে সকল দেশীয় নৃপতি-শাসিত রাজ্য ছিল তাহার অধিকাংশই 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল।

(৩) **'গ' শ্রেণীর রাজ্য (Part C States) :** এই শ্রেণীতে নয়টি রাজ্য ছিল—আজমীর, ভূপাল, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিন্ধ্যপ্রদেশ।

আজমীর, কুর্গ, দিল্লী, কচ্ছ, মণিপুর ও ত্রিপুরা—এই সাতটি রাজ্য ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে চীফ কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইত।

হিমাচল প্রদেশ ও বিন্ধ্যপ্রদেশ—এই দুইটি রাজ্য ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে উপ-রাজ্যপাল (Lieutenant-Governor) কর্তৃক শাসিত হইত।

(৪) **'ঘ' শ্রেণীর রাজ্যখণ্ড (Part D Territory) :** এই শ্রেণীতে মাত্র একটি রাজ্যখণ্ড ছিল—আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ইহা ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে চীফ কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নূতন ব্যবস্থার ফলে (১) 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সংবিধানগত পার্থক্য দূর হইয়াছে, (২) 'রাজপ্রমুখ' পদ বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং (৩) 'গ' শ্রেণীর রাজ্য ও 'ঘ' শ্রেণীর রাজ্যখণ্ড একই শ্রেণীভুক্ত

করা হইয়াছে। (অবশ্য 'গ' শ্রেণীর কয়েকটি রাজ্য—আজমীর, ভূপাল, কুর্গ ও বিন্ধ্যপ্রদেশ—নূতন ব্যবস্থায় যথাক্রমে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন-প্রণয়নের ও শাসনকার্যের ক্ষমতা বিভাগ (Distribution of Powers)—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federation)। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং একাধিক রাজ্য সরকার এবং রাজ্য আইনসভা থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি (administrative powers) ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ কয়েকটি বিষয়ে শাসনের ভার থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এবং বাকী বিষয়গুলি সম্বন্ধে শাসনের ভার থাকে রাজ্য সরকারের উপর। শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের সমগ্র রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার—উভয়েরই পৃথক আয় থাকে। আবার কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভার মধ্যে আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি (legislative powers) ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ কয়েকটি বিষয়ে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় আইনসভাকে এবং বাকী বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয় রাজ্য আইনসভাকে।

ভারতেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত। কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম পার্লামেণ্ট। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি রাজ্যে পৃথক আইনসভা আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ডে আইনসভা নাই। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে, রাজ্যের আইন সভাগুলিও আইন প্রণয়ন করে। কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবে, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়ন করিবে, তাহা সংবিধানে তিনটি তালিকায় (Legislative List) উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথমত, পার্লামেণ্ট যে আইন করিবে তাহা ভারতের সর্বত্র সকলকেই মানিতে হইবে। আর রাজ্যের আইনসভা যে আইন করিবে তাহা কেবল সেই রাজ্যের সীমার মধ্যে প্রয়োগ করা যাইবে।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যের আইনসভা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন করিতে পারিবে, পার্লামেণ্ট অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ে আইন করিবে।

তৃতীয়ত, কতকগুলি বিষয়ে পার্লামেণ্ট এবং রাজ্যের আইনসভা, উভয়ই আইন করিতে পারিবে। আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের এবং রাজ্যের

আইনসভার ক্ষমতার সীমারেখা সংবিধানে তিনটি তালিকা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

কতকগুলি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা। সেই সকল বিষয়ে আইন করিবার অধিকার রাজ্যের আইনসভার। সংবিধানে এই সকল বিষয়ের তালিকা (State List) আছে। সেই তালিকায় ৬৬টি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন,—শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা; পুলিশ; জেলখানা; বিচার; স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; জনস্বাস্থ্য; শিক্ষা; কৃষি; জমি; বন; মৎস্য পালন; সমবায় সমিতি; ইত্যাদি।

কতকগুলি বিষয়ে সকল রাজ্যের—সমগ্র ভারতের একই স্বার্থ, একই সমস্যা। মনে কর, দেশরক্ষার ব্যবস্থা। কোন বিদেশী রাষ্ট্র যদি সমুদ্রপথে বোম্বাই আক্রমণ করে তবে সমগ্র ভারতের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। কাজেই সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি পার্লামেন্টকেই দেশরক্ষা সম্বন্ধে আইন করিবার অধিকার দিতে হইবে। এই শ্রেণীর সকল বিষয়ে আইন করিবার অধিকার পার্লামেন্টের। সংবিধানে এই সকল বিষয়ের তালিকা (Union List) আছে। সেই তালিকায় ৯৭টি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন,—দেশরক্ষা ব্যবস্থা; স্থল-সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী; যুদ্ধ ও শান্তি; অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ; রেলওয়ে; ডাক, তার, টেলিফোন, বেতার; জলপথ; বিমানপথ; মুদ্রা; বৃহৎ শিল্প; বাণিজ্য; ব্যাঙ্ক; বীমা; নাগরিকতা; ইত্যাদি।

কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে পার্লামেন্ট এবং রাজ্যের আইনসভা, উভয়েই আইন করিতে পারে (Concurrent List)। এই যুক্ত তালিকায় ৪৭টি বিষয় উল্লিখিত আছে। যেমন,—ফৌজদারী আইন; বিবাহ; দত্তক গ্রহণ; যৌথ পরিবার ও সম্পত্তি বিভাগ; ঔষধ; চিকিৎসা ব্যবসায়; আইন ব্যবসায়; সংবাদপত্র; পুস্তক ও ছাপাখানা; ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে সাধারণত পার্লামেন্টের আইন রাজ্যের আইনসভার আইনের উপর বলবৎ হইবে।

যে সকল বিষয়ে আইন করিবার অধিকার রাজ্যের আইনসভার, সেই সকল বিষয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট আইন করিতে পারে। কিন্তু যে সকল বিষয়ে আইন করিবার অধিকার পার্লামেন্টের, সেই সকল বিষয়ে রাজ্যের আইনসভা কখনও আইন করিতে পারে না।

আইন-প্রণয়নের ক্ষমতার সহিত শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যে সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা (অর্থাৎ পার্লামেন্ট) আইন প্রণয়ন করিবে

সেই সকল বিষয়ে শাসনকার্যের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে। যেমন, পার্লামেণ্ট রেলওয়ে সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে; সুতরাং রেলওয়ে পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। আবার যে সকল বিষয়ে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করিবে সেই সকল বিষয়ে শাসনকার্যের ভার রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে। যেমন, রাজ্য আইনসভা পুলিশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে; সুতরাং পুলিশ বাহিনীর পরিচালনা করে রাজ্য সরকার। রেলওয়ের উপর রাজ্য সরকারের কোন কর্তৃত্ব নাই, আবার পুলিশের উপর সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Characteristics of Indian Federation)—ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলা হইয়াছে এইজন্য যে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এখানেও ক্ষমতা বিভাজনের (distribution of powers) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বৈত শাসন-পদ্ধতি (dual government) প্রচলিত।* কিন্তু অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। প্রথমত, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে—যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে—সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতার চেয়ে রাজ্য সরকার ও রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা বেশী থাকে। ভারতে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা প্রচলিত, অর্থাৎ এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা রাজ্য সরকার ও রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার চেয়ে বেশী। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে (রাজ্য সভার অনুমোদন অনুসারে অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তি পালনের জন্য প্রয়োজন হইলে) পার্লামেণ্ট রাজ্য আইনসভার অধিকারভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে, কিন্তু রাজ্য আইনসভা কখনও পার্লামেণ্টের অধিকারভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে না তৃতীয়ত, দেশে জরুরী অবস্থা (Emergency) উপস্থিত হইলে অথবা কোন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো অচল হইলে রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্যের

* "It (the Constitution) establishes a dual polity with the Union at the Centre and the States at the periphery, each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution. The Union is not a League of States, united in a loose relationship, nor are the States the agencies of the Union, deriving powers from it. Both the Union and the States are created by the Constitution, both derive their respective authority from the Constitution. The one is not subordinate to the other in its own field ; the authority of one is co-ordinate with that of the other."—*Dr. Ambedkar's speech in Constituent Assembly.*

শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। তখন ঐ রাজ্য সাময়িক ভাবে পার্লামেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন হয়। এইভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সাময়িকভাবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে (Unitary State) পরিণত করা যাইতে পারে। তাই কেহ কেহ বলেন যে ভারত প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র নয়, অর্ধ যুক্তরাষ্ট্র (Quasi-Federation) বা এককেন্দ্রিক নীতি দ্বারা প্রভাবিত যুক্তরাষ্ট্র। সংবিধানে ভারতকে "Union of States" বলা হইয়াছে, Federation বা যুক্তরাষ্ট্র বলা হয় নাই। সেখানে "Union" কথাটি দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশেষত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতে দ্বৈত নাগরিকতা (dual citizenship) নাই, এখানে প্রত্যেক নাগরিক কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক—কোন রাজ্যের নাগরিক নহে।

সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলিকে সমান অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বরের পূর্বে ভারতে 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের অধিকার 'খ' শ্রেণীর রাজ্য অপেক্ষা বেশী ছিল, এবং 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের মর্যাদা ও অধিকারের তুলনায় 'গ' শ্রেণীর রাজ্যের মর্যাদা ও অধিকার অনেক কম ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলির মধ্যে এইরূপ বৈষম্য যুক্তরাষ্ট্র গঠন-সংক্রান্ত মূলনীতির বিরোধী। রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ব্যবস্থা অনুসারে নবগঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত সমুদয় বৈষম্য দূর হইয়াছে, কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কোন কোন বিষয়ে বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেছে। ইহা ছাড়া রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডের মধ্যে বৈষম্য রহিয়াছে—রাজ্যখণ্ডগুলি স্বাতন্ত্র্যের (autonomy) অধিকারী নহে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে (Senate) প্রত্যেক রাজ্যের (State) সমানসংখ্যক প্রতিনিধি আছে, রাজ্যের আয়তন বা লোক-সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধি-সংখ্যার তারতম্য হয় না। এই ব্যবস্থা রাজ্যগুলির সমতার (equality) সূচক। কিন্তু ভারতের পার্লামেণ্টের উচ্চতর কক্ষে—অর্থাৎ রাজ্যসভায়—এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই, জনসংখ্যা অনুসারে রাজ্যের প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই রীতি মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী।

প্রশ্ন

1. Name the States and Union Territories in India. (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলির তালিকা দাও।) (১২০ পৃষ্ঠা)

2. How have legislative and executive powers been divided between

the Union and the States? (কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন-প্রণয়ন এবং শাসনকার্যের ক্ষমতা কিভাবে ভাগ করা হইয়াছে?) (১২২-১২৪ পৃষ্ঠা)

3. What is a Federation? Is India a true Federation? ('যুক্তরাষ্ট্র' কাহাকে বলে? ভারতকে প্রকৃত 'যুক্তরাষ্ট্র' বলা যায় কি?) (১২০, ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা)

4. State and explain the important characteristics of the Federation of India. (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা কর।) [H.S.E. Compartmental, 1961] (১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা)

5. What are the characteristic features of the Federation of India? (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণগুলি কি কি?) [H.S.E., 1961] (১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা)

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

সমগ্র ভারতে যে কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government) বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Union Government) রহিয়াছে তাহার শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার (Union Cabinet) পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আইন প্রণয়ন করে পার্লামেণ্ট। মোটামুটি বলিতে গেলে, পার্লামেণ্টের অনুমোদন অনুসারে রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রিসভা শাসনকার্য নির্বাহ করে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Election of President)—সংবিধান অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে, অর্থাৎ তিনি একবারে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তবে একই ব্যক্তি একাধিকবার রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন; সুতরাং নির্বাচকদিগের সমর্থন পাইলে একই ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারেন। আবার সংবিধানের কোন নির্দেশ অমান্য করিবার অপরাধে Impeachment নামক পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি ঘটিতে পারে। (পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষ (রাজ্যসভা অথবা লোকসভা) সেই কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থন সহ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবে। পরে পার্লামেণ্টের অপর কক্ষ দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থন সহ সেই অভিযোগ অনুমোদন করিবে। অনুমোদনের পূর্বে

অভিযোগের যথাযথ পরীক্ষা হইবে এবং রাষ্ট্রপতিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে। এই পদ্ধতিকে Impeachment বলা হয়।)

যিনি রাষ্ট্রপতির পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন তাঁহার নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা চাই: (১) তিনি ভারতের নাগরিক হইবেন। কোন বিদেশী ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না। (২) তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৩৫ বৎসর হওয়া চাই। (৩) তাঁহার লোকসভার সভ্য হওয়ার আইনগত যোগ্যতা থাকা চাই—অর্থাৎ তিনি উন্মাদ বা দেউলিয়া হইবেন না, তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত কোন প্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না, ইত্যাদি। (৪) তিনি কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে, অথবা এইরূপ কোন সরকারের কর্তৃত্বাধীন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে লাভজনক পদে (office of profit) নিযুক্ত থাকিবেন না। এইরূপ যোগ্যতা থাকিলে যে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করিলে তিনি পার্লামেন্টের বা কোন রাজ্যের আইনসভার সভ্য থাকিতে পারিবেন না।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) গঠিত হইবে। ইহাতে থাকিবেন: (১) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের (রাজ্যসভা ও লোকসভার) সমুদয় নির্বাচিত সভ্য; (২) সমুদয় রাজ্য আইন সভার (State Legislative Assemblies) সকল নির্বাচিত সভ্য। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে এবং রাজ্য আইন সভাসমূহে যে সকল (রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কর্তৃক) মনোনীত সভ্য থাকিবেন তাঁহারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না। যে সকল রাজ্যে বিধান পরিষদ (Legislative Council) আছে সেখানে ঐ পরিষদের কোন সভ্যই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না। নির্বাচক মণ্ডলীর (Electoral College) সভ্যগণ একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট (proportional representation by means of the single transferable secret vote) দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবেন। সংখ্যালঘু দলের স্বার্থরক্ষার জন্য ভোটদানের এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা (এবং রাজ্যসভার ক্ষেত্রে, জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। ইহার নাম পরোক্ষ

নির্বাচন (Indirect Election)। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন? ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে (যখন প্রথম রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়) ভারতে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৮ কোটি। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোটদাতার সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে। ১৮ কোটি লোকের ভোট গ্রহণের বন্দোবস্ত করা সহজ নহে। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইলে মন্ত্রিগণের (তাঁহারাও প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত) সহিত তাঁহার মতভেদের ক্ষেত্রে নানাবিধ শাসনতান্ত্রিক সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। তাই রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইলেও তিনি জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। রাষ্ট্রের নীতিতে ও শাসনকার্যে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত করা তাঁহার কর্তব্য।

রাষ্ট্রপতি বিনা ভাড়ায় সরকারী প্রাসাদে বাস করিতে পারিবেন। তিনি মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও নানাবিধ ভাতা পাইবেন।

শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (President's Executive Powers)—সংবিধানে রাষ্ট্রপতির নানারকম ক্ষমতার বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায়। তিনি রাষ্ট্রের নায়ক এবং শাসনসংক্রান্ত সকল কার্যের অধিকর্তা। সুতরাং তাঁহাকে নানারকম কাজ করিতে হয়। নানারকম কাজ করিতে হইলেই নানারকম ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। আইনসঙ্গত ক্ষমতা না থাকিলে রাষ্ট্রের কাজ করা যায় না।

কেন্দ্রের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive power of the Union) রাষ্ট্রপতির নামে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ আইনের দিক হইতে দেখিতে গেলে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার ভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। সংবিধান অনুসারে তিনি স্বয়ং অথবা সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা এই দায়িত্ব পালন করিতে পারেন। কার্যত শাসনকার্য পরিচালনা করেন মন্ত্রিগণ। মন্ত্রীদের সহিত রাষ্ট্রপতির সম্বন্ধ পরে আলোচিত হইবে। কিন্তু কাজ মন্ত্রীরা করিলেও হুকুম বাহির হয় রাষ্ট্রপতির নামে। রাষ্ট্রের নায়কের হুকুম ছাড়া কোন কাজ আইনত সিদ্ধ হয় না।

বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। যথা,—জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সমুদয় রাজ্যের রাজ্যপাল; রাজ্যখণ্ডসমূহের চীফ কমিশনার বা লেফটেনান্ট-গভর্নর; সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টসমূহের

বিচারকগণ; ভারতের অ্যাটর্নী-জেনারেল (Attorney-General)—যিনি আইনসংক্রান্ত বিষয়ে ভারত সরকারের পরামর্শদাতা এবং ভারত সরকারের পক্ষে প্রধান ব্যবহারজীবী; ভারতের কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল (Comptroller and Auditor-General)—যিনি ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকারসমূহের হিসাব পরীক্ষা করেন; প্রধান নির্বাচন কমিশনার—যিনি জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাজের ব্যবস্থা করেন; ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই সকল পদের জন্য লোক মনোনয়ন করেন মন্ত্রিসভা। অনেক সময় মন্ত্রিসভার নায়ক রূপে প্রধান মন্ত্রী স্থির করেন কোন্ পদে কাহাকে নিযুক্ত করা হইবে। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে কোন উচ্চপদের জন্য লোক মনোনয়ন করেন না; মন্ত্রীদের মনোনীত ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন—অর্থাৎ নিয়োগকার্য আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে সম্পন্ন হয়।

কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে রাষ্ট্রপতি বরখাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও বরখাস্ত করা সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন না, মন্ত্রীরা আইন সঙ্গত ভাবে যাঁহাকে বরখাস্ত করিতে বলেন তাঁহাকেই বরখাস্ত করেন।

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ভারতের স্থল-সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক। কিন্তু দেশরক্ষা বাহিনীর পরিচালনায় তিনি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত আইন মানিয়া চলিবেন। এখানেও তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিবার সুযোগ নাই। তাঁহাকে পার্লামেণ্টের আইন মানিতে হইবে; তাহা ছাড়া মন্ত্রীদের পরামর্শও তাঁহাকে লইতে হইবে।

অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে ভারতে যে সকল দূত প্রেরিত হন তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নিকট পরিচয়পত্র দাখিল করেন। যে সকল ভারতীয় দূত অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রেরিত হন তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। অবশ্য মন্ত্রীরাই তাঁহাদিগকে মনোনয়ন করেন। রাষ্ট্রপতি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে লোক নির্বাচন করেন না। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা সম্বন্ধে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির নামে কাজ করেন।

আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (President's Legislative Powers) : রাষ্ট্রপতির সহিত পার্লামেণ্টের সম্বন্ধ (President's relation

with Parliament)—রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ; রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি কক্ষ (রাজ্যসভা ও লোকসভা) লইয়া পার্লামেণ্ট গঠিত। রাজ্যসভার ১২ জন সভ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। লোকসভায় তিনি এক বা দুইজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্য মনোনয়ন করিতে পারেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভা কর্তৃক মনোনীত হন, রাষ্ট্রপতি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাহাকেও মনোনয়ন করেন না।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের (অর্থাৎ রাজ্যসভার ও লোকসভার) অধিবেশন আহ্বান করেন। তাঁহার আহ্বান ব্যতীত কোন কক্ষের অধিবেশন হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাকে প্রতি বৎসর অন্তত দুইবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতেই হইবে। তিনি যে কোন সময়ে উভয় কক্ষের (অথবা যে কোন কক্ষের) অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে (prorogue) পারেন। রাজ্যসভা চিরস্থায়ী পরিষদ। রাষ্ট্রপতি উহা ভাঙ্গিয়া দিতে (dissolve) পারেন না। আর উহার কার্যকাল বাড়াইয়া দিবার কথাই উঠে না। লোকসভা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। ইহার কার্যকাল (অর্থাৎ পাঁচ বৎসর) উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি ইহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন লোকসভা নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। রাজ্যসভা ও লোকসভা সংক্রান্ত এই সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করেন, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে কিছুই করেন না।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে উপস্থিত হইয়া ভাষণ (Address) দিতে পারেন। পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশন করাইয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হইতে ও ভাষণ দিতে পারেন। পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে যে কোন বিষয়ে তিনি বাণী (Message) পাঠাইতে পারেন। আবার পার্লামেণ্টের কোন কোন নির্দিষ্ট অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতিকে একটি ভাষণ দিতেই হয়। ঐ অধিবেশন কেন ডাকা হইয়াছে, কোন্ কোন্ বিষয় পার্লামেণ্টকে বিবেচনা করিতে হইবে, কোন্ কোন্ আইনের খসড়া বা বিধেয়ক (Bill) পার্লামেণ্টের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইবে—এই সকল বিষয় ঐ ভাষণের মারফৎ পার্লামেণ্টকে জানানো হয়। কার্যত রাষ্ট্রপতির সমুদয় ভাষণ ও বাণী মন্ত্রীরা প্রস্তুত করেন, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত মতামত তাহাতে প্রকাশিত হয় না। মন্ত্রীরা পার্লামেণ্টকে যাহা জানাইতে চাহেন রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টকে তাহাই বলেন।

সংবিধানে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে পার্লামেণ্টে

বিধেয়ক (Bill) দাখিল করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমতি লইতে হয়। কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন, নূতন কর স্থাপন বা অর্থব্যয় সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া পার্লামেণ্ট এই সকল বিষয় সংক্রান্ত কোন বিধেয়ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে না। অবশ্য তাঁহার অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া কার্যত মন্ত্রীদের পরামর্শের উপর নির্ভর করে।

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ একমত না হইলে কোন বিধেয়ক অনুমোদিত হয় না। যদি কোন ক্ষেত্রে দুই কক্ষ একমত না হয় তবে বিধেয়কটি বাতিল হইয়া যায়, অথবা মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশন আহ্বান করেন। সম্মিলিত অধিবেশনে উভয় কক্ষের যে সকল সভ্য উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ সভ্য যদি বিধেয়কটি অনুমোদন করেন তবে উহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইল বলিয়া ধরা হইবে, আর অধিকাংশ সভ্য উহার বিরুদ্ধে ভোট দিলে উহা চূড়ান্তভাবে পার্লামেণ্ট কর্তৃক পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ পৃথক ভাবে, অথবা সম্মিলিত অধিবেশনে, কোন বিধেয়ক অনুমোদন করিলে তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য দাখিল করিতে হয় তিনি সম্মতি প্রদান করিলে উহা পাকাপাকি আইনে পরিণত হয়। তিনি সম্মতি প্রদান না করিলে উহা সম্পূর্ণ বাতিল হইয়া যায়। রাষ্ট্রপতি কোন বিধেয়ক সম্বন্ধে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া উহা পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্টে ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। তখন পার্লামেণ্টের দুই কক্ষ ঐ বিধেয়ক সম্বন্ধে আবার আলোচনা করিবে। আলোচনার ফলে উহা যদি আবার উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় তবে উহা আবার রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য দাখিল করিতে হইবে। তখন তিনি উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ দ্বিতীয় বার বিধেয়কটি অনুমোদন না করিলে উহা আর রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হইবে না।

কোন রাজ্য আইন সভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিধেয়ক ঐ রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য দাখিল করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উহা দাখিল করিতেই হয়। তখন রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পাইলে উহা আইনে পরিণত হয় না।

যে কোন বিধেয়কে (তাহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হউক বা রাজ্য

আইন সভা কর্তৃক অনুমোদিত হউক) সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন বা উহা পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে কিছুই করেন না।

সাধারণত পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া আইন হয় না। কিন্তু পার্লামেণ্টের (অথবা উহার কোন একটি কক্ষের) অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে জরুরী প্রয়োজনে অবিলম্বে কোন বিষয়ে আইন করা আবশ্যক হইতে পারে। তখন আর পার্লামেণ্ট ডাকিয়া সাধারণ নিয়ম অনুসারে আইন করিবার সময় থাকে না। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে (নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে নয়) জরুরী আইন (Ordinance) জারি করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত ঐ আইন বলবৎ থাকিবে। অবশ্য তাহার পূর্বেই পার্লামেণ্ট উহা বাতিল করিতে পারিবে। আবার পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে উহা আরও দীর্ঘকালের জন্য বলবৎ করিতে অথবা স্থায়ী আইনে পরিণত করিতে পারিবে। সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে জরুরী আইন জারি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক বৎসর মন্ত্রীরা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করেন। ইহার সাধারণ নাম বাজেট (Budget)। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী দেখা গেলে নূতন কর স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। কোন বিষয়ে কত আয় ও কত ব্যয় হইবে, এবং নূতন কর স্থাপন করিতে হইলে কিসের উপর কত হারে কর বসিবে, তাহা মন্ত্রীরাই স্থির করেন ; কিন্তু প্রস্তাবগুলি রাষ্ট্রপতির নামে পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয়। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কেহ কর স্থাপন ও সরকারী ব্যয় বাবদ কোন প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিতে পারেন না। কর স্থাপন ও সরকারী ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিধেয়ক (Money Bill) লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতি তাহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতির অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (President's Financial Powers)— উপরে বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কেহ করস্থাপন ও সরকারী ব্যয় সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিতে পারেন না। এই সকল বিষয় সংক্রান্ত কোন বিধেয়ক (Money Bill) পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রপতির বিচার বিষয়ক ক্ষমতা (President's Judicial Powers)—

সুপ্রীম কোর্ট এবং হাই কোর্ট সমূহের বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কোন ব্যক্তি পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধে কোন আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইলে, অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, রাষ্ট্রপতির নিকট মার্জনা (pardon) ভিক্ষা করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে তাহার দণ্ড হ্রাস করিতে অথবা দণ্ড হইতে তাহাকে একেবারে মুক্তি দিতে পারেন।

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (President's Emergency Powers)—নানাকারণে দেশে জরুরী অবস্থার (Emergency) উদ্ভব হইতে পারে। তখন জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন ও আইন প্রণয়ন আবশ্যক হইতে পারে। তাই রাষ্ট্রপতিকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমত, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ (দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি) বা বৈদেশিক আক্রমণ (অথবা এইরূপ গোলযোগ বা আক্রমণের আশঙ্কা) সমগ্র দেশের বা ইহার কোন অংশের শান্তি বা নিরাপত্তা নষ্ট করিতে পারে। তখন রাষ্ট্রপতি ঘোষণাপত্র (Proclamation of Emergency) প্রচার করিয়া পার্লামেণ্ট এবং ভারত সরকারের হাতে কতকগুলি বিষয়ের দায়িত্ব ও কতকগুলি কাজ করিবার ক্ষমতা দিতে পারেন। আকস্মিক বিপদকালে যেন শাসন-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া না পড়ে, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যাহাতে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, সেজন্য রাষ্ট্রপতির উপর এই ভার দেওয়া হইয়াছে। এই ঘোষণাপত্র যতদিন বলবৎ থাকে ততদিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কার্যত এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, নানাকারণে কোন রাজ্যে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে সাধারণ নিয়মে ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করা কঠিন বা অসম্ভব হইয়া পড়ে (কিছুকাল পূর্বে পঞ্জাবে এবং কেরলে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল)। তখন রাষ্ট্রপতি ঘোষণাপত্র (Proclamation of failure of constitutional machinery in a State) প্রচার করিয়া ঐ রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে লইতে পারেন এবং পার্লামেণ্টকে ঐ রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করার অর্থ কার্যত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে ঐ ভার দেওয়া। এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যের আত্মকর্তৃত্ব (autonomy) সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়।

তৃতীয়ত, নানাকারণে ভারতের বা ইহার অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্যের আর্থিক

কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইতে পারে। ইহার প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া (Proclamation of Financial Emergency) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারকে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিতে পারেন।

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে সকল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন সেগুলি সাময়িক ক্ষমতা, স্থায়ী ক্ষমতা নহে; কারণ জরুরী অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। আর এই সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে প্রয়োগ করিবেন, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে প্রয়োগ করিবেন না।

রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিসভার সম্বন্ধ (President's relation with Council of Ministers)—রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করেন, বরখাস্তও করিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্বন্ধে তিনি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতে পারেন না। যে রাজনৈতিক দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতৃগণই মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং যতদিন তাঁহারা লোকসভার বিশ্বাসভাজন থাকেন ততদিন রাষ্ট্রপতি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্বন্ধে তাঁহাকে লোকসভার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারেই ব্যবহার করেন, কোন কাজেই তিনি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন না। তাঁহার নামে মন্ত্রীরাই দেশ শাসন করেন। সুতরাং শাসনকার্যের দোষ-ত্রুটির জন্য রাষ্ট্রপতির নিন্দা হয় না, শাসনকার্যের সাফল্যের জন্যও তাঁহার প্রশংসা হয় না। সকল বিষয়ের জন্য মন্ত্রীরাই দায়ী, নিন্দা বা সুখ্যাতি তাঁহাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিই শাসনযন্ত্রের নায়ক। তাই শাসনসংক্রান্ত সমুদয় নির্দেশ তাঁহার নামে প্রচারিত হয়।

শাসনকার্য ও আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে মন্ত্রীরা যাহা করিতে চাহেন তাহা সর্বদা রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে হয়। যে কোন বিষয় সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি যে কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে প্রধান মন্ত্রী তাহা জানাইতে বাধ্য। মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি নাকচ করিতে পারেন না; কিন্তু কোন মন্ত্রী যদি ব্যক্তিগত ভাবে (অর্থাৎ মন্ত্রিসভার মত না লইয়া) কোন সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন তবে রাষ্ট্রপতি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া প্রধান মন্ত্রীর মারফৎ তাহা মন্ত্রিসভার বিবেচনার

জন্য পাঠাইতে পারেন। মন্ত্রিসভা যদি ঐ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে তবে রাষ্ট্রপতি তাহাতে অবশ্যই সম্মতি প্রদান করিবেন।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির স্থান (President's place in the Constitution)—সংবিধান পড়িলে মনে হয় যেন রাষ্ট্রপতিই সকল কাজ করেন, মন্ত্রীরা কেবল তাঁহাকে সাহায্য করেন ও পরামর্শ দেন ("aid and advise")। কার্যত মন্ত্রীরাই যাহা করিবার করেন, মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত ও আদেশ রাষ্ট্রপতির নামে প্রচারিত হয়। মন্ত্রীরা আবার লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। সুতরাং লোকসভার ইচ্ছা অনুসারে মন্ত্রীদিগকে কাজ করিতে হয়। এইভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন কার্যত লোকসভার শাসনে পরিণত হয়। আবার লোকসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। সুতরাং লোকসভার শাসন পরোক্ষ ভাবে জনসাধারণের শাসন। রাষ্ট্রপতি নিজেও পরোক্ষ ভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্বাচিত। ভারতের গণতন্ত্রের তিনি নায়ক ও প্রতীক। জনসাধারণের ইচ্ছা অনুসারে যাহাতে শাসনকার্য পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রপতির কর্তব্য। তিনি সংবিধানের রক্ষক, অর্থাৎ শাসনকার্যে ও আইন-প্রণয়নে যাহাতে সংবিধানের ধারা লঙ্ঘিত না হয় তাহা তিনি দেখিবেন। জাতির প্রকৃত শাসক না হইলেও রাষ্ট্রপতি জাতির নায়ক। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

উপ-রাষ্ট্রপতি (Vice-President)—সংবিধান অনুসারে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের ভোটে নির্বাচিত হন। এখানেও একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট (proportional representation by means of the single transferable secret vote) প্রযোজ্য। উপ-রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর। একই ব্যক্তির একাধিকবার উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইবার আইনগত বাধা নাই। উপ-রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর অনুরূপ যোগ্যতা থাকা চাই—অর্থাৎ তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে, তাঁহার বয়স অন্তত ৩৫ বৎসর হওয়া চাই, ইত্যাদি। রাজ্যসভার অধিকাংশ সভ্য তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা সূচক প্রস্তাব (no-confidence motion) অনুমোদন করিলে এবং ঐ প্রস্তাব লোকসভা কর্তৃক সমর্থিত হইলে তিনি পদচ্যুত হইবেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে (ex-officio) রাজ্যসভার সভাপতি। ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন কাজ নাই। শাসনকার্যের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ

নাই। তবে রাষ্ট্রপতি কিছুদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিলে, অথবা কোন কারণে কাজ করিতে না পারিলে, উপ-রাষ্ট্রপতি সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রপতির কাজ করিবেন। আবার রাষ্ট্রপতির পদ হঠাৎ (মৃত্যু, পদত্যাগ বা পদচ্যুতি দ্বারা) শূন্য হইলে যতদিন নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হন ততদিন উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা (Union Council of Ministers)—সংবিধান অনুসারে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে সাহায্য করে এবং পরামর্শ দেয় ("aid and advise")। কার্যত সমুদয় ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত।

মন্ত্রিসভার নিয়োগ—প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। সাধারণত লোকসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতাই প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি ঐ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রীই অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে মনোনীত করেন। সুতরাং মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিবার সুযোগ পান না। যাঁহারা সমবেত ভাবে লোকসভার অধিকাংশ সভ্যের বিশ্বাসভাজন হইবেন এমন ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিতে হয়।

প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister)—প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীকে লইয়া মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) গঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রীই মন্ত্রিসভার নায়ক। মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনিই সভাপতিত্ব করেন, রাষ্ট্রপতি সেখানে উপস্থিত থাকেন না। কে কে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইবেন, কোন্ মন্ত্রী কোন্ বিভাগের ভার পাইবেন তাহা তিনিই স্থির করেন। আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে মন্ত্রিসভা কোন্ নীতি অনুসরণ করিবে তাহা প্রধানত তিনিই নির্ধারণ করেন। পার্লামেণ্টে তিনি সরকারী নীতি ও কার্যের প্রধান সমর্থক। সকল বিষয়ে তিনিই রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রীই দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

মন্ত্রিসভার সহিত পার্লামেণ্টের সম্বন্ধ (Relation between Council of Ministers and Parliament)—প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রত্যেক মন্ত্রী অবশ্যই পার্লামেণ্টের কোন একটি কক্ষের সভ্য হইবেন। পার্লামেণ্টের মনোনীত সভ্যেরাও মন্ত্রী হইতে পারেন। যিনি পার্লামেণ্টের

সভ্য নহেন এমন কোন ব্যক্তিকেও প্রধান মন্ত্রীর বা মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্যভার গ্রহণের পর ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের নির্বাচিত বা মনোনীত সভ্য হইতে হইবে, নতুবা তিনি আর মন্ত্রিত্ব করিতে পারিবেন না।

সংবিধানে বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রপতির যতদিন খুশি ততদিনই প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী (collectively responsible) থাকিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছামত মন্ত্রীদিগকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন না, যতদিন তাঁহারা লোকসভার বেশীর ভাগ সদস্যের সমর্থন পাইবেন ততদিনই তাঁহারা মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। লোকসভা কর্তৃক সমর্থিত কোন মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করিলে রাষ্ট্রপতি আর নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবেন না, কারণ নূতন কোন মন্ত্রিসভা লোকসভার সমর্থন পাইবে না। সুতরাং মন্ত্রী না থাকায় শাসনকার্য চলিবে না। আবার যে মন্ত্রিসভা লোকসভার সমর্থন হারাইয়াছে তাহাকে রাষ্ট্রপতি বরখাস্ত না করিলে শাসনযন্ত্র বিকল হইবে। লোকসভার অনুমোদন ছাড়া মন্ত্রিসভা কর আদায় ও অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। এই জন্যই যে মন্ত্রিসভা লোকসভার সমর্থন হারাইয়াছে তাহার পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং সেই মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে, নতুবা রাষ্ট্রপতি উহাকে বরখাস্ত করেন। অতএব মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি সম্বন্ধে লোকসভার ইচ্ছাই প্রবল, রাষ্ট্রপতি লোকসভার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিবেন। মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট দায়ী—এই কথার ইহাই অর্থ।

লোকসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বকে যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility) বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ কি?

সাধারণত একজন মন্ত্রীর উপর শাসনসংক্রান্ত একটি বিভাগের ভার ন্যস্ত হয়। খাদ্য মন্ত্রীর উপর খাদ্য বিভাগের ভার, রেলওয়ে মন্ত্রীর উপর রেলওয়ে পরিচালনার ভার, ইত্যাদি। প্রত্যেক মন্ত্রী নিজের বিভাগের সাধারণ কাজ সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ দিতে পারেন। যেমন, কলিকাতা ও দিল্লীর মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতে একখানি অতিরিক্ত গাড়ী দেওয়ার দরকার আছে কিনা তাহা রেলওয়ে মন্ত্রী স্থির করিবেন। কিন্তু রেলের ভাড়ার হার বাড়ানো বা কমানো সম্বন্ধে রেলওয়ে মন্ত্রীর নির্দেশই চূড়ান্ত হইবে না। এইরূপ গুরুতর বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রীদের—সমগ্র মন্ত্রিসভার—সম্মতি

চাই। মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহা সকল মন্ত্রীকেই মানিয়া লইতে হইবে এবং সেই অনুসারে কাজ হইবে। মনে কর, রেলওয়ে মন্ত্রী ভাড়ার হার কমাইতে চাহেন, কিন্তু বেশীর ভাগ মন্ত্রী চাহেন উহা বাড়াইতে। তখন ভাড়ার হার বাড়িবে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তই সরকারী নীতি রূপে গৃহীত হইবে। রেলওয়ে মন্ত্রী যদি তাহা মানিয়া লইতে না চাহেন তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। ভাড়া বাড়াইবার জন্য যদি সরকারের সমালোচনা হয় তবে সকল মন্ত্রী সম্মিলিত ভাবে তাহার জন্য দায়ী হইবেন, রেলওয়ে সংক্রান্ত বিষয় বলিয়া একা রেলওয়ে মন্ত্রী নিন্দার ভাগী হইবেন না।

অতএব দেখা গেল যে শাসনসংক্রান্ত গুরুতর কার্যগুলি সমগ্র মন্ত্রিসভার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্পাদিত হয়, মন্ত্রীরা পরস্পর হইতে পৃথকভাবে কাজ না করিয়া যৌথভাবে কাজ করেন। যে কাজ যৌথভাবে করা হয় তাহার জন্য দায়িত্বও যৌথভাবে লইতে হয়। তাই প্রত্যেক মন্ত্রী অপর সকল মন্ত্রীর কাজের জন্য লোকসভার নিকট দায়ী। কোন সরকারী কাজের নিন্দা হইলে সকল মন্ত্রীই তাহার অংশ লইবেন, আবার কোন সরকারী কাজের প্রশংসা হইলে সকল মন্ত্রীই প্রশংসাভাজন হইবেন। ইহারই নাম যৌথ দায়িত্ব।

মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব লোকসভার নিকট, রাজ্যসভার নিকট নহে। লোকসভা কোন মন্ত্রীর বা সমগ্র মন্ত্রিসভার কোন নীতি বা কার্য অনুমোদন না করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। কোন একজন মন্ত্রীর কার্য লোকসভায় নিন্দিত হইলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ঘটিবে, কারণ প্রত্যেক মন্ত্রীর প্রত্যেক কার্যের জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভা যৌথভাবে দায়ী।

লোকসভা চারিটি উপায়ে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। প্রথমত, সমগ্র মন্ত্রিসভার বা কোন একজন মন্ত্রীর উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব (motion of no-confidence) লোকসভায় উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত কোন গুরুতর বিষয়সংক্রান্ত বিধেয়ক (Bill) লোকসভায় উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশের ভোটে পরিত্যক্ত হইতে পারে। তৃতীয়ত, বাজেট বা বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ লোকসভায় উপস্থিত সভ্যদের অধিকাংশের ভোটে পরিত্যক্ত বা গুরুতর ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে। চতুর্থত, কোন গুরুতর ঘটনা বা বিষয় সম্বন্ধে মুলতুবী প্রস্তাব (adjournment

motion) লোকসভায় উপস্থিত সভ্যদের অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হইয়া পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থার ইঙ্গিত করিতে পারে।

এই চারিটি উপায়ে লোকসভা মন্ত্রিসভাকে জানাইতে পারে যে মন্ত্রিসভা ইহার (অর্থাৎ লোকসভার) বিশ্বাস ও সমর্থন হারাইয়াছে। তখন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবে, অথবা রাষ্ট্রপতি ইহাকে বরখাস্ত করিবেন, অথবা মন্ত্রিসভার অনুরোধে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের নির্দেশ দিবেন। নবনির্বাচিত লোকসভা যদি ঐ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে তবে ঐ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ বা পদচ্যুতি আবশ্যক হইবে না। আর নবনির্বাচিত লোকসভা যদি ঐ মন্ত্রিসভার বিরোধী হয় তবে ঐ মন্ত্রিসভা অবশ্যই পদত্যাগ করিবে, নতুবা রাষ্ট্রপতি ইহাকে অবশ্যই বরখাস্ত করিবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লোকসভার সমর্থন ব্যতীত কোন মন্ত্রিসভা থাকিতে পারে না, অর্থাৎ লোকসভা এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতার সম্বন্ধ থাকা অত্যাবশ্যক। এই জন্যই লোকসভার যে রাজনৈতিক দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ সেই দলের প্রধান নেতা প্রধান মন্ত্রী হন এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মন্ত্রী হন। যে দল লোকসভায় সংখ্যায় প্রবল সেই দল মন্ত্রিসভা গঠন করায় লোকসভা ও মন্ত্রিসভার মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতার সম্বন্ধ থাকে।

মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব কেবলমাত্র লোকসভার নিকট; রাজ্যসভার নিকট ইহার কোনই দায়িত্ব নাই। রাজ্যসভা মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয় না। সুতরাং মন্ত্রিসভার দায়িত্ব পার্লামেন্টের নিকট—একথা বলা ভুল, কারণ পার্লামেণ্ট বলিতে উভয় কক্ষই বুঝিতে হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক মন্ত্রীকে পার্লামেন্টের যে কোন একটি কক্ষের সভ্য হইতে হইবে। যে মন্ত্রী লোকসভার সভ্য তিনি লোকসভা ব্যতীত রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দিতে ও বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু সেখানে ভোট দিতে পারেন না। আবার যে মন্ত্রী রাজ্যসভার সভ্য তিনি রাজ্যসভা ব্যতীত লোক-সভার অধিবেশনে যোগ দিতে ও বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু সেখানে ভোট দিতে পারেন না। এই ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষই প্রত্যেক মন্ত্রীর বক্তব্য শুনিবার সুযোগ পায়।

মন্ত্রীদের কার্য (Functions of Ministers)—মন্ত্রীরাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতির নামে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। শাসনকার্য কয়টি বিভাগে ভাগ

করা হইবে তাহা সংবিধানে নির্দেশ করা হয় নাই। যখন যতগুলি বিভাগ প্রয়োজন তখন তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কখন কয়টি বিভাগ থাকিবে তাহা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। সাধারণত প্রত্যেক বিভাগের ভার একজন মন্ত্রীকে দেওয়া হয়। অবশ্য একজন মন্ত্রী একাধিক বিভাগের ভারও লইতে পারেন। কোন মন্ত্রী কোন বিভাগের ভার লইবেন তাহা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। কয়জন মন্ত্রী থাকিবেন তাহাও প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। সংবিধানে এই সম্বন্ধে কোন নির্দেশ নাই। আবার সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলেও মন্ত্রীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সহকারী মন্ত্রী (Minister of State), উপমন্ত্রী (Deputy Minister) এবং পরিষদ-সচিব (Parliamentary Secretary) নিযুক্ত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সহকারী মন্ত্রীকে মন্ত্রীর ন্যায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগের ভার দেওয়া হয়।

মন্ত্রীরা যে কেবলমাত্র শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহা নহে। বাজেট তৈয়ারি করা এবং পার্লামেণ্টে উহা পেশ করা মন্ত্রীদের একটি প্রধান কাজ। শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য কি কি নূতন কর স্থাপন বা পুরাতন কর বৃদ্ধি করিতে হইবে, কোন্ বিভাগে কোন্ কার্যের জন্য কত টাকা ব্যয় করিতে হইবে তাহা মন্ত্রীরা স্থির করেন। অর্থসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় প্রস্তাব লোকসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। মন্ত্রী ব্যতীত লোকসভার অপর কোন সভ্য অর্থসংক্রান্ত কোন প্রস্তাব লোকসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করিতে পারেন না।

পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে ঐ কক্ষের যে কোন সভ্য বিধেয়ক (Bill) উপস্থিত করিতে পারেন। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ঘটিলে সাধারণত কোন মন্ত্রী সমগ্র মন্ত্রিসভার মুখপাত্র রূপে পার্লামেণ্টের কোন কক্ষে বিধেয়ক উপস্থিত করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অর্থসংক্রান্ত বিষয় হইলে মন্ত্রী ব্যতীত আর কোন সভ্য পার্লামেণ্টে বিধেয়ক উপস্থিত করিতে পারেন না। কোন বিধেয়ক কোন মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত হইলে তাঁহাকে (এবং আবশ্যক হইলে অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে) পার্লামেণ্টে উহার মর্ম ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিতে হয় এবং বিরোধী পক্ষের (Opposition) সমালোচনার জবাব দিতে হয়। আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার কার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষেই সভ্যগণ মন্ত্রীদিগকে সরকারী কার্য ও নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। মন্ত্রীদিগকে এই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

প্রশ্ন

1. Indicate the powers of the President of the Indian Union. How is he elected? (ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বর্ণনা কর। তিনি কিভাবে নির্বাচিত হন?) [H.S.E., 1960](১২৬-১৩৪)

2. Describe the position and powers of the President of the Indian Union. (ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বর্ণনা কর [H.S.E., 1961 (১২৮-১৩৫ পৃষ্ঠা)

3. How is the President of India elected? How can he be dismissed? (ভারতের রাষ্ট্রপতি কিরূপে নির্বাচিত হন? কিরূপে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়।) (১২৬-১২৮ পৃষ্ঠা)

4. Describe the executive and legislative powers of the President. (শাসন ও আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বর্ণনা কর।) (১২৮-১৩২ পৃষ্ঠা)

5. What are the emergency powers of the President? (জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কি কি ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন?) (১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠা)

6. Analyse the President's relation with the Union Council of Ministers. (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহিত রাষ্ট্রপতির সম্বন্ধ বিশ্লেষণ কর।) (১৩৪-১৩৫ পৃষ্ঠা)

7. How is the Union Council of Ministers formed? To whom is it responsible? What is meant by 'collective responsibility'? What are the powers and duties of the Prime Minister? (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কিরূপে গঠিত হয়? ইহা কাহার নিকট দায়ী? 'যৌথ দায়িত্ব' অর্থ কি? প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তব্য কি কি?) (১৩৬-১৩৯ পৃষ্ঠা)

8. Describe the powers and functions of the Union Council of Ministers. (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কর্তব্য বর্ণনা কর।) (১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠা)

9. Analyse the relation between Parliament and the Union Council of Ministers. (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহিত পার্লামেন্টের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ কর।) (১৩৬-১৩৯ পৃষ্ঠা)

10. How does the Union Legislature exercise its control over the Union Executive? (কেন্দ্রীয় আইনসভা কিরূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রয়োগ করে?) [H.S.E. Compartmental, 1960] (১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : কেন্দ্রীয় আইনসভা

পার্লামেন্ট (Parliament)—কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম পার্লামেন্ট। রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি কক্ষ—রাজ্যসভা (Council of States) এবং লোকসভা (House of the People)—লইয়া পার্লামেন্ট গঠিত। রাজ্যসভা উচ্চতর কক্ষ, লোকসভা নিম্নতর কক্ষ।

রাজ্যসভা (Council of States)—রাজ্যসভার মোট সভ্যসংখ্যা ২৫০ বা তাহার কম হইবে। ১২ জন সভ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক এবং বিবিধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত হন। বাকী সভ্যগণ আসেন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড হইতে। নিম্নে বিভিন্ন রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডের সভ্যদের সংখ্যা দেওয়া হইল।

অন্ধ্র প্রদেশ	১৮	রাজস্থান	১০
আসাম	৭	উত্তর প্রদেশ	৩৪
বিহার	২২	পশ্চিমবঙ্গ	১৬
গুজরাট	১১	জম্মু ও কাশ্মীর	৪
কেরল	৯	দিল্লী	৩
মধ্য প্রদেশ	১৬	হিমাচল প্রদেশ	২
মাদ্রাজ	১৮	মণিপুর	১
মহারাষ্ট্র	১৯	ত্রিপুরা	১
মহীশূর	১২		২২৪
উড়িষ্যা	১০	মনোনীত	১২
পঞ্জাব	১১		২৩৬

প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিরা ঐ রাজ্যের বিধান সভার সভ্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোটে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনুসারে (proportional representation by means of the single transferable secret vote) নির্বাচিত হন, কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। সুতরাং রাজ্যসভার সভ্যেরা সকলেই

পরোক্ষভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত, কেহই জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত নহেন।

রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন উপ-রাষ্ট্রপতি। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যসভার সভাগন কর্তৃক নির্বাচিত উপ-সভাপতি (Deputy President)।

রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ, রাষ্ট্রপতি ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে (dissolve) পারেন না। তবে প্রতি দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সভ্যকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

লোকসভা (House of the People)—লোকসভার মোট সভ্য-সংখ্যা ৫২০ বা তাহার কম হইবে। ইহাদের মধ্যে অনধিক ৫০০ জন জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত, বাকী ২০ জন কেন্দ্রশাসিত রাজ্যখণ্ড হইতে পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুসারে মনোনীত বা নির্বাচিত হইবেন। নিম্নে বিভিন্ন রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডের সভ্যদের সংখ্যা দেওয়া হইল।

অন্ধ্রপ্রদেশ	৪৩	উত্তর প্রদেশ	৮৬
আসাম	১৩	পশ্চিমবঙ্গ	৩৬
বিহার	৫৩	দিল্লী	৫
বোম্বাই	৬৬	হিমাচল প্রদেশ	৪
জম্মু ও কাশ্মীর	৬	মণিপুর	২
কেরল	১৮	ত্রিপুরা	২
মধ্যপ্রদেশ	৩৬	আন্দামান নিকোবর	১
মাদ্রাজ	৪১	লাক্ষাদ্বীপ	১
মহীশূর	২৬		৫০৩
উড়িষ্যা	২০	অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	২
পঞ্জাব	২২		৫০৫
রাজস্থান	২২		

লোকসভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর, তবে রাষ্ট্রপতি কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া (dissolve) নূতন নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। লোকসভার সভাপতি বা পরিষদপাল (Speaker) এবং উপ-সভাপতি বা উপ-পরিষদপাল (Deputy Speaker) লোকসভার সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

লোকসভার সভ্যেরা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং লোকসভার গঠন রাজ্যসভার গঠন হইতে বেশী গণতান্ত্রিক। এইজন্যই

রাজ্যসভা হইতে লোকসভার ক্ষমতা বেশী। আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, রাজ্যসভার কোন কর্তৃত্ব নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেবলমাত্র লোকসভার নিকট দায়ী, রাজ্যসভার নিকট দায়ী নহে।

পার্লামেন্টের কার্য (Functions of Parliament)—পার্লামেন্টের প্রথম ও প্রধান কাজ আইন-প্রণয়ন। কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সাধারণত লোকসভা ও রাজ্যসভা পৃথকভাবে প্রত্যেক বিধেয়ক (Bill) সম্বন্ধে আলোচনা করে। বিধেয়কটি উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে উহা আইনে পরিণত হয়। যদি কোন বিধেয়ক একটি কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও অপর কক্ষ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় তবে রাষ্ট্রপতি (মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে) উভয় কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। যদি সম্মিলিত অধিবেশনে ঐ বিধেয়কটি অধিকাংশ সভ্য অনুমোদন করেন তবে উহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হইবে, আর যদি অধিকাংশ সভ্যই উহার বিপক্ষে ভোট দেন তবে উহা চূড়ান্তভাবে পরিত্যক্ত হইবে।

অর্থসংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য যে কোন বিষয়ে যে কোন কক্ষে বিধেয়ক উপস্থিত করা যায়, কিন্তু অর্থ সংক্রান্ত বিধেয়ক (Money Bill) প্রথমে লোকসভায় উপস্থিত করিতে হয়। রাজ্যসভায় এই বিধেয়কের আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে আইনে পরিণত করার জন্য রাজ্যসভার সম্মতি অপরিহার্য নয়।

কেবল আইন প্রণয়ন করাই পার্লামেন্টের কাজ নয়। ভারতের আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু রাজ্যসভার কোন কর্তৃত্ব নাই। প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নিকট দাখিল করিতে হয়। লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন কর আদায় করা বা কোন কাজের জন্য অর্থব্যয় করা যায় না ; কিন্তু রাজ্যসভার অনুমোদন আইনত প্রয়োজন হয় না। তবে কয়েকটি বিষয়ের জন্য (যেমন, রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা) অর্থব্যয় সম্বন্ধে লোকসভার কোন কর্তৃত্ব নাই।

মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট দায়ী, কিন্তু রাজ্যসভার নিকট দায়ী নহে। লোকসভা মন্ত্রিসভার কোন কার্যের বা নীতির বিরোধিতা করিলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়, অথবা রাষ্ট্রপতির নির্দেশ জারি করাইয়া লোকসভা ভঙ্গ করিতে হয়। এইরূপে লোকসভা মন্ত্রিসভার মাধ্যমে শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

লোকসভা ও রাজ্যসভা—উভয় কক্ষের সভ্যেরাই মন্ত্রীদিগকে শাসন ও আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

রাজ্যসভার একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে যাহা লোকসভার নাই। রাজ্যসভা বিশেষ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা রাজ্যতালিকা (State List)-ভুক্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের অধিকার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য পার্লামেন্টকে প্রদান করিতে পারে।

পার্লামেন্টের আরও নানাপ্রকার কাজ আছে। পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া সংবিধান সংশোধন (amendment) করা যায় না, সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারকদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে। পার্লামেন্ট সংবিধানে উল্লিখিত বিধি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রপতিকে এবং উপ-রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে।

প্রশ্ন

1. Describe the composition of Parliament. (পার্লামেন্টের গঠন বর্ণনা কর।)
(১৪২-১৪৪ পৃষ্ঠা)

2. What are the functions of Parliament? (পার্লামেন্টের কার্য কি কি?)
(১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা)

3. Analyse the composition and functions of the House of the People.
(লোকসভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।) (১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠা)

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : রাজ্যপাল ও রাজ্যের মন্ত্রিসভা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত প্রত্যেক রাজ্যে (State) একজন রাজ্যপাল আছেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বরের পূর্বে প্রত্যেক 'ক' শ্রেণীর রাজ্যে একজন রাজ্যপাল এবং 'খ' শ্রেণীর রাজ্যে একজন রাজপ্রমুখ* থাকিতেন। রাজ্যগুলির মধ্যে ঐ শ্রেণীবিভাগ দূর হওয়ায় রাজপ্রমুখের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজ্যপাল (Governor)—সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কার্যত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হন। জম্মু ও কাশ্মীরের আইন-সভা কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি নির্দিষ্টকালের জন্য ঐ রাজ্যের 'সদর-ই-রিয়াসত' রূপে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত হন।

---

* 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের শাসককে রাজপ্রমুখ বলা হইত। আইনত রাজপ্রমুখ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন না ; তবে রাষ্ট্রপতি যে ব্যক্তিকে যে 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের রাজপ্রমুখ বলিয়া স্বীকার (Recognise) করিতেন তিনিই সেই রাজ্যের রাজপ্রমুখ হইতেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজগণের সহিত ভারত সরকারের চুক্তি হইয়াছিল। সেই চুক্তি অনুসারে কে কোন্ রাজ্যের রাজপ্রমুখ হইবেন তাহা স্থির করা হইয়াছিল। হায়দরাবাদের নিজাম ঐ রাজ্যের রাজপ্রমুখ, মহীশূরের মহারাজা ঐ রাজ্যের রাজপ্রমুখ, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের রাজপ্রমুখ, জয়পুরের মহারাজা রাজস্থান রাজ্যের রাজপ্রমুখ, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া মধ্যভারতের রাজপ্রমুখ, জামনগরের জামসাহেব সৌরাষ্ট্রের রাজপ্রমুখ এবং পাতিয়ালার মহারাজা পতিয়ালা ও পূর্ব পঞ্জাব রাজ্য-সম্মিলনের রাজপ্রমুখ ছিলেন। রাজপ্রমুখের কার্যকাল নির্দিষ্ট ছিল না। কাশ্মীরে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি নির্দিষ্ট কালের জন্য 'সদর-ই-রিয়াসত' (অর্থাৎ রাজপ্রমুখ) রূপে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত হইতেন।

রাজপ্রমুখের বেতন ছিল না ; তবে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে তিনি ভাতা পাইতেন। রাজ্যের রাজধানীতে যদি রাজপ্রমুখের নিজের বাড়ী না থাকিত তবে তিনি বিনা ভাড়ায় সরকারী প্রাসাদে বাস করিতে পারিতেন।

'ক' শ্রেণীর রাজ্যে রাজ্যপালের যে মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল, 'খ' শ্রেণীর রাজ্যে রাজপ্রমুখের ঠিক সেই মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল।

রাষ্ট্রপতির যতদিন খুশি ততদিনই রাজ্যপাল স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন। কিন্তু সাধারণত রাজ্যপালের কার্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে। পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেও তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারেন, অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুত হইতে পারেন। একই ব্যক্তি একাধিকবার একই রাজ্যের বা বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত হইতে হইলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন : (১) তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে। কোন বিদেশী রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। (২) তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই।

রাজ্যপাল পদ গ্রহণের পর তিনি কোন আইনসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। রাজ্যপাল বিনা ভাড়ায় সরকারী প্রাসাদে বাস কারবেন এবং মাসিক ৫৫০০৲ টাকা বেতন ও নানাবিধ ভাতা পাইবেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা (Governor's Powers)—রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী হইলেও সংবিধানে তাঁহাকে নানাপ্রকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষমতা তিনি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে ব্যবহার করেন না। সকল বিষয়েই তাঁহাকে রাজ্যের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহিত রাষ্ট্রপতির যে সম্বন্ধ, রাজ্যের মন্ত্রিসভার সহিত রাজ্যপালের সেই সম্বন্ধ। সংবিধান অনুসারে রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা রাজ্যপালের উপর ন্যস্ত। রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমুদয় আদেশ রাজ্যপালের নামে প্রচারিত হয়। অবশ্য কি আদেশ দেওয়া হইবে তাহা মন্ত্রীরাই স্থির করেন, কিন্তু সেগুলি মন্ত্রীদের নামে প্রচারিত হয় না। রাজ্যপাল আইন অনুসারে শাসনযন্ত্রের নায়ক, তাই তাঁহার নামেই সরকারী নির্দেশগুলি প্রচারিত হয়। কেবলমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা (Tribal Area) সম্বন্ধে কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে, যাহা তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার করিতে পারেন। অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালের কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা নাই।

(১) **শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers)**—বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন; যথা,—রাজ্যের অ্যাডভোকেট-জেনারেল, রাজ্য পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ও সভ্যগণ, ইত্যাদি। রাজ্যপাল ইঁহাদের নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করেন বটে, কিন্তু এই সকল পদের জন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী লোক নির্বাচন করেন না।

প্রকৃতপক্ষে লোক নির্বাচন করে মন্ত্রিসভা। অনেক সময় মন্ত্রিসভার নায়ক ও মুখপাত্র রূপে মুখ্য মন্ত্রীই (Chief Minister) লোক নির্বাচন করেন।

(২) বিচার বিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)—কোন অপরাধে কোন আদালত কোন অপরাধীকে দণ্ডের আদেশ প্রদান করিলে সে রাজ্যপালের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতে পারে। তখন রাজ্যপাল তাহার দণ্ড হ্রাস করিতে অথবা দণ্ড ভোগ হইতে তাহাকে একেবারে মুক্তি দিতে পারেন। এই ব্যাপারেও রাজ্যপাল নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করেন না। মন্ত্রিসভার পরামর্শ তিনি অনুসরণ করেন।

(৩) আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে ক্ষমতা (Legislative Powers): রাজ্যপালের সহিত আইনসভার সম্বন্ধ (Relation between Governor and Legislature)—রাজ্যপাল রাজ্যের আইনসভার (Legislature) অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ—এই কয়টি রাজ্যে রাজ্যপাল, বিধান সভা (Legislative Assembly) ও বিধান পরিষদ (Legislative Council) লইয়া আইনসভা গঠিত। অন্যান্য রাজ্যে রাজ্যপাল ও বিধান সভা লইয়া আইনসভা গঠিত, বিধান পরিষদ নাই। রাজ্যপাল প্রয়োজন হইলে বিধান সভায় কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্য মনোনীত করিতে পারেন। বিধান পরিষদের কয়েকজন সভ্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইবেন। মন্ত্রিসভা যে সকল ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদানের পরামর্শ দেয় রাজ্যপাল তাঁহাদিগকেই মনোনীত করিয়া থাকেন। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী তিনি কাহাকেও মনোনয়ন করিতে পারেন না।

রাজ্যপাল প্রয়োজনমত বিধান সভার (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহার) অধিবেশন আহ্বান করেন এবং স্থগিত রাখেন। রাজ্যপালের আহ্বান ব্যতীত বিধান সভার (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহার) অধিবেশন হইতে পারে না। রাজ্যপাল অধিবেশন স্থগিত রাখিবার নির্দেশ দিলে বিধান সভা (বা বিধান পরিষদ) তাহা অমান্য করিতে পারে না। প্রয়োজন বোধ করিলে রাজ্যপাল বিধান সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু বিধান পরিষদ চিরস্থায়ী, উহা ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার রাজ্যপালের নাই। বিধান সভা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। রাজ্যপাল উহার কার্যকাল বাড়াইয়া দিতে পারেন না, কেবল

পার্লামেন্টই আইন দ্বারা তাহা করিতে পারে। আইনসভা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে রাজ্যপাল নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করেন না, মন্ত্রিসভা তাঁহাকে যাহা করিতে পরামর্শ দেয় তিনি তাহাই করেন।

বিধান সভার কোন কোন অধিবেশনের প্রারম্ভে (বিধান পরিষদ থাকিলে বিধান সভা ও বিধান পরিষদের কোন কোন সম্মিলিত অধিবেশনের প্রারম্ভে) রাজ্যপাল একটি ভাষণ (Address) দেন। এই ভাষণের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইয়া দেওয়া—বিধান সভার (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহার) অধিবেশন কেন ডাকা হইয়াছে, কি কি কাজ বিধান সভাকে (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহাকে) করিতে হইবে, কোন্ কোন্ বিধেয়ক (Bill) বিধান সভার (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহার) বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে; ইত্যাদি। বিধান সভায় (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে সেখানে) রাজ্যপাল যে কোন বিষয়ে বাণী (Message) প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্যপালের সকল ভাষণ ও বাণী মন্ত্রীরা প্রস্তুত করেন। মন্ত্রীরা রাজ্যপালকে যাহা বলিতে পরামর্শ দেন তাঁহাকে তাহাই বলিতে হয়। সুতরাং রাজ্যপালের ভাষণে ও বাণীতে মন্ত্রীদের নীতিই প্রকাশিত হয়, রাজ্যপালের ব্যক্তিগত মতামতের স্থান সেখানে নাই।

বিধান সভা (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহা) যদি কোন বিধেয়ক অনুমোদন করে তবে তাহা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তিনি যদি সম্মতি প্রদান করেন তবে ঐ বিধেয়কটি আইন বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি যদি সম্মতি প্রদান না করেন তবে উহা বাতিল হইয়া যাইবে, উহা আর আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। আবার তিনি কোন বিধেয়ক সম্বন্ধে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া উহা পুনর্বিবেচনার জন্য বিধান সভায় (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তথায়) পাঠাইয়া দিতে পারেন; যদি বিধান সভা (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহা) বিধেয়কটি পুনরায় অনুমোদন করে তবে উহা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে। তখন তিনি উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকিবেন। আর যদি পুনর্বিবেচনার পর বিধেয়কটি বিধান সভা কর্তৃক (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তৎকর্তৃক) আবার অনুমোদিত না হয় তবে উহা বাতিল হইয়া যাইবে, আর রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে না। ইহা ছাড়া রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে কোন বিধেয়ক সম্বন্ধে নিজের

সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। কোন বিধেয়কে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন সম্বন্ধে রাজ্যপাল মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করেন, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন না।

সাধারণত বিধান সভা (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে বিধান সভা ও বিধান পরিষদ যুক্তভাবে) রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু সারা বৎসর বিধান সভার (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহার) অধিবেশন হয় না। যখন অধিবেশন বন্ধ এমন সময়েও হঠাৎ কোন জরুরী বিষয়ে অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইতে পারে। তখন রাজ্যপাল জরুরী আইন (Ordinance) জারি করিতে পারেন। বিধান সভার (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহার) পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত ঐ আইন বলবৎ থাকিবে। অবশ্য ছয় সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্বেও বিধান সভা (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে উভয় কক্ষ যুক্তভাবে) উহা বাতিল করিতে পারে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে আরও দীর্ঘকাল বলবৎ রাখিতে পারে। জরুরী আইন প্রণয়ন করা সম্বন্ধে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হন, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধি অনুসারে আইন জারি করেন না। কোন কোন বিষয়ে জরুরী আইন করিতে হইলে পূর্বে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ লইতে হয়।

প্রতি বৎসর মন্ত্রীরা বিধান সভায় (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তথায়) সংবৎসরের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবৃতি উপস্থিত করেন। ইহার নাম বাজেট (Budget)। বিধান সভার অনুমোদন ব্যতীত কর স্থাপন করা যায় না। মন্ত্রীরা যখন বিধান সভায় (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে সেখানে) টাকা খরচ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখন তাহা রাজ্যপালের অনুমতি লইয়া করা হয়। অবশ্য মন্ত্রীরাই বাজেট প্রস্তুত করেন এবং কর স্থাপন ও সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে সকল ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা যাহা স্থির করেন তাহাতেই রাজ্যপাল সম্মতি দিয়া থাকেন।

(৪) **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers)**—রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া কেহ করস্থাপন ও সরকারী ব্যয়সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব রাজ্যের আইনসভায় উপস্থিত করিতে পারেন না। এই সকল বিষয় সংক্রান্ত কোন বিধেয়ক রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলে তাহাতে রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন হয়। অবশ্য এখানেও রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কার্য করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে আইনের দিক হইতে রাজ্যপালের অনেক ক্ষমতা থাকিলেও কার্যত তিনি নিজে কিছুই করেন না। তাঁহার নামে মন্ত্রীরাই সকল কাজ করেন। সুতরাং শাসনকার্য তাঁহার নামে সম্পাদিত হইলেও ইহার জন্য তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। সকল কাজের জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী। মন্ত্রিগণই রাজ্যের প্রকৃত শাসক, রাজ্যপালের অবস্থা রাষ্ট্রপতির অবস্থার সহিত তুলনীয়।

রাজ্যের মন্ত্রিসভা (State Council of Ministers)—প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) আছে। রাষ্ট্রপতির সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যে সম্বন্ধ, রাজ্যপালের সহিত রাজ্যের মন্ত্রিসভার ঠিক সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ—

(১) রাজ্য বিধান সভায় (State Legislative Assembly) যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দলের নায়ককে রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রীর (Chief Minister) পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন।

(২) যতদিন রাজ্য বিধান সভা মন্ত্রিসভার নীতি ও কার্য অনুমোদন করে ততদিন রাজ্যপাল ঐ মন্ত্রিসভা বহাল রাখেন।

(৩) সকল বিষয়েই রাজ্যপাল মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন, অর্থাৎ রাজ্যপালের নামে মন্ত্রিসভাই রাজ্যশাসন করে।

লোকসভার সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যে সম্বন্ধ, রাজ্যের বিধান সভার সহিত রাজ্যের মন্ত্রিসভার ঠিক সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ—

(১) প্রত্যেক মন্ত্রীকে বিধান সভার (অথবা বিধান পরিষদ বা Legislative Council থাকিলে তাহার) নির্বাচিত বা মনোনীত সভ্য হইতে হইবে। যিনি বিধান সভার (বা বিধান পরিষদের) সভ্য নহেন এমন ব্যক্তিও মন্ত্রী হইতে পারেন, কিন্তু কার্যভার গ্রহণের পর ছয় মাসের মধ্যে সভ্য হইতে না পারিলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

(২) মন্ত্রিসভাকে যৌথভাবে বিধান সভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে (collective responsibility) ; যে রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেখানে ঐ পরিষদের নিকট মন্ত্রিসভার কোন দায়িত্ব নাই।

(৩) যেখানে বিধান পরিষদ আছে সেখানে প্রত্যেক মন্ত্রীই উভয় কক্ষের (অর্থাৎ বিধান পরিষদের ও বিধান সভার) অধিবেশনে যোগ দিতে ও বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু যে মন্ত্রী যে কক্ষের সভ্য সেই মন্ত্রীর কেবলমাত্র সেই কক্ষেই ভোট দিবার অধিকার আছে।

(৪) যে চারিটি উপায়ে লোকসভা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে, সেই চারিটি উপায়েই বিধান সভা রাজ্য মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে।*

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রধান মন্ত্রীর যে স্থান ও মর্যাদা, রাজ্যের মন্ত্রিসভায় মুখ্য মন্ত্রীর ঠিক সেই স্থান ও মর্যাদা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কার্য যেমন নানা বিভাগে বিভক্ত, রাজ্য মন্ত্রিসভার কার্যও তেমনই নানা বিভাগে বিভক্ত। রাজ্য মন্ত্রিসভায় কয়জন মন্ত্রী থাকিবেন তাহা সংবিধানে বলা হয় নাই। শাসনকার্য কয়টি বিভাগে বিভক্ত হইবে, কয়জন মন্ত্রী থাকিবেন, কোন্ মন্ত্রী কোন বিভাগের ভার লইবেন—এই সকল বিষয় রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে স্থির করেন। সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলেও মন্ত্রীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উপমন্ত্রী (Deputy Minister) এবং পরিষদ-সচিব (Parliamentary Secretary) নিযুক্ত করা হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ন্যায় রাজ্যমন্ত্রীরাও শাসনকার্য পরিচালনা করেন, বাজেট তৈয়ারি করেন এবং উহা বিধান সভায় (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তথায়) পেশ করেন, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে বিধেয়ক বিধান সভায় (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তথায়) উপস্থিত করেন।

পার্লামেণ্টের সভ্যদের ন্যায় বিধান সভার (এবং বিধান পরিষদ থাকিলে তাহার) সভ্যগণ রাজ্যমন্ত্রীদিগকে সরকারী কার্য ও নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। মন্ত্রীদিগকে এই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর—জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের এমন কতকগুলি অধিকার আছে যাহা আর কোন রাজ্যের নাই। এই রাজ্যের রাজ্যপাল বা সদর-ই-রিয়াসত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত নহেন, রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত। অনেক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য নহে।

কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড (Union Territories)—এই সকল রাজ্যখণ্ডে মন্ত্রিসভা বা আইনসভা থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে 'চীফ কমিশনার' বা লেফ্‌টেনেণ্ট-গভর্ণরগণ এই সকল রাজ্যখণ্ড শাসন করেন। রাষ্ট্রপতি এই সকল রাজ্যখণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় আইন করিতে পারেন।

---

* ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

প্রশ্ন

1. Discuss the position and powers of the Governor of a State in the Indian Union. (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যের রাজ্যপালের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।) [H. S. E., Compartmental, 1960] (১৪৭-১৫১ পৃষ্ঠা)

2. Describe the executive and legislative powers of the Governor. (শাসন ও আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে রাজ্যপালের ক্ষমতা বর্ণনা কর।) (১৪৭-১৫০ পৃষ্ঠা)

3. Describe the Governor's relation with the State Council of Ministers. (রাজ্য মন্ত্রিসভার সহিত রাজ্যপালের সম্বন্ধ বর্ণনা কর।) (১৫১ পৃষ্ঠা)

4. How is the State Council of Ministers formed? To whom is it responsible? What is meant by 'collective responsibility'? What are the powers and duties of the Chief Minister? (রাজ্য মন্ত্রিসভা কিরূপে গঠিত হয়? ইহা কাহার নিকট দায়ী? 'যৌথ দায়িত্ব' অর্থ কি? মুখ্য মন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তব্য কি কি?) (১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা)

5. Describe the powers and functions of the State Council of Ministers. (রাজ্য মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কর্তব্য বর্ণনা কর।) (১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা)

6. Analyse the relations between the State Legislature and the State Council of Ministers. (রাজ্য মন্ত্রিসভার ও রাজ্য আইনসভার সম্বন্ধ বিশ্লেষণ কর।) (১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the position of a Minister in relation to the Governor and the State Legislature. (রাজ্যপাল ও আইনসভার সহিত মন্ত্রীর সম্বন্ধ আলোচনা কর।) (১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা)

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : রাজ্যের আইনসভা

প্রত্যেক রাজ্যে একটি আইনসভা (Legislature) আছে। অধিকাংশ রাজ্যের আইনসভায় মাত্র একটি কক্ষ (House) আছে; তাহার নাম বিধান সভা (Legislative Assembly)। বর্তমানে নয়টি রাজ্যে (অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, মহীশূর, পঞ্জাব, পশ্চিম বঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ) আইন-সভায় দুইটি কক্ষ আছে। উচ্চতর কক্ষের নাম বিধান পরিষদ (Legislative Council), নিম্নতর কক্ষের নাম বিধান সভা।

বিধান পরিষদ (Legislative Council)—বিধান পরিষদ চিরস্থায়ী পরিষদ, অর্থাৎ ইহার নির্দিষ্ট কার্যকাল নাই এবং রাজ্যপাল ইহা ভঙ্গ করিতে

(dissolve) পারেন না। পরিষদের কয়েকজন সভ্যকে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনাত করেন। অন্যান্য সভ্যেরা নির্বাচিত হন চারি শ্রেণীর নির্বাচক দ্বারা—সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধান সভার সভ্যগণ; মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ; শিক্ষকগণ; স্নাতকগণ (Graduates)।

বিধান পরিষদের সভাপতি (President) এবং উপ-সভাপতি (Deputy President) পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

বিধান সভা (Legislative Assembly)—বিধান সভার সভ্যগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, তবে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিধান সভার সভ্যপদে মনোনীত করিতে পারেন। নির্বাচিত সভ্যদের মধ্যে কয়েকজনের আসন অনুন্নত জাতি Scheduled Caste) এবং অনুন্নত উপজাতির (Scheduled Tribe) প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত (Reserved) থাকে।

নিম্নে বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার সভ্যদের সংখ্যা দেওয়া হইল।

অন্ধ্রপ্রদেশ	...	৩০২	মহীশূর	...	২০৯
আসাম	...	১০৫	উড়িষ্যা	...	১৪০
বিহার	...	৩১৮	পঞ্জাব	...	১৫৪
জম্মু ও কাশ্মীর	...	৭৫	রাজস্থান	...	১৭৬
কেরল	...	১২৭	উত্তর প্রদেশ	...	৪৩১
মধ্যপ্রদেশ	...	২৮৯	পশ্চিম বঙ্গ	...	২৫৮
মাদ্রাজ	...	২০৫			

বিধান সভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। কার্যকাল অতীত হইবার পূর্বেই রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে বিধান সভা ভঙ্গ (Dissolve) করিয়া নূতন নির্বাচন করাইতে পারেন, কিন্তু তিনি বিধান সভার কার্যকাল বাড়াইতে পারেন না। জরুরী অবস্থা (Emergency) উপস্থিত হইলে পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা যে কোন রাজ্য বিধান সভার কার্যকাল বাড়াইয়া দিতে পারে।

বিধান সভার সভাপতি বা পরিষদপাল (Speaker) এবং সহ-সভাপতি বা উপ-পরিষদপাল (Deputy Speaker) সভার সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

বিধান সভার সভ্যেরা (অতি অল্পসংখ্যক মনোনীত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান

সভা বাদে) সকলেই প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং বিধান সভার গঠন বিধান পরিষদের গঠন হইতে বেশী গণতান্ত্রিক। এই জন্যই বিধান পরিষদ হইতে বিধান সভার ক্ষমতা অনেক বেশী। রাজ্যের আয়-ব্যয় এবং মন্ত্রিসভার কার্য সম্পূর্ণভাবে বিধান সভার কর্তৃত্বাধান, বিধান পরিষদের এই সকল বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নাই।

রাজ্যের আইনসভার কার্য (Functions of State Legislature)—পার্লামেণ্টের ন্যায় রাজ্যের আইনসভারও প্রথম ও প্রধান কাজ আইন-প্রণয়ন। কোন্ কোন্ বিষয়ে রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যে রাজ্যের আইনসভায় কেবলমাত্র একটি কক্ষ (বিধান সভা) আছে সেখানে ঐ কক্ষ কোন বিধেয়ক (Bill) অনুমোদন করিলে তাহা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। দুইটি কক্ষ থাকিলে সাধারণত বিধেয়কটি উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বিধান পরিষদের অনুমোদন না পাইলে কেবল বিধান সভার ও রাজ্যপালের অনুমোদন পাইলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিধেয়কটি আইন হইতে পারে। এইরূপে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধান সভার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

রাজ্যের আয়-ব্যয়ের উপর বিধান সভার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু বিধান পরিষদের কোন কর্তৃত্ব নাই। প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ (Budget) বিধান সভার নিকট (এবং দুই কক্ষ থাকিলে উভয় কক্ষের নিকট) দাখিল করিতে হয়। বিধান সভার অনুমোদন ব্যতীত কোন কর আদায় করা বা কোন কাজের জন্য অর্থব্যয় করা যায় না। বিধান পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। তবে কয়েকটি বিষয়ের জন্য (যেমন, রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা) অর্থব্যয় সম্বন্ধে বিধান সভার কোন কর্তৃত্ব নাই।

রাজ্যের মন্ত্রিসভা বিধান সভার নিকট দায়ী, বিধান পরিষদের নিকট দায়ী নয়। বিধান সভা মন্ত্রিসভার কোন কার্যের বা নীতির বিরোধিতা করিলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়, অথবা রাজ্যপালের নির্দেশ জারি করাইয়া বিধান সভা ভঙ্গ করিতে হয়। বিধান সভা ও বিধান পরিষদ—উভয় কক্ষের সভ্যেরাই মন্ত্রীদিগকে শাসন ও আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

সংবিধানের কোন কোন অংশের সংশোধন (Amendment) করিতে হইলে যতগুলি রাজ্য আছে তাহাদের অন্তত অর্ধেকের আইনসভার সম্মতি

প্রয়োজন। এখানে আইনসভা বলিতে যে রাজ্যে দুইটি কক্ষ আছে সেখানে উভয় কক্ষই বুঝিতে হইবে।

বিধান সভা সমূহের নির্বাচিত সভ্যগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড (Union Territories)—পূর্বে বলা হইয়াছে যে বর্তমানে ছয়টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যখণ্ড আছে : (১) দিল্লী, (২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) ত্রিপুরা, (৪) মণিপুর, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৬) ল্যাকাডিভ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ। ইহার প্রত্যেকটি একজন 'চীফ কমিশনার' (Chief Commissioner) বা 'লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্ণর আখ্যাধারী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীর শাসনাধীন ; এখানে রাজ্যপাল নাই। পার্লামেণ্ট রাজ্যখণ্ড-গুলির জন্য আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রপতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং ল্যাকাডিভ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের শাসনসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কোন রাজ্যখণ্ডেই বিধান সভা নাই, তবে হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরায় আঞ্চলিক সংসদ (Territorial Council) আছে।

আঞ্চলিক পরামর্শ সভা (Zonal Council)—বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে সম্মিলিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণের জন্য সমগ্র ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে (Zone) ভাগ করা হইয়াছে : (১) উত্তর অঞ্চল (পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান) ; (২) মধ্য অঞ্চল (উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ) ; (৩) পূর্ব অঞ্চল (বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা) ; (৪) পশ্চিম অঞ্চল (মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর); (৫) দক্ষিণ অঞ্চল (অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরল)। প্রত্যেক অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক পরামর্শ সভা আছে। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইহার সভাপতি, এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের কয়েকজন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী সহ) ইহার সভ্য। এই সভার সুপারিশগুলি আইনত বাধ্যতামূলক নহে।

নির্বাচনকেন্দ্র (Constituencies)—লোকসভার নির্বাচনের জন্য সমগ্র ভারতকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে সাধারণত সাড়ে সাত লক্ষ বা তাহার চেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের বাস। প্রত্যেক বিভাগ হইতে লোকসভায় একজন সভ্য নির্বাচিত হন। প্রত্যেকটি বিভাগকে পার্লামেণ্টের নির্বাচনকেন্দ্র (Parliamentary Constituency) বলা হয়।

বিধান সভার নির্বাচনের জন্য প্রত্যেকটি রাজ্যকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে সাধারণত ৭৫ হাজার লোকের বাস। প্রত্যেক

বিভাগ হইতে বিধান সভার একজন সভ্য নির্বাচিত হন। প্রত্যেকটি বিভাগকে বিধান সভার নির্বাচনকেন্দ্র (Assembly Constituency) বলা হয়।

প্রশ্ন

1. Describe the composition of the State Legislature. (রাজ্য আইন-সভার গঠন বর্ণনা কর। (১৫৩-১৫৫ পৃষ্ঠা)

2. What are the functions of the State Legislature ? (রাজ্য আইনসভার কার্য কি কি ?) (১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠা)

3. What are the powers and functions of the Legislature of West Bengal ? (পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।) (H.S. E., 1960) (পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬)

বিংশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান : কেন্দ্র ও রাজ্য সম্বন্ধে নানা কথা

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্বন্ধ (Relation between the Centre and the States)—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় (Federal Government) কেন্দ্র (Centre) ও রাজ্যের (Unit) মধ্যে শাসনসংক্রান্ত অধিকার ও দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কোন্ বিষয় কাহার অধিকারভুক্ত সেই সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিরোধ উপস্থিত হইলে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহার মীমাংসা হয়। ভারতে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রই প্রবল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অনেকের মতে ভারত প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র নয়, অর্ধ-যুক্তরাষ্ট্র (Quasi-Federation) বা এককেন্দ্রিক নীতি দ্বারা প্রভাবিত যুক্তরাষ্ট্র।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

(১) **আইন প্রণয়ন**—সাধারণত রাজ্য তালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র রাজ্যের আইন-সভার আছে। কিন্তু পার্লামেণ্ট যদি মনে করে যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক তবে পার্লামেণ্ট রাজ্যের আইনসভার অধিকার খর্ব করিয়া সেই আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেণ্টকে দিতে পারে। এখানেও রাজ্য আইনসভার অধিকার খর্ব করা হয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা (Proclamation of Emergency) করিলে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

চতুর্থত, কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক জরুরী অবস্থা (Failure of Constitutional Machinery) ঘটিলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে পার্লামেণ্ট ঐ রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া এক বা একাধিক রাজ্য সম্মিলিত ভাবে অনুরোধ করিয়া রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেণ্টকে প্রদান করিতে পারে।

(২) **শাসনসংক্রান্ত বিষয়**—কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য সংবিধানে কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

(১) পার্লামেণ্ট কর্তৃক রচিত আইন যাহাতে সুচারুরূপে প্রয়োগ করা যায় প্রত্যেক রাজ্য সরকার সেইভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে স্বায় শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করিতে পারে প্রত্যেক রাজ্য সরকার সেইভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যে কোন রেলপথ, স্থলপথ বা জলপথ নির্মাণ ও রক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) রাজ্য সরকারের সম্মতি লইয়া কেন্দ্রায় সরকার স্বীয় শাসনসংক্রান্ত কোন কার্যের ভার ঐ রাজ্য সরকারকে দিতে পারিবে।

(৫) বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে, অথবা কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে কোন বিরোধ হইলে তাহার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রপতি একটি অন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council) গঠন করিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় (Heads of the Revenue and Expenditure of Union Government)—কেন্দ্রীয় সরকারের আয় চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) আমদানি-রপ্তানি শুল্ক (Customs), আবগারী শুল্ক (Excise) ও আয়কর (Income Tax), সম্পত্তি কর (Estate Duty), সম্পদ কর (Wealth Tax), ব্যয় কর (Expenditure Tax) প্রভৃতি কর হইতে প্রাপ্ত আয়।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন কোন কর কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ, আদায় ও ব্যয় করে। কোন কোন কর কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ ও আদায় করিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদান করে। কোন কোন কর কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ ও আদায় করে, পরে উহা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করা হয় (যেমন, আয়কর)। কোন কোন কর কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ ও আদায় করিবার পর উহা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বন্টিত হইতে পারে।

(২) করের উপর অতিরিক্ত কর (Surcharge on duties and taxes) হইতে প্রাপ্ত আয়।

(৩) রেলওয়ে, পোস্ট অফিস প্রভৃতি সরকারী বিভাগ হইতে প্রাপ্ত আয়।

(৪) অন্যান্য বিবিধ সূত্রে (যেমন, মুদ্রাঙ্কন হইতে) প্রাপ্ত আয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) এককালীন ব্যয় বা Capital expenditure—যে ব্যয় একবার করিলেই চলে, প্রতিবৎসর করিতে হয় না। যেমন, নূতন রেললাইন নির্মাণ।

(২) বাৎসরিক ব্যয় বা Revenue expenditure—যে ব্যয় প্রতিবৎসর করিতে হয়। যেমন, রেল পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন।

দেশরক্ষার (Defence) জন্য ভারত সরকারের সব চেয়ে বেশী ব্যয় হয়। ইহার মধ্যে Capital expenditure এবং Revenue expenditure উভয়ই আছে।

রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয় (Heads of Revenue and Expenditure of State Governments)—রাজ্য সরকারের আয় প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়ীকৃত কর হইতে প্রাপ্ত আয় (যেমন, ভূমি রাজস্ব, কৃষি আয় কর, বিক্রয় কর, ইত্যাদি)।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও আদায়ীকৃত করের অংশ (যেমন, আয় কর এবং কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত আয়)।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত সাহায্য (subvention)। ইহা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যা পাটশুল্কের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সাহায্য পায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় রাজ্য সরকারের ব্যয়ও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক-কালীন ব্যয় (Capital Expenditure) এবং বাৎসরিক ব্যয় (Revenue Expenditure)।

ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহ (Indian political parties)—'রাজনৈতিক দল' কথাটির অর্থ এবং গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে তিনটি প্রধান রাজ-নৈতিক দল আছে :—

(১) কংগ্রেস দেশসেবার ঐতিহ্যে ও জনপ্রিয়তায় ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পার্লামেণ্টে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় এই দলের নেতৃগণ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিয়াছেন। একমাত্র কেরল ব্যতীত অন্যান্য সকল রাজ্যেও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বর্তমান আছে। কেরলে কংগ্রেস এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা আছে।

(২) সাম্যবাদী দল (Communist Party)—একমাত্র কেরল রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া এই দল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল, কিন্তু পরে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে এই দলের কিছু প্রভাব আছে।

(৩) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল (P.S.P.) কোন রাজ্যেই উল্লেখযোগ্য প্রভাব স্থাপন করিতে পারে নাই।

ইহা ছাড়া জনসঙ্ঘ, হিন্দুমহাসভা, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল আছে।

প্রশ্ন

1. Describe the relations between the Centre and the States. (কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ বর্ণনা কর)। (পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮)

2. State the relation between the Centre and the States of the Indian Union on legislative and executive matters. (আইন প্রণয়ন ও শাসনসংক্রান্ত কার্য

সম্বন্ধে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ বর্ণনা কর)। (H. S. E., Compartmental, 1960) (১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠা)

3. Give a brief account of the main heads of revenue and expenditure of (a) the Central Government, (b) the State Governments. (কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সমূহের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও)। (১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠা)

4. What do you know about the Indian political parties? ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে কি জান?) (১৬০ পৃষ্ঠা)

একবিংশ অধ্যায়

ভারতের সংবিধান ঃ বিচার-ব্যবস্থা

বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of judicial system)— পার্লামেন্ট ও রাজ্যের আইনসভাগুলি আইন প্রণয়ন করে। যে আইন অমান্য করে তাহার শাস্তির হুকুম দেয় বিচারালয়।

ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইলেও এখানে দ্বৈত বিচার-ব্যবস্থা (dual judiciary) নাই, এখানে বিচার-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক (unitary)। সমগ্র ভারতের জন্য একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় (Supreme Court) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ বিচারালয় (High Court) আছে। এই দুইটি বিচারালয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী, দুই রকম মোকদ্দমার বিচার করে। নিম্ন বিচারালয়গুলি দেওয়ানী ও ফৌজদারী, দুইভাগে বিভক্ত। গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমায় জুরী প্রথা (Jury system) প্রচলিত, কিন্তু সম্প্রতি ইহার বিলোপ ঘটিতেছে। শ্রমিক-মালিক বিরোধের জন্য পৃথক বিচারালয়ও (Industrial Tribunal) আছে।

বিচারকগণ যাহাতে শাসন কর্তৃপক্ষ (Executive) এবং রাজনীতির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সংবিধানে তাহার ব্যবস্থা আছে।

জেলার বিচারালয়—প্রত্যেক জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বিচারালয় থাকে।

গ্রামের পঞ্চায়েত আদালত ছোটখাট দেওয়ানা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করে।

প্রত্যেক জেলা শহরে এবং মহকুমা শহরে কয়েকজন মুন্সেফ (Munsif) আছেন ; কোন কোন গ্রামেও একজন বা একাধিক মুন্সেফ থাকেন। ইঁহারা দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করেন।

প্রত্যেক জেলা শহরে এবং মহকুমা শহরে ছোট-খাট ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের জন্য কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (Deputy Magistrate) এবং সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (Sub-Deputy Magistrate) আছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং Sub-Divisional Officer-গণও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। কোন কোন স্থানে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের ভার অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণের (Honorary Magistrates) উপরও ন্যস্ত হয়।

প্রত্যেক জেলা শহরে বড় বড় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য এক বা একাধিক সাব-জজ (Subordinate Judge) আছেন।

প্রত্যেক জেলায় একজন জেলা ও দায়রা জজ (District and Sessions Judge) আছেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমায় তিনি জুরীর (Jury) সাহায্য গ্রহণ করেন।

সম্প্রতি কোন কোন রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থা পৃথক করিবার (separation of Judiciary and Executive) নীতি গৃহীত হইয়াছে। এই নীতি অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটগণ আর মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না।

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই—এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে (Presidency Towns) ছোট-খাট দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য ছোট আদালত (Small Causes Court) আছে এবং ছোট-খাট ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের জন্য কয়েকজন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট (Presidency Magistrate) আছেন। প্রেসিডেন্সি শহরের গুরুতর ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা সরাসরি ভাবে হাই কোর্টে উপস্থিত করা হয়। সম্প্রতি কলিকাতায় City Court স্থাপিত হইয়াছে। এখানে গুরুতর দেওয়ানী এবং ফৌজদারী, দুইরকম মোকদ্দমার বিচার হয়।

হাই কোর্ট (High Court)—প্রত্যেক রাজ্যেই একটি হাই কোর্ট আছে। প্রত্যেক হাই কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) এবং কয়েকজন সহকারী বিচারপতি (Puisne Judge) আছেন। হাই কোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্যে

বহাল থাকেন। কেবলমাত্র অসদাচরণ অথবা অক্ষমতার অপরাধে এবং পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের অনুরোধে রাষ্ট্রপতি যে কোন হাই কোর্টের বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। যাঁহাদের নিম্নলিখিত গুণ (qualifications) আছে তাঁহারা হাই কোর্টের বিচারকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন—(১) অন্তত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হাই কোর্টের ব্যবহারিক বা অ্যাড্‌ভোকেট ; (২) অন্তত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিম্ন আদালতের বিচারক। কিন্তু ভারতের নাগরিক না হইলে কেহই ভারতীয় কোন হাই কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

হাই কোর্টের বিচারকগণের বেতন মাসিক ৩৫০০৲ টাকা। তাঁহাদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি রাজ্যের রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা দেওয়া বা না দেওয়া সম্বন্ধে রাজ্যের বিধান সভার কোন কর্তৃত্ব নাই।

কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হাই কোর্টের অধিকার (jurisdiction) দুই প্রকার--মৌলিক (Original) এবং আপীলসংক্রান্ত (Appellate)। (১) ঐ তিনটি শহরের নির্দিষ্ট অংশে (Presidency area) কোন গুরুতর দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার উৎপত্তি হইলে তাহা প্রথমেই হাই কোর্টের বিচারাধীন হয়। ইহার নাম হাই কোর্টের মৌলিক অধিকার। সম্প্রতি কলিকাতায় City Court স্থাপনের ফলে এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। (২) সাব-জজ ও জেলা জজগণের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হাই কোর্টে করিতে হয়। ইহার নাম হাই কোর্টের আপীলসংক্রান্ত অধিকার। ঐ তিনটি হাই কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য হাই কোর্টের মৌলিক অধিকার নাই, কেবলমাত্র আপীলসংক্রান্ত অধিকার আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাই কোর্টের হুকুমের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court)—ভারতের বিচার বিভাগের শীর্ষদেশে রহিয়াছে সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মুখ্য বিচারপতি (Chief Justice of India) এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতি লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। সকল বিচারপতিই ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কর্মে বহাল থাকিবেন। কেহ যদি (১) ভারতের নাগরিক হন এবং (২) পূর্বে অন্তত পাঁচ বৎসর কাল কোন হাই কোর্টের বিচারপতি রূপে বা অন্তত দশ বৎসর কাল কোন হাই কোর্টের ব্যবহারিক (Advocate) রূপে কাজ করিয়া থাকেন, অথবা (৩) রাষ্ট্রপতির মতে একজন

বিখ্যাত আইনজ্ঞ ("eminent jurist") বলিয়া গণ্য হন, তাহা হইলে তিনি প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতির অসদাচারণ বা অযোগ্যতা প্রমাণিত হইলে ঐ সম্বন্ধে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ যদি অভিযোগ করিয়া তাঁহার পদচ্যুতি দাবি করে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে ৬৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পদচ্যুত করিতে পারেন। প্রধান বিচারপতি মাসে ৫০০০্ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ মাসিক ৪০০০্ টাকা বেতন পান।

প্রধান ধর্মাধিকরণের কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) মৌলিক বিভাগ, (২) আপীল বিভাগ, ও (২) পরামর্শদান বিভাগ।

১। মৌলিক বিভাগ (Original Jurisdiction): ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে, অথবা বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে, যদি আইনসংক্রান্ত বিবাদ বাধে তবে তাহার বিচার সুপ্রীম কোর্টে হইবে।

২। আপীল বিভাগ (Appellate Jurisdiction): যে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমায় ভারতের যে কোন হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আপীল করা চলিবে, যদি এই ব্যাপারের সহিত সংবিধানের কোন ধারার ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত থাকে।

আবার হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানী মামলার আপীল চলিবে, যদি মামলায় অন্যূন ২০,০০০্ টাকার দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হইয়া থাকে। ফৌজদারী মামলায় যদি হাই কোর্ট নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া থাকে তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টে আপীল চলিবে।

৩। পরামর্শদান বিভাগ (Advisory Jurisdiction): রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবে।

সংবিধানে ভারতের নাগরিকগণকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে যে সকল মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) দেওয়া হইয়াছে সেগুলি রক্ষা করা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম প্রধান কার্য। সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি কাহারও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ (writs) জারি করিয়া ঐ অধিকার রক্ষা করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আদালতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোন বিরোধ বা মতভেদ উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় আদালতের সিদ্ধান্তই সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান রূপে গৃহীত হয়। সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দ্বারা ইহার কঠোরতার (rigidity) হ্রাস করা কেন্দ্রীয় আদালতের প্রধান কর্তব্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট দীর্ঘকাল যাবৎ এই কর্তব্য পালন করিতেছে। ভারতেও সুপ্রীম কোর্ট ইহা পালন করিতেছে।

প্রশ্ন

1. Give a brief account of the judicial system in India. (ভারতের বিচার-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।) (১৬৩-১৬৫ পৃষ্ঠা)

2. Indicate the composition and functions of the Supreme Court. (সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর।) (১৬৩-১৬৫ পৃষ্ঠা)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

স্থানীয় শাসন

স্থানীয় শাসন (Local Government)—শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি ভাগের শাসনভার বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়। এই পদ্ধতির নাম স্থানীয় শাসন।

মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্য কয়েকটি বিভাগে (ইংরেজী নাম Division) বিভক্ত। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দুইটি বিভাগ আছে—প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ। বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি কমিশনার (Commissioner)। শাসন বিভাগের প্রধান কর্মচারীরা এই পদে নিযুক্ত হন। কমিশনার বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলির শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করেন। ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি তাঁহার কর্তৃত্বাধীন থাকে।

প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি জেলায় (District) বিভক্ত হয়। ইংরেজ আমল হইতে জেলাগুলিই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ রূপে গণ্য হইতেছে। জেলা শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর (District

Magistrate and Collector)—কোন কোন ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার (Deputy Commissioner) বলা হয়। শাসনকার্যে অভিজ্ঞ কর্মচারীদিগকে জেলার ভার দেওয়া হয়। কোন কোন বিষয়ে কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইলেও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করেন, তাঁহার দায়িত্বভারও কম কঠিন নহে।

ম্যাজিস্ট্রেট রূপে জেলাশাসক জেলার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করেন। পুলিশের কাজ তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। নিম্নপদস্থ ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে কাজ করেন। বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণের (Separation of Executive and Judiciary) নীতি অনুসারে কোন কোন রাজ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার ক্ষমতা বিলোপ করা হইতেছে।

কালেক্টর রূপে জেলা শাসক ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা তাঁহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। জেলার রাজকোষ (Treasury) তিনি পরিচালনা করেন।

প্রকৃতপক্ষে জেলা শাসকের কর্মতালিকা বহু বিস্তৃত ও বিচিত্র। জেলার মধ্যে তিনি সরকারের প্রধান প্রতিনিধি। জেলার শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়ে তিনি কেন্দ্রস্বরূপ। তিনিই সরকারের "চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত"। কৃষি, বন, সেচ, চিকিৎসা, জেল, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সরকারী কার্য তাঁহাকে পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজের দিকে তাঁহাকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি বিপদ উপস্থিত হইলে বিপন্ন জনসাধারণকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হয়। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎসবাদিতে যোগদান করা তাঁহার কর্তব্যের অঙ্গ। জেলা শাসকের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং শাসন-দক্ষতার উপর জন-সাধারণের মঙ্গল ও সরকারের সুনাম অনেকাংশে নির্ভর করে।

প্রত্যেকটি জেলা কয়েকটি মহকুমায় (Sub-Division) বিভক্ত। মহকুমা শাসক (Sub-Divisional Officer) জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীনে মহকুমার শাসনকার্য নির্বাহ করেন।

পুলিশের কার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী (Superintendent of Police) থাকেন। প্রত্যেক জেলা কতকগুলি থানায় ভাগ করা হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Government)—শিক্ষা, স্বাস্থ্য,

রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে স্থানীয় অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবার অধিকারই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। মিউনিসিপ্যালটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সমবেত হইয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এই অধিকার পরিচালনা করেন।

মিউনিসিপ্যালিটি (Municipality)—অধিকাংশ শহরে এবং কোন কোন গ্রামে (যেমন, ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়ায়) মিউনিসিপ্যালিটি আছে। করদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত সভ্য বা কমিশনারগণ ইহার কার্য পরিচালনা করেন। সভাপতি বা Chairman কমিশনারগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। কোন কোন বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার সরকারের আছে। কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যালিটির কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে অবহেলা বা অযোগ্যতা প্রদর্শন করিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।

প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে হয়ঃ—

(১) সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত—টিকা দেওয়া, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা, উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহ করা, ভেজাল খাদ্য বিক্রয় বন্ধ করা; ইত্যাদি। (২) জনসাধারণকে নিরাপদে রাখা—রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তায় আলো দেওয়া, অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা করা, বাড়ীঘর নির্মাণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া; ইত্যাদি। (৩) শিক্ষাবিস্তার—স্কুল স্থাপন, স্কুল ও লাইব্রেরীতে সাহায্য দান; ইত্যাদি। (৪) সাধারণের সুবিধা বিধান—গ্যাস ও ইলেকট্রিক আলো সরবরাহ করা, শ্মশান রক্ষা করা; ইত্যাদি।

মিউনিসিপ্যালিটি বিভিন্ন কর স্থাপন করিয়া অর্থসংগ্রহ করে। যেমন,—বাড়ীঘর, ব্যবসায়, যানবাহন, জীবজন্তু, পুল, খেয়াঘাট, আলো, জল, আমোদ-প্রমোদ, বাজার প্রভৃতির উপর কর। অর্থাভাব ঘটিলে মিউনিসিপ্যালিটি ঋণ গ্রহন করিতে এবং সরকারী সাহায্য পাইতে পারে।

কলিকাতা কর্পোরেশন (Calcutta Corporation)—কোন কোন বড় শহরের মিউনিসিপ্যালিটিকে 'কর্পোরেশন' বলা হয়। ভারতে কলিকাতা কর্পোরেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ মিউনিসিপ্যালিটি। ইহার আয় বার্ষিক প্রায় আট কোটি টাকা। কর্পোরেশনের সভাপতির উপাধি 'মেয়র' (Mayor)। করদাতৃগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করেন। সাধারণ ভোটদাতাগণ ৮০ জন প্রতিনিধি (Councillor) নির্বাচন করে, এই প্রতিনিধিগণ আবার ৫ জন সভ্য (Alderman) নির্বাচন করেন। এই ৮৫ জন সভ্য

ব্যতীত একজন পদাধিকার বলে (ex-officio) সভ্য আছেন। অতএব মোট ৮৬ জন সভ্য লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন গঠিত।

এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তাকে 'কমিশনার' (Commissioner) বলা হয়। তিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি সভ্যগণের নির্ধারিত নীতি অনুসারে কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করেন। বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুসারে কমিশনার প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

শহর অঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি করদাতাদের সুবিধার জন্য যে সকল কাজ করে, কলিকাতায় কর্পোরেশন সেই সকল কাজ করে। রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত করা, রাত্রিকালে রাস্তায় আলো দেওয়া, পানীয় জল সরবরাহ করা, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা (যেমন, সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য টিকা দেওয়া), বাজার পরিচালনা ও খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা, মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বন্দোবস্ত করা—এই সকল কর্পোরেশনের প্রধান কর্তব্য।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা নানা বিষয়ে রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীন।

ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্ট (Improvement Trust)—বড় বড় শহরের অস্বাস্থ্যকর এবং আবর্জনাপূর্ণ স্থানসমূহের উন্নতি করিবার জন্য Improvement Trust গঠিত হয়। কলিকাতা, হাওড়া, বোম্বাই, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে Improvement Trust আছে।

জেলা বোর্ড (District Board)—প্রত্যেক জেলায় একটি বোর্ড আছে। ইহার সভ্যগণকে করদাতারা নির্বাচন করে। বোর্ডের সভাপতিকে (Chairman) সভ্যরা নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচন করেন। কোন কোন বিষয়ে জেলা বোর্ডের উপর সরকারী কর্তৃত্ব আছে।

গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, সংক্রামক রোগের প্রতিকার, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি জেলা বোর্ডের প্রধান কার্য। রোড সেস (Road Cess), পাব্‌লিক ওয়ার্ক্‌স্ সেস্ (Public Works Cess), খেয়াঘাটের ইজারা হইতে প্রাপ্ত আয়, মোটরগাড়ীর উপর ট্যাক্স প্রভৃতি জেলা বোর্ডের অর্থ সংগ্রহের উপায়।

গ্রাম পঞ্চায়েত—ভারতে প্রাচীন কাল হইতে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বিনষ্ট করে। বর্তমান ভারতীয় সংবিধানে

গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশে ব্যাপকভাবে "গাঁও সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৫০০ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পঞ্চায়েতের নিম্নতম প্রতিষ্ঠানের নাম গ্রাম-সভা। গ্রাম-সভার উপরে আছে অঞ্চল-পঞ্চায়েত। বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা, পথঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি কার্যের ভার ইহাদের উপর দেওয়া হইবে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামবাসীরা নানা বিষয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিবার সুযোগ পাইবে। ছোটখাট মোকদ্দমার বিচারের জন্য ন্যায় পঞ্চায়েত আছে।

প্রশ্ন

1. Give a brief account of District administration. (জেলা শাসনের ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।) (পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৬)

2. Describe the system of Local Self-Government in West Bengal. (পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা বর্ণনা কর।) (পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৯)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পল্লী ও শহরের সমস্যা

গ্রামের সমস্যা—ভারত গ্রামপ্রধান দেশ। দেশের অধিকাংশ লোক (শতকরা প্রায় ৮৮ জন) গ্রামে বাস করে। কিন্তু গ্রামগুলির যে দুর্দশা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গ্রামবাসিগণ প্রায় সকলেই অতিশয় দরিদ্র। তাহাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়ার মত সংস্থান তাহাদের নাই। তারপর, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। মাথা গুঁজিবার স্থানও স্বল্পপরিসর। তাহারা যেভাবে বাস করে তাহা সভ্য মানুষের করুণার উদ্রেক করে। জানালাহীন টিন অথবা মাটির ঘরে, যেখানে আলো হাওয়া ঢুকিবার পথ রুদ্ধ সেখানে, কোন রকমে তাহারা দিনপাত করে। অনেকে গ্রামের রৌদ্র বাতাসের গুণকীর্তন করেন। কিন্তু, এক্ষেত্রেও ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে বাতাসহীন গৃহের মধ্যে সূর্য-রশ্মি এবং হাওয়ার প্রবেশপথ খুব

কমই আছে। অনেক সময়ে আবার দুইটি গৃহের মাঝখানে খোলা জায়গা থাকে না। তাহাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়। সুতরাং যতক্ষণ গৃহের বাহিরে থাকা যায়, কেবলমাত্র ততক্ষণই রৌদ্র ও হাওয়া সেবন করা যায়। ইহাতেও সমস্যা আছে। গ্রামের নানারকম আবর্জনা, ময়লা ইত্যাদির নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা নাই। রাস্তা থাকিলেও তাহা ধূলিধূসরিত। ফলে, হাওয়া বিশুদ্ধ না হইয়া অনেক সময়েই পূতিগন্ধময় হয়। পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এত বেশী যে অপরিষ্কার জল দ্বারাই পিপাসা নিবারণ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পল্লীবাসীরা নিষ্প্রাণ হইয়া পড়ে। কাজেই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবির মনে অনুপ্রেরণা আনিলেও সাধারণ মানুষের কাছে গ্রামের কোন আকর্ষণ নাই।

গ্রামের লোকের দুরবস্থার প্রধান কারণ কাজের অভাব। কাজ নাই—বেকার অবস্থায় কেহ ভালভাবে জীবনযাপন করিতে পারে না। তাহারা পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া গ্রামের পরিবেশ পরিবর্তন করিবারও ব্যবস্থা করিতে পারে না।

তাহাদের দুরবস্থার আর একটি কারণ তাহাদের জ্ঞানহীনতা। আর্থিক দুরবস্থা এবং জ্ঞানহীনতা দূর করিতে গেলে প্রথমেই দরকার তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা—যে শিক্ষায় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হয় সেই শিক্ষা—দরকার। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হাতের কাজও শেখানো দরকার। চাষ আবাদের ভাল পদ্ধতি, কিছু কিছু কুটির শিল্প—এই সব শেখানো দরকার। গ্রামের লোকের টাকা খরচ করিয়া লেখাপড়া শেখার মত অবস্থা নয়। তাই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা দরকার। যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক, তাহারা দিনের বেলায় হয়ত মাঠে কাজ করে। তাই, তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলা দরকার। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার করা যায়। ইহার জন্য সরকারের তরফ হইতে অর্থ সাহায্য দরকার।

গ্রামের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের দেশে জন্ম এবং মৃত্যু দুই-এরই হার খুব বেশী। যেখানে ব্রিটেনে গড়পড়তা হাজারে ১২৷১৩ জন মারা যায় সেখানে আমাদের দেশে ১৬ জন মারা যায়। শিশুমৃত্যুর হারও আমাদের দেশে অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় খুব বেশী।

সেইজন্য স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সবরকম প্রচেষ্টাই দরকার। বাসস্থানের

উন্নতি করা দরকার। বাড়ীগুলি এমনভাবে তৈয়ারি করা উচিত যাহাতে সেগুলিতে আলো এবং হাওয়া ঢোকে। গ্রামের লোকদের কয়েকটি বদ অভ্যাস আছে। যেমন, তাহারা যেখানে সেখানে মাঠে ঘাটে মলত্যাগ করে, আর বাড়ীর যত আবর্জনা ঘরের পাশে ফেলিয়া রাখে। জল নিষ্কাশনেরও কোন ব্যবস্থা রাখে না। ইহাতে শুধু যে বাতাস পূতিগন্ধময় হয় তাহা নহে, যেখানে সেখানে জল জমিয়া থাকার জন্য মশামাছির উৎপাত অসম্ভব বাড়িয়া যায়। এইজন্য ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদির প্রকোপ গ্রামাঞ্চলে খুব বেশী। গ্রামে জল নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা তৈয়ারি করা প্রয়োজন। পচা খাল ডোবা ভরাট করা দরকার। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করার অভ্যাস দূর করা দরকার। আবর্জনা ফেলিবার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করা উচিত এবং মাঝে মাঝে এই সব আবর্জনা জ্বালাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ভয়ানক অভাব। গ্রামে পুষ্করিণীই সাধারণত জলের অভাব মিটায়। কিন্তু অধিকাংশ পুষ্করিণীই পচা জলে এবং কচুরিপানায় ভর্তি। লোকে একই পুষ্করিণীতে স্নান করে, বাসন মাজে, গরু-মহিষাদিকে স্নান করায় এবং সেখান হইতেই নিজেদের জন্য পানীয় জল আনে। কাজেই "বিশুদ্ধ পানীয় জল" কথাটা গ্রামাঞ্চলে অচল। এই পানীয় জলের অভাবে গ্রামাঞ্চলে নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপ খুব বেশী। গ্রামাঞ্চলে রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাও চাই। স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রয়োজন লোকের অজ্ঞতা দূর করা। এইজন্য মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খোলা দরকার। গ্রামে মজা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা উচিত। একই পুষ্করিণীতে মানুষ এবং পশু যাহাতে তাহাদের সর্ববিধ কর্ম সম্পন্ন না করে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নূতন নূতন পুষ্করিণী ও নলকূপ খনন করা উচিত। রোগের চিকিৎসার জন্য ঔষধালয় ও হাসপাতাল বেশী সংখ্যায় রাখা উচিত। এই সব কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা জেলা বোর্ডের মারফৎ করা উচিত। রাজ্য সরকার উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলে এবং সেই অর্থ উপযুক্ত ভাবে বিনিয়োগ করিলে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

আমাদের দেশে গ্রামগুলিতে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ। কোন কোন গ্রামে একমাত্র পায়ে চলার রাস্তা ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্য কোন কোন জায়গায় হয়ত গরুর গাড়ী চলিতে পারে এইরূপ রাস্তা আছে। ভাল রাস্তা ঘাট না থাকিলে কত যে অসুবিধা হয় তাহা বলা যায় না। অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে

কোন যোগাযোগ থাকে না। ইহাতে গ্রামের আর্থিক উন্নতিও হয় না। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের কথা তো বলাই বাহুল্য। এইজন্য ভাল রাস্তাঘাট তৈয়ারি করা দরকার। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জেলা বোর্ডের এই বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। তাহারা উদ্যোগী হইলে গ্রামের রাস্তাঘাট খুব অল্পসময়ের মধ্যে ভাল করা যায়।

গ্রামের লোকের সর্ববিধ দুর্দশার মূল কারণ হইল তাহাদের কর্মহীনতা। বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ সময়ে বেকার থাকে। যাহারা চাষ আবাদ করে তাহারাও বৎসরের অর্ধেক সময়েই বসিয়া থাকে। যাহারা দিন মজুরি করে তাহারাও এক ধান কাটার সময় ছাড়া অন্য সময়ে প্রায় বসিয়াই থাকে। এই কর্মহীনতার দরুণ তাহাদের আয়ের পরিমাণ অতিশয় সামান্য এবং অল্প আয়ের জন্য তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত। এইজন্য গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান করা নিতান্ত দরকার। কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে গোমহিষাদি এবং হাঁসমুর্গী পালন এবং নানাবিধ কুটিরশিল্পের বহুল প্রসার দরকার। শুধু তাই নয়, এই সব কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদি যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হয় সে ব্যবস্থাও করা দরকার।

খাদ্য, পরিধেয় এবং বাসগৃহের ব্যবস্থা একটা চলনসই মানে পৌছান শ্রম এবং সময় সাপেক্ষ। ইহার জন্য বহু টাকারও প্রয়োজন। একটা পরিকল্পনা ছাড়া ইহা করা অসম্ভব।

গ্রামগুলির দুর্দশার জন্য লোকে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসে। গ্রামের দিকে কেহ দৃষ্টি দেয় না। ইহার ফলে শহরের সমস্যা যেমন বাড়ে, গ্রামের অবস্থাও ততোধিক খারাপ হয়। গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে পারিলে লোকে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিবে না। তাহাতে গ্রাম এবং শহর উভয়েরই উন্নতি হইবে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নতির জন্য যেমন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তেমনি গ্রামোন্নয়নের জন্যও ব্যবস্থা হইয়াছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Project)— এই পরিকল্পনার কাজ ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর সুরু হইয়াছে। ৫৫টি 'প্রজেক্টে' (project) কাজ আরম্ভ হয়। এক একটি 'প্রজেক্টে' প্রায় ৩০০টি গ্রাম, প্রায় ২ লক্ষ লোক এবং প্রায় দেড়লক্ষ একর পরিমাণ চাষের জমি আছে। এক একটি 'প্রজেক্টে'র আয়তন ৪৫০-৫০০ বর্গ মাইল। এক একটি 'প্রজেক্টে' ৩টি করিয়া 'ডেভেলপমেন্ট ব্লক' (Development Bloc) আছে। পশ্চিমবঙ্গে ৮টি ও আসামে ৪টি 'প্রজেক্ট' আছে।

জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থা (National Extension Service)—পল্লী-উন্নয়নের কাজ দেশের সর্বত্র প্রসারের জন্য সরকার কমিউনিটি প্রজেক্টের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার (National Extension Service) কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই দুইটি কর্মসূচী পরস্পরের পরিপূরক। জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার দ্বারা যে সমস্ত জায়গাকে উন্নত করা হয়, সেখানে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মারফৎ সর্বাঙ্গীন এবং সুষ্ঠু উন্নতির চেষ্টা করা হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় আর্থিক উন্নতির দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়, কিন্তু সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল গ্রামের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে :

(১) কুটিরশিল্প এবং স্বল্পায়তন শিল্পের উন্নতি—যাহাতে অধিকতর কর্মসংস্থান হয়।

(২) সমবায় প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রসার।

(৩) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রথার ভিত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পঞ্চায়েত প্রথার প্রসার।

(৪) গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং খেলাধূলার উন্নতি।

(৫) গ্রামে রাস্তাঘাট নির্মাণ।

(৬) উন্নত ধরণের বাসগৃহের জন্য নক্সা এবং পদ্ধতি নিরূপণ।

সরকার ও পল্লী-উন্নয়ন—গ্রামের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের কাজে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রণালী এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে মাধ্যম অথবা বাহক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শেষ হইলে, অর্থাৎ ১৯৬০-১৯৬১ সালের মধ্যে, দেশের সর্বত্র জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার 'ব্লক' (Bloc) স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৪০টি 'ব্লক'কে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার 'ব্লকে' রূপান্তরিত করার হিসাব ছিল। ২,২০,৮৬৩ গ্রামের মধ্যে ৯৩,২৬০টি গ্রামকে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা নব রূপায়িত করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

এই পরিকল্পনাগুলির জন্য ভার বহন করে আংশিকভাবে জনসাধারণ এবং আংশিকভাবে সরকার। প্রত্যেক 'প্রজেক্টে' (Project area) লোকদের নিকট

হইতে কিছু কিছু অর্থ, শ্রম এবং জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হয়। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ভাগাভাগি করিয়া অর্থসাহায্য করে। দ্বিতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার কাজের জন্য সরকার মোট ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছিল।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি কিনিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারত সরকারকে অর্থসাহায্য করিয়াছে। তাহা ছাড়া আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞও আনা হইয়াছে। আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন (Ford Foundations) প্রথম হইতেই বহু লোককে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে শিক্ষা দিতেছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠন—সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার শীর্ষে রহিয়াছে ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। কেন্দ্রে (Centre) একটি কমিটি আছে। এই কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছেন পরিকল্পনা কমিশনের সভ্যগণ, খাদ্য ও কৃষি এবং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মন্ত্রিগণ। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি। এই কেন্দ্রীয় কমিটি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূলনীতি নির্ধারণ করে। কার্য পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য উন্নয়ন কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। ইহাতে আছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (সভাপতি), উন্নয়ন দপ্তরগুলির মন্ত্রিগণ, এবং কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে উন্নয়ন কমিশনার। উন্নয়ন কমিশনারের কার্য হইল উন্নয়ন দপ্তরগুলিতে কাজগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলার উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। জেলা কমিটিতে আছেন জেলার উন্নয়ন দপ্তরগুলির কর্তাগণ, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান এবং অন্য কয়েকজন বেসরকারী সভ্য। প্রতিটি 'ব্লকে' একজন 'ব্লক' উন্নয়ন কর্মচারী (Bloc Development Offcer) থাকেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ থাকেন। পরিশেষে আছেন 'গ্রামসেবক' (Village Level Worker)। ৫-১০টি গ্রাম তাঁহার অধীনে। গ্রামগুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাঁহার। এই পরিকল্পনা সরকারী উদ্যোগে চালু হইলেও বেসরকারী সহযোগিতা সব সময়েই প্রয়োজন এবং আদৃত। বেসরকারী মতামত প্রকাশ করিবার নানারূপ মাধ্যম আছে। গ্রামসেবক তাঁহার কাজ চালান পঞ্চায়েত অথবা উন্নয়ন সমিতির সহযোগিতায়। প্রতি 'ব্লকে' আবার 'ব্লক' অফিসারের সঙ্গে পরামর্শদান কমিটি আছে। বলা বাহুল্য, প্রধান নিয়ন্ত্রণের ভার আইনসভার

হাতে। কেন্দ্রে পার্লামেণ্ট এবং রাজ্যগুলিতে রাজ্য আইনসভা নির্দেশ দেয় এবং সমালোচনা করে।

শহরের সমস্যা—গ্রামের যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, শহরেও সে সব সমস্যা আছে। তবে কোন কোন বিষয়ে শহরের সুবিধা আছে। শহরের অধিবাসীদের গ্রামের অধিবাসীদের চেয়ে আয় বেশী, কাজের সুবিধা বেশী, শিক্ষালাভের সুযোগও অনেক বেশী। তাহা ছাড়া, জীবন ধারণের অন্য নানারূপ সুখ-সুবিধা শহরে অনেক বেশী। রাস্তাঘাট, যানবাহন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রামের চেয়ে শহরে অনেক ভাল। শহরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বেশী। করদান করিয়া এবং শিক্ষার সুযোগ লইয়া শহরের লোক তাহাদের পরিবেশের উন্নতি করিতে পারে।

শহরের প্রধান সমস্যা বাসগৃহের। প্রায় শহরই নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে গঠিত। কাজেই ঘরবাড়ী অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি। রাস্তাগুলিও সরু এবং নোংরা। অল্প জায়গা লইয়া বাড়ীগুলি তৈয়ারি হয় বলিয়া বাড়ীর মধ্যে কোন ফাঁকা জায়গা থাকে না। আর খুব ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বাড়ী তৈয়ার হওয়ার দরুণ বাড়ীর মধ্যে আলো হাওয়া খুব বেশী চলাচল করিতে পারে না। রাস্তার ঠিক উপরেই বাড়ী এবং রাস্তায় যথেষ্ট আবর্জনা থাকার জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা করা কঠিন। তাহা ছাড়া লোক অনুপাতে বাড়ীর সংখ্যা খুব কম, তাই বহু লোক একত্র এক বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হয়। যাহারা বস্তীতে থাকে তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বস্তীগুলি মানুষের বাসের অযোগ্য। ধোঁয়া, ধূলা এবং অন্ধকারের রাজত্ব সেখানে। তার উপর জলেরও অভাব। এমন অবস্থায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ সেখানে খুব বেশী।

কাজেই শহরে বাসগৃহের সমস্যা অতি কঠিন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য বস্তীগুলিকে উচ্ছেদ করিয়া নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা। যে সব শহরে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট (Improvement Trust) আছে সেখানে উহারা ছোট ছোট বাড়ী তৈয়ারি করিয়া ভাড়া দিতে পারে অথবা বিক্রয় করিতে পারে। রাজ্য সরকারও এবিষয়ে অবহিত হইলে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। কলিকাতায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ফ্ল্যাটবাড়ী করিয়া ভাড়া দিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ফ্ল্যাটবাড়ী করিয়া ভাড়া দিতেছে। ইহাতে মধ্যবিত্ত লোকদের কিছু সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা অতি সামান্য। সরকার ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট বস্তী উন্নয়নের জন্যও চেষ্টা করিতেছে। তবে এখন পর্যন্ত এই চেষ্টা সফল হয় নাই।

শহরের আর একটি সমস্যা হইল জলের। বড় বড় শহরে জল সরবরাহ করে মিউনিসিপ্যালিটি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কম। যাহারা জল পায় তাহারা জলের অপচয়ও করে। এজন্যও নানারূপ অসুবিধা হয়। জলের সরবরাহ বাড়ানো খুব কঠিন নয়। নলকূপ বসাইয়া অতি সহজেই জল সরবরাহ বাড়ানো যায়।

জলের সঙ্গে আরও একটি জিনিসের অভাব খুবই গুরুতর। সেটি হইল খাঁটি দুধ। এই বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির তৎপর হওয়া উচিত। খাটালগুলির উপর এবং দুধ-বিক্রেতাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় দুধ সরবরাহ করিয়া এই বিষয়ে কিছুটা উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সমগ্র কলিকাতার প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী সরবরাহ অতি সামান্য।

শহরের আরও একটি সমস্যা হইল আবর্জনা পরিষ্কার করা এবং ধোঁয়া অপসারণ। রাস্তার আবর্জনার জন্য রাস্তায় ঘাটে চলাফেরা করা কঠিন হইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কাজ শহরকে পরিষ্কার রাখা। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম মিউনিসিপ্যালিটি এবিষয়ে তৎপর।

এটা অবশ্য ঠিক যে করদাতাগণ ঠিকমত কর দেয় না বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি যথেষ্ট টাকা পায় না। কিন্তু যাহা পায় তাহাও যদি যথাযথভাবে ব্যয় করে তাহা হইলেও অনেক কাজ করা যায়। মিউনিসিপ্যালিটি যদি তৎপর হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক শহরকে স্বায়ত্তশাসিত একটি ছোটখাট রাজ্যের মত করিয়া তুলিতে পারে। শহরে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া, শহরের যানবাহনাদি পরিচালনা করিয়া, শহরে বৈদ্যুতিক আলো এবং গ্যাস সরবরাহ করিয়া, উপরন্তু নানাবিধ শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শহরগুলিকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যময় করিয়া তোলা যায়।

প্রশ্ন

1. Describe the main problems of the rural areas and indicate some remedies. (গ্রামাঞ্চলের প্রধান সমস্যাগুলি আলোচনা কর এবং কয়েকটি প্রতিকার নির্দেশ কর।) (পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭২)

2. Write a note on Community Development Projects. (সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিখ।) (পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৩)

3. How can the municipal areas be improved ? (মিউনিসিপ্যালিটির অন্তভুক্ত অঞ্চলগুলি কিরূপে উন্নত করা যায় ?) (পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

দেশরক্ষার ব্যবস্থা

প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করিত। স্বাধীনতা লাভের পর সামরিক শক্তি দেশের স্বাধীনতা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইতেছে।

অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও দেশরক্ষীরা তিনটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত: স্থলসৈন্যবাহিনী (Army), নৌসৈন্যবাহিনী (Navy), বিমান-বাহিনী (Air Force)।

স্থলসৈন্যবাহিনীর প্রধান অধিনায়ককে Chief of the Army Staff বলা হয়। তাঁহার অধীনে তিনজন সেনানায়ক (General Officer Commanding) পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে (Zone) তিনটি আঞ্চলিক বাহিনী পরিচালনা করেন। ভারতের স্থলসৈন্যসংখ্যা মোট একলক্ষ ত্রিশ হাজার।

নৌসৈন্যবাহিনীর প্রধান অধিনায়ককে Chief of the Naval Staff বলা হয়। তাঁহার অধীনে ৫০০ নৌসৈন্যনায়ক (naval officer) এবং ৫,৫০০ নৌসৈন্য (naval ratings) আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে ভারতে নৌবহর রহিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় নৌবহরে একটি Cruiser, তিনটি Destroyer এবং অন্যান্য শ্রেণীর কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ আছে।

বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষকে Chief of the Air Staff বলা হয়। আধুনিক ধরণের বিমান ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া এই বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হইতেছে। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় বিমান বাহিনীর কেন্দ্র আছে।

দেশরক্ষীদিগকে শিক্ষাদানের জন্য সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নৌসৈন্য-বাহিনীর জন্য কোচিন, লোনাভালা এবং জামনগরে শিক্ষাব্যবস্থা আছে। বিমানবাহিনীর জন্য বাঙ্গালোর, কৈম্বাটোর এবং আম্বালাতে শিক্ষাব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া পুনায় জাতীয় সামরিক শিক্ষালয় (National Defence

Academy) এবং ওয়েলিংটনে (দক্ষিণ ভারত) দেশরক্ষা বাহিনীর শিক্ষালয় (Defence Services Staff College) আছে।

দেশরক্ষা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে Defence Science Organisation প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশরক্ষা সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্ট। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সভ্য দেশরক্ষা সচিব (Defence Minister) তিনটি বাহিনীর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্য দায়ী।

ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের রক্ষার জন্য সুবৃহৎ বাহিনী প্রয়োজন। অত বড় বাহিনী সুসজ্জিত রাখিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা ভারতের নাই। ইহা ছাড়া স্বাধীন দেশের নাগরিকগণের পক্ষে কিছু সামরিক শিক্ষা প্রয়োজন, তাহা হইলে কোন আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে সকলেই দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। যাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেজন্য Territorial Army এবং 'লোকসহায়ক সেনা' (National Volunteer Force) গঠন করা হইয়াছে। আবার স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর (National Cadet Corps) গঠন করা হইয়াছে। Territorial Army, National Volunteer Force এবং National Cadet Corps-এর সভ্যগণ প্রকৃতপক্ষে বেতনভোগী সৈন্য না হইলেও দেশরক্ষার জন্য তাহাদের উপর খানিকটা নির্ভর করা যায়।

ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর (National Cadet Corps)—১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ একটি আইন অনুসারে N. C. C. গঠিত হয়। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যাহাতে পরস্পরের সহিত সখ্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতির সেবা করিতে শিখে এবং ভবিষ্যতে জাতির নেতৃত্বের উপযুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করাই N. C. C. সংগঠনের উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে দেশরক্ষা সম্বন্ধে যুবকদের কৌতূহল উৎপাদন করা N. C. C.র অন্যতম উদ্দেশ্য। N. C. C.র সহিত সংযুক্ত যুবকগণের মধ্য হইতে পরে সামরিক কর্মচারী নিয়োগ করার সুবিধা হইবে, আর যে সকল ক্যাডেট সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিবে না তাহারাও দেশের বিপদ উপস্থিত হইলে সামরিক কার্যে সহায়তা করিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা মন্ত্রী দপ্তর (Ministry of Defence)

N. C. C. সংক্রান্ত সকল কার্য পরিচালনা করে। N. C. C.র তিনটি শাখা আছে; (১) Senior Division কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য—ইহাদের বয়স ২৬ বৎসরের বেশী হইবে না; (২) Junior Division: স্কুলের ছাত্রদের জন্য—ইহাদের বয়স ১৩ হইতে ১৭ বৎসরের মধ্যে হইবে; (৩) Girls Division—কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য। কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকগণকে সামরিক প্রথায় শিক্ষাদান করিয়া পরে তাঁহাদের দ্বারা ক্যাডেটদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমর বিভাগের কর্মচারীরা তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। Senior Division এবং Junior Division উভয়ই তিনটি শাখায় বিভক্ত: Army Wing, Naval Wing, Air Wing; ইহারা যথাক্রমে স্থলসৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট।

ক্যাডেটদিগকে যে কেবলমাত্র সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নহে; সমাজসেবামূলক কার্য তাহাদের শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। তাহারা গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, জল সরবরাহের সুবিধার জন্য খাল খনন এবং পুকুর ও কূপের উন্নতি সাধন করে, বিদ্যালয় ও পঞ্চায়েতের জন্য গৃহ নির্মাণ করে, অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেয় এবং তাহারা পীড়িত হইলে সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এই সকল গঠন-মূলক কাজের মধ্য দিয়া জনসাধারণের সহিত তাহাদের বন্ধুত্বমূলক যোগাযোগ ঘটে এবং দেশের ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মে।

তিন বৎসর পূর্বে ক্যাডেটদের মোট সংখ্যা ছিল ৯৮,৭৭৭; বর্তমানে সংখ্যা বাড়িয়াছে। N. C. C.র জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করে।

প্রশ্ন

1. Write what you know of India's defence arrangements. (ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।) (পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮)

2. Write a short note on National Cadet Corps. (ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।) (পৃষ্ঠা ১৭৮-১৭৯)

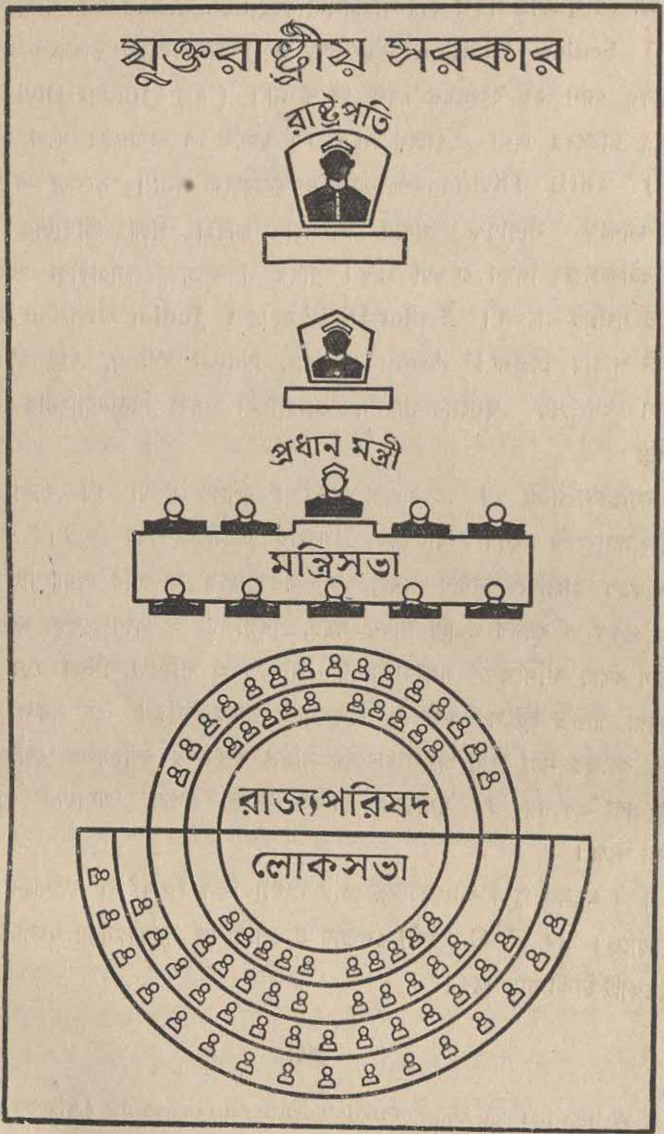
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
রাষ্ট্রপতি
প্রধান মন্ত্রী
মন্ত্রিসভা
রাজ্যপরিষদ
লোকসভা

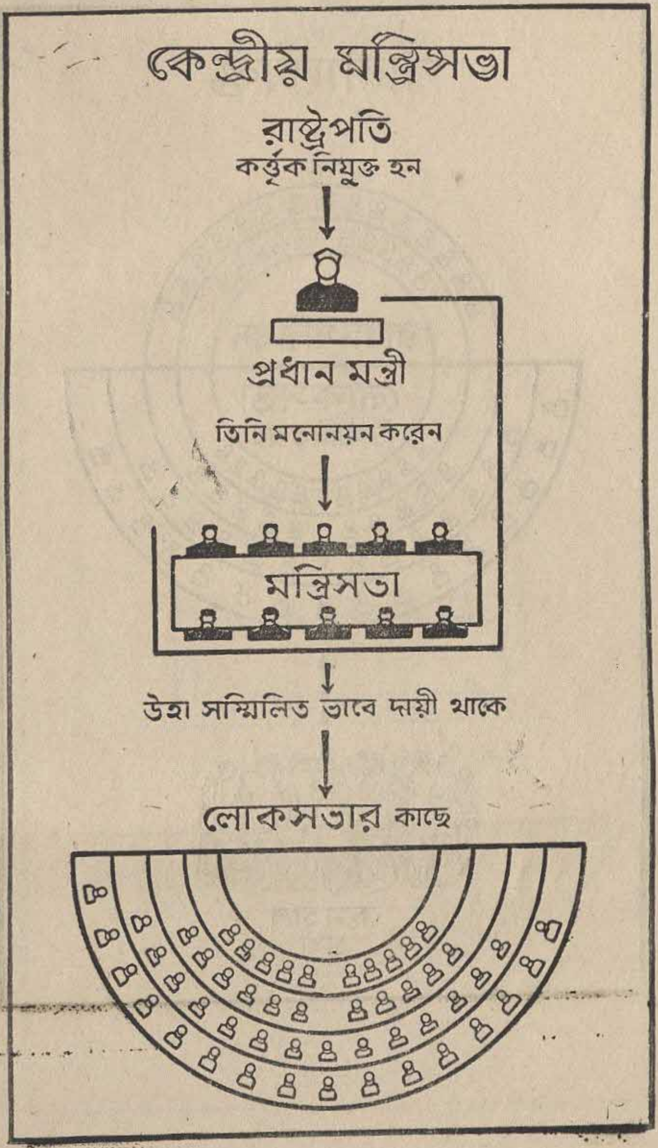
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
রাষ্ট্রপতি
কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন
প্রধান মন্ত্রী
তিনি মনোনয়ন করেন
মন্ত্রিসভা
উহা সম্মিলিত ভাবে দায়ী থাকে
লোকসভার কাছে

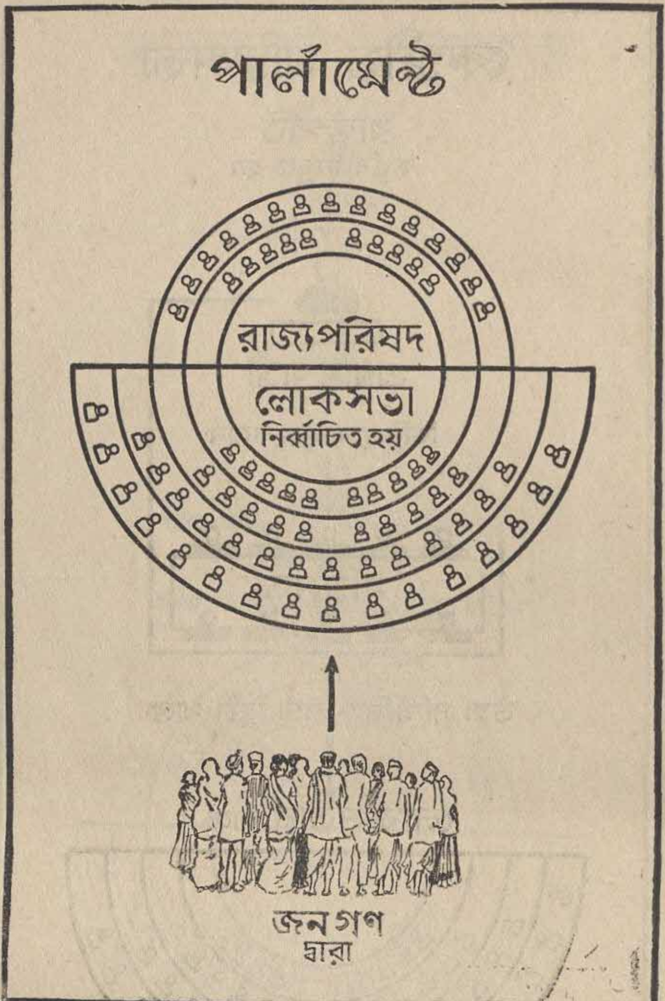
পার্লামেন্ট
রাজ্যপরিষদ
লোকসভা
নির্বাচিত হয়
জনগণ
দ্বারা

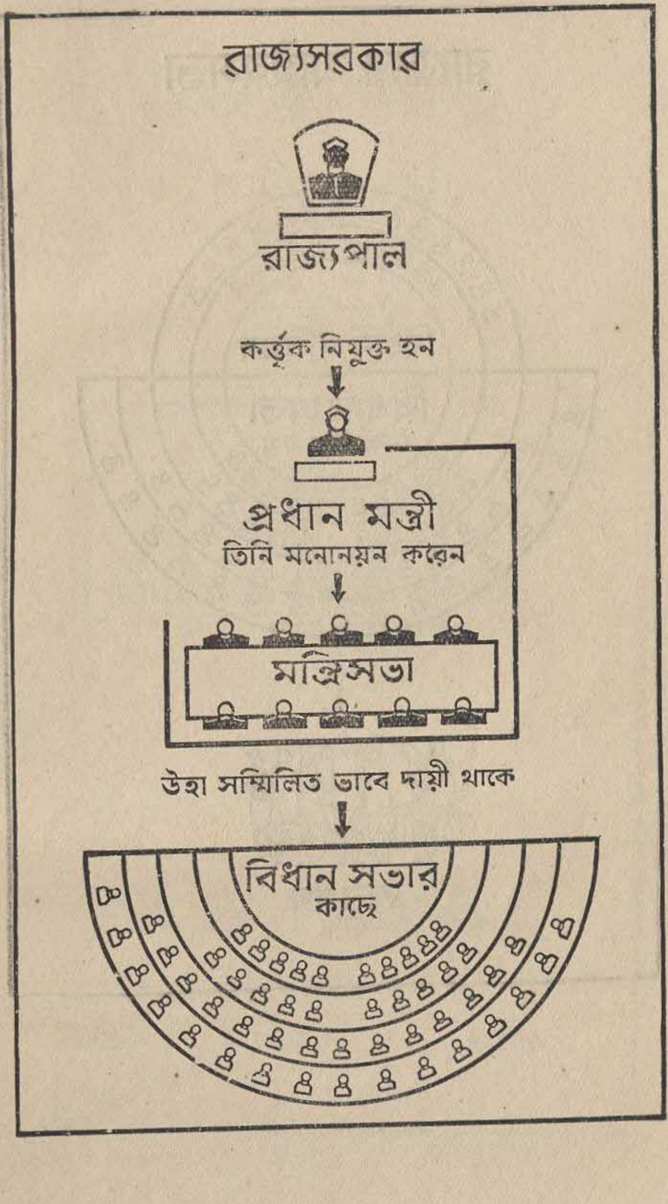
রাজ্যসরকার
রাজ্যপাল
কর্তৃক নিযুক্ত হন
প্রধান মন্ত্রী
তিনি মনোনয়ন করেন
মন্ত্রিসভা
উহা সম্মিলিত ভাবে দায়ী থাকে
বিধান সভার
কাছে

রাজ্যের আইনসভা

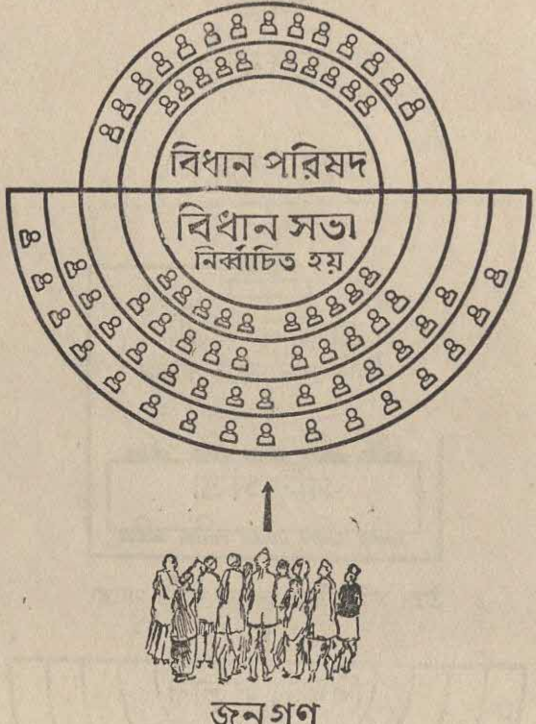

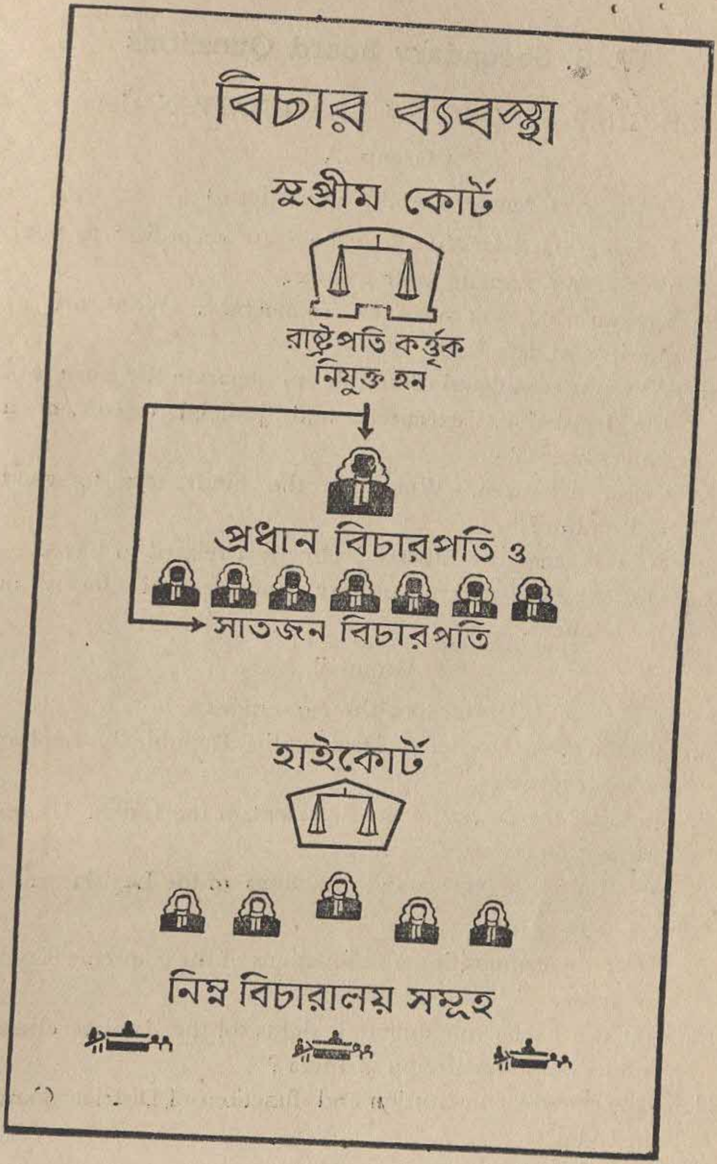
বিচার ব্যবস্থা
সুপ্রীম কোর্ট
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন
প্রধান বিচারপতি ও
সাতজন বিচারপতি
হাইকোর্ট
নিম্ন বিচারালয় সমূহ

W. B. Secondary Board Questions

HIGHER SECONDARY EXAMINATION—1960

Group A

(Answer any three questions)

1. Define a State. Is West Bengal a State according to your definition ? Explain your answer.
2. Explain what you mean by Democracy. What are its merits and defects ?
3. Why is it considered desirable to separate the powers of the legislative, executive and judicial organs of a Government ?
4. Define a citizen. What are the hindrances to good citizenship ?
5. What is meant by Liberty ? How is it related to Law ?

or Distinguish between unitary and federal forms of government.

Group B

(Answer any three questions)

6. "India is a sovereign Democratic Republic"—Explain what it means.
7. Indicate the powers of the President of the Indian Union. How is he elected ?
8. What are the powers and functions of the Legislature of West Bengal ?
9. State the composition and functions of the Supreme Court of India.
10. What are the fundamental rights of the Indian citizen under the Constitution of India ?
11. Describe the constitution and functions of District Boards in India.

———

HIGHER SECONDARY EXAMINATION—1960

COMPARTMENTAL

Group A

(Answer any three questions)

1. Explain and criticise the Social Contract theory about the origin of the State.
2. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of Government. Is the Government of India Presidential or Parliamentary ?
3. State and explain the Socialist theory about the functions of Government.
4. Define a party. What are the merits and demerits of a Party System of Government ?
5. What is meant by Public Opinion ? How is Public opinion formed in a country?

Group B

(Answer any three questions)

6. What are Directive Principles of State Policy as stated in the Indian Constitution ? What is their significance ?
7. State and explain the important characteristics of the Federation of India.
8. How does the Union Legislature exercise its control over the Union Executive ?
9. Discuss the position and powers of the Governor of a State in the Indian Union.
10. State the relation between the Centre and the States of the Indian Union on legislative and executive matters.

HIGHER SECONDARY EXAMINATION—1961

Group A

(Answer any three questions)

1. Explain the characteristics of the State and distinguish it from other associations.
2. Distinguish between Direct and Indirect Democracy. What are the defects of a democratic form of government ?
3. Explain the limits to the theory of Separation of Powers. Give examples.
4. Define a citizen. What are the qualities of a good citizen ?
5. "Rights and Duties go together."—Explain.

Group B

(Answer any three questions)

6. State at least four of the Fundamental Rights of an Indian citizen. How are these Fundamental Rights protected in the Indian Constitution ?
7. What are the characteristic features of the Federation of India ?
8. Describe the organisation of the Judiciary in India.
9. What are the functions of Municipalities in India ? What are their principal sources of revenue ?
10. Describe the position and powers of the President of the Indian Union.

TEXT BOOKS FOR HIGHER SECONDARY STUDENTS

ভারত কাহিনী ও আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস
ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তর্কশাস্ত্র-প্রবেশ
ডঃ কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল
শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

★ ★ ★

BEST HELP BOOKS FOR HIGHER SECONDARY STUDENTS

Higher Secondary History Companion in Bengali
By A GOLD MEDALIST

Higher Secondary Logic Companion in Bengali
By Prof. R. C. MUNSHI

A. MUKHERJEE & CO., PRIVATE LTD.
2, BANKIM CHATTERJEE STREET :: CALCUTTA-12